দ্বাদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬২ - আষাঢ় ১৩৬৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

দ্বাদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬২ - আষাঢ় ১৩৬৩

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

কৃষ্ণ-যশোদা

চিত্রাধিকারী শ্রীঅভয় খাটাউ

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅরবিন্দমোহন বসুকে লিখিত

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

· ·র চিঠি পড়ে দেখলুম। তিনি আমার সম্বন্ধে এতটা বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে আমার মত কি তা ভাল করে পড়েও দেখেননি। আমি কোনো প্রবন্ধে[১] কোনো জায়গাতেই বলিনি যে "বয়কট" বন্ধ করা উচিত। আমি কোথাও আভাসে মাত্রও বলিনি যে ভারতবর্ষে সব জাতিকেই ঠিক একই ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে— পৌত্তলিকতার দোষগুণ সম্বন্ধে আমি কোনো কথা এ পর্য্যন্ত উত্থাপন করিনি। আমি কেবলমাত্র এই কথাটুকু বলেছি যে বয়কটই করি আর যাই করি অন্যায় অসত্য অধর্ম্মকে অবলম্বন করে চল্লে কিছুতেই আমাদের শ্রেয় হবেনা। যা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সত্য যা সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল তাকে কোনো উপস্থিত প্রয়োজনসাধনের কাছে খর্ব্ব করে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারবনা, তা সে চেষ্টাকে যত বড় নামই দাওনা। ধর্ম্মকে দেশে প্রতিষ্ঠা না করে দেশকেই ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার যে চেষ্টা তাকে য়ুরোপীয় নজিরের খাতিরে আমরা কখনই শ্রদ্ধা করতে পারবনা। Manlinessএর দোহাই দিয়ে ধর্ম্মকে দুর্ব্বল Sentimentalism বলে উড়িয়ে দেবার একটা প্রথা য়ুরোপে আছে আমরাও তার নকল করতে সুরু করেছি— কিন্তু আমাদের দেশে যাকে মনুষ্যত্ব বলে তা Manlinessএর চেয়ে অনেক বড়— আমরা যেন ঐ য়ুরোপীয় Manlinessএর ধিক্কারে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি ঐ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত না হই। আমাদের দেশে বলেচেন, "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ভূমা অর্থাৎ যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁকেই জানতে তাঁকেই লাভ করতে চাইবে— তাঁকে আর কিছুরই কাছে ছোট করতে চাইবেনা— যদি তাঁকে খর্ব্ব করে প্যাট্রিয়টিজম্‌কেই চরম করে তুলি তবে সে প্যাট্রিয়টিজম্ একটা ঘোরতর অন্ধতা; আমাদের দেশের হাঁচি টিকটিকি, ওলাবিবি ঘেঁটুপূজার মতই অন্ধতা; প্রভেদ এই যে, এই অন্ধতার উপর সভ্যদেশের ছাপ মারা আছে— এই অন্ধতা বড় নাম ধরে আমাদের বড় রকম করে ভোলাতে পারে। একথা নিশ্চয় মনে রাখতে হবে দেশ আমাদের দেবতা নয়— অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে আমরা দেশকে বরণ করতে পারিনে। তুমি Creed of Buddhaতে পড়েছ যে বুদ্ধদেব বলেছেন "Conduct moulds character and character is destiny." ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল কোনো আকস্মিক কার্য্য উদ্ধারের জন্যে যদি নিজের character নষ্ট করতে থাকে তবে মূলধন খুইয়ে বসে দেউলে হবার পথে যায়। যাই হোক এ সমস্ত তর্কের বিষয় নয় এ হল গোড়াকার কথা— সংসারের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে প্রবৃত্তির সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে, প্রয়োজনের সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে এই একটি হাল অটলভাবে চেপে ধরে থাকতেই হবে যে, লাভই হোক আর ক্ষতিই হোক, বাঁচিই আর মরিই,

ধর্ম্মকে, ভূমাকে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সত্যকে মহত্তম মঙ্গলকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করবই— দুর্ব্বলতাবশত তার থেকে ভ্রষ্ট হতে পারি কিন্তু স্পর্দ্ধা করে কোনোদিন যেন একথা মনে চিন্তাও না করি যে ধর্ম্ম চুলোয় যাক দেশকে আমি বড় করে তুলব দেশের জন্যে চুরি করব, ডাকাতি করব, অন্যায় করব। দৈশিকতা (প্যাট্রিয়টিজম্) আমাদের আত্মাকে চরম আশ্রয় দিতে পারবেনা, আমি মনুষ্যত্বকে বরণ করে নিয়েছি— আমি হীরের মূল্যে কাচ কিনব না— দৈশিকতা যে মনুষ্যত্বকে লঙ্ঘন করবে এত আমি আমার জীবনে ঘটতে দিতে পারবনা— সেই পথে দু পা বাড়িয়েই দেখলুম পারলুম না— দেশকে ছাড়িয়ে যদি ধর্ম্মকে যদি বিশ্বমানবকে না দেখতে পাই, যদি দেশের সংস্কারে আমার ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আমি আমার আত্মার খাদ্য হতে বঞ্চিত হই।

· ·যে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন সেটা কেবল বর্ত্তমান সময়ের উত্তেজনাবশত। এই জন্যই আমার উপরে অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন। এ সমস্তই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে বারম্বার প্রার্থনা করেছি তাঁকে যেন আমি আমার সমস্ত সমর্পণ করতে পারি তাহলেই আমার সকল বোঝা হাল্‌কা হয়ে যাবে— আমার খ্যাতি যদি তিনি কেড়ে নেন আমি যদি বন্ধু ও অন্য সকলের দ্বারা অবজ্ঞার সহিত তিরস্কৃত হতে পারি তাহলে আমার মঙ্গলই হবে— এখনও আমি অন্যের মুখাপেক্ষা করে থাকি আমার সেই আজন্মের অভ্যাস কাটেনি— সম্পূর্ণ একলা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত জীবন ভরে উঠবে এমন শুভদিন যদি তিনি দেন তবে আমি ধন্য হব। আমার প্রতি যদি কেউ বিমুখ ও বিরক্ত হন তাহলে তুমি মনে কিছুমাত্র বেদনা বোধ কোরোনা— ঈশ্বর আমার সমস্ত ক্ষতিপূরণ করবেন প্রত্যেক ক্ষতিতে আমি তাঁকেই বেশি করে ধরব— আমি তাঁকে কিছুতে ছাড়বনা। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ১৩১৫ সালে রচিত, স্বদেশী আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী—"পথ ও পাথেয়", বঙ্গদর্শন ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ, ভারতী ১৩১৫ আষাঢ়; "সমস্যা", প্রবাসী, বঙ্গদর্শন ১৩১৫ আষাঢ়; "সদুপায়", প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী ১৩১৫ শ্রাবণ; "দেশহিত", বঙ্গদর্শন ১৩১৫ আশ্বিন। প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধমালার সর্বশেষ রচনায়— সম্ভবতঃ এইটিই এই পত্রের অব্যবহিত উপলক্ষ্য— রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

'· ·এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।· ·যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্দেশ্যসাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।· ·আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই?· ·উন্মত্ততা অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না?· ·জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।· ·আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে-নামে যে-বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে; আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে।· ·দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণকরাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল— সে-ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না— সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।'

বাউল-পরিচয়

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

বাউল অর্থ পাগল। কেহ কেহ অর্থ করেন যাহারা বায়ু সাধন করিয়া সুষুম্নাপথে দেহস্থিত চক্রের পর চক্র ভেদ করে তাহারাই বায়ুল বা বাউল। বাউলদের মধ্যে অনেকে চক্রবেধ মানেন বটে, কিন্তু তাহা যে বায়ু দ্বারা সাধিত হয় তাহা সকলে মানেন না। অনেকে মনে করে সেই "বেধ ধ্যানবেধ।" দেহতত্ত্ব ও যোগশাস্ত্রের গ্রন্থে ও জ্ঞানের ও ধ্যানের দ্বারাও বেধের কথা বুঝিতে পারা যায়। কাজেই বাউল অর্থ "বায়ু দ্বারা চক্রবেধক মণ্ডলী" এ কথা মানা গেল না। বাউলের পাগল অর্থ ধরাই স্বাভাবিক। ইহা ঠিক বুঝাইবার জন্য নরহরির একটি পদ উল্লেখ করা যাইতেছে—

> তাই তো পাগল (বাউল) হৈনুঁ ভাই।
> এখন লোকের বেদের ভেদ-বিভেদের আর তো দাবিদাওয়া নাই।
> নাই হাকম হুকম জুলুম নেম রীতি,
> নিজানন্দে চলি সদাই (সহজ) আত্মভাব প্রীতি।
> সদা প্রেমেতে যোগ, নাই রে বিয়োগ, সবার সাথে নাচি গাই॥

এখানে বাউল আর পাগল একযোগে ধরা হইয়াছে। এবং বাউল হইলে তার আর বাহ্য দাবিদাওয়া রহিল না, তখন সে আত্মভাব ও প্রীতিতে সকলের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হইয়া নাচিবে গাহিবে, বাহিরের লোকের বা শাস্ত্রের অর্থহীন হুকুমের জুলুম আর তার উপর চলিবে না।

দাবি তো কেবল বাহিরের শাস্ত্রের বা সমাজের নয়, নিজের ইচ্ছা রুচি-অরুচির, ইন্দ্রিয় ও কামের দাবিরও অন্ত নাই। তাই সমাজের এই-সকলের জুলুম ও দাবিদাওয়া মিটাইবার জন্য ইহাঁদের মধ্যে নিয়ম আছে জীবন থাকিতেই একবার মরিয়া যাইতে হইবে। মরিলে দাবিদাওয়া সব ফুরাইয়া যায়। সমাজও তখন বাধ্য হইয়া নিষ্কৃতি দেয়। জীবন্তে মরার এই পদ্ধতিকে মুসলমান ভাবের বাউলরা বলেন "ফাণা"। এই শব্দ ও এই পদ্ধতি সুফীদের মধ্যেও খুব চলিত। কবীর নানক প্রভৃতির মধ্যেও "বাউর" পাগল অর্থে আছে এবং "জীতে হি মর জানা" (জীবন থাকিতে মরিয়া যাওয়া) তত্ত্বটিও বহু স্থানে আছে।

এই বিষয়ে বিখ্যাত সুফী মোল্লা রুমীর হিকায়ত-ই-তূতী নামে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। পারসীক এক বণিকের একটি প্রিয় তোতাপাখি ছিল। পাখিটি ছিল ভারতের। বড় মধুর তার বুলি। বণিক একবার ভারতে আসিতেছেন বাণিজ্য করিতে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি উপহার চাই। তোতাকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, ভারতে আমার মুক্ত ভাইদের জিজ্ঞাসা করিও আমি কিসে মুক্তি পাই। ভারতে আসিয়া বণিক বনচারী তোতাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তোতাটি মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। বণিক অপ্রস্তুত হইয়া দেশে ফিরিয়া তাহার তোতার কাছে বাধ্য হইয়া সেই কথাই যখন সে বলিল তখনই তার প্রিয় তোতাপাখিও খাঁচায় মরিয়া গেল। পাখিটি ফেলিয়া দিলে তখন সে আবার উড়িয়া গাছে বসিয়া কহিল, এই উপদেশই আমাকে বনচারী তোতা দিয়া গিয়াছে। জীবন্তে না মরিলে আর মুক্তি নাই। যখন আমার

দ্বারা কেহ কোনো কাজ পাইবার আশা রাখিবে না তখনই আমাকে মুক্তি দিবে। এই উপাখ্যানটির বহু অনুবাদ আছে। নিকলসনের ইংরাজী অনুবাদে সহজেই মিলিতে পারে।

আবার যখন দাবি না থাকিলেও আপনাকে লুটাইয়া দেওয়া যায় তখনই তো প্রেম। যতক্ষণ দাবি আছে, প্রয়োজনের বাঁধন আছে, ততক্ষণ মুক্তি কই? মুক্তি না হইলে প্রেম অসম্ভব। প্রয়োজনের অতিরিক্তকে লইয়াই প্রেমের কারবার। তাহাই অথর্ববেদে "উচ্ছিষ্ট" (অথর্ব ১১-৯)। জীবনে মরিতে পারিলে যখন সব দাবি এড়ানো যায় তখন সবই "উচ্ছিষ্ট" বা অতিরিক্ত; তখন সর্বত্রই মুক্তি ও প্রেমের অবকাশ।

বাউল-ভাবের ভাবুক গৃহী ও বৈরাগী দুই শ্রেণীই আছে। ইহাঁরা জাতি পংক্তি, তীর্থ দেবতা মন্দির কিছুই মানেন না। বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোনো কোনো উৎসবস্থলে একত্র হইলেও ইহাঁরা কোনো দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন না। বলেন "ঠাকোর-ঠোকোর মোদের নাই।" ইহাঁদের নিজেদের যে সাধন-ঘর আছে তাহাতে কখনো দেবমূর্তি প্রভৃতি থাকে না। কোথাও কোথাও গুরু বা প্রাচীন সাধকদের আসন যত্ন করিয়া সাজাইয়া রাখিলেও সত্যকার বাউলদের মধ্যে তাহা পূজা করিবার রীতি নাই।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর খুব নিম্নস্তরের লোকদের মধ্য হইতে এক-আধজন ভাবের ভাবুক লোক আসিয়া এই বাউলদের মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাই গৃহী ও বৈষ্ণব এই উভয় শ্রেণীর কাছে ইহাঁরা নিন্দিত ও অবজ্ঞাত। নিম্ন জাতিতে থাকিতেও কোনো মন্দিরে ইহাঁদের প্রবেশ-অধিকার থাকে না, তাই বাউল হইয়াও ইহাঁরা কখনো কোনো মন্দিরে প্রবেশ করেন না। ঠাকুর এই মানবদেহেরই মধ্যে। বাহিরের ঠাকোর-ঠোকোর দর্শন করিতে যাওয়া ইহাঁরা অতিশয় অবজ্ঞার সহিত দেখেন। নিজেদের মানবত্বের গৌরব (dignity) ইহাঁরা এইভাবে সযত্নে রক্ষা করেন।

ইহাঁরা বলেন: মন্দিরে আর যাইব কেন? এই মানবদেহই তো মন্দির। ইহার মধ্যে সেই পরমদেবতা পরমপুরুষ বিরাজমান। মানবের রচিত ক্ষুদ্র ঠাকোর-ঠোকোরের স্থান এ মন্দিরে নাই। যে দেহ সবার নিন্দিত ও লাঞ্ছিত সেই দেহকেই তাঁরা দেবমন্দির বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন, আর দেবতাকেও মনের মানুষ বলিয়া আপনার জন করিয়া লইয়াছেন।

নানা সম্প্রদায়ের নানা ভাবে কেশ ও শ্মশ্রু রাখিবার ও কামাইবার বিধি; ইহাতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। পাছে কাহারও সঙ্গে "ভেদ-বিভেদ" হয় তাই বাউলেরা সর্বকেশশ্মশ্রু রক্ষা করেন। বলেন, এই ভাবেও আমরা সহজ হইয়া থাকি, কোনো বিশেষ দলে ধরা দিই না। শিখদের সর্বকেশ রক্ষাও ইহার সহিত তুলনীয়।

ইহাঁরা কখনো নিজেকে অনাবৃত বা নগ্ন রাখাটা ধর্মের সাধনা বলিয়া মনে করেন না। বাউলদের মত, সর্বদেহ সাদাসিধা আচ্ছাদনে পরিহিত রাখিবে। যদি নূতন বস্ত্র না জোটে তবে নানা স্থান হইতে ছেঁড়া-খোঁড়া বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ধৌত পবিত্র করিয়া নিজেরা সেলাই করিয়া আলখাল্লা তৈয়ার করিবে। দেহগত শ্লীলতা সযত্নে রক্ষা করিবে। কাজেই ইহাঁরা দিগম্বর বা ক্ষপণক শ্রেণীর মত নহেন। এ বিষয়ে ইহাঁরা অনেক পরিমাণে বৌদ্ধদের মত।

কবীর, নানক, রবিদাস, দাদু, রজ্জবজী প্রভৃতিও এই দেহকেই দেবতার মন্দির বলিয়াছেন। এই দেহেই বিশ্বময়ের অধিষ্ঠানভূমি। এই 'মানবদেহে'ই বিশ্বনাথ ও বিশ্বমন্দিরকে প্রত্যক্ষ করিয়া কবীর বলিয়াছেন—

ইস্ ঘট অংতর বাগবগীচে ইসী মেঁ সিরজন হারা।
ইস্ ঘট অংতর সাত সমুন্দর ইসী মেঁ নৌলখ তারা॥ কবীর ১-১০১

এই দেহের মধ্যেই কুঞ্জকানন, ইহাতেই সৃজনকর্তা বিরাজমান। ইহার মধ্যেই সপ্ত সমুদ্র ও নব লক্ষ তারা।

য়া ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা য়াহী মেঁ ঠাকুর দ্বারা॥ কবীর ১-৮৫

এই ঘটের মধ্যেই কাশী দ্বারকা, ইহার মধ্যেই ঠাকুরের মন্দির। এই ঘটের মধ্যেই সর্ব জ্ঞান ও সর্ব শাস্ত্র।

শাস্ত্রের কথা বলিতে দাদূ বলিয়াছেন—

কায়া হমারী কিতাব কহিয়ে লিখি রাখই রহিমান।

এই কায়াই আমার কোরাণ শাস্ত্র। ইহাতেই দয়াময় তাঁর বাণী লিখিয়া রাখেন।

রজ্জব বলিয়াছেন—

সাধন হারকী অংতর কাগজ প্রাণ অক্ষর মাহিঁ।
যহ পুস্তক কোউ বিলা বাঁচে মর্ম শব্দ ন সুনা হি॥

সাধকের অন্তরই কাগজ, তাহাতে প্রাণের অক্ষরে প্রকটিত শাস্ত্র। এই পুস্তক ক্বচিৎই কেহ পড়ে, মরমের ধ্বনি শুনিয়াও শুনে না।

এই বাউলদের সার কথা হইল যোগ। ত্যাগ নয়। জগতের কাহাকেও বা কিছুই ত্যাগ করা সাধনা নয়। সাধনা হইল সবার সঙ্গে ও সব-কিছুর সঙ্গে যুক্ত হওয়া। প্রত্যেক মানবজীবনই দেবমন্দির। জীবনের প্রদীপটি জ্বলিয়া উঠে নাই বলিয়া মন্দিরকে আমরা মন্দির বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। সাধনার দৃষ্টিতে সকল মানবের সেই মন্দির দেখিয়া সর্বত্র শ্রদ্ধায় প্রণত ও সর্বত্র প্রীতিতে যুক্ত হইতে হইবে। কাহাকেও কোনো সত্য বা জ্ঞান দিতে হইলে অবজ্ঞার ও অপ্রেমের সহিত দিবে না; কারণ, বিনা প্রেমে কোনো সত্য ও জীবন্ত তত্ত্ব দেওয়া বা নেওয়া যায় না। প্রতি জীবনেই চিন্ময় পরমাত্মার প্রদীপ দীপ্যমান। দেখিতে জানে না বলিয়া অন্ধকার মনে হয়। শ্রদ্ধা ও প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতে জানিলে সে বাধা অপগত হয়। এই কথাই কবীরও বলিয়াছেন—

ঘর ঘর দীপক বরৈ লখৈ নহিঁ অংধ হৈ।
লখত লখত লখি পরৈ কটৈ জম ফন্দ হৈ॥ কবীর ২-৩৩

ঘরে ঘরে দীপক জ্বলিতেছে, অন্ধ তুমি দেখিতে পাও না। দেখিতে দেখিতে যেই একদিন দেখিয়া ফেলিবে অমনি যমের পাশ মুক্ত হইয়া যাইবে।

কবীর আরও বলেন—

জোগী পড়ে বিজোগ কহৈ ঘর দুর হৈ। কবীর ২-৩৪

বিযুক্ত হইয়া আছেন বলিয়াই যোগী বলেন সেই ধাম বহু দূরে। সাধনার দৃষ্টি হইলেই দেখা যাইবে সকল ঘটে তিনি বিরাজমান। তাই সর্বত্র যুক্ত হইতে হইবে।

বাউলদের মতামতের সঙ্গে উত্তরপশ্চিম, রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগের সাধকদের অনেক স্থলে মিল আছে। তবে বাউলেরা পশ্চিমের ঐসব সাধকদের মত নিজেদের সম্প্রদায়কে একটা বিশেষ মঠ বা church করিয়া গড়িয়া তোলেন নাই। কবীর প্রভৃতিরও ইচ্ছা ছিল যাহাতে মঠ

সম্প্রদায় গড়িয়া না উঠে। তবু তাহা ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে বাউলেরা তাহা ঘটিতে দেন নাই। কাজেই বাংলার বাউলদের এমন একটা বিশেষ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা আছে যাহা বুঝানো কঠিন। আজ বাংলার বাউলদের বিষয়ই প্রধান আলোচ্য। প্রসঙ্গক্রমে অন্য প্রদেশের ভক্তদের বাণী এক-আধটুকু বলিতে হইতে পারে।

বাংলার বাউল

বাংলা দেশের মর্মের কথা প্রকাশ পাইয়াছে পল্লীর বাউলদের গানে। শিক্ষায় বা বংশ-আভিজাত্যের কোনো গৌরবের দাবি ইহাঁদের নাই; অথচ অসাধারণ ইহাঁদের চিন্তার সাহস ও প্রকাশের অপূর্বত্ব। সমাজের নিম্নতম জাতির লোকদের মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক নির্ভীকতা আমরা দেখিতে পাই তাহা উচ্চতম শ্রেণীদের মধ্যেও দুর্লভ।৴ এই বিষয়ে সুফীদের মধ্যে একটি চমৎকার গল্প আছে। রাজার ছেলে ও চাষার ছেলে পড়েন এক পাঠশালে। পাঠ সাঙ্গ করিয়া দুজনে ঘরে যান। দুজনেরই বাপ মারা গেলে বহুকাল পরে আবার দুজনের এক তীর্থে দেখা। রাজার ছেলে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার বাপের কবর কিসের?" চাষার ছেলে বলেন, "মাটির। তার উপরে একটি গোলাপ গাছ।" রাজার ছেলে গর্বে বলেন, "আমার বাপের কবর ত্রিশ হাজার শিলা-শিল্পী কুড়ি বছর ধরিয়া গড়িয়াছেন।" চাষার ছেলে বলেন, "টের পাইবেন তোমার বাপ বিচারের দিনে। ভগবানের ডাক আসিলে তাহাঁকে একটা এই দারুণ বাধা ভাঙিয়া বাহির হইতে হইবে।" ভগবানের ডাক আসিলে যাহাঁরা অভিজাত তাহাঁরা জাতি কুল মান বিদ্যা সম্পদ ইত্যাদির ভারে সে ডাক শুনিতে পান না। সহজ অকিঞ্চনেরা সে ডাক অনায়াসে শোনেন। তাই বুদ্ধ তাঁর সিংহাসন, মহাপ্রভু তাঁর বিদ্যার ভার সরাইয়া দেন। মহাপ্রভু তো স্পষ্টই বলেন, "আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নই, ত্যাগী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ নই, আমি শুধু প্রেমপথে পথিকদের দাস দাসানুদাস।"

> নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ
> নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

বর্তমান কালের প্রভাবে এইরূপ ভারমুক্ত সহজ সরল নির্ভীক শ্রেণী এখন দিনে দিনে লোপ পাইতে বসিয়াছে, অথবা নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া এখন কোনোমতে ইহাঁরা অস্তিত্বটুকুমাত্র বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রাচীন কালের বাউলদের গানের মত গান আর এখন বড় একটা রচিত হয় না। সে সাহস সে বীর্য ইহাঁরা ক্রমেই হারাইতে বসিয়াছেন, চারিদিকের আবহাওয়াও এখন অনুকূল নহে। তবু এখনো মাঝে মাঝে যে সমর্থ সাধক না দেখা যায় তাহা নহে।

তবে যথার্থ বাউল দিনে দিনেই কমিয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন পরে ইহাঁদের দেখা পাওয়া অসম্ভব হইবে। অথচ ইহাঁদের সত্য পরিচয় এখন পর্যন্ত লিখিত ভাবে কিছুই রাখা হয় নাই।

৴ আমাদের অতিশয় সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ইহাঁদের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপে এই পল্লীসাধকদের বিষয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তাহাতে কুতূহলী চিত্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আরো কিছু জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া ওঠে। বাউলদের রচনার প্রতি চিরদিনই তাহাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। এই যুগে তাহাঁর অপেক্ষা বাউল-রসের মর্মজ্ঞ ও বাউল-সাহিত্যের অনুরাগী কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।৴

সহজ ভাব সম্বন্ধীয় যে-কয়খানা পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে সাচ্চা বাউল ভাবের পরিচয় মেলে না। আসল বাউলরা তো পুঁথির ধারই ধারেন না। যাঁহারা আধা বৈষ্ণব আধা বাউল, কি আধা তান্ত্রিক আধা বাউল, তাঁহারাই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব বা তান্ত্রিকভাবে, compromise এর মত, দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু যথার্থ বাউলের সে নির্ভীক শক্তি বা রচনার গভীরতা গ্রন্থী বাউলদের নাই। সহজ নামে তাঁহারা যে সস্তা ইন্দ্রিয়-উপভোগের পন্থা খুলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে পারে না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থও তান্ত্রিক ভাবের গ্রন্থী বাউলের শ্রেণীর সঞ্চয়।

আসল বাউলরা কোনো রকমের শাস্ত্র পুঁথি বা লেখার ধার ধারেন না। তাঁহারা বলেন, "ও-সব তো সঞ্চয়। অনুরাগের জীবনে সঞ্চয় দিয়া কি কাজ হইবে? ও-সব হইল বিষয়ীদের 'গাঁঠ'। ও-সব আমরা মানি না। বিষয়ের হাটের ও-সব বোঝা প্রেমের রাজ্যে অচল।"

মানুষের জীবনে যে নিত্য নব নব ভাবের সজীব লীলা চলিয়াছে তাহাতেই তাঁহাদের আস্থা। অনির্বচনীয় এই লীলার প্রকাশ ভাষাতে করা যায় না। এই অপরূপ লীলা ধরা যায় কতকটা গানে। সুরে ও ছন্দে ভাষায় যে অনির্বচনীয়তার আভাস দেখা দেয় তাহাতেই এই লীলা কতকটা ধরা পড়ে। এই গান গুরু হইতে শিষ্যক্রমে ইহাঁরা শিক্ষা করেন। শক্তি থাকিলে ও সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিলে নূতন গানও কেহ কেহ রচনা করেন কিন্তু পুঁথিতে তাহা সঞ্চয় করেন না।

ইহাঁদের কাছে কোনো প্রশ্ন করিলে ইহাঁরা সেই-সব গান গাহিয়াই উত্তর দেন। সাধারণ কথায় উত্তর দিতে ইহাঁরা বড় চাহেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "আমরা পক্ষী জাতি, পায়ে হাঁটিয়া চলিতে জানি না, আমরা পাখায় উড়ি।"

আমরা পাথির জাত
হেঁটে চলার ভাও জানি না, উড়ে চলার ধাত।

শাস্ত্র বা সাম্প্রদায়িক কোনো পদ্ধতির ইহাঁরা ধার ধারেন না। ভাব প্রকাশের শক্তি ইহাঁদের অসাধারণ, এবং ভাব ব্যক্ত করিতেও ইহাঁদের বিন্দুমাত্র ভয়ডর নাই।

দক্ষিণ বিক্রমপুর -নিবাসী ছকু ঠাকুর নামে একজন অশীতিপর ব্রাহ্মণ কাশীতে শেষ জীবন যাপন করেন। ইনি নমঃশূদ্রজাতীয় গঙ্গারাম নামে একজন বাউলের শিষ্য বলিয়া ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে তাঁহার কোনো স্থান ছিল না। কাশীতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহ খাইতে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, "আমি তো ব্রাহ্মণ নই। আমি মানুষ। মানুষ বলিয়া যদি নিমন্ত্রণ কর তবে যাইতে পারি।" কাশীধাম-সুলভ আচারবিচার তিনি মানিতেন না। অথচ তাঁহার মত প্রেমরসিক লোক জীবনে কমই দেখিয়াছি। তীর্থের নানাবিধ নোংরামিতে কখনো তাঁহাকে মলিন দেখি নাই। তিনি নির্ভয়ে তাঁহার ভাব বাউলের গানে ব্যক্ত করিতেন।

একবার একজন তাঁহাকে বলেন, "লোকের মধ্যে যে আপনাদের নিন্দার সীমা নাই। আপনি যাকে-তাকে এ-সব কথা না বলিলেই হয়।" তাহাতে ছকু ঠাকুর গাহিলেন—

বুলুক[১] রে বুলুক বুলুক যার মনে যা লয় গো।
আপন (সাচ্চা) পথের পথিক আমি কার বা করি ভয় গো।

---

১ বুলুক=বলুক

আমের বীচে হয়ই রে আম, জামের বীচে হয়ই রে জাম।
'আমি'র বীচে আসল 'আমি' জয় গুরু জয় জয় গো॥ ইত্যাদি

ব্যক্তিত্বকে তাহার সত্য সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর করাই সত্য সাধনা। বাউলদের সাধনার সেই সার কথা তিনি তখনই গানের মধ্য দিয়া শুনাইয়া দিলেন।

বাউলরা অনুরাগকেই প্রধান বস্তু বলিয়া মানেন। একবার এক বৈষ্ণবভাবাপন্ন লোক এক বৃদ্ধ সাধক বাউলকে বলেন, "বৈষ্ণবদের মধ্যে যে অনুরাগের নানা শ্রেণীভেদ আছে সে-সব আপনি দেখিয়াছেন?" বাউল বলিলেন, "আমি মূর্খ নিরক্ষর মানুষ, শাস্ত্রের বা জ্ঞানের কি কোনো খোঁজ আমরা রাখি বাবা?" সেই লোকটি বলিলেন, "আমি আপনাকে তবে সে-সব শাস্ত্র পড়িয়া শুনাইব।" তার পর বৈষ্ণবদের প্রেমরসের অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে অনুরাগের নানা প্রকারভেদ ও নানা লক্ষণ বিশদভাবে সেই প্রেমিক বৃদ্ধ বাউলকে পড়িয়া শুনাইলেন। বাউলটি কোনোমতে দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন তাঁহার কাছে সেই লোকটি সেই বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন তখন তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী,
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি॥

অর্থাৎ, অনুরাগের কুসুমবনে এই-সব বিষয়ীজন-সুলভ স্বর্ণকারের পরীক্ষা চলিবে না।

ইহাঁরা নিজেদের কোনো ইতিহাস রাখেনও না এবং তাহার জন্য ইহাঁদের কোনো মাথাব্যথাও নাই।

বিক্রমপুরে এক নদীতীরে এক খালের মুখে একবার এক বাউলের কাছে বসিয়া আছি, জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, তোমরা তোমাদের কোনো ইতিহাস বা চিহ্ন রাখিয়া যাও না কেন?" বাউল বলিলেন, "আমরা সহজ কিনা, তাই কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাই না।"

খালে ভাঁটা, তখন জল নাই। কচিৎ দুই-একটি ডিঙিনৌকার মাঝি গরজের দায়ে কাদার মধ্যেও নৌকা ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলিয়াছে। বাউল বলিলেন, "ঐ যে নদীতে সহজ জলে সব ডিঙি পাল তুলিয়া চলিয়াছে, উহারা কি কোনো চিহ্ন রাখিয়া যায়? উহারা যে সহজ পথের পথিক। ঐ কৃত্রিম কাদা-পথের মাঝি যে কাদায় নাও ঠেলিয়া ঠেলিয়া নিজ চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে, সহজ পথের মর্ম ও কি জানিবে?"

[ক্রমশঃ

নববর্ষা : কালী-তুলির ছবি　　　শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

বিজ্ঞানের বিভীষিকা

রাজশেখর বসু

অনেক বৎসর আগেকার ঘটনা। দুটি ছেলে ভ্রূকুটি করে ঠোঁট কামড়ে হাতে ইট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ-এগারো, সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এখন পরস্পর ভয় দেখাচ্ছে, হয়তো একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিণাম কি সাংঘাতিক হবে তা এরা মোটামুটি বোঝে, তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়েরা দূর থেকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। দুজনেই আমার ভাগনে, একটু খাতিরও করে, সুতরাং এদের নিরস্ত্র করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।

মার্কিন আর সোভিএট যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় ওই রকম, কিন্তু ওঁদের মামা নেই। এই দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণু-বোমা উদ্যত করে পরস্পর বিভীষিকা দেখাচ্ছে, মানবজাতি ত্রস্ত হয়ে আছে। রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা সফল হবে কিনা বলা যায় না। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুই মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে, আর একটা মহত্তর প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃথিবীব্যাপী আতঙ্ক আর অশান্তির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এঁদের যুক্তি এই রকম।—

পরমাণু-বোমা আবিষ্কারের পূর্বে যুদ্ধ এত ভয়াবহ ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে আকাশযানের সংখ্যা কম ছিল সেজন্য বোমা-বর্ষণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্স-প্রশিয়া যুদ্ধ, তার পর ব্রিটিশ-বোঅর আর রুশ-জাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হয়েছিল, জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হলেও লোকক্ষয় বেশী হয় নি। মেশিন-গন, দূরক্ষেপী কামান, টরপিডো, সবমেরীন, বোমা-বর্ষী বিমান, এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের ফলে মানুষের নাশিকা শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো অন্যান্য উৎকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীজ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্মনুষ্য করা হবে, অথবা এমন গ্যাস বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উদ্ভাবিত হবে যার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক জড়বুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের মতন আত্মসমর্পণ করবে। মোট কথা, মানুষ বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু শ্রেয়স্কর জ্ঞান লাভ করে নি, বহিঃপ্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অন্তঃপ্রকৃতিকে সংযত করতে পারে নি। তার স্বার্থবুদ্ধি প্রাচীন কালে যেমন সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর হাতে যেমন জলন্ত মশাল, অদূরদর্শী অপরিণতবুদ্ধি মানুষের হাতে বিজ্ঞানও তেমনি ভয়ংকর। অতএব বিজ্ঞানচর্চা কিছুকাল স্থগিত থাকুক— বিশেষ করে রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের মূল। চন্দ্রলোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, রেশমের চাইতে মজবুত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য আমরা দশ-বিশ বৎসর সবুর করতে রাজী আছি। মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এখন সর্বতোভাবে করা হক।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্চার সমর্থকগণ বলতে পারেন — সেকালে যখন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নি তখন কি মানুষের সংকট কম ছিল? নেপোলিয়নের আমলে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি ইয়ার্স ওঅর, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টাণ্টদের ধর্মযুদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খ্রীষ্টান-মুসলমানদের ক্রুজেড ও

জেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের ক্ষতি হয়েছিল। সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে লোকক্ষয় হত তা একালের তুলনায় কম নয়।

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন — বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে কেন, সুপ্রয়োগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, দুর্ভিক্ষ কমেছে, চিকিৎসার উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যু কমেছে, লোকের পরমায়ু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন মোটর গাড়ি এয়ারোপ্লেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মানুষের সুখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ করা ঘোর মূর্খতা।

উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বোঝা দরকার — বিজ্ঞান শব্দের অর্থ, এবং মানবস্বভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ।

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে দুই শ্রেণীর বিদ্যা বোঝায়। দুই বিদ্যাই পর্যবেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে লব্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধির উপায় নির্ধারণ। প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে — মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে, আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে। যারা বিস্ময় বোধ করে না এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে বেশী। যাঁরা বিস্ময়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমন্বিত হন তাঁরা কবি বা ভক্ত। আর, বিস্ময়ের মূলে যে রহস্য আছে তার সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁরা বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীদের এক দল জ্ঞানলাভেই তৃপ্ত হন, এঁরা নিষ্কাম শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিজের বা পরের লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এঁরা সকাম ফলিতবিজ্ঞানী। সংখ্যায় এঁরাই বেশী।

জ্যোতিষের অধিকাংশ তত্ত্বই নিষ্কাম বিদ্যা। হেলির ধূমকেতু প্রায় ছেয়াত্তর বৎসর অন্তর দেখা দেয়, মঙ্গল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ ফেঁপে উঠছে — এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে পারে কিন্তু অন্য লাভের সম্ভাবনা নেই, অন্তত আপাতত নেই। সেগুন আর ঘেঁটু একই বর্গের গাছ, চামচিকার দেহে রাডারের মতন যন্ত্র আছে, তারই সাহায্যে অন্ধকারে বাধা এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে পারে — ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এখনও কোনও সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে লাগানো যায় নি। চুম্বক লোহা টানে, তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রান্ত দক্ষিণে আকৃষ্ট হয় — এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জ্ঞান মাত্র বা কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্তু পরে মানুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে মাংস সুস্বাদ হয় — এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে।

ভাল মন্দ নানা রকম অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মানুষ চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। মোটামুটি কার্যসিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্তু জনকতক কুতূহলী আছেন যাঁরা কার্য আর কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তাঁরাই বিজ্ঞানী। আদিম মানুষ আবিষ্কার করেছিল যে, আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে। বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন — আঁচ যতই বাড়ানো হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক পাচক পাচিকা এই তত্ত্ব জানে না, জানলে ইন্ধনের খরচ হয়তো একটু কমত।

কাণ্ডজ্ঞান (common sense), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান — এই তিনের মধ্যে আকাশ পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। স্থূল সূক্ষ্ম সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ অনুমান ইত্যাদির দ্বারা লব্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে তা সাবধানে অর্জিত, বহু প্রমাণিত, এবং তাতে কার্যকারণতা যথাসম্ভব নিরূপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হয়। চিরাগত ভিত্তিহীন সংস্কার, শিল্পকলা, এমন কি খেলার নিয়মও বিজ্ঞান নামে চলে। ফলিত জ্যোতিষ আর সামুদ্রিককে বিজ্ঞান বলা হয়, দরজীবিজ্ঞান শতরঞ্জ-বিজ্ঞানও শোনা যায়।

যাঁরা নিষ্কাম জিজ্ঞাসু, লাভালাভের চিন্তা যাঁদের নেই, এমন জ্ঞানযোগী শুদ্ধবিজ্ঞানী অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের চাইতে অনেক বেশী আছেন যাঁরা ফলকামী, বিজ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্যা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুদ্ধবিজ্ঞানী, যদিও তাঁদের আবিষ্কার অন্য লোকে কাজে লাগিয়েছে! কিন্তু এঞ্জিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাডার প্রভৃতি যন্ত্রের, সালভার্সান স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধের, এবং বন্দুক কামান টরপিডো আর অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্রের উদ্‌ভাবকগণ ফললাভের জন্যই বিজ্ঞানচর্চা করেন। এঁদের কাছে বিজ্ঞান মুখ্যত কার্যসিদ্ধির উপায়, উকিলের কাছে আইনের জ্ঞান যেমন মকদ্দমা জেতবার উপায়। নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার এবং তত্ত্বের প্রয়োগ — এই দুই বিদ্যাই বিজ্ঞান, কিন্তু বিদ্যার যদি অপপ্রয়োগ হয় তবেই তা ভয়ংকরী।

ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রায় সমস্তই সহজাত, কিন্তু মানুষ নূতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে লাগায়, এবং অপরকে শেখায়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই শিল্পকলা আর বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে। মানুষ নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে বিদ্যার সুপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল জাল করে, অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু সেজন্য লেখাপড়া নিষিদ্ধ করতে কেউ বলে না। চোরের জন্য সিঁধকাঠি আর গুণ্ডার জন্য ছোরা তৈরি হয়, বিষ-ঔষধ দিয়ে মানুষ খুন করা হয়, কিন্তু কেউ চায় না যে কামারের কাজ আর ঔষধ তৈরি স্থগিত থাকুক।

কূটবুদ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রয়োগ করেছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে সকল রাষ্ট্রে বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত থাকুক — এই আবদার করা বৃথা। হবুচন্দ্রের রাজ্যে সে রকম ব্যবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার কোনও রাষ্ট্র এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। যুদ্ধবিরোধী অহিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট মারণাস্ত্রের লোপ চায়, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশায় পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে।

বিজ্ঞানচর্চা স্থগিত রাখলে এবং পরমাণু-বোমা নিষিদ্ধ করলেও সংকট দূর হবে না। আরও নানারকম নৃশংস যুদ্ধাস্ত্র আছে — টি-এন-টি আর ফসফরস বোমা, চালকহীন বিমান, শব্দভেদী টরপিডো, ইত্যাদি। যখন কামান বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনুর্বাণ তলোয়ার বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করেছে। দোষ বিজ্ঞানের নয়, মানুষের স্বভাবেরই দোষ।

অরণ্যবাসকালে শস্ত্রপাণি রামকে সীতা বলেছিলেন — কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ — শস্ত্রের সংসর্গে বুদ্ধি কদর্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই সত্য। পরম মারণাস্ত্র যদি হাতে থাকে তবে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংযম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের জনমত যদি প্রবল হয় তবে অতি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

হয় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্য দুই পক্ষই সংযত হয়েছিল। পরমাণু-বোমার বিরুদ্ধেও যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবসমাজের ধিক্‌কারের ভয়ে আমেরিকা-রাশিয়াকেও সংযত হতে হবে। আশার কথা, যাঁদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শান্তিকামীরাও ঘোষণা করছেন যে পরমাণু-বোমা ফেলে জনপদ ধ্বংস আর অগণিত নিরীহ প্রজা হত্যার চাইতে মহাপাতক কিছু নেই। অনেক বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেও যদি পরমাণু-বোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিষ্যৎ মানবসন্তানের দেহে প্রকট হবে।

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতায় এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। শক্তিশালী জাতিদের উপনিবেশপদ্ধতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রভুত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভৃতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, জলদস্যুতা, পাপব্যবসায়ের জন্য নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্ট্রসংঘের সমবেত চেষ্টায় বহু পরিমাণে নিবারিত হয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমাণুশক্তির যথেচ্ছ প্রয়োগও নিবারিত হতে পারবে। এচ. জি. ওয়েল্‌স, ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্রা বসুধার স্বপ্ন দেখেছেন তা যদি কোনও দিন সফল হয় তবে হয়তো যুদ্ধও নিবারিত হবে।

এক কালে পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের আদর্শ ছিল — সরল জীবন ও মহৎ চিন্তা। আজকাল শোনা যায় — মহৎ চিন্তা অবশ্যই চাই, কিন্তু জীবনযাত্রার মান আর সর্ববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই মানবজীবন সার্থক হবে। পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি বলে — আরও কামনা কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও উপার্জন কর; কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা হলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, জীবনযাত্রা উন্নত থেকে উন্নততর হবে। এই পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় বিজ্ঞান। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগসুখের বৃদ্ধি।

ভারতের শাস্ত্র বিপরীত কথা বলেছে — ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে দুর্নীতি বাড়ছে, তারই পরিণাম স্বরূপ অন্য দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কামনা সংযত না করলে মানুষের মঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এখনও বোঝেন নি।

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই বাড়াতে হবে। সকলের জন্য যথোচিত খাদ্য বস্ত্র আবাস চাই, শিক্ষা সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত মাত্রায় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্যক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসকল যদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্ত্রের বাহুল্য আর বিলাসসামগ্রীর বাহুল্য দুটোই মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা মনে রাখা দরকার।

পৃথিবীতে বহু বার প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে তারা রক্ষা পেয়েছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার জন্যও পরিবেশ বদলাচ্ছে। মানুষ এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত কর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম অনুমান করতে পারে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর

চেষ্টা হচ্ছে তার ফলেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যদি দুর্ভিক্ষ শিশুমৃত্যু এবং ম্যালেরিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয়, প্রজার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ না হয় তবে জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপে বাড়বে, প্রজার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে এখনও কিছুকাল ক্রমবর্ধমান মানবজাতির খাদ্য ও অন্যান্য জীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, মানুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা হতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ ছিল — ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি বিষয়ের সাধনা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হত। বর্তমান কালে বিজ্ঞান পঞ্চম পুরুষার্থ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের অবহেলার ফলে ভারতবাসী দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ করেছে, এখন তাকে সযত্নে সাধনা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক — কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিণাম দূর ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে তা সকল ক্ষেত্রে অনুমান করা অসম্ভব। ডাক্তার বেণ্টলি বলে গেছেন, বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ রেলপথের অসতর্ক বিন্যাস। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে, অসতর্ক প্রয়োগে এমন জীবাণু-বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটঘ্নের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে পারে এমন মশকবংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে যে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল তার ফলে বহুদূরস্থ জাপানী জেলেরা ব্যাধিগ্রস্ত হবে এ কথা মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। মোট কথা, বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সুফলের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে।

ইতিহাসের মুক্তি

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

মানুষ মানুষের কথা শুনতে ভালোবাসে ; প্রাচীন মানুষের কাহিনী, সমকালীন মানুষের সংবাদ। আধুনিক সভ্য জগতে এই দ্বিতীয় চাহিদার যোগান দেয় খবরের কাগজ। প্রথম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য অনেক পূর্ব থেকেই মানুষ রচনা করছে ইতিহাস। কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চয় স্বীকার করতে রাজি হবেন না যে তাঁদের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সমধর্মী। ইতিহাস গড়ার মালমসলা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্ভব অসম্ভব নানা মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের জন্য ঋজু পথে ও কুটিল কৌশলে সাংবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের সমতুল্য ? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগুরু যাচাই করে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে, সংগৃহীত উপকরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ও নির্মম বিচারে খাঁটি সত্য নির্ণয় করে ঐতিহাসিক সে ব্যাপারের যে বিবরণ দেন ও তার মর্মগত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করেন, সে কি ঐ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সমগোত্রীয় ? নিজ কর্মের গুরুত্বে অবহিত কোনো আত্মসম্মানী ঐতিহাসিক এমন কথা ভাবতে পারেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক ! যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফাউলার তাঁর রোমের চটি ইতিহাসে, প্রাচীন রোমান সেনেটের যে বিবরণ পণ্ডিতেরা অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন, তার কিছু পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এসব পাণ্ডিত্য বিস্মৃতির অতলে ডোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি ঐ রোমান সেনেটের একদিনকার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ যদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে পারতেন।

খবরের কাগজের সঙ্গে ইতিহাসের নাম একসঙ্গে উচ্চারণে ঐতিহাসিকের বিরক্তির কারণ তার চেষ্টা ও সৃষ্টিকে খেলো করে দেখাতে। যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তি, সত্যসন্ধিৎসা ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস রচনায় প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে। সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকৃতরুচি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চাঙ্গ মানসিক চেষ্টাকে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে হেয় করার মুখ্য কথা নয়। বড় কথা ইতিহাসের লক্ষ্যকেই ছোট করে ফেলা। মনের নানা খেয়ালখুশির চরিতার্থতায় মানুষ অনেক রকম সৃষ্টি করেছে। রাজারাজড়া এবং বীরপুরুষেরা প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী শুনতে চেয়েছে। চারণেরা কিংবদন্তী ও কল্পনায় মিশিয়ে গাথা রচনা করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে নিয়ে হাসি-কান্না উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয়। তাই কথাসরিৎসাগরের মত বই দেশে দেশে লেখকেরা লেখে। মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। পড়তে-লিখতে-জানা আধুনিক পৃথিবী গল্প-উপন্যাসে ছেয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাস এসব মনোরঞ্জকদের দলে নয়। তার লক্ষ্য উঁচু। অতীতের কাহিনী সে বলে বটে — সমস্ত রকম মিথ্যা রাগ-বিরাগ কল্পনার খাদ-মুক্ত অতীতের খাঁটি সত্য। কিন্তু সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের কাজ নয়, যদিও গল্প সত্য হলে লোকের তাতে বেশী অনুরাগ। লোকে

ভূতের গল্পও সত্য-ভূতের গল্প শুনতে চায়; কারণ গল্প-বলাটা ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় মাত্র। ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা যেসব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।

২

ইতিহাসের এই উপদেষ্টার পদগৌরব অনেক কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, যেসব লোক আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও বলেন ইতিহাসের মত সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি, সেইসব অল্পবুদ্ধি অরসিক সাধুলোকদের নমস্কার করেছেন।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলসল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায় ॥

ধনঞ্জয়ের মতে নাট্যের স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবান্তর। কিন্তু ইতিহাসের কাজ যে আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তাঁর এ অভিমত সুস্পষ্ট।

ধনঞ্জয় আধুনিক লেখক। মাত্র হাজার বছরের পূর্বেকার লোক। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সময়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের নানা পুঁথিতে ইতিহাস নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে দ্বিজাতির পাঠ্যের তালিকায় একটি পাঠ্যবিষয় হচ্ছে ইতিহাস।

বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃশক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহম্ ॥ আচার, ৪৫
বেদাথর্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
যপযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাঽধ্যাত্মিকীং জপেৎ ॥ আচার, ১০১

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি খুব কম করেও ধনঞ্জয়ের পাঁচ শ বছর পূর্বের।

মনুস্মৃতিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের সময় যেসব শাস্ত্র পড়ে শোনাবার বিধি আছে তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রানি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥ ৩।২৩২

মনুস্মৃতির যে পুঁথি আমরা পেয়েছি, খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকে মেধাতিথি যার ভাষ্য লিখেছিলেন, তার রচনা বা গ্রন্থন -কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। কিন্তু কোনো মতেই সে রচনা-কাল খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে নয়। তার চেয়ে দু-তিন শ পূর্বে হওয়াই খুব সম্ভব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সামবেদ ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদ এই ত্রয়ীর বাইরে ইতিহাসকেও অথর্ববেদের সঙ্গে বেদ বলা হয়েছে।

সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ॥ প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝা যায় যে, নানা বিদ্যাকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। ওর অর্থ কি তা রাজার নানা বিদ্যা চর্চার প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা দিনের পূর্বভাগে যুদ্ধের নানা অঙ্গের বিদ্যা শিখবেন।

পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যায়িকোদাহরণং
ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ॥ দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়

দিনের শেষভাগে ইতিহাস-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত; আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র— এদের বলে ইতিহাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল পণ্ডিতদের বিরাট তর্কস্থল। কিন্তু অপণ্ডিত লোকও যদি প্রচলিত মনুস্মৃতির সঙ্গে এ অর্থশাস্ত্র পড়েন তবে প্রতীতি হতে দেরি হয় না যে, কৌটিল্যের বহু অংশ মনুস্মৃতির চেয়ে প্রাচীনতর। সুতরাং যে পণ্ডিতেরা অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল বলেন খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক তাঁদের মত অগ্রাহ্য করবার কোনো সংগত কারণ নেই।

গৌতমধর্মসূত্রে, যেসকল বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষা করেন, তাঁদের বহুশ্রুতত্ব-লাভের জন্য যেসব বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়, তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতঃ। ৮।১
স এষ বহুশ্রুতো ভবতি।
লোকবেদবেদাঙ্গবিৎ।
বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ। ৮।৪-৬

বাকোবাক্য নামে বিদ্যাটির উল্লেখ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনেও আছে। টীকাকাররা ব্যাখ্যায় বলেছেন, প্রশ্নোত্তর-রূপ বিদ্যা, সম্ভব তর্কশাস্ত্র, গ্রীসে Socratic dialogue-এ যার আরম্ভ।

যেসকল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি টিঁকে আছে বা এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতমধর্মসূত্র তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এর যেসব প্রসঙ্গ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে এক তাদের মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গৌতমধর্মসূত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃস্টপূর্ব ছয় শ থেকে চার শ শতকের পরে নয়। এ মত গ্রাহ্যযোগ্য।

অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আমাদের দেশে ইতিহাস নামে বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল ও চর্চা চলেছিল। এ বিদ্যার স্বরূপ কি ছিল?

৩

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের গণনা স্পষ্টই পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপার। ওর মূল অপারিভাষিক অর্থ, অন্য যেসব বিদ্যার নাম করা হয়েছে তাদের সমষ্টি। পুরাতনকালের বৃত্তান্ত,

আখ্যায়িকা ও তাদের মধ্যে যে উপদেশ নিহিত আছে, যেসব ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকম উদাহরণের বেশ একটু চমকপ্রদ নমুনা কৌটিল্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কৌটিল্য রাজাকে বাইরের ও ঘরের নানা শত্রু থেকে আত্মরক্ষায় সাবধানতার উপদেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ এই : অন্তঃপুরে মহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজা পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে অনুসন্ধান নেবেন যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিয়ে একাকী যাবেন না, কারণ—

দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান।
মাতুঃশয্যান্তর্গতশ্চ পুত্রঃ কারূশম্।
লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্যস্য দেবী কাশিরাজম্।
বিষদিগ্ধেন নূপুরেণ বৈরন্ত্যং মেখলামণিনাং সৌবীরং
জালূথমাদর্শেন বেণ্যাগূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী
বিদূরথং জঘান। ১॥১৭

পট্টমহিষীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভদ্রসেনকে তার ভাই হত্যা করেছিল। মার শয্যার তলে প্রচ্ছন্ন থেকে কারূশরাজাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মধুর ছলে খই-এ বিষ মেখে কাশিরাজের মহিষী তাকে হত্যা করেছিল। বিষদিগ্ধ নূপুরের আঘাতে বৈরন্ত্য রাজাকে, মেখলামণির আঘাতে সৌবীর রাজাকে, মুকুরের আঘাতে জালূথ রাজাকে তাদের মহিষীরা হত্যা করেছিল। বেণীতে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বিদূরথ রাজার মহিষী বিদূরথকে হত্যা করেছিল।

সন্দেহ নেই যে কৌটিল্য প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বোধেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কল্পিত আখ্যায়িকার নয়। সে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিম্বদন্তীর যতই মিশ্রণ থাকুক। অজ্ঞাত-অতীতের ভদ্রসেন-বিদূরথের হত্যা থেকে হাল আমলের 'লিকুইডেশন' পর্যন্ত ক্ষমতালোভী মানুষের ছল ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তন হয় নাই।

৪

মনুস্মৃতির যে শ্লোকে 'ইতিহাসাংশ্চ' ব'লে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখেছেন "ইতিহাসা-মহাভারতাদয়ঃ"। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির 'ইতিহাসাংস্তথা'র ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় ঐ এক কথাই বলেছেন, "ইতিহাসান্মহাভারতাদীন্"। মেধাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর মনুর তুলনায় অনেক আধুনিক। মেধাতিথি খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকের, বিজ্ঞানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্তু ইতিহাস যে মহাভারতের মত গ্রন্থ এ ঐতিহ্য প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অথর্ববেদের সঙ্গে ইতিহাসকে বেদ বলা, ও মহাভারত যে পঞ্চম বেদ এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মনুস্মৃতির কোথাও নাম করে মহাভারতের উল্লেখ নেই। অনেক মনে করেন যে, মনুস্মৃতির বর্তমান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের মহাভারতের রচনা হয় নাই। কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনী অবশ্য অনেক প্রাচীন ; এবং সে কাহিনী নিয়ে অনেক রচনা, অনেক গাথিকার নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই সে স্বীকৃতি রয়েছে। সৌতি বলছেন, অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের যে রচনা তিনি শোনাতে যাচ্ছেন—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥—আদি, ১৷২৬

সে ইতিহাস কোনো কোনো কবি পূর্বে আংশিক বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন, এবং অন্য কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন। এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে যে অনেক কল্পিত উপাখ্যানের মিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা মহাভারতে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু উপাখ্যান বাদ দিয়ে যে চব্বিশ হাজার শ্লোকে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন প্রকৃত মহাভারত।

ইদং শতসহস্রন্তু শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়ং শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্ ॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥—আদি ॥ ১ ॥ ৬৩-৬৪

অনুমান করা কঠিন নয় যে, লক্ষকে কেটে নয়, চব্বিশ হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনাটিই মূল ভারতেতিহাস। সে কাহিনী যে ঐতিহাসিক, প্রাচীন কালে সত্য সত্যই ঘটেছিল, প্রাচীনদের এ বিশ্বাস দৃঢ়। আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তাঁরা মহাভারতের কাহিনীকে ভিন্ন করে দেখেছেন। পুরাণের কথায় মেধাতিথি বলেছেন, "পুরাণানি ব্যাসাদিপ্রণীতানি সৃষ্ট্যাদিবর্ণনরূপানি", অর্থাৎ যার বেশীর ভাগ কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন, যেমন থুকিডিডেস্ হোমার-বর্ণিত ট্রোজান-যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। তবে মহাভারতের কাহিনীও যে উপদেশাত্মক, শাস্ত্রকারেরা সে কথা বলতে ভোলেন নাই। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে বিনয়ের সুফল ও অবিনয়ের কুফল-বর্ণনা আছে। জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশে চলার নাম বিনয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অবিনয়। অবিনয়ের ফলে রাজারা সপরিগ্রহ বিনষ্ট হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশহীন বনবাসীও রাজ্যলাভ করে। উদাহরণ,

বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাস-যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ ॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান মনুরেব চ। ৭ ॥ ৪১-৪২

মেধাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাষ্য করেছেন, "এতানি মহাভারতাদাখ্যানানি জ্ঞেয়ানি"। এবং মহাভারতেই তার উপদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে। 'এতে চার বেদেরই কথা আছে, এ কাহিনী পবিত্র ও পাপভয়হারী'।

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্ ॥—আদি ॥ ১৷২১

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সৌতির কাছে সোপাখ্যান লক্ষশ্লোকের 'শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্' শুনতে চেয়েছিলেন।

৫

মহাভারতের কাহিনী থেকে নানা উপদেশ সংগ্রহ কিছুই কঠিন নয়। মানুষের অনেক কর্মচেষ্টা ও তার পরিণতি থেকেই কঠিন নয়। কিন্তু মহাভারতের বিচিত্র দীর্ঘ ইতিহাসের রচনা হয়েছিল গুটিকয়েক উপদেশের

উদাহরণ-স্বরূপে— ঐ উপদেশই লক্ষ্য, কাহিনীর বর্ণনাটা উপলক্ষ্য — এমন কল্পনা সুস্থ মনের কল্পনা নয়। কোনো তত্ত্বের মায়ায় বুদ্ধির বিভ্রান্তি না ঘটলে সর্পে এমন রজ্জুভ্রম হয় না। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা মহাভারত-কথা শোনার জন্য সৌতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ সে কথা বিচিত্র— 'চিত্রাঃ কথাঃ'।

তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ॥—আদি ॥ ১।৩

যে কাহিনী বিচিত্র, গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়, তা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটে। মানুষ সে কাহিনী ভুলতে চায় না। তাকে রচনায় নিবদ্ধ করে স্থায়ী করে রাখতে চায়। উপদেশের চিরকালীন ভাণ্ড-বোধে নয়, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়িত্ব দেবার মনের স্বাভাবিক প্রবণতায়। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'। কিন্তু সমাজের হিতে যাঁরা অনন্যচিত্ত তাঁরা একে উপদেশের পুণ্যজলে শোধন করে মানুষের কাজে লাগাতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনী যে কাহিনী মাত্র নয়, সংসারের যাত্রাপথে অঙ্গুলি সংকেত, সে শিক্ষা তাঁরা ইতিহাসের কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত করেন— সহজে বা কষ্টে। সমাজহিতৈষীদের 'প্রবৃত্তিরেষা'। ঐতিহাসিক বলেন তথাস্তু। ভেবেছিলাম অতীত নিয়ে খেলা করছি, কিন্তু দেখি সমাজের হিত করছি। মনে করেছিলাম প্রাচীন কাহিনী-তৃষ্ণার জল এনেছি, কিন্তু দেখছি যা এনেছি তা উপদেশের অমৃত। 'ধন্যোঽহং'।

৬

বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'যথার্থ ইতিহাস' (real history), হোমারের ট্রয়যুদ্ধের কি বেদব্যাসের ভাবতযুদ্ধের ইতিহাসের মত ইতিহাস নয়, তার লেখকেরাও অনেকে বলেছেন যে, তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন কেবল অতীতের কাহিনীকে বর্ণনার জন্য নয়, যাতে অতীতের কাহিনীর আলোতে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। থুকিডিডেস্ পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, যাতে সেই অতীত ঘটনা থেকে এর পর অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পলিবিয়াস রোম-কার্থেজ-যুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধের অনুসন্ধান করেছেন, যাতে ভবিষ্যতের সদৃশ ঘটনায় এ সম্বন্ধের প্রয়োগ করা যায়। ইউরোপের কেবল গ্রীক কি গ্রীকো-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাস লোকশিক্ষক— ন্যায়পথের শিক্ষা দেয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের সে পরামর্শদাতা। এই কল্পনাকে মৃদু উপহাস করে র‍্যাঙ্কে তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের গোড়ায় বলেছেন, 'ইতিহাসের উপরে যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, সে গুরুভার-বহনে তিনি অক্ষম। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন যে যা ঘটেছে তা ঠিক কেমন করে ঘটেছে।'

শাস্ত্রকৃৎ কি দার্শনিকেরা যে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিককে উপদেষ্টার আসনে বসিয়েছেন সে সম্মান বহু ঐতিহাসিক লিওপোল্ড র‍্যাঙ্কের মত প্রত্যাখ্যান করেন নাই। সে মর্যাদা ও সম্মান শিরোধার্য করেছেন এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু যদি বাইরের দেওয়া পদবীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখেন 'কিমিদং' তবে ইতিহাসের স্বরূপ ও লক্ষ্যের যথার্থ জ্ঞান, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন 'সম্যক্ জ্ঞান', তা লাভ হয়।

থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থ এই বলে আরম্ভ করেছেন—

'এথেন্সবাসী থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান ও এথেনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করেছেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এই ধারণায় যে, পূর্বে পূর্বে যা সব ঘটেছে এ যুদ্ধের গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রীস দেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অন্য পক্ষে যোগ দিয়েছে বা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রীকেরাও যোগ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের কথা কালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ জানা যায় না। কিন্তু অনুসন্ধান ও গবেষণায় যতদূর জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না যে, অতীতের কোনো যুদ্ধ বা ঘটনার এই যুদ্ধের মত গুরুত্ব ছিল।'

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে থুকিডিডেসের পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় মাত্রাজ্ঞানহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধটা ছিল একটা মাঝারি রকমের ঝগড়া; ওর স্মৃতি একটু বেশী টিকে আছে এইজন্য যে, থুকিডিডেস তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। থুকিডিডেসের ধারণায় বিজ্ঞতার হাসি হাসার পূর্বে মনে করা ভালো যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বে আকৃষ্ট হয়ে বর্তমানের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখেছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের ধারণা লোকে কি চোখে দেখবে— অবশ্য যদি ততদিন তার স্মৃতি বেঁচে থাকে।

থুকিডিডেস তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উপদেশ দেবার মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। এ রচনায় তাঁর প্রবৃত্তি এসেছিল, কারণ এ যুদ্ধের কাহিনী তাঁর মনে হয়েছিল 'চিত্রাঃ কথাঃ'; এবং অতীতের সমস্ত ঘটনার তুলনায় 'বিচিত্রাঃ কথাঃ'।

এর পর থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনারীতির কথা বলেছেন—

'এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করিনি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।'

৭

থুকিডিডেসকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার গুরু। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনাশূন্য অনাবিল কাহিনী রচনার যে সূত্রের তিনি সূত্রকার, আধুনিক ঐতিহাসিক রীতিকে তার ভাষ্য বলা যায়। অবশ্য অতি বিস্তৃত ভাষ্য। কারণ আধুনিক কালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও মূল্যবিচারের চেষ্টা ও পদ্ধতি যেমন বিপুল তেমনি জটিল। দু-তিন শ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞান-বিদ্যা ইতিহাসের তথ্য নির্ণয়ের সহায়, যার কল্পনাও থুকিডিডেসের কালে সম্ভব ছিল না। বহু বিজ্ঞান-বিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে ঐতিহাসিককে অনেক

প্রাচীন মূলহীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এসব দৃষ্টফল বিদ্যার সার্থক অনুশীলন সত্যমিথ্যা-পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, ইতিহাসের তথ্য নির্ণয়ে ঐতিহাসিককে তা প্রভাবিত করেছে। তার স্বীকৃতির সঙ্গে উৎকর্ষের দাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহাসকার নিজের রচিত ইতিহাসের নাম দিয়েছেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস,' অর্থাৎ যা প্রাচীনদের ঢিলেঢালা ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এ নামকরণে সত্যাভাস কিছু আছে, নামের মহিমায় বস্তুর তথ্যপ্রকাশের চেষ্টায় যা অপরিহার্য। কিন্তু আজকের দিনের ঐতিহাসিকের হাতে সত্যনির্ণয়ের যা সব উপায় এসেছে তার তুলনায় প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ছিলেন রিক্ত-অস্ত্র মুষ্টিযোদ্ধা মাত্র। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস রচনা থুকিডিডেসের কাছে খুব সম্ভব মনে হয় নাই। কারণ তত পূর্বের ঘটনা সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুত থুকিডিডেসের একুশ বছরের ইতিহাস তাঁর সমকালীন ঘটনার ইতিহাস। পলিবিয়াসের পিউনিক-যুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেমন না হলেও প্রায় সমধর্মী। দূর-অতীতের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে আধুনিক ঐতিহাসিকদের রীতিপদ্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক সূক্ষ্ম। যে প্রাচীনেরা তাঁদের কালের ইতিহাস লিখে গেছেন বা এমন বিবরণ লিখে গেছেন যা থেকে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায় সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু দিক থেকে পরীক্ষা করে সত্য নির্ণয়ের অসীম চেষ্টা। যে কাজকে থুকিডিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ আধুনিক ইতিহাস-লেখকেরা নিত্য করছেন। বিবরণের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন্ কালের, যে প্রাচীন ভাষা ও লিপির স্মৃতি লোপ হয়েছে তার পাঠোদ্ধার, মানুষের সভ্যতার যেসব সৃষ্টি মাটির নীচে চাপা পড়েছে মাটি খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ মনে হয় যেন অসাধ্যসাধন। সে অসাধ্যসাধন আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সাধারণ কাজ। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনো কিছুর উপলক্ষ্য হিসাবে নয়, ঐ জ্ঞানই ঐতিহাসিকের চরম লক্ষ্য ব'লে। অতীতের নির্ভুল নিখুঁত জ্ঞানলাভের এই বিদ্যা মানুষ সৃষ্টি করেছে। সেই বিদ্যার ও তার আদর্শের আকর্ষণ ইতিহাসকারের উদ্যমের উৎস। সেই আদর্শে পৌছিবার কোনো শ্রমকেই শ্রম মনে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়া অন্য যে-কোনো মাপকাঠির মাপে ঐতিহাসিকের অনেক শ্রম মনে হবে নিরর্থক পণ্ডশ্রম। যীশু জন্মেছিলেন খৃস্টপূর্ব চার অব্দে না দশ অব্দে, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে না রবিবার প্রাতে, সে গবেষণায় শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয়ের আর কোন্ সার্থকতা আছে? সে সার্থকতা হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে অবিচ্যুতি। সত্যের জন্যই সত্যের অনুসরণ। 'সত্যে নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ'— ঐতিহাসিকের সে ভয় হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয়। অন্য কোনো ভয় নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি হত অতীত সত্য ঘটনার উদাহরণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া— ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের নীতি— তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপদেশের বেশী উপযোগী হত। অনলংকৃত নিরাবরণ সত্যের চেয়ে কল্পনায় রাঙানো ও সাজানো কাহিনীর আকর্ষণ লোকের কাছে অনেক বেশী। যে আকর্ষণের অভাব আছে বলে থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাস-রচনার ব্যাজনিন্দা করেছেন। যে কারণে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সোপাখ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিদ্যার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকেরা। তাঁরা যে ইতিহাস তখন লিখেছেন তার বেশীর ভাগ খৃস্টধর্মের নানা ঘটনার ও খৃস্টান সাধুসন্তদের জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাসকে বিচিত্র কল্পনায় পুষ্ট ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি

ও ভয় গাঢ় করার চেষ্টা দোষের ছিল না। তাতে লেখকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ প্রয়োজনে অসত্যকথনেও দোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে। সে কাল গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরে নাই। আজ ক্রমশ ধর্মের দাবির জায়গা নিচ্ছে রাষ্ট্রের দাবি। ধর্মগুরুর আসনে বসেছে রাষ্ট্রনেতা। সেই ইতিহাস হবে তাঁদের কাম্য যাতে রাষ্ট্রের উপর, অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদের উপর লোকের ভক্তি ও ভয় প্রবল ও প্রগাঢ় হয়। তাতে যদি কিছু অসত্যভাষণের প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে রাষ্ট্রসচেতন ঐতিহাসিকের দেশপ্রেম। ইউরোপের মধ্যযুগে থুকিডিডেসের ইতিহাসের আদর্শ বেঁচে ছিল না। আজ সে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেশী কঠোর হয়েছে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। শোনা যাবে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। কেবল সত্যভাষণের আদর্শ থেকে তার লক্ষ্য অনেক উঁচুতে, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মঙ্গল।

৮

এক কাল ছিল যখন, আজ যে সকল বিদ্যা নিজের গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ, তার অনেকগুলি ছিল অন্য সাধনার অঙ্গ ও উপায়। সেই উপায়ের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু মানুষের চঞ্চল কর্মকৃৎ মন ও প্রতিভা উপায়ের গণ্ডি ভেদ করে স্বতন্ত্র বিদ্যায় তাদের গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গবিদ্যাগুলি তার উদাহরণ। যে বিদ্যা ছিল বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সত্য অর্থ-গ্রহণের উপায় মাত্র, তা গড়ে উঠল ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান হয়ে। ছন্দঃশাস্ত্র বৈদিক ছন্দোবিচারে আবদ্ধ থাকল না। জ্যোতিষ ও জ্যামিতি বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণতি পেল। মানুষের প্রতিভার এসব সৃষ্টি ও বিদ্যার চর্চাকে বৈদিক কুলপতিরা সুনজরে দেখেন নি। মনুসংহিতায় তার স্মৃতি রয়ে গেছে। 'যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না ক'রে অন্য বিদ্যায় শ্রম করে এই জন্মেই তার সবংশ আশু শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি হয়।'

> যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
> স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ২॥১৬৮

'অন্যত্র' কথার ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন, "শাস্ত্রাঙ্গেষু তর্কশাস্ত্রগ্রন্থেষু বা"। কুল্লুক সোজাসুজি বলেছেন, "অর্থশাস্ত্রাদৌ"। সর্বজ্ঞ নারায়ণ শুধু বলেছেন, "অন্যত্র শাস্ত্রে," অর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্য বিদ্যায়।

ইউরোপের মধ্যযুগে খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে অন্য বিদ্যার যারা চর্চা করত ধর্মগুরুরা তাদের সন্দেহের চোখেই দেখতেন। এর প্রেরণা যে ভগবানের নয়, আসে শয়তানের কাছে থেকে, সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন। ফাউস্টের প্রাচীন গল্প এর উদাহরণ। ধর্ম ও নীতির রথচক্রের বন্ধন থেকে বিদ্যাগুলির মুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে। ইতিহাসেরও ঘটেছে সেই মুক্তি। কিন্তু কোনো বন্ধন থেকে মুক্তিই চরম মুক্তি নয়। মুক্তিকে রক্ষার জন্য মানুষকে অতন্দ্র থাকতে হয়। কারণ পুরাতন বন্ধন নূতন নূতন রূপে মানুষের মুক্ত মন ও বিদ্যাকে আবার বাঁধতে চায়। মানুষের মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর আজকের পৃথিবী অনুকূল নয়। সম্ভব ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৯

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা খেয়াল-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, মানুষের কোনো কাজে লাগে না? মানুষ নিজের কাজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সুতরাং মানুষের তা কাজে লাগে। কিন্তু, যে মানুষের কাজে লাগে সে মানুষ সত্যের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তত্ত্বের মাপে কাটাছাঁটা প্রমাণসই standardised মানুষ নয়। মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় মুখ্যত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। সুতরাং প্রয়োজন সিদ্ধির কাঠামে সে বস্তুকে পুরতে চায়। তাতে বস্তুর সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠামের কাজ নয়; তাতে কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কার্যসিদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে নিষ্প্রয়োজন অবান্তরকে দূরে রাখার জন্যই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে প্রয়োজনসিদ্ধির দৃষ্টিতে তা অবস্তু। তাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চলে এবং অগ্রাহ্য করলেই কাজ ভালো চলে। ক্রমে মানুষের ব্যবহারিক মনের ধারণা জন্মে যে, কাঠামোর মধ্যে যা রয়েছে তাই বস্তু, তার বাইরে বস্তুর আর অস্তিত্ব নেই।

আজ যারা সভ্য মানুষ, একদিন ছিল যখন তাদের পূর্বপিতামহদের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার আহার আবাস ও আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায়। সে মানুষের কাঠামো বুদ্ধিমান্ দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামো। তার পর অনেক হাজার বছরের নানা সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মন শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তবাহুল্য মন সৃষ্টির প্রেরণায় ও আনন্দে বহু সৃষ্টি করে চলেছে যা শরীরের কাজে লাগে না, বাহুল্য মুক্ত মনের কাজে লাগে। কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য সবই এই মুক্ত মনের সৃষ্টি। কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্মৃতি মানুষের মনে বেঁচে আছে। তার এক কারণ, অনেক মানুষের মন আজও শরীরের সেই একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। তাই যখন প্রশ্ন হয়, এ বস্তু মানুষের কোন্ কাজে লাগে তখন প্রশ্নকর্তা যে মানুষের কথা বলেন সে মানুষ হচ্ছে দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামোর মানুষ। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগে কি না। যত গাম্ভীর্য ও মুরব্বিয়ানার সঙ্গে প্রশ্ন হোক-না কেন, একটু বাজিয়ে দেখলেই আওয়াজ চিনতে ভুল হয় না। যে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিহাসও মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি। তাকে শরীরের কাজে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহু শরীরে সমষ্টি মাত্র তার কাজেও লাগানো যায় না। চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিস্ময়। সেই চিরবিস্ময়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালা (১৯৫৪), প্রথম বক্তৃতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত

বিশ্বপথিক বাঙালী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

সভ্যতার আদি যুগে মানুষ ঘর বাঁধতে শেখে নি, তখন তার ছিল যাযাবরবৃত্তি। পৃথিবীর সহজ দানের প্রাচুর্য যেখানে মিলত সেখানে দিনকয়েক থাকত সে, তারপর আবার চলত অন্যত্র দানডাণ্ডার খোঁজার পালা। এমনি করে সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে, সে তখন ছিল পথচলতি মানুষ, তার জঙ্গমতায় স্থাবরত্বের কোনো বাঁধন ছিল না। তার পরে এল যুগবদলের পালা। পৃথিবীর দান দোহন করবার কৌশল তখনো মানুষের আয়ত্ত হয় নি, কিন্তু জীবজন্তু পালন তখন তার আয়ত্তে। সে দুধ খায়, মাংস খায়, মেষের লোমে জামা করে, জন্তুর চামড়ায় তাঁবু করে— তার জীবনের সঙ্গে পশুপালন সংযুক্ত হয়েছে। কালক্রমে এই পশুচারণ যুগও মানুষ কাটিয়ে এল সে যখন শিখল কৃষির গোড়ার তত্ত্ব— পৃথিবীর দানকে নিজের মতো করে আদায় করার কৌশল। সে কৌশল প্রথমে খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। এখনও আদিম জাতের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন আছে— হলকর্ষণ তারা শেখে নি। যাই হোক, কৃষিযুগের শুরু সেখানেই। সেই প্রথম স্থাবরত্বের শক্ত বাঁধন পড়তে লাগল জঙ্গমতায়। যাযাবর বাঁধনছেঁড়াভাবে যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারে, তার কোনো পিছটান নেই। পশুচারণ যুগে হয়তো সামান্য কিছুটা বাঁধন লেগেছে, কেননা পশুর পাল নিয়ে অত সহজে ঘুরে বেড়ানো যায় না, যেখানে চারণভূমি নেই সেখানেও বসবাস করা যায় না। তা ছাড়া পশুর পাল শুধু জীবনের সহায়ই ছিল না, সময় সময় বিনিময়েরও বাহন ছিল। কিন্তু তবু তার জঙ্গমতার অভাব হয় নি। কিন্তু মাটির মায়া লাগালো প্রথম বাঁধন। যে জমি চাষ করে সে জমি ফেলে সহজে অন্যত্র যেতে পারে না, অন্ততঃ যতক্ষণ না আর এক জায়গায় আরও ভালো জমি পায়। পেলেও সে জমি তৈরি করায় পরিশ্রম আছে। সুতরাং কৃষিসভ্যতার সঙ্গে মানুষও ঘর বাঁধতে শুরু করল, আরম্ভ হল গ্রামের পত্তন। ক্রমে ক্রমে গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী। সভ্যতা যুগে যুগে বিবর্তিত হতে লাগল।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে জীবিকার কৌশলই বদল হয়েছে তা নয়, মানুষের জীবন ও তার সমাজসংগঠনও বদল হয়েছে। কারণ, ইতিহাসের এই ব্যাপক পটভূমিকায় আলোচনা করলে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মানুষ তার সমাজকে সেইভাবেই সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছে যে সমাজের মাধ্যমে তার জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। যেখানে সে তা পারে নি সেখানেই তার ক্ষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টয়েনবী বলেছেন যতদিন গ্রীক রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল না ততদিন তাদের সমাজসংগঠন হিসেবে নগর-রাষ্ট্র বা City-States গুলির সার্থকতা ছিল যথেষ্ট— কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেখা দিল এবং প্রয়োজনও হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, তখনও তারা নগর-রাষ্ট্রের বাঁধন কাটিয়ে দেশজোড়া বৃহৎ সংস্থা গড়তে পারল না বলেই গ্রীসের ঘটল অপমৃত্যু। কিছু কিছু এরকম সংস্থা গড়ে ওঠার চেষ্টা শেষের যুগে গ্রীসে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি। বাস্তবিক, এই সহজ সত্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে যাযাবর মানুষ সঙ্গীহীন চলেছে দেশদেশান্তরে, কোথায় তার পরিবার, কোথায়ই বা তার সমাজ আর কোথায়ই বা তার রাষ্ট্র! সে একা।

কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পশুর দল চারণ করতে গেলেও কিছুটা সংগঠন দরকার, দরকার পারস্পরিক সাহায্য— কাজেই তার মধ্যে রাষ্ট্রের বা সমাজের সন্ধান না পাই, অন্ততঃ পরিবারের বা গোষ্ঠীর সন্ধান পেলে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। তেমনি একথাও সহজেই বোঝা যায়, কৃষির কাজ একলার নয়, তার মধ্যে বিপুল এবং বিরাট সংগঠন ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। কাজেই তার তাগিদে যদি শুধু পরিবার বা গোষ্ঠী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় তা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রামীণ জীবন ও নাগর জীবনের পার্থক্যের মূলও তো এইখানে। যে প্রয়োজনের তাগিদে নগর বা মহানগর গড়ে সে তাগিদ আর গ্রামসমাজের তাগিদ এক তো নয়,— বরং একেবারে মূলতঃ তফাত।

কৃষিজীবন জগতে বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, শুধু ভারতবর্ষে নয় অন্যত্রও। সে তুলনায় যন্ত্রসভ্যতা তো নেহাতই নাবালক। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে যে কৃষিসভ্যতা চলে এসেছে বাহ্যতঃ সে কৃষিসভ্যতা বলে চিহ্নিত হলেও তার চেহারা কালে কালে বিপুল পরিবর্তিত হয়েছে— বস্তুতঃ তার আদি ও অন্ত যুগের চেহারা মোটেই একরকম নয়। সমাজশাস্ত্রীরা জানেন, কৃষিসভ্যতার গোড়ার যুগে জমির দখল ছিল যৌথ, ক্রমে ধীরে ধীরে তা ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। এ বিবর্তন হতে কমদিন লাগে নি। এইভাবে কৃষিসভ্যতা চলতে চলতে আর এক ধাপ দেখা দিল। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও যেমন চেহারা গেল বদলে, তেমনি অন্যদিকে দেখা দিল হস্তশিল্প। এর সঙ্গে ঘটল আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এঙ্গেলস্ তার 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের গোড়ার কথা' (*The Origin of the Family, Private Property and the State*) নামক পুস্তকে এই বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, The division of production into two great branches, agriculture and handicrafts, gave rise to production for exchange··· and with it came trade, not only in the interior and on the tribal boundaries, but also overseas. অর্থাৎ কৃষি এবং হস্তশিল্প এই দুটি বিভাগ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন আর শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন রইল না— উৎপাদন হল বিনিময়ের বাহন। লক্ষ্মী ছেড়ে মানুষের মন ধাবিত হল কুবেরের ভাণ্ডারের দিকে— প্রয়োজনের সীমানা গেল বদলিয়ে। সেই সঙ্গে স্বতঃই দেখা দিল বাণিজ্য। শুধু দেশের চতুঃসীমার মধ্যে বাণিজ্য নয়, সপ্তসাগর পেরিয়ে বাণিজ্যও।

কৃষিসভ্যতার ইতিহাস মোটামুটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, যন্ত্রযুগের পূর্ব পর্যন্ত তার বিবর্তন মোটামুটি এইভাবেই চলে এসেছিল। সেই প্রাচীন ফিনিসীয় নাবিকেরা পণ্য বহন করে ফিরত দেশ দেশান্তরে, ভারতবর্ষের বাণিজ্যতরী নোঙর ফেলেছে দেশবিদেশের ঘাটে ঘাটে। বাংলার মসলিনের বাজার জমেছে গ্রীসে, রোমে— পরের যুগে ইংলণ্ডেও। সেই বাণিজ্যতরী গিয়েছে প্রাচ্যভূখণ্ডের বন্দরে বন্দরে, তার সপ্তডিঙা মধুকর পাড়ি জমিয়েছে উত্তাল ভারতমহাসাগরে— শুধু বাণিজ্যের পণ্য নয়, সংস্কৃতির বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে দ্বীপময় মহা-ভারতবর্ষে। তেমনি পাহাড় মরুভূমি পার হয়ে চলেছে সার্থবাহ, চীনে জাপানে নিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের বার্তা। বস্তুতঃ ইতিহাসের সেই সুদূর অতীতে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়া— ইউরোপ তখনও জাগ্রত হয় নি। তাই সভ্যতার বিকাশের সেই গোড়ার যুগে প্রাচ্যভূখণ্ডেই চলত বেশিরকম আনাগোনা— দেশদেশান্তরের মধ্যে সংযোগ রচিত হতে থাকত।

এই বিরাট আদানপ্রদান সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কৃষিসভ্যতার মূল কথাটা ছিল

আঁকড়ে থাকা। বণিকসম্প্রদায় দেশ বিদেশে যতই ঘুরুন না কেন, কৃষিসভ্যতার গোড়ার কথা হল মাটি। মাটি ছেড়ে নড়াচড়া সহজ নয়। সেইজন্য কৃষিসভ্যতার আনুষঙ্গিক হিসেবে যতই বাণিজ্য চলতে থাকুক না কেন, তার মূল ছিল মাটির গভীরে, তার শিকড় ছিল পোঁতা। বণিকদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী লোক দেশবিদেশে প্রায় যেতই না, দূরের শহর নগরেও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে যেত না। গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্তিত হত, কারণ তাদের সমস্ত কর্মই ছিল গ্রাম ও ভূমিকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক জীবনের এই তাগিদে সমাজজীবনও গড়ে উঠেছিল অনুরূপভাবে। তাই আমাদের পণ্যতরী যতই মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাক না কেন, জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, বহির্বিস্তারী নয়।

কালক্রমে দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের এই যোগসূত্রও গেল শুখিয়ে। বাণিজ্যের ক্ষীণধারা লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে আমরা আরও স্বাশ্রয়ী হয়ে পড়লুম, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গেল কেটে। আর কোনো বশিষ্ঠ হিমালয় পার হয়ে গেলেন না তিব্বত-চীনে, কোনো অতীশ-দীপংকর গেলেন না বিদেশে, বিদেশের কোনো ছাত্র এসে শোভাবর্ধন করতে থাকল না নালন্দার মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের। অজ্ঞান হল ভয়ের জন্মভূমি, অজানাকে ভয় করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। দেশবিদেশের মানুষ ও তার আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি আমাদের যতই অজানা হয়ে পড়ল ততই তারা হয়ে দাঁড়াল ভয়ের আকর— আমরা তাদের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। যে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ সামাজিক গঠন এবং মানসিক আদর্শের ফলে একদিন নিখিল বিশ্বে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলতে পেরেছিল আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, সকলে আসুক সকল দিক থেকে, যার বাণী কাল ও দেশের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে নিখিল মানবচিত্তে ধ্বনিত হতে পেরেছিল, সেই ভারতবর্ষ ক্রমে জীর্ণ ঠুনকো আচারের বেড়াজালের মধ্যে নিজে লুকিয়ে ফেলে উটপাখির মতো ভাবতে শুরু করল, এইবার মাটিতে মুখ লুকিয়েছি, আর বুঝি কেউ আমায় দেখতে পাবে না। আমাদের জীবনদর্শনও তখন সমাজের প্রাণপ্রবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ন্যায়ের চুলচেরা তর্কের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্রাণপদ্মের যে বিকাশ-সৌরভে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা এশিয়া আমোদিত হয়েছিল সেই প্রাণপদ্ম মুদিত হয়ে গেল। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পিছনে একটা বিরাট্ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বদল ছিল।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে হয় আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি কি না। তার জন্য বুঝতে হবে, এখন জগতে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠন হয়েছে এবং তার দাবি কি। একথা পাঠ্যপুস্তকেও বারবার বলা হয়ে থাকে, গত দু'শো বছর ধরে জগতে যে যুগের আবির্ভাব হয়েছে সে যুগ হল যন্ত্রের যুগ, তার সভ্যতা হল যন্ত্রসভ্যতা। যন্ত্র যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে যন্ত্র এখনকার যন্ত্রের মতো মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে নি, আর তখন যন্ত্রই সভ্যতার নিয়ামক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কালক্রমে যন্ত্ররাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা গেল বদলিয়ে। উৎপাটিত হল কৃষিসভ্যতা, ভেঙে গেল গ্রামকেন্দ্রিক স্বাশ্রয়িতা, গড়ে উঠল বড় বড় নগর বন্দর, পণ্য চলতে লাগল অনবরত দেশবিদেশে। এ পণ্য আগের যুগের পণ্য নয়, যা কেবল বণিকদের ব্যাপার ছিল। এ পণ্য উৎপাদন করে সারা দেশের লোকে, বিদেশের বাজারের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়, জগতের এক কোণে মন্দার লক্ষণ দেখা দিলে জগতের অপর কোণে সারা দেশের লোকের যায় মুখ শুখিয়ে। আর্জেণ্টিনায় বিপ্লব ঘটলে ইংরেজের ঘরে ঘরে দেখা দেয় মাংসের অভাব, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ডাণ্ডীর ম্যান্‌চেস্টারের কলে কারখানায় পড়ে কালো ছায়া। সারা দেশের লোকের

ভাগ্য গেল অপরাপর দেশের সঙ্গে জড়িয়ে। মার্ক্স্ পর্যন্ত তো বলেছেন, এই হল ধনতন্ত্রের বৈপ্লবিক ভূমিকা। সে তার খরনখর প্রসারিত করেছে সারা জগতের গ্রামে নগরে, তার ছায়া পড়েছে নিখিল বিশ্বের প্রান্ত-প্রান্তরে, উৎখাত করেছে সে দেশবিদেশের গ্রামীণ সভ্যতাকে, বিপর্যস্ত করেছে কৃষিব্যবস্থাকে, অবসান ঘটিয়েছে সামন্ততন্ত্রের, বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে গোটা জগৎকে, আকাশবাতাসে শোনা গিয়েছে তার পরাক্রান্ত সিংহগর্জন। এইভাবে বাড়তে বাড়তেই তো দেখা দেয় তার শেষ রূপ, যাকে লেনিন বলেছেন ফিনান্স-ক্যাপিটাল। তার রূপই হল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ মানবিক প্রয়োজন মেটাবার উপকরণ নয় অর্থ, সে হল বিপুল উৎপাদন ও লাভের উপকরণ মাত্র। সে উৎপাদন আদিম যুগের মতো নিজের বা আশেপাশের লোকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, সে হয়তো স্বদেশের ক্ষুধা না মিটিয়ে বিদেশে চালান দেবার জন্য, যদি স্বদেশের চেয়ে বিদেশের বাজার হতে লাভের মাত্রা বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই-ভাবে ক্রমে ক্রমে বিরাট বিশ্ব একত্র গ্রথিত হয়েছে, তাদের পারস্পরিক যোগসূত্র আর কাটাবার নয়। এক সময় তো বিলেতী লাট্টু মার্কা কাপড়ের দামের ওঠাপড়ার উপর অন্ততঃ কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি হত আমাদের চাষীর ব্যয়ের অঙ্কের।

আজ ধনতন্ত্রের যুগও অবসান হতে চলেছে, দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে নতুন যুগের জয়যাত্রা, শোনা যাচ্ছে নতুন কালের পদধ্বনি। সে বস্তু সাম্যবাদই হোক সমাজবাদই হোক, একথা নিশ্চিত যে ফিনান্স-ক্যাপিটালের নির্বাধ পরাক্রম জগতে আর কোনোদিনই ফিরবে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমরা কুবেরের বদলে লক্ষ্মীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছি বলে জগৎকে আবার পিছিয়ে নিয়ে যাব বা পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারব। বস্তুতঃ তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আর তার প্রয়োজনও নেই। যে যন্ত্ররাজ মানুষের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আজ তাকে আয়ত্তে এনে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে এর মানে নয় যে যন্ত্রটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তার অর্থ হল যন্ত্রটার মোড় ফেরাতে হবে, এই মাত্র। সুতরাং মনে রাখতে হবে, আমরা দু'শো বছর ধরে যে জালে জড়িয়েছি, যখন প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আমরা সমান মানুষ হিসেবে অপরের সঙ্গে মিশব তখন সেই জাল তো কাটবেই না, বরং অধীনতার গ্লানিমুক্ত অবস্থায় মানবকল্যাণের পরিবেশে সে জাল আরও শক্ত হবে কল্যাণময় হবে সুষমায় ভূষিত হবে। আজকের দিনের প্রত্যেক দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন এমনই যে আর আমরা একলা থাকতে কিছুতেই পারছি না। বরং বলতে পারা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা শ্রেণীর মধ্যে শোষক-শোষিত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হলে তখনই তো বেশি করে এবং সত্য করে শুরু হল বিশ্বপথিকের মহাভিনিষ্ক্রমণ, এই তো আরম্ভ হল তার প্রকৃত জয়যাত্রা। এই হল জগতের মেলায় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, এই হল প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি যে আজকের দিনে কোনো মানুষই অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এতদিনে দেখা দিল সত্যকার মহামিলনের মন্ত্র। বাস্তবিক, স্বাধীন ভারতবর্ষ দেশে দেশে যে পঞ্চশীলের বাণী বহন করে ফিরছে সেটা মূলতঃ এই কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সেকালের ভারতবর্ষ যেমন সেকালের পরিবেশে ডাক দিয়েছিল বিশ্বমানবকে আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, আজ তেমনি সে বলতে চাচ্ছে আমরা তোমাদের আহ্বান করছি রণদামামা বাজিয়ে নয়, দৌর্বল্যের গ্লানিতে নয়, পরাক্রমের অহংকারে নয়, আমরা তোমাদের আহ্বান করছি মানবকল্যাণের যজ্ঞশালায়, তোমরা আয়ন্তু সর্বতঃ, সকল দিক হতে এসো, স্বাহা, তোমাদের মঙ্গল হোক। আজকের সন্দেহদিগ্ধ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জগতে ভারতবর্ষের ক্ষীণ কণ্ঠ কতদূর শ্রুতিগোচর হবে তা জানিনে, কিন্তু একথা সত্য যে ভারতবর্ষ আবার নতুন করে এ যুগের পরিবেশে সেই

মানবকল্যাণের জয়ঘোষণা করবারই চেষ্টা করছে যা শুধু ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই নয় শাশ্বত মানবাত্মার বাণী। কথাটা নতুন নয়।

একদিন না একদিন একথা হয়তো বিশ্বজগৎকে শুনতেই হবে, কেননা মাতলামিটা সাময়িক বিকার হতে পারে কিন্তু স্থায়ী স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। কিন্তু সে চিন্তার দায় আমাদের নয়। আমাদের এই কথা ভাবতে হবে, প্রথমতঃ আমরা যে যুগে এসে পড়েছি সে যুগে দূরদূরান্তরের মানুষও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা। শুধু গ্রামটুকু নয়, শুধু চারপাশের সমাজটুকু নয়, কত দেশের কত চেনা অচেনা মানুষ তার সমাজ ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি নিয়ে আমাদের জীবনে ছায়াপাত করছে। তার উপর যাতায়াতের সুবিধার জন্য কোনো দেশই আর দূর নেই। লণ্ডন তো আমাদের ঘরের কাছে, বিলেত থেকে ফিরবার পথে কায়রো এসে পৌঁছলেই মনে হয় যেন আসানসোল পৌঁছে গেলুম, পরের স্টেশনই বর্ধমান অর্থাৎ বোম্বাই, তারপরেই কলকাতা। অহরহ চলছে দেশবিদেশে যাতায়াত। এইভাবে আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছি, দূরত্ব ক্রমেই বিলীয়মান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এসব ব্যাপার তো জগতের সর্বত্রই আজ ঘটছে, কিন্তু আমরা তার উপর দায়িত্ব নিয়েছি মানবমিলনের বাণী প্রচার করবার। আজকের পথই যে শুধু আমাদের বিশ্বপথিক হতে বাধ্য করছে তাই নয়, আমরাও আগ্রহসহকারে সে পথ বেছে নিয়েছি। সেজন্য আজকের দিনে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হল বিশ্বপথিক হবার। এ যুগের তাৎপর্যই এই। এমন কি সে পথ ছাড়া আমাদের স্বকীয়তার সাধনাও হতে পারে না।

প্রশ্ন হল, আমরা সে পথে সত্য সত্যই বেরিয়েছি কি না। মনে রাখতে হবে, যখন জগৎ এরকম ঘনসংবদ্ধ হয় নি, পরাধীনতার প্রথম ধাক্কায় যখন আমরা জীর্ণ এবং উদ্বিগ্ন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে আমরা যখন ব্যতিব্যস্ত ও ভারকেন্দ্রচ্যুত, সেই বেসামাল বিপর্যস্ত যুগে বাঙালীই সব প্রথম বিশ্বপথিকতা ও ভারতপথিকতার পথে বেরিয়েছিল। 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> "যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদবিভেদ তার ভেসে যায়, যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন যোগায় সকল দেশকে সকল কালকে।
>
> একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান মননধারা।··· শত শত বৎসর চলে গেল, ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হোলো নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না, তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে, তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে, তখন জ্ঞানের চলমান গতি হোলো অবরুদ্ধ, নির্জীব হোলো নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ··· খণ্ড খণ্ড সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।···
>
> যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে,···ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন ক'রে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার

ক্ষেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে।···

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা, সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনীশক্তি বললাভ করে।·· মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা।···

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতির লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হোলো ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়।··· এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী।"

তারপর কালে কালে শুধু রামমোহন নয়, বহু মহাপুরুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা এই ধারাকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করেছেন স্বকীয় তেজে এবং বীর্যে। বিদ্যাসাগর এর মধ্যে আর এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। আচারনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়ে কি উদার আগ্রহ ছিল তাঁর সকল মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবার, চিত্তের স্বারাজ্য এবং মোহমুক্ত মনের নির্বাধ অনুশীলন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার। আর কি নিদারুণ নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন তার জন্য! একদিকে বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীলোকের অধিকার-প্রতিষ্ঠা, বহুবিবাহ-নিবারণ ও অন্য নানাবিধ সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা হতে শুরু করে অন্য দিকে সম্প্রদায়নির্বিশেষে জ্ঞানলাভের সুযোগদানের জন্য মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা (হিন্দু কলেজে হিন্দু ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার ছিল না)— কোন্ দিকে তিনি অসীম বীর্যবত্তার সঙ্গে যুদ্ধ না করে গিয়েছেন! শকুন্তলা সীতার বনবাসের সঙ্গে তিনি যেমন পরিচয় ঘটিয়েছেন বাঙালী পাঠকের, তেমনি বালকপাঠ্য পুস্তকে লিখেছেন অস্ট্রিয়া ভিয়েনা জার্মানির গল্প। কি উদার আকাশে তাঁর চিত্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু শুধু বিদ্যাসাগর ন'ন। বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়েও, যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হয়েছে আমাদের সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের উপর। আর এই আম্নায়ে শেষ পর্যন্ত এলেন এই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সঙ্গে ছোটবড় আরও অনেকে এসেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃই সংকীর্ণতার ধূলোর ঝড় ওড়ে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা যখন জাতীয় কংগ্রেসের কল্পনা করেছিলেন তখন সারা ভারতই তাঁদের চিত্তাকাশ জুড়ে ছিল। 'এক ধর্মরাজ্যপাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—এই ছিল তার মোটামুটি উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, বিশ্বপথিক বা ভারতপথিক হয়ে তাঁরা বাঙালীত্ব বা বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেন নি, বাংলার ক্ষতিসাধন করেও অন্য জায়গার হিত করতে যান নি। বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের প্রকৃত সাধনায় তা হয় না। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা, সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনীশক্তি বল লাভ করে। সুতরাং নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বপথিকতার কথা আওড়ানো

কেবল ভানমাত্র। বস্তুত যে মানুষ তার নিজের স্বকীয়তায় সফল হবে, সৃষ্টি করতে পারবে তার চারিত্রদীপ্তি, উৎসারিত হবে তার তেজ, সেই তেজের জোরেই সে বিশ্বমানবের সাধনাকে জয়যুক্ত করতে পারে, অন্যথায় নয়। এই পথে তার নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বহমান চিন্তাস্রোত অন্যকেও সঞ্জীবিত করতে থাকে, সাড়া জাগিয়ে তোলে দিকে দিকে, দেখতে দেখতে সে নতুন ইতিহাসের পুরোধা হয়ে দাঁড়ায়। গত শতকে বাঙালীর তাই ঘটেছিল।

আজ বাংলা তথা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, যখন আমরা বাইরের সঙ্গে একালের সমাজ ও রাষ্ট্রিক বন্ধনের অনিবার্য ফলস্বরূপে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ছি, ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে এমন কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা মনে ভরসা জাগায় না। স্বাধীনতালাভের পর এ আশা অসঙ্গত ছিল না যে দেশময় এবার বিপুল কর্মের নির্মল স্রোত বইবে, যে স্রোতে আমাদের বহুকালসঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। আজ দেশে নানাস্থানে কর্মের কিছু কিছু ধারা বইতে শুরু করেছে সত্য, কিন্তু তা এমন পরিমাণে নয় যাতে দেশের চেহারা ফিরে যেতে পারে। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, আমরা পুরাতন বাঁধন সব ছিঁড়ে ফেলেছি, কিন্তু নতুন কোনো বাঁধন গড়ে তুলতে পারি নি। আগেকার সমাজ ও অর্থনীতির বাঁধনে শহর এবং গ্রামগুলি একধরনে বাঁধা ছিল। আজ সে বাঁধন কেটেছে। তার বদলে নতুন সমাজের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগের মধ্য দিয়ে মৌচাকের কোষগুলির মতো গ্রামগুলিকে গড়তে চেয়েছিলেন গান্ধিজী। কিন্তু তা-ও হয় নি। এখন আমরা যে পথ ধরেছি তাতে গান্ধিজীর কথা আর চলবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু সে কথা না চললেও ক্ষতি নেই, যদি আমরা একালের অন্য কোনো সফল পদ্ধতিতে দেশ গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা-ও হচ্ছে না। তার ফলে আজ দেশে সকল বাঁধন কেটে স্বার্থ দ্বেষ হানাহানি প্রবল হয়ে উঠেছে। তার একটা বড় উদাহরণ অত্যুগ্র প্রাদেশিকতা। সেই সঙ্গে জাতিগত ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বাধীনতার পর একদল ফিরে যেতে চান সেই প্রাচীন কালে, অর্থাৎ সেই রামরাজ্যে, যে অর্থে গান্ধিজী কখনো রামরাজ্য শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু অন্য প্রদেশের কথা বলি কেন? আজ বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও তো দেখা যায়, এখানে প্রাদেশিকতা প্রখর না হলেও ভেদবুদ্ধির অভাব নেই। বৃহৎ কাজে নতুন সমাজ গড়ার আহ্বানে আমরা তেমনভাবে মিলতে পারছি কই? এমন কি সার্বজনীন পুজো কি সংস্কৃতি-সম্মেলনের মতো ছোট ছোট ব্যাপারেও তো আমরা কেবল ভেঙে ভেঙে টুকরো করতেই সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের কথায় এরকম বুদ্ধি নিয়ে চুল চেরা যায় কিন্তু গ্রন্থিচ্ছেদন করা যায় না। সেইজন্যই বিস্মিত হবার কারণ নেই যে আমাদের ভাগ্যে কেবলই গ্রন্থির উপর গ্রন্থি পড়ছে—আমরা যে সারা ভারতবর্ষের হাতেই নিদারুণ মার খাচ্ছি তাই নয়, আত্মহত্যার চেষ্টাও কম করছি নে। এক-এক সময় মনে হয় এই মারের অনেকখানিই হয়তো আমাদের ন্যায্য পাওনা। যদি পাশের লোকের সঙ্গে মিলতে না পারি, মিলতে না পারি পাশের গ্রামের সঙ্গে, স্বার্থবুদ্ধি যদি প্রলয়ংকর হয়ে ওঠে, প্রতারণা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে প্রশংসিত হতে থাকে, সত্যনিষ্ঠার নাম হয় বোকামি, মানবসভার কল্যাণযজ্ঞে নিঃস্বার্থ কর্মীর সন্ধান বিরল হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, যে পথ শ্রেয়স্কর তাকে পরিত্যাগ করে আমরা আপাত-প্রেয়স্কর পথই বেছে নিয়েছি, তা হলে স্বীকার করতেই হবে আজ বিরাট্ বিশ্ব তার বিশিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের ফলে এ যুগে বিশেষ করে আমাদের যে পথে আহ্বান করছে

আমরা সে পথে চলছি না— তা হলে মেনে নিতেই হবে মনুষ্যত্বের যে উদ্বোধনে আজ শুধু আমাদের মুক্তি নয় এমন কি আর্থিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠাও, সেই উদ্বোধনের তূর্যধ্বনি আমাদের কানে পৌঁছয় নি। অথচ একদিন এই পথেই বাংলা ও বাঙালী বড় হয়েছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত বড় হবার পথই এই। আজ সেজন্য সে পথই কাম্য যে পথে বাঙালী শুধু যে পরস্পর মিলিত হতে পারবে তাই নয়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিহিতার্থকে পূর্ণ বিকশিত করে ভারতপথিকতা ও বিশ্বপথিকতার পথে বাংলাকেই বড় করবে, কারণ তাতেই তার চরিত্রের প্রতিষ্ঠা, তাতেই তার সেই তেজের বিকিরণ, যে মহনীয় তেজ সকল কালে সকল জাতিকে উন্নতির উত্তুঙ্গশিখরে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীচৈতন্যলীলার ইঙ্গিত

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বন-বিষ্ণুপুরের নিকট কাঁকিল্যাগ্রামে এক গাদা পুথির সঙ্গে একখানি নামহীন খণ্ডিত পুথি পান। বহুদিন ধরিয়া অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত উহার সম্পাদনা করিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়া ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে পুথিখানি প্রকাশ করান। সুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রম সত্ত্বেও পুথির একাদশ খণ্ডের নামের পাঠোদ্ধার করা হইয়াছিল "বালখণ্ড"; কিন্তু উক্ত খণ্ডকে 'বালখণ্ড' বলিবার কোনো সার্থকতা নাই দেখিয়া পরবর্তী সংস্করণে উহাকে 'বাণখণ্ড' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন পুথিতে 'ল'য়ের সহিত দন্ত্য 'ন'য়ের পার্থক্য কম, কিন্তু 'ণ'য়ের বেলা সে কথা বলা চলে না।

একখানিমাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করা যায় না। বিশেষতঃ উপজীব্য পুথিখানি এক হাতের লেখা নহে— তিন হাতের লেখা। তাহার মধ্যে আবার সম্পাদক মহাশয়ের মতে "তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না।" একই যুগে বা একই বৎসরে একাধিক ব্যক্তি মিলিয়া একখানি পুথি নকল করিলে, একজন অপরের হাতের লেখার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে না। তৃতীয় লিপিকরের এই ইচ্ছাকৃত অনুকরণ সন্দেহজনক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথিখানির লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে উহাতে "একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়;—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।" তিনি পুথির কাল নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল"। কিন্তু একই পুথিতে তিন রকমের লিপি থাকিলে পুথির কাল নির্ভর করা উচিত "অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষরের" কালের উপর।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশের তিন বৎসর পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উহার অকৃত্রিমতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দে উক্ত পত্রিকায় তিনি "স্বীয় মত স্থাপন ও পূর্বভ্রান্তি সংশোধন করিয়া" লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুপুরের পুথির লিপিতে নাগরী ছাঁদ থাকিত, "বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক-হাতের কয়েকটি ব্যঞ্জনাক্ষরে কোণশূন্যতা ও উ স্বরাক্ষরে শৃঙ্গহীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোণশূন্যতা নাগরীর চিহ্ন।" তাঁহার অভিমত যে কৃষ্ণকীর্তনের পুথি "১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে, পূর্বে নয়।"

পুথি যদি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার মধ্যে শ্রীচৈতন্যলীলার কিছু ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নহে। 'রাধাবিরহ'খণ্ডে দেখি রাধা বড়াইকে বলিতেছেন, "প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল।" কোথায় কোথায় কৃষ্ণকে খুঁজিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিতে যাইয়া রাধা বলিতেছেন—

> আগেত চাইহ বড়ায়ি বমুলের ঘরে।
> আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে॥

তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়াপাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দ ভোলে॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন জাএ সে গোকুলে॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনা নিকটে॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভাল মতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথাঁ চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে॥
তথাত চাহিআঁ না পাহ যবেঁ কাহ্ন।
তবেঁস চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান॥
তথাহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশক্কেতথানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে॥

এই পর্যন্ত বুঝিতে কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার পরই সহসা দেখি যে রাধা বলিতেছেন—

তথাহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে॥
তথাহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁস পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথে।
আদি অন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য মনে হয় উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন— 'নিতান্তই যদি ব্রজমণ্ডলের কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেননা শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য সাগরে প্রায়ই যান। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাহা হইলে "সুধি পাইবে," সন্ধান বা তত্ত্ব পাইবে যেখানে জগন্নাথ বাস করেন। এই তোমাকে ভাগীরথীকূলের আদিলীলা ও জগন্নাথধামের অন্ত্যলীলা "আদি অন্ত কথা সব কহিল তোমাতে"।

এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিলে পুথির প্রাচীনত্বের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণের মূল পদে "ভাগীরথীকূল" মুদ্রিত হইলেও, প্রথম সংস্করণের টীকায় ঐ শব্দ ছাপা হয় "ভাগীরথী" কুল রূপে; আর উহার ব্যাখ্যায় লেখা হয় "'ভগীরথকুলে' অর্থাৎ ভগীরথ নামা (কোনো) গোপগৃহে, এইরূপ অর্থ

হইতে পারে।" "সাগরের ঘরে" 'শব্দের' টীকায় প্রথম সংস্করণে ছিল— "পূর্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ ৬)। এখানে আবার সাগর গোআল বলা হইতেছে। ইনি কে?" চতুর্থ সংস্করণের টীকায় সংশয়াত্মক "ইনি কে?" শব্দ লোপ করা হইয়াছে। কবি বা গায়ক 'সাগর' শব্দে সমুদ্রের ব্যঞ্জনা করিয়া, পারম্পর্য অনুরোধে সাগরকে গোয়ালা বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। যেখানে জগন্নাথ বাস করেন সেখানে এই শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান বা তত্ত্ব মিলিতে পারে বলার তাৎপর্য বুঝিবার জন্য লোচনের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নিম্নলিখিত উক্তি স্মরণ করা উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥—শেষখণ্ড, পৃ ১১৭

"ভাগীরথীকূলে"র অর্থ যে ভগীরথ নামে কোনো গোয়ালার ঘরে হইতে পারে না তাহা উপলব্ধি করিয়া সম্পাদক মহাশয় পরবর্তী সংস্করণের টীকায় উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ব্রজমণ্ডলস্থ মানসগঙ্গাতীরে" (চতুর্থ সংস্করণ, পৃ ২৭১)। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্তবাবলীর অন্তর্গত ব্রজবিলাসে "মানসজাহ্নবীর" উল্লেখ থাকিলেও, রূপসনাতনের বৃন্দাবনগমনের পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়; যদি বা উক্ত নামধেয় সরোবর প্রাক্-চৈতন্য যুগের হয়, উহাকে কেহ সহজবুদ্ধিতে ভাগীরথী বলিয়া উল্লেখ করে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামধেয় গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্যলীলার আরও দুই ধরনের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, শ্রীরাধার প্রণয়মাধুরী আস্বাদন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্বরূপ-দামোদর কর্তৃক প্রচারিত (চৈ. চ. ১।৪।৯১) এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কোনো কথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া গেলে তাহা শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী যুগের যোজনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "দানখণ্ডের" এক জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন—

অসুর কুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল আবতার কাহ্ন।—প্রথম সং, পৃ ১২৭; চতুর্থ সং, পৃ ৫০

আবার "ভারখণ্ডে" দেখি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ অবতার।—প্রথম সং, পৃ ১৮৫, চতুর্থ সং, পৃ ৭৩

দ্বিতীয়তঃ বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য-রচিত "নিমেষেণ যুগায়িতং, চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং" শ্লোকের ভাব লইয়া দুইটি গীতাংশ রচনা করিয়াছেন। "নিমেষেণ যুগায়িতং", শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এক নিমেষকাল একযুগ বলিয়া মনে হয়, এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাই বড়ু চণ্ডীদাসের—

কাহ্ন বিনি মোর এবেঁ একখণ
এক কুল যুগ ভাএ।—প্রথম সং, পৃ ২৯৬

আর "চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং" এর ভাব পাই

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পানী।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে কবি যে কেবল 'মজুর', 'মজুরিয়া', 'কুতঘাট', 'বাকি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, জল অর্থে 'পানি' শব্দের প্রয়োগ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। চতুর্থ সংস্করণের পত্রাঙ্ক উল্লেখ

করিয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—'তোমার যৌবন রাধে পানির ফোটা' (পৃ ২৬), 'দধিখাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পানী' (পৃ ৩২), আবার 'দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পানি' (পৃ ৪২), 'আর শোষত পানি নাহিঁ পীওঁ' (পৃ ৪৩), 'ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পানি' (পৃ ৪৫), 'ঘোল দুধে মোর দিলেক পানী' (পৃ ৫৬), 'পানি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে' (পৃ ৬০), 'ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পানী' (পৃ ৬৫), 'তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব' (পৃ ৭৯), 'এহার পানী খাহিতেঁ সব জনে' (পৃ ৯৪), 'সখি পানি নেউ স্বখে' (পৃ ৯৫), 'আহ্মে পাণি নিব' (পৃ ৯৮), 'কাছের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল' (পৃ ১১৩)।

কথা উঠিতে পারে যে বড়ু চণ্ডীদাস যে শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত শ্লোকাংশের ভাবানুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি ? সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই ; কিন্তু ঐ কবি জয়দেবের ৫।৮-১৩ শ্লোকের অনুবাদ 'তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে' (প্রথম সং, পৃ ২০২-২০৩) ; ১০।২—৯ শ্লোকের অনুবাদ 'যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ, দশন রুচি তোহ্মারে।' এবং দশাবতার স্তোত্রের ভাবানুবাদ (প্রথম সং, পৃ ২৩৫) প্রভৃতি স্থানে অনুবাদে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র ৪১৫টি গীতের মধ্যে ২৮৯টি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৭০ ভাগে "বড়ু চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে। শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় কোথাও অনুবাদ দেখা যায় নাই। "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল" প্রভৃতি অনন্ত নামযুক্ত গায়ক বা কবির যে সাতটী গীত দেখা যায়, তাহার সহিত "বড়ুচণ্ডীদাস" এবং শুধু "চণ্ডীদাস" ভণিতার ভাব ভাষা ও ছন্দের পার্থক্য লক্ষণীয়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র তিনটি শ্রেষ্ঠপদ "তমাল কুসুম চিকুর গণে" (প্রথম সং, পৃ ২২৫), "কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি" (ঐ, পৃ ২৯৪), "এধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার" (ঐ, পৃ ৩৩৬) শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" পুথি গায়কদের মুখে শুনা গান হইতে লেখা। গায়কেরা ভণিতা সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকিতেন না। শুধু চণ্ডীদাস ভণিতার অনেক নিকৃষ্ট গীতও ঐ পুথিতে স্থান পাইয়াছে। আমরা "তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে" গীতাংশের যে এত জোর দিয়াছি তাহার ভনিতা "বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে"। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে" যত প্রকারের ভণিতা আছে, তাহার মধ্যে ঐ ধরনের ভণিতার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ঠিক ঐরূপ ভণিতা ৪৯ বার এবং "চণ্ডীদাসে" শব্দের পরিবর্তে "চণ্ডীদাস" দিয়া ২৯ বার, একুনে ৭৮ বার ঐ ধরনের ভণিতা আছে। ভণিতার সূত্র ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন গীতের রচয়িতার রচনাশৈলী, ভাব ও ভাষা বিচারের ইঙ্গিত মাত্র দিয়া এখানে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

শিক্ষা-দর্শন ও সাধারণ দর্শন

তাঁর নিজস্ব কোনো দর্শনের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বার বার অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি দর্শন ছিল। বুদ্ধি-গঠিত কোনো ইমারত নয়, এক দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃ-উৎসারিত একটি দর্শন। প্রথমে ব্যাপক কাঠামো রচনা, পরে তার ঘরপূরণ— এ পদ্ধতি তাঁর নয়। তাঁর দীর্ঘ রচনাজীবনে বিভিন্ন সময়ে ও প্রসঙ্গে উচ্চারিত ধারণা ও অনুভূতিগুলির আপাতবিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং পরে এক বিস্তৃত সাধারণ প্ল্যানের মধ্যে এরা সহজেই ধরা দিয়েছে। হিবার্ট বক্তৃতা উপলক্ষে এইগুলিকেই তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, যদিও বুদ্ধির শৃঙ্খল চিরকালই তাঁর কাছে অপ্রীতিকর। *The Religion of Man*-এ এই বক্তৃতাগুলিই প্রকাশিত হয়। এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, নিজের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ স্ব-কৃত বিবৃতি এই গ্রন্থেই পাওয়া যাবে। এই দর্শনের মূল্য যাই হোক, এর বৈশিষ্ট্য এই যে মানুষটি এখানে তাঁর দর্শনের অনুবর্তন করেন নি, বরং দর্শনই একটি অদ্ভুত ঐশ্বর্যময় জীবনের অনুবর্তী হয়েছে, তাকে যথাযথভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছে।

এইভাবে জীবনের মধ্য থেকে যে দর্শন জন্ম নেয়, তার পক্ষে একটা বিভেদহীন বিষয়-নিরপেক্ষ সমগ্রতা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথেরও একটিমাত্র সমগ্রদৃষ্টির মধ্যে জীবন ও বিশ্বজগতের বিভিন্ন দিক ও স্তর সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত প্রতিক্রিয়া সম্মিলিত হয়েছে। তাই তাঁর সাধারণ দর্শন ও তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলনীতির কোনো পার্থক্য নেই।

এই অভিন্নতা আবিষ্কারের অক্ষমতার জন্যই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন শিক্ষাবিৎদের কাছে তার পূর্ণমূল্য পায় নি। এমনকি যাঁরা রবীন্দ্র-অনুরাগী তাঁরাও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে যথেষ্ট প্রেরণা ও ইঙ্গিত লাভ করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দর্শনগুলির সঙ্গে তুলনীয় কোনো একটি সমগ্র দর্শনের সাক্ষাৎলাভ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক রচনার পরিমাণ কম নয়, কিন্তু এগুলির অধিকাংশই কোনো-না-কোনো সাময়িক উপলক্ষের সঙ্গে জড়িত, এবং প্রথম উচ্চারণের সময়েও এগুলির অনেক অনুচ্চারিত অংশ পূর্ণ হয়েছে, বা শ্রোতারা মনে মনে পূরণ ক'রে নিয়েছেন, রবীন্দ্র-জীবন ও -সাহিত্যের বৃহত্তর ভূমিকায়।

বিশ্বমানব

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যমূলক গদ্যরচনাও ইঙ্গিতপ্রধান, উপমাবহুল, বোধির বিদ্যুৎ-চমকে উজ্জ্বল। কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা সুসম্বদ্ধ সার-সংকলন সন্ধানীর পক্ষে লোভনীয় হলেও তাঁর কাছে আশা করা বৃথা। কাজেই তাঁর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মতামত একত্র করে সরল সুসম্বদ্ধ বিবৃতিরচনার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

এই বিবৃতির যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে রবীন্দ্ররচনা থেকে উদ্ধৃতির দ্বারা। সেই চেষ্টাই এখানে করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার অর্থ বিশ্বসত্য বা বিশ্বমানবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ও তারই প্রভাবে ব্যক্তি-সত্তার বৃদ্ধি ও বিকাশ। এই বিশ্বচেতনার মধ্যে আছে মানুষের দেহসত্তা, প্রাণ, মন ও আত্মার অনুরূপ স্তরবিভাগ। মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার মধ্যে সমাহৃত। পরমা নির্বৃতি বা অপরিবর্তনীয় পূর্ণতার ধারক এই বিশ্বচেতনা নয়, তাই তাকে absolute বলা চলে না। কিন্তু অন্য এক অর্থে বিশ্বমানব পূর্ণ ও চরম— তিনি একই সুন্দর সুসমঞ্জস চেতনায় মিলিত করেন অন্তহীন ব্যক্তি-বৈচিত্র্য, আংশিক অভিজ্ঞতা, আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু নিজের মধ্যে তিনি একটি সক্রিয় শক্তি, একটি তাঁর বিশ্বময় আত্মা, মন, প্রাণ ও তনু থেকে তিনি রচনা ক'রে চলেছেন শেষহীন বিবর্তনশীল সৃষ্টি-পরম্পরা। তাঁর এই বিপুল উদ্দেশ্যের ভূমিকায় দেখলেই তবে মানুষের বিবর্তনের সত্য অর্থ বোঝা যায়। মানুষ ইচ্ছা করলে তার সমস্ত শক্তির এই উৎস, অন্তরাত্মার এই ভূমিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ বা দূরত্ব রক্ষা করে চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাকে থাকতে হবে বিবর্তনশক্তির একটি অজ্ঞান নিষ্ক্রিয় যন্ত্রমাত্র হয়ে। কিন্তু যদি সে যুক্ত করে নিজেকে বিশ্ব-অভিপ্রায়ের সঙ্গে, তা হলে তার পক্ষে নিজের বিবর্তনে সজ্ঞান সক্রিয়তা সম্ভবপর হয়। বৃহত্তর সত্যের সঙ্গে এই যোগরক্ষা ও সহযোগিতার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে প্রকৃত শিক্ষার মূল্য নির্ণয়।

বলা যেতে পারে, এই রকম এক বিশ্বব্যাপী অস্তিত্বের প্রমাণ কি। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই যে, আজ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতাগুলির সমস্ত প্রয়াস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন সাধনা ও বিচিত্র মানবসম্বন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে তার আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিস্তারের সমস্ত চেষ্টার মুখ ঐ বৃহতের দিকে। তার সচেতন মন বিশ্বমানবকে স্বীকার না করুক, তার মগ্নচৈতন্যের প্রবণতার মধ্যে এই স্বীকৃতি রয়েছে।

The Religion of Man গ্রন্থে নানাদিক থেকে এই বিশ্বমানব সত্যটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। সেখান থেকে উদ্ধৃত নীচের দুটি অনুচ্ছেদে এই ধারণার রূপটি এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় তা রবীন্দ্রনাথের কথায় পাওয়া যাবে।

"মানুষের ঐক্যকে যুক্তির ভাষায় যাই নাম দেওয়া যাক-না, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমরা শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করি যখন অপরের মধ্যে নিজেকে পাই— আর এই হল ভালোবাসার সংজ্ঞা। এই প্রেমই সমগ্রের সাক্ষ্য বহন ক'রে আনে— যা মানুষের পূর্ণ ও শেষ সত্য। এরই দ্বারা উন্মোচিত হয় আমাদের বৃহত্তম মুক্তির ক্ষেত্র· ·এবং সেখানেই মানব-আত্মার অতুল ঐশ্বর্য অর্জিত হয়েছে সহানুভূতি ও সহযোগিতার দ্বারা, জ্ঞানের নিষ্কাম সাধনার দ্বারা, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে জনসেবার জন্য বুদ্ধির কঠোর তপস্যার দ্বারা। আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা, তিনি আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন, মানুষের জগতে তিনিই চিরকাল করেছেন দীপ্তিবিস্তারের আয়োজন· ·আর সেই হল সভ্যতার মূল প্রেরণা।"

আবার—

"কল্পনার দ্বারা আমরা দর্শনলাভ করতে পারি এই বিশ্বপুরুষের, কিন্তু তিনি আমাদের মনের সৃষ্টি নন। ব্যক্তিমানুষের চেয়ে তিনি অনেক বেশি সত্য, আমাদের প্রত্যেককে অতিক্রম ক'রে তিনি তাঁর সর্বময় সত্তায় অধিষ্ঠিত। তাঁর বিরাট সংকল্পের অনুযায়ী চিন্তাগুলি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সারিবদ্ধ হয়ে

কেবলি চলেছে পূর্ণসত্যের দিকে। তাঁর সংগঠনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু তাঁর সংকল্পের সঙ্গে সজ্ঞান-সামঞ্জস্য রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন। এমনকি আমরা নিজেদের সর্বনাশ স্বীকার করে তাঁর পথে বাধাসৃষ্টিও করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা সহযোগিতা করি তাঁর সঙ্গে তখনি কেবল লাভ করি আমাদের সত্য ধর্ম।"

বিশেষভাবে শিক্ষামূলক রচনাগুলিতে এই ধারণাগুলি কখনোই বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয় নি, কিন্তু এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ও স্পষ্ট ইঙ্গিতের অভাব নেই। এবং এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাবিষয়ক একটি প্রধান রচনা A Poet's School, একটি অধ্যায় হিসাবে *The Religion of Man*-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর থেকে এ কথা নিঃশেষে প্রমাণ হয় যে তিনি তাঁর শিক্ষা-দর্শনকে তাঁর সাধারণ দর্শনেরই একটি অঙ্গ বলে মনে করেছিলেন। নীচের উদ্ধৃতি দুটির দ্বিতীয়টি A Poet's School থেকে—

"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশনই করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

"আমি একান্তভাবে দুটি জিনিসকে মিলিত ক বার আকাঙ্ক্ষা করেছি: প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার; আর সেবাকর্মে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ— যা ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদ্‌কে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে।"

রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববাদ

বিশ্বপুরুষের এই তত্ত্বটি আর-একটু মনোযোগের সঙ্গে এইবার বুঝে দেখা দরকার। জানা দরকার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সঙ্গে তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য কোথায়। তাতে রবীন্দ্রনাথের স্থাননির্ণয় ছাড়া আর-একটি উদ্দেশ্যও সাধিত হতে পারে। সব রকমের বিশ্ববাদ ও অতিপ্রাকৃত তত্ত্বকে 'প্রাচ্য', 'উপন্যাস-সুলভ', 'আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অচল' প্রভৃতি ধারণার দ্বারা চিহ্নিত ক'রে অবজ্ঞাপোষণের একটি প্রবণতা আধুনিক পাঠকের মনে থাকা সম্ভব। তা এর দ্বারা দূর হবে। দেখা যাবে পাশ্চাত্ত্য জগতেও বিশ্ববাদের অভাব নেই, এবং আধুনিক চিন্তাজগৎ সরাসরি এই তত্ত্বকে গ্রহণ না করলেও এর থেকে নিষ্পন্ন বহু চিন্তা ও ধারণাকে আশ্রয় করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু পরিভাষা সম্পর্কে একটি সংশয়ের নিরসন করতে হবে। বিশ্বগত বা সার্বিক, পরম বা চরম (absolute), অতিপ্রাকৃত, তুরীয় (transcendental)—এই কথাগুলির অর্থের তীক্ষ্ণ সীমানা কেবলি অস্পষ্ট হয়ে পরস্পর মিশিয়ে যেতে চায়, শুধু অবিশেষজ্ঞ পাঠকচিত্তে নয়, সুবিখ্যাত দার্শনিকদের রচনাতেও। সব চেয়ে অসুবিধা শেষ শব্দটি নিয়ে। ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্যে তার বিচিত্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একেবারে উচ্চতম শিখরটিকে স্থাপন করা হয়েছে এই মায়াজগৎ, নিখিল বিশ্ব এমনকি উচ্চতর লোক বা জাগৎসমূহেরও ঊর্ধ্বে। এই শেষ, পরম সত্য যা ত্রিগুণাতীত, বিভেদ, বহুত্ব, বিকল্প, বিকার ও ক্রিয়াশীলতার দ্বারা যা চিহ্নিত নয় তাকেই ভারতীয় অর্থে বলা যায় তুরীয়। ইউরোপে ক্যাথলিক অধ্যাত্মবাদের কিছু অংশ ছাড়া আর কোনো দর্শনের এই অর্থে তুরীয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেখানে নির্বিচারে এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে প্লেটোর World of essence ও archetypal ideas সম্বন্ধে, স্পিনোজা ও হেগেলের দার্শনিক মতবাদের বিশেষণ হিসাবে, এমনকি কাণ্টের 'ক্রিটিক'গুলি সম্বন্ধেও। কাণ্ট নিজেই ঐ বিশেষণ

ব্যবহার করেছেন অতীন্দ্রিয় সত্যকে বোঝাতে। 'পরম' কথাটিও খাঁটি ভারতীয় মতে শুধু ঐ তুরীয় সত্য সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, কারণ এতেও বোঝায় নামরূপহীন সকল সম্পর্কমুক্ত নিশ্চল নির্বিকার সত্যকে।

আমাদের আলোচনায় উপরের অর্থে তুরীয় ও পরম শব্দ দুটি নিষ্প্রয়োজন, যদিও রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি লেখবার সময় পাশ্চাত্ত্য প্রথা অনুযায়ী কখনো কখনো এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা হলে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য দর্শনগুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: যেগুলি কোনো রকম সার্বিকতা বা বিশ্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যেগুলি আপেক্ষিকতা ও বহুত্ববাদের ভিত্তিতে গঠিত। শেষের গুলির দৃষ্টি ঐহিক (secular) এবং বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে তারা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের অনুবর্তী। আগের গুলির মধ্যে কোনো কোনোটি প্রকৃতির কাঠামোর মধ্যেই তাদের সার্বিক তত্ত্বটিকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, কোনোটি বা অতিপ্রাকৃত সত্য স্বীকার করেছে। এই 'অতিপ্রাকৃত' মানে এমন-একটি তত্ত্ব যা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধ ও যুক্তির অনধিগম্য, কিন্তু অন্য উপায়ে যার উপলব্ধি অসম্ভব নয়। 'অতিপ্রাকৃত' শব্দটি এই অর্থেই আজকাল পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিষয়ক রচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

কোনো বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে, আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনো অতিপ্রাকৃত সত্যের মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথ একা নন, এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গী আছেন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো, সেণ্ট্ টমাস একুইনাস, স্পিনোজা, ফ্রোয়েবেল ও বার্গসঁ। এঁদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে শেষোক্ত দুজনের সঙ্গে তাঁর দর্শনের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এঁদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাঁর সুসমঞ্জস পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, তাঁর বিশ্বতত্ত্বের একটা অন্তরঙ্গ জীবন্ত প্রত্যক্ষতায়। এই তত্ত্বের সব কয়টি স্তরকেই তিনি যথাযথ মূল্য দিয়েছেন, এবং সেগুলি আপনা থেকে মিলিত হয়ে রূপ নিয়েছে এক পূর্ণ সত্যের, সার্বিক পুরুষের। এই পুরুষ সত্তা বা তার বিভিন্ন স্তর কেবলমাত্র কতকগুলি অংশের সমষ্টি নয়, শুধুই একটা বিমূর্তন (abstraction) বা সাধারণীকরণ (generalisation) নয়। পূর্ণ তার অংশগুলির যোগফলের চেয়ে অর্থগভীরতায়, সত্যের উচ্চতায়, গুণ ও ক্রিয়ায়, সব রকমেই বড়। জগতে সে অন্তর্লীন (immanent) সমস্ত গতিবিধি ক্রিয়ার প্রয়োজক শক্তি রূপে, কিন্তু নিজের মধ্যে এ একটি সক্রিয় (dynamic) আত্মসৃষ্টিপরায়ণ পুরুষ-শক্তি যিনি নিজের বিশ্বময় তনু প্রাণ মন আত্মার যুগপৎ সঞ্চালনে নিরন্তর পূর্ণতা থেকে উচ্চতর পূর্ণতায় অগ্রসর হচ্ছেন। এই পুরুষকে জানলে তাঁর সাহায্যে মানুষের বিবর্তনের আদ্যোপান্ত ধারাটি দেখা যায়, দেখা যায় তা দেহ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন ও মন থেকে আত্মায় আরোহণের একটি ছেদহীন প্রবাহ। এবং সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে, এই পুরুষশক্তিকে স্বাঙ্গীকৃত ক'রে জগতে একটা নূতন শক্তির প্রবর্তন করা যায়, ব্যক্তিগত বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা যায়।

কিন্তু যেসব পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববাদীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের দিকে চাইলে দেখি তাঁদের সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ ও মনোযোগ বিশ্বতত্ত্বের মানসস্বরূপের দিকে। কেউ কেউ অপর রূপগুলিরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু হয় এই ইঙ্গিত থেকে গেছে বিচ্ছিন্ন, না হয় তাদের মিলানো হয়েছে শুধু একটা বুদ্ধিবন্ধনে। এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তার শেষ ফল ও প্রবণতা অগ্রসর হয়েছে ঐ কেবল একটি বিশ্বমানস-রূপায়নের দিকে। এমনকি কোনো বিশেষ দার্শনিক যখন যত্ন করে তাঁর বিশ্বতত্ত্বকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা কিংবা বুদ্ধিমনের অতিরিক্ত কোনো গুণ বা ঐশ্বর্যের দ্বারা মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন, তখনি পাশ্চাত্ত্য মনের

স্বাভাবিক ঐহিকতা ও বস্তুতন্ত্রবাদ, সে দেশের পণ্ডিতদের সব রকম অতিপ্রাকৃত ও অতিযৌক্তিক (supra-rational) তত্ত্বের প্রতি বিরূপতা, কল্পনাটিকে নামিয়ে এনেছে মাটির পৃথিবীতে, এবং তাকে তার সমস্ত রোমান্স ও অতিপ্রাকৃত এজনারহিত করে কাজে লাগিয়েছে নিজেদের।

প্লেটো দেখেছিলেন একটি সার্বিক 'আইডিয়া'র জগৎ। কিন্তু সুন্দরের, প্রেমের চকিতদীপ্তিও তাঁর চোখে পড়েছিল। কিন্তু এই সবগুলির সমন্বয় তিনি করতে পারেন নি এবং তাঁর দর্শনকে শুধু ঐ ideaর ভিত্তিতেই স্থাপিত করেছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁর আইডিয়া একটি অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব, কিন্তু তাঁর নিজের শিষ্য অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর হাতেই তা সংকুচিত হয়ে হয়ে দাঁড়াল Universal Reason বা বিশ্বমানস, যা অতিপ্রাকৃত হবেই এমন নয় এবং যা সাধারণ বুদ্ধিমান্ লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য। অ্যারিস্টট্‌ল্‌-এর এই Reason-এও অর্থের যে প্রসার, যুক্তিবাদের অতিরিক্ত একটা চেতনার যে পরিবেশ ছিল তা কমে কমে রেনেসাঁসের পরে এসে ঠেকল নিছক বুদ্ধিবাদে এবং এখন সাধারণতঃ ঐ দুটি ধারণা— reason ও rationalismকে একার্থক বলে ধরা হয়ে থাকে।

স্পিনোজা-দর্শনের বিশ্বতত্ত্ব এই জগতের অন্তর্লীন। তাকে কখনো তিনি দেখেছেন আত্মসৃষ্টিপর প্রকৃতি, 'Natura naturans' রূপে, কখনো বা 'সমস্ত স্থানে ও কালে ছড়িয়ে থাকা মানসিকতা'র সমষ্টি হিসাবে। মাঝে মাঝে তিনি এই তত্ত্বের প্রাণময়তা আনন্দময়তারও সন্তর্পণ ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, সর্বসমেত একটি সুসমঞ্জস চিত্র তিনি উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর দর্শনের ভাগ্যও প্লেটোর দর্শনের মতই। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে যেগুলি এর আতিশয্য বা কৌনিকতা তার বর্জনের পর এ দর্শন এখন আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার মূল ভিত্তি, এমনকি একে বলা হয় বিজ্ঞানের নিজস্ব দর্শন।

আধুনিক ইউরোপে বার্গসঁ-দর্শনের অবির্ভাব একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। তাঁর বিশ্বপ্রাণ, élan vital ও তার নিষ্ক্রমণশীল আত্মসৃষ্টিমূলক বিবর্তন, emergent self-creative evolution, ম্লান নীরক্ত কাল্পনিকতা মাত্র নয়, নিছক বুদ্ধিকৃত সংযোজনের কৌশলও নয়। বার্গসঁ জীবনস্রোত 'কান পেতে শোনেন', 'আধ্যাত্মিক স্টেথিস্কোপের দ্বারা' শোনেন প্রাণের হৃৎপিণ্ডধ্বনি। তাঁর বিশ্বতত্ত্ব এমন একটি প্রত্যক্ষ জীবন্ত .সত্য যা ইউরোপীয় দর্শনে দুর্লভ, বরং প্রাচ্য সাধকদ্রষ্টার উপলব্ধির সঙ্গেই তার মিল দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দিকে পাশ্চাত্ত্যসুলভ অনুরাগের ফলে বার্গসঁ তাঁর এই 'প্রত্যক্ষ দর্শন'কে প্রাণতত্ত্বের যুক্তিপ্রমাণের উপর স্থাপিত করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববাদকে বার্গসঁর এই প্রেরণাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দেখাই পাশ্চাত্ত্যমনের পক্ষে হিতকর হবে। রবীন্দ্রদর্শনের একটি দিকের রহস্য এর ফলে উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই বিশেষ দিকটিতেও রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ তাঁর বিশ্বতত্ত্ব শুধু অন্তর্লীনই নয়, তা শুধু বোধির (intuition) স্ফুরণেই নিজের কাজ ক'রে চলে না। নিজের সৃষ্টির বাইরেও এর দাঁড়াবার স্থান আছে, এবং পূর্ণ জাগ্রত সজ্ঞান চিন্তার দ্বারা কাজ করতেও এ সমর্থ। রবীন্দ্রনাথের বলাকা-যুগের কাব্যে বার্গসঁ-প্রভাব অনেকেই দেখেছেন। বার্গসঁর রচনাপাঠে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আবাল্য অভিজ্ঞতার স্বরূপ অপেক্ষাকৃত সহজে বিশ্লেষণ করেছেন এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গেই এই প্রাণরূপের প্রথম আবেগময় প্রকাশ, এবং এ কবিতা লেখা হয়েছিল *Creative Evolution* প্রকাশিত হবার বহু বৎসর আগে। কবিতাটির মূলতত্ত্ব-নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ নিজেই *The Religion of Man*-এ করেছেন।

ফ্রোয়েবেল ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ণতর সাদৃশ্য পাওয়া যাবে এমন একজনের মধ্যে যিনি শিক্ষাবিৎ হিসাবে জগৎ-বিখ্যাত, কিন্তু দার্শনিক জগতে যাঁর প্রতিষ্ঠা কম। ফ্রোয়েবেল ক্লার্জিম্যানের পুত্র, বাল্যেই ক্যাথলিক ধর্মমতের কিছু কিছু অংশ তাঁর মানস-গঠনের মধ্যে স্থায়ী স্থানলাভ করে। এক হিসাবে বলা যায় তাঁর শিক্ষাদর্শনে ফ্রোয়েবেল পুনর্জীবন দান করেছেন অ্যারিস্টটল্-টমাস্ রফাকে (Aristotelian-Thomistic solution), যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপের শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সেণ্ট্ টমাস অ্যাকুইনাস গ্রহণ করেছিলেন অ্যারিস্টটল্-এর Universal Reason, তাঁর 'matter'এর নিরন্তর বিবর্তিত হয়ে 'form'এ পরিণত হওয়ার মতবাদ, অর্থাৎ এই জগতের মধ্যেই সম্ভাবনাগুলির সত্যে পরিণত হওয়ার তত্ত্ব। এরই সঙ্গে তিনি জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক অতিপ্রাকৃত ভাগবততত্ত্ব। ফলে এই দু'রকম তত্ত্ব পরস্পরকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও স্বতন্ত্রই থেকে গিয়েছিল। ফ্রোয়েবেল এই সমন্বয়ের সাধনা করেন। তাঁর কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা ও বাহিরের মুক্তজীবন তাঁকে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অধিকার দেয়, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি অতিপ্রাকৃত সত্যের সঙ্গে প্রকৃতি ও জীবনের প্রত্যক্ষ ও মহৎ তথ্যগুলির যোগসাধনে সক্ষম হন, তাঁর নিজের ভাষায় 'চার্চের সঙ্গে যুক্ত করেন প্রকৃতির মন্দির'। স্থায়ী প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা নয়, বরং যা তাঁর সমস্ত লেখায় দেখা যায় সেই ধীর শ্রমশীল মননশীলতার দ্বারা তিনি পান তাঁর 'চিরন্তন ঐক্য'কে।

"এই সর্ব-নিয়ামক বিধানের ভিত্তি ও উৎস হতে পারে একটি সর্বব্যাপী, উদ্যোগশীল, জীবন্ত, আত্মসচেতন, অতএব চিরন্তন ঐক্য।"· ·"এই ঐক্যই ঈশ্বর।"

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের মুখেও অসঙ্গত হত না। শুধু ঐ 'বিধান' ও 'ঐক্যে'র বিমূর্ত ধারণার উপর হয়তো তিনি এতটা জোর দিতেন না। বরং তিনি তুলে ধরতেন প্রকৃতি ও জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্যের দিকটিকে, সৃষ্টির পরমাশ্চর্যকে,· এক বিরাট চেতনার দীপ্তি, শান্তি ও সুষমাকে। প্রসার, গভীরতা, ও প্রত্যয়ঘনতার যে তফাত এই দুজন মনীষীর মধ্যে দেখা যায় তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের মন ও আত্মার অধিকতর ঔদার্য ও সামর্থ্য। তা নইলে দু জনের নিষ্ক্রমণ-ভঙ্গী ও গতিপথের আশ্চর্য সাদৃশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেলের একটি উক্তি নীচে দেওয়া হল। দেখা যাবে আগে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য খুবই কম।—

"শিক্ষার দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে মানুষের দিব্য সারাৎসারকে (divine essence), তাকে বার ক'রে এনে তুলে ধরতে হবে সচেতনতায়; সমস্ত মানুষটাকেই তার মধ্যে যে দিব্যতত্ত্ব জীবন্তভাবে বর্তমান তার স্বাধীন সচেতন অনুবর্তিতায় প্রবুদ্ধ করতে হবে এবং জীবনে এই তত্ত্বের স্বাধীন রূপায়নে সমর্থ ক'রে তুলতে হবে।"

এবারে ফ্রোয়েবেল ও রবীন্দ্রনাথের মিলগুলি আরো সূক্ষ্ম ও সুশৃঙ্খলভাবে নীচের বিবৃতিতে দেখানো হয়েছে।—

১. বাস্তব জগতের চেয়ে উর্ধ্বতর একটি সত্য আছে। ২. তা শুধু একটি বিমূর্তন বা নীতি-সমষ্টি

নয়, কল্পনার আত্মোৎক্ষেপনও নয়। আমাদের দৈনন্দিন সত্যের চেয়ে তা সত্যতর, তার নিজেরই একটি স্বতন্ত্র সক্রিয় প্রাণশক্তি আছে, এবং তা আত্মসচেতন। ৩. এই তত্ত্ব সার্বিক ও শাশ্বত, অতএব 'অতিপ্রাকৃত'। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেও এ উপস্থিত। প্রতি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান্ তার অন্তরতম ঐক্য, পরিণতিশীলতার শক্তিরূপে। দৃশ্যজগৎকে পরিপূর্ণ ক'রে এ অতিক্রম করে বর্তমান। ৪. এই সত্য তার বিরাট চেতনার মধ্যে ধারণ ক'রে আছে মানুষের প্রাণ মন আত্মার অনুরূপ বিভিন্ন স্তর। ৫. শিক্ষার দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-চেতনাকে ঐ উচ্চতর চেতনায় অনুপ্রবেশ করতে ও তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে পরিণতিলাভ করতে সাহায্য করা, এবং, বহির্জীবনে ও কর্মে আভ্যন্তরিক এই পরিণতির স্বাধীন প্রকাশ ও রূপায়নে সুনিপুণ করে তোলা। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিমুখ ক্রিয়াকে বলেছেন 'প্রেম ও কর্ম,' 'বিশ্ব-আত্মার ধ্যানময় দর্শন' ও 'সেবাকর্মে তার বহিঃপ্রকাশ'। শুধু তাঁদের মতবাদেই নয়, শিক্ষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রোয়েবেল আনন্দময় জীবন ও সৃষ্টিমূলক কাজকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের সেই পরীক্ষার ফল জগতের সামনে উপস্থিত করেছেন।

যেমন প্রত্যাশা করা যায়, শিক্ষার প্রক্রিয়া ও উপাদান সম্বন্ধে দুই মনীষীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য এত দূরপ্রসারী যে আকস্মিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'কিণ্ডারগার্টেন'-পদ্ধতির সঙ্গে কখনো না কখনো রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছিল। কিংবা ফ্রোয়েবেলের রচনা খুব সম্ভব তিনি পাঠ করেছিলেন। যেমন ভাবেই হোক, তাঁর চিন্তায় ফ্রোয়েবেলের কিছুটা প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সঙ্গে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর দর্শন যে তাঁর মন ও আত্মার পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। বার্গসঁ-প্রভাবের মত এক্ষেত্রেও বলা যায় সহমর্মী একটি ব্যক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাগুলিকেই সহজে খুঁজে পেয়েছিলেন।

কিন্তু মিল যতই গভীর হোক, পার্থক্যও আছে। এই পার্থক্য শেষ ফসলে, দুজনের কল্পনার শেষ তুলির ছোঁয়ায়, সমগ্র চেষ্টার ভিতরকার আবেগে। যথাস্থানে সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলির আলোচনা হবে, কিন্তু দৃষ্টি ও আবেগের কয়েকটি মূল প্রভেদ এখানে দেওয়া হল।—

১. একজন ক্যাথলিক প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, আর একজন কবি— প্রথম তত্ত্বদর্শন হয়েছে দুজনের দুরকম পথে। ফ্রোয়েবেল অগ্রসর হয়েছেন 'বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টি' ও দীর্ঘ একাগ্র চিন্তার মধ্য দিয়ে; রবীন্দ্রনাথ জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। উপলব্ধির অস্পষ্ট স্থানগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি সাহায্য নিয়েছেন 'কল্পনা'র— যে কল্পনা আত্মকেন্দ্রিক নয়, সত্যসন্ধী, কিংবা তাঁর আলস্যহীন সৃষ্টিকর্মের অভিজ্ঞতার।

২. স্বভাবে চরিত্রে বাল্যশিক্ষার ফলে ফ্রোয়েবেলের প্রবণতা বুদ্ধিপরায়ণতা ও ধার্মিক শুচিতার দিকে। *The Education of Man*-এ তাঁর নির্দিষ্ট শিক্ষানীতির দুটি হচ্ছে এই: (ক) 'জ্ঞানী হওয়াই মানুষের মহত্তম উদ্দেশ্য।' (খ) 'শিক্ষার লক্ষ্য হল একটি বিশ্বস্ত, শুদ্ধ, অব্যভিচারী, অতএব সাধু জীবন (holy life)।' ফ্রোয়েবেল জীবনের বিজ্ঞানে আগ্রহশীল এবং তাঁর ঐক্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানে গণিতবিদ্যা-বিশারদের বিমূর্তনপ্রীতির যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও সাধুজীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুগত মতবাদের দ্বারাও তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই বেশী হৃদয়বান্, আবেগপ্রবণ, সৌন্দর্যরসিক, কল্পনাকুশল, যদিও বুদ্ধিমত্তাতেও তিনি কিছুমাত্র কম নন। তিনি ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব অবিসম্বাদিত। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে কোনো ভেদরেখা স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে এ দুই-ই একটিমাত্র ধারাবাহিক পরস্পর-অনুপ্রবিষ্ট সত্যের অংশ। সাধারণ জীবনের বিপরীত কোনো সাধুজীবনে তাঁর আগ্রহ নেই, তিনি চান শুদ্ধ সুন্দর আনন্দময় জীবন, ভালোবাসার জীবন।

৩. উপরের দুটি প্রভেদের মূল হচ্ছে এই। ফ্রোয়েবেল যাকে বলছেন ঈশ্বর এবং দেখছেন একটি বিমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে, রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখেছেন বিশ্বমানব, পরমপুরুষ রূপে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতত্ত্ব তাই একটি নিকটতর, পূর্ণতর সত্য যা মানুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলিকে স্পর্শ করে। কোনো কঠোর ত্যাগ, ব্যক্তিত্বের কোনো অংশ বর্জন, আমাদের পৃথিবী-জীবনের পূর্ণ অর্থের কোনো সঙ্কোচন এই সত্য দাবী করে না। বরং এই সত্য নিজের পুরুষসত্তার (personality) বলে মানুষের মধ্যকার পুরুষকে সবরকমে কৃতার্থ করে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে মহৎ, সব চেয়ে বিশিষ্ট দান।

স্বীকৃতি

কৃষ্ণ-যশোদা চিত্রের ব্লক বোম্বাইয়ের United Asia পত্র হইতে; নববর্ষা চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ও কলিকাতা সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয় -অনুষ্ঠিত আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের চিত্রপ্রদর্শনীর স্মারকগ্রন্থ হইতে; জীবনানন্দ দাশের প্রতিকৃতির ব্লক 'কবিতা' পত্র হইতে; এবং করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের ব্লক 'শনিবারের চিঠি' হইতে প্রাপ্ত। আইন্‌স্টাইন ও নেহরু চিত্র শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪, ১৯ নবেম্বর ১৮৭৭   মৃত্যু ২২ মাঘ ১৩৬১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫

অনেক দিন আগের কথা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। করুণানিধানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাফুলে'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কথা বলেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে আজ সেই কথা মনে পড়ছে। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "গোয়ালার জোলো দুধ এবং খাঁটি দুধে যে প্রভেদ, এক্ষণকার প্রকাশিত রাশি রাশি কবিতা এবং করুণানিধানবাবুর কবিতায়ও সেই প্রভেদ।"

সহজ কথা সহজ করে বলার মধ্যে যে সততা আছে, করুণানিধান সেই সততার অধিকারী।

কথার কারিকুরি দিয়ে চমক সৃষ্টি ক'রে একরকমের কবিতা রচনা করা যায়। কিন্তু চমক যেমন চমকেই শেষ হয়ে যায়, ঐ কারিকুরির বাহাদুরিও তেমনি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ক্ষণস্থায়ী এই সৌভাগ্য লাভ করায় যাঁদের অভিরুচি তাঁদের প্রকৃত কবি ব'লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু নগদ-বিদায়ের উপরেই যাঁদের ঝোঁক বেশি তাঁরা আমাদের স্বীকার করা বা না-করা গ্রাহ্য করবেন— এমন আশা করা ঠিক না। আমরাও না হয় তাঁদের গ্রাহ্য না করলাম।

কিন্তু যে-কবিতা অগ্রাহ্য করব ব'লে স্থির করা সত্ত্বেও অগ্রাহ্য করা যায় না, সে কবিতা হচ্ছে গোয়ালার জোলো দুধের না, সে কবিতা খাঁটি দুধের কবিতা— সে কবিতা করুণানিধানের কবিতা। কোনো রকমের কৃত্রিমতা বা আড়ম্বর করুণানিধানের কবিতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাইরের প্রকৃতি এবং এই কবির নিজের প্রকৃতির মধ্যে যেন বিশেষ পার্থক্য নেই। বাইরের প্রকৃতি যেমন নিজে নিজেই নিজের খুশিতে পুলকিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে, করুণানিধানের কবিপ্রকৃতিও ঠিক তেমনি। পোশাকী সাজের চেয়ে আটপৌরে সজ্জাই করুণানিধানের কাব্যের বিশেষত্ব। কোনো দক্ষ মালীর হাতের যত্নে একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে শৌখিন বাগান রচিত হয় নি তাঁর কাব্যে, করুণানিধানের কবিতা হচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে নিসর্গ-লালিত একটি কানন, হিসেব করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসানো নেই কোনো লতা কিংবা কোনো গুল্ম, অথচ সব মিলে-মিশে প্রকৃতির এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

করুণানিধান প্রকৃতির কবি। কিন্তু এই কথাই সব কথা নয়, করুণানিধান প্রকৃত কবি।

প্রকৃত কবির লক্ষণ আছে অনেক। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে— প্রকৃত কবিতা রচনা করা। আর-একটা লক্ষণও আছে, নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীনতা হচ্ছে সেই লক্ষণ। জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্যে কাঙালপনা করা প্রকৃত কবির স্বভাব নয়, প্রকৃতিও নয়। করুণানিধান প্রকৃত কবির এই দ্বিবিধ লক্ষণে লক্ষ্মীমন্ত।

জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্যে জনতার চাহিদার যোগানদার হতে হয়। কিন্তু করুণানিধান যোগানদার ছিলেন নিজের মনেরই চাহিদার। বাইরের প্রকৃতিতে যখন শুরু হত উৎসব, বর্ষায় যখন 'আকাশের কোলে কোমল কাজল' ফুটে উঠত, ঝাউয়ের বনে ঝালর উঠত দুলে, তখন কবিও নিজেকে সেই উৎসবে দিতেন মত্ত ক'রে। এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। কবির সেই আনন্দ-উল্লাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে

অকৃত্রিম কবিতার রূপে। অভ্রের চূর্ণ আকাশে নিক্ষেপ ক'রে মেকি তারকার ঝিকিমিকি তিনি দেখান নি, নগদ-বিদায়ের কাঙাল ছিলেন না ব'লে তিনি সুদূর নীলাম্বরের দেশ থেকে খাঁটি তারার ঝিলিমিলি নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্যে।

জনতার হাততালি দিয়ে কাব্যের বিচার হয় না, কাব্যের বিচার রসবোদ্ধার করজোড় নমস্কারে। করুণানিধান সেই নমস্কার লাভ করেছেন। তিনি সার্থক কবি।

এই সার্থকতার হেতু আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে পরমাত্মীয়-রূপে গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছেন করুণানিধান। তাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে প্রকৃতির সেই পরিচিত পদধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেজে চলেছে। প্রকৃতির কোনো রূপ কিংবা কোনো শোভা আবিষ্কারের উচ্চকণ্ঠ উল্লাস নেই তাঁর কাব্যে; বর্ণনা-কালে সকলের জানা এবং সকলের দেখা শোভারই কথা যেন স্বগতোক্তিতে তিনি বলছেন, এই রকম অনাড়ম্বর ভঙ্গির জন্যেই তাঁর কবিতায় এই আন্তরিক সুর ধ্বনিত হয়েছে।—

> চলিলাম গৃহে, গ্রামপথে ধুলা, সাপ গেছে পার হয়ে,
> কোথাও পাখির নখের ভঙ্গি— চোখে পড়ে রয়ে রয়ে।

গ্রামপথের ধুলার উপর এই অস্পষ্ট চিহ্নগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের অতলে তিনি ছিলেন একজন ডুবারি। সেই নিবিড় নেপথ্য-লোকে নিজেকে লুক্কায়িত রেখে সর্বাঙ্গে যেন মেখে এসেছেন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ ও সুষমা।

বহিঃপ্রকৃতির স্বপ্নে স্বপ্নাবিষ্ট কবি অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। মানবমনের দুঃখসুখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেমপ্রীতি কামনা-বেদনা প্রভৃতি বিবিধ ভাবের সঙ্গে কবির যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ-রূপে উল্লেখ করা যায় তাঁর 'মৃণু' কবিতাটি, তার কয়েকটি ছত্র—

> ময়ূরকণ্ঠী চেলীর মতন কুয়াশা গিরির শিরে,
> সহসা উঠিয়া বাতায়ন-দ্বার খুলিয়া দিলাম ধীরে—
> হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
> চুম্বন দিনু কপোলে তাহার ভুলিনু লজ্জা লেশ।
> কি-এক আবেশে মুগ্ধ জীবনে হেরিনু ক্লান্ত মুখ,
> করপুটখানি ভরিয়া দিলাম বনফুল-যৌতুক।

কবির প্রীতিকরুণার সুন্দর আলেখ্য অঙ্কিত করেছে।

যে-কবি যেখানেই বাস করুন, তাঁর আবাসস্থল থেকে কাব্যতীর্থের দূরত্ব সমান। এই দূরত্ব লাঘব করার জন্যে যদি কোনো কবি সময় ও শক্তি ক্ষয় করেন তা হলে তাঁকে প্রকৃত কবি যেমন বলা যায় না, তাঁকে বুদ্ধিমান কবি বলাও তেমনি দুরূহ। করুণানিধানের কবিতা পাঠ ক'রে যখন মুগ্ধ হতে হয় তখন তাঁর বুদ্ধির তারিফও করতে হয়। তিনি আজ কাব্যতীর্থের যশোমন্দিরে উপনীত। জীবনের কোনো দুর্বল মুহূর্তেও তিনি কাব্যতীর্থের দীর্ঘপথটি সংক্ষিপ্ত করে নেবার জন্যে চেষ্টা করেন নি। একনিষ্ঠ পরিব্রাজকের মত তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা ক'রে চলেছিলেন। আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এইভাবে তীর্থযাত্রা সম্ভব নয়।

করুণানিধানের কাব্যে রূপের সঙ্গে ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। ভাষার লাবণ্যের সঙ্গে শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। উপযুক্ত ভাবপ্রকাশের জন্যে উপযুক্ত ছন্দ যেমন দরকার, বিশেষ

কোনো চিত্র অঙ্কনের জন্যে তেমনি বিশেষ একটি কথা না হলে চলে না। স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই কবির কাছে এই কথা এসে ধরা দেয় বটে, কিন্তু সব সময় নয়। একটি কথা খুঁজে বা'র করার জন্যে একটি দীর্ঘরাত্রিও অতিবাহিত হয়ে যায়। করুণানিধানের শব্দচয়নের সার্থকতা দেখে মনে হয় হাততালি পাবার মত শব্দ চয়ন না ক'রে তিনি যে করজোড় নমস্কারের জন্যে কথা খুঁজে বের করেছেন— এর পিছনে তাঁর বহু বিনিদ্র রজনীর দীর্ঘ ইতিহাস আছে। অথচ, আশ্চর্য এই, কোথাও কোনো-একটি বিশেষ শব্দ যে অনেক শ্রম ও সাধনার ফলে তাঁকে নির্বাচন করতে হয়েছে, সেই শব্দের ধ্বনিতে তার প্রতিধ্বনি নেই।

করুণানিধানের দীর্ঘজীবনের তুলনায় তাঁর রচনার পরিমাণ খুব বেশি না। অথচ, সেই কয়েকখানি বইই তাঁর জীবনের সার সংগ্রহ ক'রে আমাদের সম্মুখে কবি-পরিচিতি রূপে বর্তমান। 'ঝরাফুল' দিয়েই করুণানিধানের কাব্যজীবনের সূত্রপাত। এই বইটির আগে আরো দুইখানি বই 'বঙ্গমঙ্গল' ও 'প্রসাদী' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন তিনি অজ্ঞাত কবি। 'ঝরাফুল' থেকেই তিনি স্বীকৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেন। এর পরে 'শান্তিজল' 'ধানদুর্বা' 'রবীন্দ্র-আরতি' ও 'গীতারঞ্জন'— এই চারখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া প্রথম তিনখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতার সংকলন ক'রে 'শতনরী' ও 'ত্রয়ী' নামে দুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

করুণানিধানের সত্তর-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষ্যে কবির সংবর্ধনা-সভায় মোহিতলাল মজুমদার যে কবিতাটি রচনা ক'রে এনে পাঠ করেছিলেন তার কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করে এই আলোচনার উপসংহার করি—

> আজও তুমি আগে আগে, আমি তব পিছে চলিয়াছি,
> এবারের যাত্রাপথে হারাব না পদচিহ্ন তব ;
> আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ফুলে মালা একগাছি—
> রূপে যার একদিন রচিতাম স্বপ্ন নব-নব।
> আপনি লইতে কণ্ঠে সে-মালিকা তুমি প্রীতিভরে,
> ফুল মোর বড় হয়ে ফুটিত যে তোমার আদরে।
> আজ আর কণ্ঠে নয়, একটুকু পরশন যাচি'
> বাঁধিলাম করমূলে, জানাবারে— আজও আমি আছি।

কিন্তু হায়, বাংলার এই দুই কবির কেউই আজ আমাদের মধ্যে নেই।

সুশীল রায়

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জন্ম ১৩ আষাঢ় ১২৯৪, ২৬ জুন ১৮৮৭ মৃত্যু ৩১ ভাদ্র ১৩৬১, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা রবীন্দ্রকাব্য থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে প্রধানত বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়ত রচনাকৌশলের অভিনবত্বের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিময়, আবেগপ্রবণ, মর্তাতীত অতীন্দ্রিয়তার বিকল্প হিসেবে যতীন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন ক্ষুব্ধ মনের বাস্তবমুখী যুক্তির রুক্ষতা। যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, যে কাব্যদর্শন নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বাংলার কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার প্রতিপাদ্য এই কথা যে, জগতে দুঃখটাই প্রধান, সুখটা বিরল। "ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহিক সন্দেহ"— এই দুঃখবাদ তাঁর কবিতার এক অভিনব স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। রবীন্দ্রকাব্যে ওতপ্রোত তরুণ মনের কাছে নূতন ভাবে বলা এই নূতন কথাগুলি অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কনিষ্ঠ কবিদের কাছে এই আকর্ষণ আরো বেশি দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, তৎকালীন 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের থেকে অন্য রকম হবার চেষ্টায় তখন নূতন নূতন পথ খুঁজছে। যতীন্দ্রনাথের বাস্তবমুখিতা, তাঁর রুক্ষ ও বন্ধুর ভাষা-ছন্দ, তাঁর অবিশ্বাস ও বিদ্রূপের ভঙ্গিটির মধ্যে নবীন কবিরা এক অভিলষিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের কবিতার সহজ ঘরোয়া আটপৌরে ভাষা, বিলম্বিত তাল, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা, মাঝে মাঝে চমকপ্রদ উপমা ও বর্ণনা তাঁর কবিতাকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে, তার আকর্ষণ তরুণ বিদ্রোহোন্মুখ কবিগণের কাছে যে খুবই প্রবল হয়ে উঠবে এ তো স্বাভাবিক। বিশেষত যতীন্দ্রনাথের কবিতায় বিশ্বের সৌন্দর্য যে বর্ণনার মাধুর্যে প্রকাশিত হয় নি এমন নয়। তাই যতীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন—

কোথা হতে তুমি এলে গো লক্ষ্মি! কোথা ছিলে এতদিন!
আমার প্রমোদভবনের তরে কা'রা হ'ল ভিটাহীন?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি!
অশ্রুসাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণতল!
তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী!
ভরেছ আতরদানি
কত প্রভাতের আধফোটা ফুল মর্ম নিঙাড়ি' ছানি'?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব-সুগন্ধ-ঢালা—
সদ্য-ছিন্ন শিশু-কুসুমের কচি মুণ্ডের মালা!

তখন সেকালের নবীন কবিরা এ রচনার মধ্যে এমন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেছিল, যা তারা সাগ্রহে সমাদরে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে এই কারণে যে, এর রচনা তাদের রবীন্দ্রসাহিত্যপুষ্ট মনের সৌন্দর্যবোধকে পীড়িত করেনি।

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাঁর কবিতাকে বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণের বিষয় করেছে, আর প্রকাশভঙ্গির অসাধারণতা তাঁর কবিতাকে রসোজ্জ্বল করেছে। নতুবা কেবল দুঃখের প্রাধান্য প্রচার ক'রে তিনি একজন স্মরণীয় কবি হয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত তাঁর কবিতার উৎকর্ষ তাঁর বর্ণনাকৌশল ও উপমা-গুলিতেই বেশি প্রকট। যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিটিই প্রকৃতপক্ষে পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে রবীন্দ্রোত্তর কবিদলের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য ও উৎকৃষ্ট কবিরূপে চিহ্নিত করেছে।

যে দুঃখবাদ যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে প্রায় আগাগোড়াই— অন্তত 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া'তে প্রবলভাবে প্রচার করেছেন, তার মূলে আন্তরিকতা অবশ্যই ছিল, এবং কাব্যে তাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতেই হয়তো তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু ওর মধ্যেই তাঁর আন্তরিক প্রত্যয় সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ মনে হয় না। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে উল্টোভাবে কথা বলার ভঙ্গিটি তিনি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলেন— যেমন রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' রচনাকালে ঠাট্টাচ্ছলে গভীর কথা বলার একটি ভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন।

শিল্পীমাত্রেই নূতন ভাবে তার বক্তব্যকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চায়। বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যের সহজ সাবলীল লালিত্যের পথে তাঁর আদর্শবাদ ও অতীন্দ্রিয়তাকে অনুসরণ ক'রে এমন কবিতা লেখা সেকালে সহজ ছিল না, যা নিজেকে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ-কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে স্বতন্ত্র, অন্য ধাঁচের কবিতা লেখবার একটা আকাঙ্ক্ষা হয়তো যতীন্দ্রনাথকে এ জাতীয় রুক্ষ আটপৌরে ভাষায় নূতন ধরনের মতবাদ প্রচারে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'অনুপূর্বা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চিরশ্যামল বাংলা কাব্যে মরুভূমির পর মরুভূমির আমদানি কোরে একটা কৌতূহল জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করেছিলাম।" এ উপায়ে পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস যে তাঁর কবিতার বক্তব্য নির্বাচনেও কতকটা প্রকাশ পায় নি, এ কথাই বা বলা যায় কী ক'রে? অবশ্য তাঁর এ প্রয়াস যে আন্তরিকতাময় ছিল, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তবে, আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে তাঁর জীবনদর্শন ব'লে মনে হতে পারে, সেটা সে-দর্শনের একটা আবরণমাত্র ছিল, এটাই বেশি মনে হয়।

২

যতীন্দ্রনাথের প্রকাশের ঋজুতা, বর্ণনার স্পষ্টতা, রচনার বলিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি তাঁর উপমার অসাধারণত্ব পাঠকমাত্রকেই চমকিত করে। তাঁর সহজায়ত্ত বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে অনেক তুচ্ছ বস্তু ও সাধারণ দৃশ্যকে সূক্ষ্মভাবে দেখবার ক্ষমতা দিয়েছিল। যার ফলে তাঁর বক্তব্য অনেক সময়েই অনেক ঘরোয়া উদাহরণ, উপমা ও বর্ণনাকে আশ্রয় ক'রে দানা বেঁধেছে।

> বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা
> রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।

অথবা

> দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
> ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যুশয়ন রক্ত বমন করে।

মোহিতলাল মজুমদার

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ

প্রভৃতি পংক্তিতে শুধু অসাধারণ উপমা-কৌশলই লক্ষণীয় নয়, প্রকৃতির মহৎ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে যেভাবে নাগরিক ও দৈনন্দিন জীবনের বেদনাহত রূপকে উপমিত করা হয়েছে, তাতে তাঁর সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। যতীন্দ্রনাথের কবিতা যিনি আগে পড়েন নি, তাঁর কাছে এই সব পংক্তি বাংলা কবিতায় অভিনব মনে হবে সন্দেহ নেই।

যুক্তির মধ্য দিয়ে স্বকীয় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যতীন্দ্রনাথ যে ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন তা বন্ধুর ও অনতিললিত, তাঁর ভাষার গঠনরীতি (diction) গদ্যাভিমুখী। যদিও তাঁর ছন্দ-মিল নিখুঁত, তবু অনেক জায়গায়, অনেক উৎকৃষ্ট পংক্তিতে একস্বরের মিল ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। 'থেকে'র সঙ্গে 'বুকে', 'ব্যথা'র সঙ্গে 'কোথা', 'মরীচিকা'র সঙ্গে 'থাকা', 'জ্বালা'র সঙ্গে 'তলা', 'অধীনতা'র সঙ্গে 'মাতা' প্রভৃতি একস্বরের মিল তিনি প্রভূতভাবে এবং অকুতোভয়ে ব্যবহার করেছেন— যা তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী কোনো কবিই এরূপ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে সাহস পান নি। সুখের বিষয়, যতীন্দ্রনাথের কবিতায় এর একটি মিলও শ্রুতিকটু বলে মনে হয় না। তাঁর ভাষার ও যুক্তির আবেগে এ ত্রুটি— যদি একে ত্রুটি বলা যায়— সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে।

যতীন্দ্রনাথের যে-সব উজ্জ্বল অসাধারণ পংক্তি আমাদের মনোহরণ করেছিল, এবং যা যে-কোনো পাঠককেই মুগ্ধ না করে পারে না, এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হল, যা থেকে যতীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে অপরিচিত পাঠক তাঁর কাব্যের স্বরূপ কতকটা বুঝতে পারবেন বলে আশা করি।

কত না অশ্রু, কত হাহুতাশ, কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত কত না ফন্দি করা।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে যায় ঘুরে, বায়োস্কোপের ফিতা।

—ঘুমের ঘোরে, দ্বিতীয় ঝোঁক

কেন ভাই রবি বিরক্ত করো? তুমি দেখি সব-ওঁচা,
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা?

—ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।

—ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক

চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে
বিশ্বম্ভর, হে গণেশবর, যোগায় তোমারি পেটে!

—ঘুমের ঘোরে, দ্বিতীয় ঝোঁক

ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু দুখবাদী বৈরাগী।

—দুঃখবাদী

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধব্যোমের হাহাকার-কম্পন,
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ, বুকে বুক,—
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
—জীবন ও মৃত্যু

উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে কেবল যে যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটিই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, এর মধ্যে তাঁর ভাষাবেগ, বিশ্বের সৌন্দর্যচেতনা এবং উদাহরণ-উপমার বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছে। এককালে নবীন সাহিত্যিকেরা যতীন্দ্রনাথের দুটি পংক্তি নিয়ে প্রচুর সোরগোল তুলেছিলেন—

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি-সাহারার বুকে ?

এই পংক্তি দুটি অতটা কোলাহলযোগ্য হোক বা নাই হোক, এর মধ্যে বাস্তবমুখী কবিমনের যে বেদনাহত রূপটি ধরা পড়ে তা সকলের মনকেই নাড়া দেয়।

জগতের ও জীবনের চারদিকে ছড়ানো নানা খুঁটিনাটি থেকে যতীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের বিষয় আহরণ করেছিলেন। যে দুঃখ, যে-বেদনা জগদ্‌ব্যাপ্ত, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এমন সব তুচ্ছ অথচ সদাদৃশ্যমান ঘটনাকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন, যা রবীন্দ্রোত্তর 'রোম্যান্টিক' কবিতায় অতিবিরল, অথচ মাছের বাজার, তেলের ঘানি, খেজুর-বাগান নিয়ে তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলি শুধুমাত্র বাস্তবতা-সর্বস্ব তর্কে পর্যবসিত হয় নি, ওই সাধারণ অকাব্যিক উপকরণ থেকে তিনি যে প্রকৃত কাব্যরস সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেটাই যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বড় কথা। বাজারের মাছ দেখে

এখনো যে দেহ রুপোর পাত্‌রে, হীরের টুক্‌রো আঁখি—
মরণের শীত করে নিবারণ বরফের কাঁথা ঢাকি।

এ জাতীয় ভাব যে কবির মনে উদিত হয়, তাকে একান্ত বাস্তববাদী বা বস্তুতান্ত্রিক বলা যায় না। এই জন্য আধুনিক বা সাম্প্রতিক বাস্তবতাবাদী কবিদের সগোত্র বলে যতীন্দ্রনাথকে বর্ণনা করা অসংগত। বরং এ কথাই বোধহয় বলা চলে, যে দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে যতীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করেছিলেন, তা অনুভূতিময় সৌন্দর্যলোকের দিকেই বেশি অগ্রসর। জীবনের বহু দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তিনি যেভাবে মহত্তর কাব্যলোকের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, তা তাঁর কবিতার একটি লাইনেই সবচেয়ে ভালো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি।
শ্যাওড়াতলায় ফুটে চেয়ে থাকে শখের সূর্যমুখী !

৩

যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর প্রথম চারখানি কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' এবং 'সায়ম্'-এ প্রকাশ পেয়েছে। 'ত্রিযামা' ও তার পরবর্তী রচনায় তাঁর কাব্যের বলিষ্ঠতা কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে ; এবং এ সময়ে তাঁর আটপৌরে রুক্ষ ভাষা, বিচিত্র বর্ণনা ও উপমা, অনন্যসাধারণ দুঃখবাদ সবই

স্তিমিত হয়ে রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল বলে মনে হয়। 'সায়ম্' গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা যতীন্দ্রনাথের কাব্য-দর্শনের ভাব-পরিণতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। 'নাস্তিক' কবিতায় কবি লিখছেন—

আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা ?
রজনী সাজাবে তার তারার পসরা ?
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে
নৃত্যরসে নবতনু পড়িবে কি টলে ?
সিন্ধুপারে অনিন্দিতা নিদ্রিতা সুন্দরী
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী ?
মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জমে
হয়তো ফিরিয়া পাবো জনমে জনমে
নব নব রসে রূপে। শুধু জানি হায়
তোমারে পাই নি বন্ধু পাবো না তোমায়। · ·
দুঃখ মোর তাই
হইয়া পরানবন্ধু থাকিয়াও নাই।

'চিরবৈশাখ' কবিতাটি 'মরীচিকা' 'মরুশিখা'কে স্মরণ করিয়ে আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যায়।

বন্ধু জানো তো তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালোবেসেছিনু কেন আমি মরুভূমি।
শোনো গো বন্ধু ঐ পশ্চিমে মামুলি মেঘের ডাক
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপটা লাগিয়া কখন সে যায় চুকে।
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাখিব আশা ?
চিরবৈশাখ বাসিবে কি মোরে নির্জলা ভালবাসা ?

'সায়ম্' গ্রন্থ থেকেই কবির বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে এসেছে বোঝা যায়। 'ঘুমের সাথী' কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের 'লীলাসঙ্গিনী'কে পদে পদেই স্মরণ করায়, যতীন্দ্রনাথের কবিস্বরূপটি বোঝবার জন্য এ কথা মনে রাখা দরকার। যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রভাবিত রবীন্দ্র-ঐতিহ্যপুষ্ট কবি হয়েও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশিষ্ট প্রকাশ-কৌশল, স্বকীয় ভাষা ও অপূর্ব ও অসাধারণ সব উপমার সাহায্যে তাঁর কবিতাকে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তিনি তার থেকে নূতন সুরের কাব্য রচনা করতে পেরেছিলেন— এ কৃতিত্ব, কি ঐতিহাসিক বিচারে, কি কাব্যবিচারে, সর্বদাই স্মরণীয়। তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ তাঁর রচনায় স্বতঃই পরিস্ফুট, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, তিনি নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি, স্বকীয় একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, যা তাঁর সমসাময়িক সকল কবির মধ্যে পাওয়া যায় না।

অজিত দত্ত

মোহিতলাল মজুমদার

জন্ম ১১ কার্তিক ১২৯৫, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ মৃত্যু ১০ শ্রাবণ ১৩৫৯, ২৬ জুলাই ১৯৫২

এ দেশের ও অন্য দেশের প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রগুলিতে কাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অথচ নিখিল কাব্য বা কবিতার উৎসস্বরূপ কবিমানস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি ; কবির স্বরূপ বা স্বভাবের সাহায্যে কাব্য-ব্যাখ্যার কৌশল 'আধুনিক' পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছেই আমাদের শিখতে হয়— সমালোচক মোহিতলাল একাধিক প্রবন্ধেই এ কথা বলেছেন, আর আমরা তা মেনে নিতেও প্রস্তুত আছি। প্রাচীনদের কাব্যবিচার যে শব্দার্থের বিচার, ছন্দের বিচার, রীতির বিচার, অলংকারের নাম-রূপ-নিরূপণ এবং বিশেষেও-নির্বিশেষ রসের 'বোধে বোধ' মাত্র নয়— ক্ষীণকণ্ঠেও এ প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে পারি এমন শাস্ত্রজ্ঞান আমাদের নেই। এ তথ্যও অস্বীকার করা যায় না যে আমাদের আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্যবিচারের দুরূহ দায়িত্ব যাঁরা স্বেচ্ছায় ও সার্থকভাবে গ্রহণ করেছেন উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দের পাশ্চাত্য মনীষারই অনুবর্তন করেছেন বেশি ; ভরত ভামহ আনন্দবর্ধন প্রভৃতি মুনি বা মনীষীদের উক্তি প্রত্যুক্তি তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি। 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' অথবা অনুরূপ তাৎপর্যগম্ভীর আর দু-একটি বচন আমাদের জাতিগত শ্রুতি বা স্মৃতির পর্যায়ে উন্নীত বলা চলে, সেই বাক্যাবলিরও যেরূপ ব্যাখ্যা আমরা সচরাচর করে থাকি সেটা প্রধানতঃ 'আধুনিক' মন আর মতি নিয়েই। নূতন পাত্রে যেন পুরাতন সুরাসার-সিঞ্চন। শোচনীয় পরিণাম সব সময়েই ঘটে এমন নয়।

মোহিতলালের মুদ্রিত কবিতাবলী থেকে মোহিতলালের কবিপ্রকৃতির স্বরূপ-জ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য। একবার সেই স্বরূপজ্ঞান পাকা হলে, কাব্যে ফিরে এসে কবিতার রূপে ও রসে মগ্ন হওয়া, মুগ্ধ হওয়া, বহুগুণে সার্থক ও সম্ভবপর হবে।

পূর্বাচার্যদের অনুসরণে প্রথমেই বলে নিই (সেই আচার্যপরম্পরার মধ্যে, দেশ ও কালের সন্নিকট সোপানপীঠে, মোহিতলালকেও সসম্মানে ও সাদরে বরণ করে নিতে হবে) স্মরণ করে নিই— কবিতায় তথ্য ও তত্ত্ব, এমন-কি ভাষা ও ভাব, কখনোই মুখ্য নয়। আর, নয় ব'লেই তো কবিপ্রকৃতির নিবিড় ও নিকট পরিচয়-লাভ এমন একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বড়ো বড়ো জমা-খরচের অঙ্ক নিমেষেই কষে ফেলে এমন যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হয়েছে। প্রণয়পত্র বা কবিতা এমন অনায়াসেই রচিত হলে কথা থাকত না। এ দিকে, আয়াস স্বীকার ক'রেও ফল নেই, সে আয়াস ও অধ্যবসায় যদি প্রধানতঃ মস্তিষ্কজীবী বা বুদ্ধিগত হয়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ায় 'বিশেষ'ত্ব নেই ; যে ক্ষেত্রে যেটুকু আছে খাদ ব'লেই গণ্য হয়ে থাকে, না থাকলেই বড়ো ভালো হ'ত। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কোনো ব্যক্তির, কোনো বিশেষের, বিশেষ কোনো ছাপ নেই আর থাকাও অসংগত। কিন্তু বাসনা বেদনা আবেগ ও আনন্দ থেকেই কবিতার উদ্‌ভব, অনির্বচনীয় রসেই তার গতি ও স্থিতি। এ বস্তু সত্যই অনন্য ও অ-পূর্ব। অর্থাৎ, রাম রহিম রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ সত্তায়, বিভিন্ন জীবনে, এগুলির বোধ ও ব্যঞ্জনা এবং বাঙ্ময় প্রকাশ একরূপ নয়। অনুস্যূত ঐক্য অবশ্যই আছে, না হলে একের ভাষা অন্যে বুঝত না ; কিন্তু বৈচিত্র্য আর বিশিষ্টতাই অতিপ্রকট। আর, এই কারণেই কোনো রসিক যখন কোনো কবির রচনাকে গ্রহণ করেন সেই কবির ভাবেই নিজেকে ভাবিত করেন, কবির রঙে নিজেকে রঞ্জিত করেন। আবার, যে-কোনো

রচনাকে বিভিন্ন রসিক ব্যক্তি বিচিত্রভাবে বোধ করেন না, যে-কোনো রসসৃষ্টিকে কিছু বা নূতন করে সৃজন করেন না, এ কথাও কখনোই বলতে পারব না। 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা' হৃদয়বৃত্তির ধর্মই এই। এজন্যই প্রতিদিন প্রভাতে একই সূর্য ওঠে নিত্যনূতন বর্ণচ্ছটায় ও জ্যোতিরুৎসবে এবং রবীন্দ্রনাথ যা দেখলেন হোমার তা দেখেন নি; হ্যুগোর দৃষ্টিও স্বতন্ত্র; আর যদু মধু আপনি আমি কী যে দেখেছি, স্বতঃপ্রকাশ সৌন্দর্যে প্রকটিত করতে পারি এমন ভাষা আজও জোটে নি।

আমাদের মতো 'নীরব কবি'দের আরও তাই আগ্রহ সার্থক কবিকৃতি নিয়ে, বিশেষ বিশেষ কবিচেতনা নিয়ে, কবিজীবন নিয়ে এবং কবিত্বের প্রকৃতি নিয়ে। জীবন বলতে অবশ্য স্থূল জীবন নয়।—

বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
আমায় দেখো না বাহিরে!

একই শরীরে সামাজিক মানুষ একটি আছে আর আছে একজন 'অসামাজিক' 'অলৌকিক' কবি, উভয়ে সূক্ষ্ম একটি সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধা হলেও অভিন্ন নয়, প্রবন্ধকার মোহিতলাল এটি পুনঃ পুনঃ বলেছেন— আমরাও অস্বীকার করি নে। বাস্তবজীবনের অনিশ্চিত অস্থির তথ্যরাজিকে অনুমানে ও কল্পনায় স্তূপীকৃত ক'রে তুলে কবিকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে হারাবার সম্ভাবনাই বেশি; কবিতার রস আপনার সকল স্বাদ সংবরণ করলেও অনুযোগ করার কিছু থাকবে না— অতএব, সে উদ্যমে আমাদের কাজ নেই।

২

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

পূর্ব কবির অপূর্ব এই শ্লোকে বিশেষভাবে পরিচিত যে কবির পাদবন্দনা অনুচিত হবে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই নাম। পূর্ব ও পশ্চিম তোয়নিধিতে অবগাহন-পূর্বক গগনমণ্ডল স্পর্শ ক'রে আমাদের শিয়রে দণ্ডায়মান। জাতির মানস-ভূমণ্ডলকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে ফেলে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের মাঝখানে সংযোগ এবং ব্যবধান উভয়ই সৃষ্টি করেছেন। এমন-কি, সূর্যচন্দ্রের গতিপথস্পর্শী উন্নত মস্তক অকালে কোন্ অদৃষ্টের চরণে নত করেছিলেন যে অগ্রজ বিন্ধ্যকুলাচল (দত্তকুলোদ্ভব শ্রীমধুসূদন) তাঁরও বিস্ময় ও বেদনার আবেদন জাতিকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। এই রবীন্দ্রনাথ থেকেই বাঙালি জাতির বা বাংলা সাহিত্যের সুপ্রশস্ত এবং অবারিত আধুনিক কাল, যে কাল মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে নিয়তই ধাবিত— সাময়িক বাধা বা বিপর্যয় যেমনই হোক। আধুনিক সাহিত্যবিচার বা কাব্যবোধ তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিশাল কবিকৃতির পটভূমিতেই সম্ভব; এই মানদণ্ডেই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অন্যান্য কবিকৃতির রূপ'জ্ঞান 'ও স্বরূপ'পরিচয় সহজসাধ্য। অতএব মোহিতলালের কবিপ্রতিভার ধারণাও ঐ নির্ধারিত পন্থায় কেমন ও কতদূর অগ্রসর হয় দেখা যাক।

লোকোত্তর রবীন্দ্রপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে মুহূর্তে, ঐ সময় থেকে আর ঐ আলোকে ও উত্তাপে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে যা-কিছু রচনা, তাকেই রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য বলা চলে। গোবিন্দদাস ও দ্বিজেন্দ্রলাল না হলেও, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক। উপস্থিত, সমালোচক মোহিতলাল সম্পর্কে বেশি কিছু বলবার স্থান নেই আর অল্প কিছু বললেও অনুচিত

হবে, অতএব কবি মোহিতলাল যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে অতিশয় বিশিষ্ট— তিন-চারজন প্রধান কবির মধ্যে একজন— আমাদের এই ধারণাটি পরিস্ফুট করতে পারিলেই যথেষ্ট হবে। অক্ষয়কুমার, রজনীকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবি; রবীন্দ্রপ্রতিভার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন তাঁদের কাব্যেও যদি বা থাকে, সে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে টেনে এনে কাজ নেই এবং এইটুকু বলাই ভালো যে, রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বড়ো কবি নন, দীর্ঘায়ু হলেও বড়ো-কবিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন যে এমন নয় (রবীন্দ্রনাথের পরে বড়ো কবি বলতে পারি এমন কেউই এই বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করেন নি, আগামী শত বা দ্বিশত বৎসরের মধ্যে করবেন কি না তাও বলা যায় না) তা হোক, সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষ একটি কবি; অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সহজেই তাঁকে পৃথক্ করা যায়; তিনি ভাবে ভাষায় ছন্দে অনেকটা রবীন্দ্রপ্রভাবিত হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি কখনোই নন। এই বিশিষ্টতার কারণ আর-কিছু নয়, মনের বিশেষ গঠন ও প্রকৃতি, সমালোচক মোহিতলালের ভাষায়— বিশিষ্ট কবিমানস।[১] তিনি বলেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা 'মনোধর্মী, যুক্তিবাদী, নীতিপরায়ণ, প্রত্যক্ষ-বাস্তবের পূজারী'; 'চক্ষুকর্ণের পিপাসা, দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ, ···শব্দের দ্বারা চিত্ররচনা ও ছন্দের দ্বারা সঙ্গীতরচনা' তার স্বভাবসিদ্ধ। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় ছিল বোধের উপর বুদ্ধির প্রাধান্য, সত্তার গভীর গম্ভীর আবেগ ও উপলব্ধির পরিবর্তে [২]ষড়িন্দ্রিয়ের পথে পথে সতত বহির্গমনোন্মুখ আবেশ ও কল্পনা, কল্পনা থেকেও তথ্যসঞ্চয় কৌতূহল ও কৌতুক। এই কারণেই, তাঁর কবিতায় এত ছিল বাগ্‌বিভূতি, ছন্দের চাতুরী, মনোমুগ্ধকর কারিগরি, অথচ কী জানি কী একটা ছিল না, বা অতি অল্পই ছিল। সেই কী-জানি-কী বস্তুকে ইচ্ছা হয় অলংকারধ্বনি বা রসধ্বনি বলুন, ইচ্ছা হয় তো বলুন—

'Eternal passion !
Eternal pain !'

এই 'অসীম ক্ষুধা ও অনন্ত যাতনা' বাংলা কাব্যে আনয়ন করেছেন রবীন্দ্র-পরবর্তী দু-চার জন কবি[৩], তাদের পুরোভাগেই আছেন— মোহিতলাল। এই 'ক্ষুধা ও যাতনার' বাঙ্ময় প্রকাশে আবহমান কালের বহুবিধ সংস্কার বিশ্বাস ও অভ্যাসকে পদাঘাত ক'রে পরিণামভাবনাহীন বিদ্রোহ মুখর হয়ে উঠেছে; বিপ্লবের রক্তকেতন উড়েছে খ্যাপা কালবৈশাখী ঝড়ের ঘূর্ণি-ধুলোটের আবেগে ব্যাকুল-বিদীর্ণ হয়ে। সেই বিদ্রোহের ও বিপ্লবের মোহিতলালই পুরোধা। প্রাণের ও গানের অধীর উচ্ছলতায় দুরন্ত, দুর্মদ নজরুল, তাঁকেও মোহিতলালের অনুগামী বলতে হবে, কেবল কালক্রমের হিসাব খতিয়ে নয়, কলাসাফল্যেরও বিচার-বিবেচনায়। কারণ, নজরুলের 'বিদ্রোহী' আর তদ্‌বৎ অন্যান্য অতিখ্যাত কবিতা এক কালে যতই চমকপ্রদ মনে হয়ে থাক্, আজ আমাদের প্রাণে মনে তেমন ক'রে আলোড়ন জাগাবে না যে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নির্মম কালের বিচারে এ যেন স্থির হয়েই গিয়েছে যে, সে কবিতায় যতটা উত্তেজনা আছে ততটা গভীর গম্ভীর সত্য নেই। নজরুলের প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্বের সামীপ্যে বা সহযোগে তার যতটা জৌলুষ, সেই

---

১ মোহিতলালের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পর্কে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধেরই বচন বর্তমান প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে উৎকলিত হয়েছে।

২ মন'কে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলায় বাধা নেই।

৩ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যের আলোচনায় ভাওয়াল-কবি গোবিন্দদাসের কথা আসে না, এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

জীবন্ত জ্বলন্ত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার তেমন আর দীপ্তি নেই, দাহ নেই। অর্থাৎ, নজরুল ও তাঁর কবিকৃতি, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই আজ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, অতীত হয়ে গেছে। মোহিতলালের বিদ্রোহের বাণীতে এমন উত্তেজনা না থাকলেও, থাকে নি ব'লেই, তার প্রতীতির গভীর গম্ভীর ভাব ও দার্ঢ্য, আবেগের স্থায়িত্ব ও সংক্রামকতা, স্বভাবগত রাগদ্বেষের সংযত সংহত শক্তি—বহুগুণেই অধিক। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের বিবেচক পাঠকের কাছে এ কথা আজ স্বতঃই প্রমাণিত মনে করি। উদ্ধৃতিভারে এ প্রবন্ধকে ভারী করা অনাবশ্যক।

৩

Eternal passion !

Eternal pain !

তবে কি রবীন্দ্রকাব্যে এর আবেগতরঙ্গের অস্থির করাঘাত এবং গদ্‌গদবচন কখনো বাজে নি? বেজেছে বৈকি। কড়ি ও কোমল'এ, মানসী'তে তার সাক্ষ্য আছে।—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার

এ কথা কবি এক দিনে বলে উঠতে পারেন নি। কিন্তু, বলতে পেরেছেন যে এই এক বিস্ময় আর এই আমাদের আশাতীত এক সৌভাগ্য বলতে হবে। passion and pain -অতিক্রমণের পালা প্রায় নেপথ্যেই সেরে এসেছেন, বাইরের দশ জনে জানে নি।—

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়, বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি, বন্ধু, উঠেছিল গান কত ব্যথা ভেদ করি !

অগ্নিশুদ্ধমূর্তিতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন কবি পরবর্তী কালে, অলক্ষ্য অলোকলোকের দ্বার যেখানে অবারিত, আর—

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি !
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি !
নাহি দেশকাল, তুমি অনিমেষমুরতি—
তুমি অচপলদামিনী !

এর পরেও নানা ছন্দে, নানা স্বরে, নানা ভাষায় এরূপ আর্তি বা আকূতি জেগেছে সন্দেহ নেই—

মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখী ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

অথবা—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খ'সে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে !

অথবা—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !

কিন্তু, সে হল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস; অমর্ত অসন্তোষ অথবা divine discontent তাকে বলা যেতে পারে;

passion and pain'এর— 'দেহ'গত, এমন-কি ব্যক্তিগত, বাসনা বেদনা ও ক্ষোভের কী এক আশ্চর্য দেহান্তর, রূপান্তর !

৪

কিন্তু মর্তজীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা সুখ, অসীম ক্ষুধা ও চির-অতৃপ্তি, আশা ও স্বপ্নের শেষ নিষ্ফলতা, এগুলিকে অতিমর্ত পরিণামে পৌঁছিয়ে দেওয়া, বিদ্যুদ্‌গতি সংগীতের বেগে ও জন্ম-জন্মের পুণ্যফলে, আজও সকল কবির পক্ষে সম্ভব নয়— আর, তার প্রয়োজনও দেখি নে। আপন আপন জীবনের নিবিড় গভীর অভিজ্ঞতার উৎস থেকে আনন্দবেদনার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্রিত হয়ে উঠবে, কবিতা সম্পর্কে এইটুকু কেবল রসিক-মাত্রেরই দাবি— তা ব'লে সকলের সব অভিজ্ঞতা এক ছাঁচেই ঢালা হবে কেন ? হয় না ব'লেই বিস্ময় ও বৈচিত্র্য আছে, আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য রয়েছে, আর আমাদেরও এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে।

মোহিতলালের 'ব্যথার আরতি', স্মরগরলের অবিস্মরণীয় পিপাসা, দেহধূপাধারের-গন্ধধূমে-অন্ধ-হওয়া স্পর্শরসিকতা, অভিনব 'দেহবাদ' অভিধানে আখ্যাত হয়েছে। নূতন একপ্রকার 'বীরাচার', নূতন তন্ত্র, নবরহস্যবাদ, এমন বললেও অনুচিত হবে না। সাত-সমুদ্র-পারের কোনো কোনো কবিকীর্তির সঙ্গেই বুঝি তার সাক্ষাৎ সম্পর্ক এবং স্বাভাবিক মিল— ডি. এইচ. লরেন্সের নাম স্বতঃই মনে পড়ে। ফরাসী কবি বদ্‌লেয়ারও আমাদের কবির অপরিচিত ছিলেন না। আর, ঐরূপ আরও দু-একজন পাশ্চাত্য কবির সঙ্গে বর্তমান লেখকের প্রথম পরিচয় মোহিতলালেরই বলিষ্ঠ ভাষান্তরের মধ্যস্থতায়।[৪] সহধর্মিতা বা সহমর্মিতা কতখানি নিবিড় ও গভীর হলে 'প্রেতপুরী'র মতো স্বাধীন ও সচ্ছন্দ ভাষান্তর সম্ভব হয়, রসিকজন বিবেচনা ক'রে দেখবেন। 'ভাষান্তর' শব্দটি ব্যবহার করতেই যেন সংশয় ও সংকোচ আসে। অতএব এ কথা কখনোই বলব না যে মোহিতলালের এই দেহবাদ বস্তুটি ধার-করা বা সমুদ্রপারের আমদানি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক দেহের মধ্যেই দেহবাদের মূল আছে এ কথা যেমন সত্য ততোধিক সত্য হল এই যে, দেহতত্ত্বের সাধনা বা 'সহজিয়া' আচার বিচার ও বিশ্বাস যে দেশে বহু শতাব্দ ধ'রে চলে আসছে, সে দেশের সন্তান আপন দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তেই ঐ মতের ও পথের উত্তরাধিকার অর্জন করে বসে আছে। প্রাণময় 'চৈতন্য'ময় দেহের রক্তরাগরঞ্জিত সেই উপলব্ধি এত দিনে যুগোপযোগী কবিবাক্‌ লাভ করল, বিশ্বজন-গ্রাহ্য সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত হল, মোহিতলালের কবিকীর্তিতে এইটেই আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দ, কারুনৈপুণ্য এবং শব্দসংগীত অর্থাৎ রবীন্দ্রপ্রতিভার হিতকর যা-কিছু প্রভাব, এ-সমস্তই গ্রহণ ক'রে, আত্মসাৎ ক'রে, রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুবৃত্তি বা অনুকরণের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন মোহিতলাল এবং কবি হিসাবে সার্থক হলেন। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে এ ঘটনা এই বুঝি প্রথম ঘটল। অকাল-প্রস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ আঙ্গিকের দিক দিয়ে অজস্র মৌলিকতা দেখানো-সত্ত্বেও, নৈপুণ্য-সত্ত্বেও, আপন রক্তের অক্ষরে আপনার লেখাগুলি লিখতে পারেন নি— আমাদের এ ধারণা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি। মোহিতলালের সমকালীন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্যসৃষ্টিতে ভাব ভাষা রীতি পদ্ধতি অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি সব-কিছু অপ্রত্যাশিত এ কথা যেমন সত্য এও সত্য যে, উঁচুনিচু আল-পথে দ্বিচক্র-চালনার মতো দম্‌কা ছন্দে আর তৈলহীন রুক্ষ দেহে সে কবিতা রবিপ্রতিভার অনেক প্রসাদই বাহ্যতঃ উপেক্ষা করেছে ; অন্তরে

---

৪ 'হেমন্ত-গোধূলি' গ্রন্থে— অন্তরদাহ (Stéphan Mallarmé), নাগার্জুন এবং প্রেতপুরী (George Sylvester Viereck)

যা নিয়েছে রসভারাতুর বিশেষ একটি পরিণতি না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই ধরা পড়ে নি। তা ছাড়া, যতীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী হতে পারেন, দেহবাদী ঠিক নন। অভিমানবশে অথবা 'শখ' ক'রে নাস্তিক যদি বা হয়ে থাকেন, সহজিয়া সাধক বা তান্ত্রিক নন। তাঁর জীবনদর্শন আলাদা। তাঁকে দুঃখবাদী বলা হয়, সেটা অর্ধসত্য সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, যতীন্দ্রনাথের যেমন একপ্রকার 'আনন্দময় দুঃখ-বাদ'—

আনন্দ লহ লহ ;
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ— দুঃখেরি ফেরি বহ !

মোহিতলালের তেমনি 'দেহবাদ' হলেও, সে একপ্রকার 'চৈতন্যময় দেহ-বাদ'। কারণ,—

বাঁশীতে বাজিল ব্যথার সোহিনী,
রতি হল রাধা চির-বিরহিণী

এবং—

মোর কামকলা— কেলি-উল্লাস
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস
আমি যে বধূরে কোলে ক'রে কাঁদি, যত হেরি তার মুখ !
...
আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ !
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না !
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত !

অর্থাৎ, দেহ দিয়ে আর দেহের ভিতরেই দেহাতীতের সন্ধান। বাংলার 'বীর' সন্তান ছাড়া এমন দুঃসাহস হয় কার ? অথবা, দুঃসাহসীর সংখ্যা একাধিক হলেও, অধিকারী মেলাই দুষ্কর। এ ক্ষেত্রে মোহিতলালই হলেন উচ্চ অধিকারী, হয়তো বা একমাত্র অধিকারী আধুনিক বাংলা কাব্যে। এ বিষয়ে মোহিতলালের অনুগামী অন্যান্য আধুনিক কবি (এক কালে তাঁদের গোত্র-নাম ছিল 'অতি আধুনিক') সমভাবে সার্থক হতে পারেন নি। জীবনের জ্বালা তাঁদের কারোই কম নয়, বিদ্রোহ উচ্চকণ্ঠ, কলাকৌশলের উপর দখলও প্রশংসনীয়, তবু হয়তো বেদনার মূল প্রসারিত হয় নি সত্তার গভীরতম প্রদেশ-অবধি, যথোচিত তীব্রতার অভাব ছিল হয়তো উপলব্ধিতে, এবং বহু ক্ষেত্রে হয় কথা নয়তো কৌশল বক্তব্যকে আর বেদনাকেও ছাপিয়ে উঠে থাকবে। (ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।) সাধকবিশেষে এই দেহযজ্ঞ, এই শবসাধনা, কালভৈরবের অকাল বোধন, প্রতিভার প্রাণ-হানিকর বা প্রকাশ-হানিকর হয় নি যে এমনও বলা যায় না। মৃত্যু বা মূর্ছা এনে দিয়েছে। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কাব্যে সেই অপূরণীয় ক্ষতি।

দেহাত্মবাদের পুরোযায়ী পথিক মোহিতলাল কিন্তু এ-সব সংকট কাটিয়ে চলে গেছেন। বিস্মরণী, স্মরগরল, হেমন্তগোধূলি— কোনো কাব্যগ্রন্থেই[৫] তাঁর আত্যন্তিক পদস্খলন ঘটে নি। সজ্ঞান, সচেতন, সবেদন ভাবে তাঁর প্রাতিভ সৃজনের ক্রিয়া অগ্রসর হয়ে চলেছে।

---

৫ পূর্বপ্রকাশিত 'স্বপন-পসারী' নিয়ে চারখানি মোহিতলালের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ; প্রকাশ বাংলা ১৩২৮ থেকে ১৩৪৮ সালের মধ্যে। উল্লিখিত গ্রন্থত্রয়েই কবির সুপরিণত প্রতিভার পরিচয়।

অথচ এই সবল প্রতিভার ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব আছে, আত্মবিরোধ আছে, সব-শেষে এ কথাও না বললে নয়। আমরা যতদূর বুঝেছি সেই দ্বন্দ্ব বা বিরোধ ত্রিবিধ— দেহে এবং আত্মায় বিরোধ, বুদ্ধিতে এবং বোধে বিরোধ, আঙ্গিকে এবং অভীপ্সায় বিরোধ। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্পপরিসরে এ বিষয়ে অতি সামান্য ইঙ্গিত দেওয়াই যথেষ্ট।

দেহাত্মবিরোধ। এই বিরোধের বোধ কোনো না কোনো আকারে মননশীল মরজীব-মাত্রের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে। এই বিরোধের সমাধান কেবল বিশ্বাসে ভক্তিতে ও অহমের একান্ত আত্মনিবেদনে। তা হলেই সামঞ্জস্য ও সংগতির বোধ, একটি শান্তি ও সন্তোষের ভূমিকা, সম্ভবপর হয়। ভগবৎপ্রসাদ, অপরোক্ষানুভূতি, ঋষিদৃষ্টি— সে তো লক্ষ লক্ষ দেহধারীর মধ্যে দু-একজনই পেয়ে থাকে। তবু, রসপিপাসা আর তত্ত্বপিপাসা এক বা অবিচ্ছেদ্য নয় ব'লেই, সে যন্ত্রণা সকল কবি বা শিল্পীকে ভোগ করতে হয় না মোহিতলাল যা ভোগ করেছেন— যা তিনি কোনো ক্রমেই এড়াতে পারেন নি। তন্দ্রাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসার এই পীড়নে কবিপ্রতিভাতেও চীড় খেয়ে গিয়েছে, পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, মোহিতলালের বহু কবিতাই তার অল্প বা অধিক সাক্ষ্য বহন করে। যেমন বলা যেতে পারে, স্মরগরলের 'নারীস্তোত্র'শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় বোধের বা বুদ্ধি-বিচারের পারম্পর্য ও শৃঙ্খলা কতখানি আছে? গেঁথে-তোলা আকৃতি যা'ও বা আছে, জীবনগত ও স্বয়ংপূর্ণ ঐক্য একটি আছে কি? যদি না থাকে, দেহাত্মবিরোধের মায়িক বোধই তার হেতু। 'বুদ্ধ' কবিতাটিতেও এমনি দ্বিধাভিন্ন 'প্রত্যয়' আদ্যন্ত প্রকটিত মনে হয়।—

ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা

এবংবিধ উক্তিতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় না— না হৃদয়ের দিক দিয়ে, না বুদ্ধির দিক দিয়ে। আর, দেহই যদি সব হয়, অথবা দেহই যদি আত্মা হয়, তা হলে দেহবিমুখ ও বিদেহ বুদ্ধ বা শোপেন্‌হর'কে সম্বোধন ক'রে এরূপ দীর্ঘাতিদীর্ঘ ভাষণের বিশেষ কোনো মানে হয় না।—

যদি মরি সুচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই— শেষ হয় নয়নের ধারা!
বল, বল, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা?
এ পিপাসা সুমধুর— বল তুমি, বল, স্বপ্নহর!—
ঘুচিবে না?— মরণের শেষ নাই, বল আর বার!···
যূপবদ্ধ পশু আমি?— ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে?— না, না, সে যে মধু'র উৎসার!
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার।[৬]

বস্তুতঃ, এ-সব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতায়, রসোজ্জ্বল ছত্ররাজি আর অপরূপ শব্দসংগীত -সত্ত্বেও, অন্তর্লীন একটি বিরোধের কারণে কবিকৃতির শিল্পগত ঐক্য বা সার্থকতা পদে পদে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

এই বিরোধকেই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোধ এবং বুদ্ধির বিরোধও বলা যায়। হৃদবোধে স্বভাবতঃই একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য থাকে; এমন-কি ভিন্ন ভিন্ন বোধেও যদি বিরোধ বেধে ওঠে সে বিরোধ স্থায়ী হয় না, নূতন একটি বোধের জন্ম দেয়। মেঘের সঙ্গে মেঘ যেমন মিশে যায়; আকস্মিক সংঘর্ষে বজ্রবিদ্যুতের বিকাশ

৬ দ্রষ্টব্য 'বিস্মরণী' কাব্যে 'পান্থ' কবিতা— 'দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশে'।

হলেও তার স্থায়িত্ব অতি অল্প, নিবিড় মিলনাবেগেরই ঐ ভাষা ও উদ্ভাস, তৃষাতর্পণ সুস্নিগ্ধ বারিবর্ষণে তার অবসান। কিন্তু, বোধ ও বুদ্ধির মিলন তেমন অবশ্যম্ভাবী নয়। শিল্পরূপ এবং রসরূপ পেতে হলে যেমন তথ্যকে তেমনি তত্ত্বকে কবি-বোধের সকাশে আত্মনিবেদন করতেই হয়। অর্থাৎ, তথ্যকে, তত্ত্বকে সম্পূর্ণ জীর্ণ করেই আবেগ ও উপলব্ধি কাব্যের রূপ পায়। অজীর্ণ ভাবনা কাব্যশরীরকে অসুস্থ, কাজেই অসুন্দর করে; এমন-কি যে মনোময় চিন্ময় লোকে কারণরূপে ক্ষণে ক্ষণে কত কবিতার জন্ম এবং মৃত্যু, সেখানে হতে হতে হয়ে ওঠে না কবিতা— অর্থাৎ, ঐক্যবান্ প্রাণবান্ কোনো সত্তা পায় না, যদি বা কোনো প্রকারে পুস্তকেও ছাপা হয়। দুঃখের বিষয়, এমন দুর্ঘটনা, বোধ ও বুদ্ধির অনাবশ্যক অহেতু বিতর্ক, হয়তো বা লাঠালাঠি, মোহিতলালের একাধিক কবিতায় ঘটেছে।

আঙ্গিকে ও অভিপ্রায়ে বিরোধ যে-কোনো কবির রচনাতেই থাকতে পারে। একান্তই আকস্মিক ঘটনা। না ঘটতেও পারত। মোহিতলালের রচনায় একটি বিশেষ কারণে তা বার বার দেখা গেছে, আমাদের এই ধারণা। মোহিতলালী কবিপ্রতিভার যে প্রকৃতি তাতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দোবন্ধের দীর্ঘবিলম্বিত পদক্ষেপই তার পক্ষে সহজসিদ্ধ ও সুন্দর। ছড়ার ছন্দের রুনুঝুনু নূপুররব, তার চটুল চরণের নৃত্যভঙ্গীতে তেমন সুরে কৈ বাজে নি। সত্যেন্দ্রনাথকেই বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। (ছড়ার ছন্দে লেখা 'ঘুঘুর ডাক' কবিতাটি সার্থক ব্যতিক্রম— 'বিস্মরণী' কাব্যের এই কবিতাটির মতো আরও অবশ্য থাকতে পারে।) রাবীন্দ্রিক শব্দসংগীত সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবন্ধের সুদুর্লভ চারুতায় আর কারুকর্মেও কবি আমাদের চমৎকৃত করেছেন। কোনো কোনো কাব্যরসিক বলেছেন মনে হয়, নূরজহান ও জহাঙ্গীর, মৃত্যু ও নচিকেতা প্রভৃতি নাট্যকাব্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের পরেই ইনি স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। তথ্য হিসাবে অস্বীকার করা যায় না, অথচ আর-এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পর এ ক্ষেত্রে আর-কারোই উল্লেখ করা চলে না। আসল কথা এই যে, এগুলি মোহিতলালেরও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। অতি পুরাতন পরিচয়ের সংস্কারবশতঃ কি না কে জানে, স্বপন-পসারী কাব্যের 'শেষ-শয্যায় নূরজহান্' কবিতাটি বর্তমান লেখকের মনের পটে সন্ধ্যাশেষের ম্লানায়মান সোনার বর্ণে অঙ্কিত—

> খসে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ আসিলে বেয়ে—
> লাল হয়ে গেল পাণ্ডুর রাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে!
> চেনাবের তীর— পিপাসা-অথির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী,
> তোমার আমার চেনা সে চেনার— এই গাছ-তলে বস'গো যদি!

এমন কোনো কোনো ছত্র আজও মনে পড়ে। (এই কবিতায় এবং অন্য অনেক কবিতায় বাংলার সঙ্গে উর্দু-ফার্শি জবানের সংমিশ্রণে মোহিতলাল অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সত্যেন্দ্রনাথ বা নজরুলের তুলনায় কম কি বেশি হঠাৎ বলা যায় না।) বেদুঈন, কালাপাহাড়, নাদিরশাহের জাগরণ, নাদিরশাহের শেষ— একোক্তিচ্ছলে রচিত হলেও, রসবস্তুর বিচারে এগুলিকেও একপ্রকার নাট্যকাব্য বলা যেতে পারে। তা হলে, রীতিবৈচিত্র্যের ও কবিকৃতিত্বের পরিমাণ সমধিক ব'লে অবশ্যই স্বীকৃত হয়।

৫

বর্তমান প্রবন্ধের শেষ সীমায় এসে স্বতঃই মনে হল, সমালোচনাচ্ছলে এ কচ্‌কচি কেনই বা? কবি মোহিতলালের কতকগুলি কবিতা, বহু কবিতা, কত যে ভালো লেগেছে, বহুকাল ধ'রে বহু লোকেরই

ভালো লাগবে, সেই আসল কথাটা বলা হয়েছে কি? মোহিতলালের কবিস্বভাবগত গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসা আর অনাহূত অবাঞ্ছিত বিতর্ক (সেই তার শক্তি, সেই তার দুর্বলতা) তারই হাওয়া লেগে আমাদেরও সাধ হল বুঝি তত্ত্বদর্শী সাজতে! সে সাজ সকলকে মানায় না। তত্ত্বদৃষ্টি আর রসজ্ঞতা এক নয়। কান পেতে শুনি-না এই সুর, লৌকিকে অলৌকিকে মেশা, বিষাদে ও বেদনায় মধুর—

আজিকে শুক্লা হেমন্ত-বিভাবরী,
তারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী।
তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
ফুলমালঞ্চে হৈমবতীর বেশে···
ফুটেছিল যারা যৌবনবৈশাখে
রৌদ্র-মদিরা পান করি' শাখে-শাখে,
যত তাপ তত সরস যাদের তনু, হাসিতে যাহারা হাহাকার চেপে রাখে—
তারা নাই আজ, ভয় নাই— এস তুমি!
বরিষার শেষে শীতল আজি এ ভূমি;
উদিবে এখনি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা হিমনিষিক্ত ধরণীর মুখ চুমি'।···
তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে
তুহিনমোহিনী হৈমবতীর বেশে!
নীরব নিথর রঙের পাথার শুধু বিথারিয়া দাও নয়ননির্ণিমেষে।

কবি মোহিতলাল, মনীষী মোহিতলাল, আপন অতুলনীয় কীর্তি ও কৃতিত্বের উপযোগী সম্মান ও সমাদর এ দেশের শিক্ষিতসমাজ অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকেও পান নি— সে এ দেশেরই দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। 'ব্যক্তি মোহিতলাল' সম্পর্কে কোনোরূপ দোষারোপ ক'রেই তার স্খালন হয় না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে ঋণী। কবি ছিলেন তিনি অস্থিমজ্জায়, দেহে মনে, তন্দ্রায় ও জাগরণে। আর কেউ শুনুক বা না'ই শুনুক, তাঁর জীবনশেষের নিবেদন তাঁর জীবনান্তর্যামিনী অবশ্যই শুনেছেন—

পরশহরষে মজি নাই— তাই গেয়েছি দেহের গান,
জেগে র'ব বলি' করি নাই তা'র অধরের মধু পান।
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে!···
'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ!

কানাই সামন্ত

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম ৬ ফাল্গুন ১৩০৫, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ মৃত্যু ৫ কার্তিক ১৩৬১, ২২ অক্টোবর ১৯৫৪

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে তখন দেশ তাঁকে স্বীকার করল। শুধু কলকাতা শহরে নয়, যাকে আমরা মফস্বল বলি, যে কোনো সজীব আন্দোলনের ঢেউ যেখানে গিয়ে পৌছতে পৌছতে একযুগ অন্ততঃ কেটে যায়, সেইসব ছোটো শহর, আধা-শহর, পল্লীগ্রাম, এমনকি প্রবাসী বাংলাসমাজেও তাঁর স্মরণসভার অনুষ্ঠান অসংখ্য হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এক সংস্করণ শেষ হতে অন্ততঃ পনেরো বছর লেগেছিল, 'বনলতা সেন'-এর দু বছরও লাগল না। দেখে একদিকে যেমন আনন্দ হয়, অন্যদিকে তেমনি এই ভেবে দুঃখ বোধ করি যে, বেঁচে থাকতে তাঁকে কতবড়ো অনাদরই সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিভার প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রাথমিক বৈরিতা হয়তো শুধু বাংলাদেশেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সে কথা ভেবে আত্মদোষের লাঘবও হয় না কিছু। জীবনানন্দ দাশের প্রতি আক্রমণ অস্বাভাবিক তীব্র হয়ে উঠেছিল, তার কারণ আমাদের অনভ্যস্ত আলংকারিক ভাষায়, অনভ্যস্ত ছন্দে এমন এক প্রবল কাব্যস্রোত তিনি বইয়ে দিলেন যে, বধির হয়ে তাকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব ছিল। অক্ষমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি; আর যিনি শক্তিমান তাঁকে প্রথমে অশ্রদ্ধা করি, অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, তার পর গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মৃত্যুর শোক চিরকাল থাকে না, এবং অসম্ভব ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আমাদের কিছু পূরণও করে। জীবনানন্দের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর পরে তাঁর কাব্যের এবং সাধারণভাবে আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রতি বৃহৎ বাঙালী পাঠকসমাজের অনীহা যদি কিছুটা পরিমাণেও দূর হয়ে থাকে— মৃত্যুর শীতল হাত থেকে সেই দানটুকুই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।

যৌবনে পা দিয়েই আমরা যারা আধুনিক কাব্যের নিষিদ্ধ ফল আস্বাদ করেছিলাম, হিতৈষীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করার প্রবৃত্তি হয় নি যাঁদের, তারা সেই নিষিদ্ধ ফলের মধ্যেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে শিখেছিলাম। আজ যখন ভেবে দেখি 'কেন' তখন একসঙ্গে এত কথা ভিড় করে আসে, এই কাব্যের মায়া-আরসিটিকে এতদিক থেকে আলো ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যে, সে কথা সংক্ষেপে বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে ক্লান্তি এবং বিষাদকে বলা হয় আধুনিক মনের উপলব্ধিগত প্রচণ্ড সত্য, আমরা কি সেই উপলব্ধির স্বাদ পেয়েছিলাম জীবনানন্দে? সে কথা হয়তো মিথ্যে নয়।

আসিয়াছি নেমে এই খেতে;
শরীরের অবসাদ— হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তার পর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি— পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।

—অবসরের গান

এইসব কবিতার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে যে মনস্বী বিষণ্নতা তার মধ্যে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি

মেশাতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিষাদ হলেও তার চরিত্র এমন নয় যার থেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম হবে। ফলতঃ জীবনানন্দীয় কাব্যকলা জীবনকে বর্জন করতে শেখায় না; সবগুলি ইন্দ্রিয়কে তা আরো তীক্ষ্ণ ক'রে, সজাগ ক'রে তোলে, পরমাশ্চর্য প্রাণলীলার প্রতি প্রগাঢ় মুগ্ধতায় হৃদয়মন ভরে দেয়। আধুনিক মনের এই লক্ষণ। জটিল জীবনাঙ্কের শেষ ফল অক্ষয় আনন্দের প্রতীতি— সে কথা নিঃসন্দিগ্ধ নিরুদ্বেগ চিত্তে অমনি কেউ বললেই তা নিয়ে আর আমাদের মন কিছুতে ভরতে চায় না। অসংখ্য ঋণ রক্ত সফলতা ক্ষতি আর মৃত্যু ছড়ানো সৃষ্টিলোকের চেতনা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করছে। অথচ এই অসম্ভব ক্ষতিতে ভরা বিশ্বের পটে অন্ধকার রহস্যের মতো, যেন কোন্ অলৌকিক আঙ্কিক নিয়মে অন্ধ অবোধ আনন্দিত প্রাণের আবর্তনও চলেছে, হেমন্তের ফসলকাটা মাঠ যার কথা নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেয়। সভ্যতার জটিলতাকে যখন আমল দেন নি জীবনানন্দ, যখন তিনি ছিলেন নির্জন নিসর্গলীলার কবি, হেমন্তের মাঠ ঘাট বন জঙ্গল কীট পতঙ্গ পোখপাখালির কথায় যখন তাঁর কবিতা ভরা, তখনো সেই নিসর্গনিকেতনকে তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্বস্তির দেবালয় ব'লে তার নান্দীপাঠ করেন নি। মৃত্যুর জমিতে দাঁড়িয়ে তবু যারা হৃদয় ভরে জীবনের সুধাপান করতে লজ্জা পায় না ('জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর'), শেক্‌স্‌পীরীয় অর্থে সেই অপরাজেয় ভাঁড়ের কণ্ঠস্বর শুনি জীবনানন্দের কাব্যে—

> ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
> প্রেম আর পিপাসার গান
> আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন ;
> ফসল— ধানের ফলে যাহাদের মন
> ভরে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা
> করে গেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন—

শেক্‌সপীরীয় ফল্‌স্টাফ কিম্বা, 'হ্যাম্‌লেটে'র খনকযুগলের মানসিক চরিত্র যাঁদের স্পর্শ করে না, জীবনানন্দে 'রূপ আর কামনা'র গান তাঁদের কাছে অপরিব্যক্ত, অনতিব্যক্ত থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করি। 'কমলালেবু'র মতো কবিতার স্বাদ তাঁরা কিছুতেই উপভোগ করতে পারবেন না, বুঝবেন না কোন্ প্রাণের উল্লাসে লেখা যায়—

> আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
> গেলাসে গেলাসে পান করি,
> এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘষি,
> ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
> ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।
>
> —ঘাস

তার পর ভিন্ন আর এক অধ্যায়ের উন্মোচন হল জীবনানন্দের কাব্যে, 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদি গ্রন্থে যার নিদর্শন আছে। ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার রঙ্গভূমি যে শহরকে এতকাল এড়িয়ে চলেছিলেন তার তীব্র আর্তনাদকে আর ভুলে থাকতে পারলেন না। তাঁর এই মধ্যপর্বের কবিতাবলী ব্যঙ্গে বিদ্রূপে, ক্ষয়ক্ষতি মলিনতার বেদনায় মথিত হয়েছে।

মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো
এইখানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;

• • •

চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধভিড়— অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের সুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয়সাধ
নেই।...

—এই সব দিন রাত্রি

এই উন্মথিত বেদনার বিষ পরিপাক ক'রে তার পর উত্তীর্ণ-আনন্দের, প্রত্যয়ের জয়গান—

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

তাঁর কাব্যে সাবলীল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে উঠতে আকস্মিক ভাবে সময় শেষ হয়ে গেল।

জীবনানন্দ অসামান্য প্রতিভার কবি। কবিদের মধ্যে অসামান্য তাঁরাই যাঁদের রচনায় জীবনের প্রগাঢ়তম আনন্দবেদনার রূপ উন্মোচিত হয় ; ইন্দ্রিয় দিয়ে যা উপভোগ করবার, হৃদয় দিয়ে যা উপলব্ধি করবার, এবং প্রাণের গভীরে যা বোধ করবার বিষয় তাকে যাঁরা অভাবিতপূর্ব গতিময় ভাষার স্পন্দনে স্মরণীয়ভাবে তর্জমা ক'রে দেন আমাদের জন্য, যা আমরা আর ভুলতে পারি না, যে তর্জমার জগতে প্রবেশ করলে নিজেকে এবং বিশ্বপৃথিবীকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করি আমরা—অসামান্য কবি তাঁরাই। দশ বছর আগেকার মতো আজ আর বিদ্রূপের গ্লানি জীবনানন্দের নাম স্পর্শ করছে না বটে, কিন্তু এখনো যে তিনি 'বনলতা সেন' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা নিয়েই অধিকাংশ পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত তার অনেক অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ ক'রে একটির কথা বলা প্রয়োজন। বাঙালী পাঠক আজ পর্যন্ত সেই-সব ধরনের কবিতা নিয়েই অভ্যস্ত যার মধ্যে ভাবের কোনো প্রবাহ কিংবা গতি নেই, কোনো এক জায়গা থেকে শুরু ক'রে আর কোনো প্রাপ্তিতে যা পৌঁছে দেয় না, যার প্রথম পংক্তি কিংবা স্তবকেই প্রকাশ সে কবিতায় কবির অভিপ্রায়টি কী, এবং পরবর্তী পংক্তিগুলিতে উপমা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি উপস্থিত ক'রে সেই কথাটিকেই বিশদ করবার চেষ্টা। কিন্তু আধুনিক কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হাতে নিলে দেখা যাবে কাব্যের গঠন সেখানে একেবারে স্বতন্ত্র। তার শুরু আছে, মধ্য আছে, পৌঁছনো আছে। বিশেষতঃ জীবনানন্দের কোনো কবিতা কী কথা বলতে চায়— এক লাইনে তার কোনো সারসংক্ষেপ হবার নয়।

এসব কবিতা হচ্ছে ভাষায় বোনা কোনো উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শব্দের ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাঠককে সেই অভিজ্ঞতাটি নিজের মধ্যে পুনরায় গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই অভ্যাস দুদিনে আয়ত্ত হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতাবলীতেই কি বাঙালী পাঠক আজ পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথেরও যাঁরা পরবর্তী, যথার্থভাবে দেশ তাঁদের গ্রহণ করবার আগে আমরা তাই আরো কিছুদিন সহজেই অপেক্ষা করতে পারি।

নরেশ গুহ
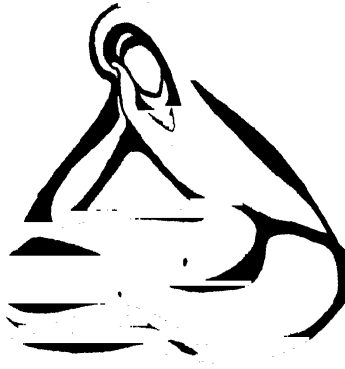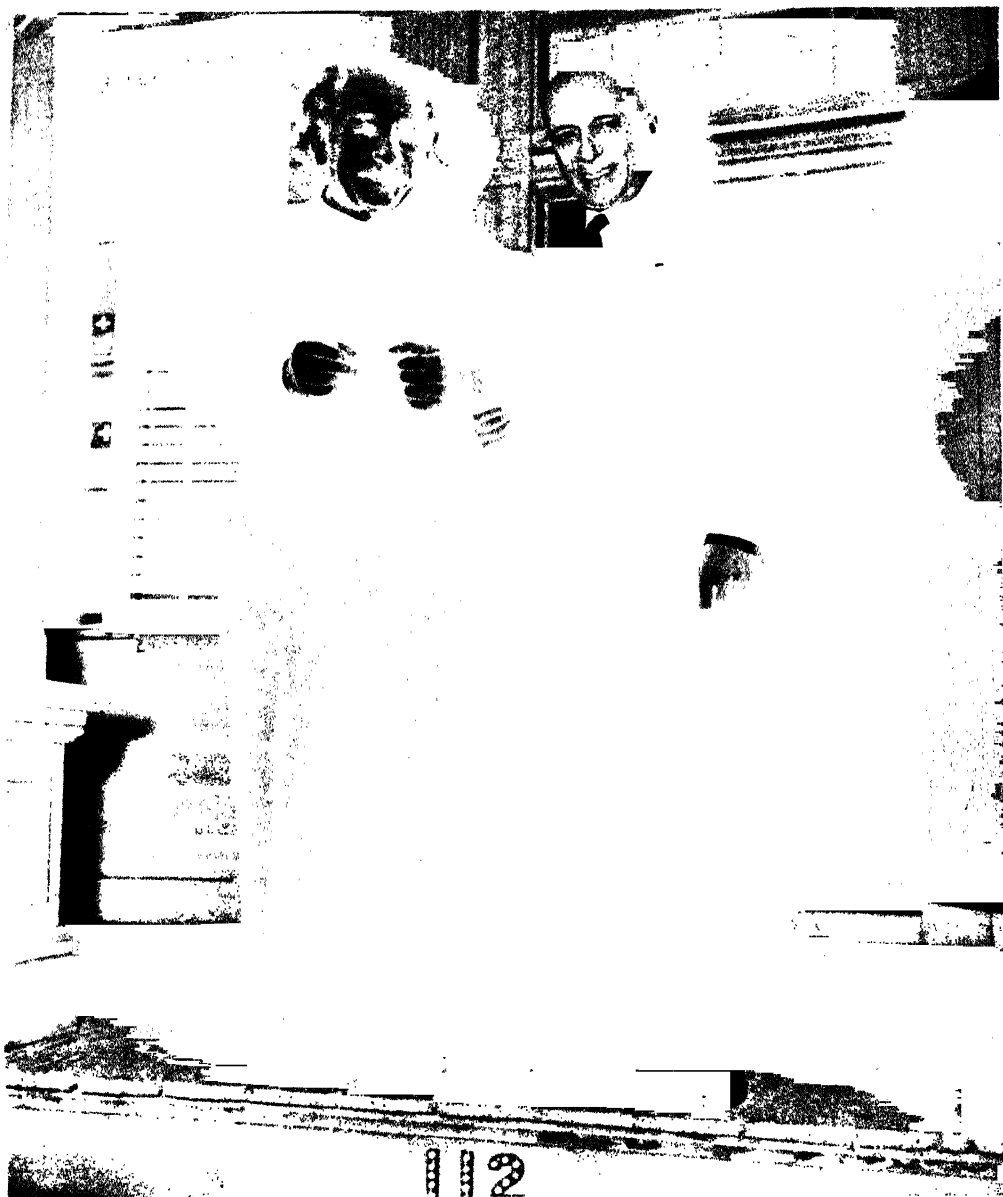
রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

আইনস্টাইন ও জওহরলাল

আইন্‌স্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

সম্প্রতি লোকান্তরিত, বিশ্ববিশ্রুত, বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইন আর রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের মধ্যে ১৪ জুলাই ১৯৩০ তারিখে একটি সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনা হয়। *The Religion of Man* গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট-রূপে উহার একটি অনুলেখন সংকলিত আছে। উক্ত অনুলেখন—উহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত মন্তব্য-সহ বাংলা অনুবাদে নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

'প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মানিতে গিয়ে আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যান্ত্র শিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল— বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সু-বিধা'র সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্‌ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইন্‌স্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

'গত বৎসরের গ্রীষ্মে আবার যখন জর্মানিতে যাই, বর্লিনের অদূরে Kaputhএ আইন্‌স্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দু দিন' আগে অক্‌স্‌ফোর্ডে হিবার্ট্‌ বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, আর *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধ'রে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যান ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মানুষের মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক **সত্য**। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার করণ-কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐপ্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্মসাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

'একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইন্‌স্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তূরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমান্ত-চুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে— জগৎ থেকে—

নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট্ দুটিই মানুষের স্বরূপপ্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।' —রবীন্দ্রনাথ

আইন্‌স্টাইন॥ সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ভগবৎ-সত্তায় আপনার বিশ্বাস আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ॥ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের **অপ্রমেয় সত্তায়** নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা। মানুষী সত্তায় গৃহীত হতে পারে না এমন কিছুই তো দেখা যায় না; কাজেই বিশ্বের যা সত্য তা মানবসত্য। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাক— জড় পদার্থ যে-সব প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনে গঠিত তার মাঝে মাঝে আছে অবকাশ, কিন্তু জড় বস্তু তবু ফাঁপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত ব'লেই মনে হয়। তেমনি অগণ্য ব্যষ্টির সমাবেশে সমষ্টিমানব, মানবিক সম্পর্কের প্রসাদে পরস্পর তারা যুক্ত, আর সেই কারণেই মানুষের সংসার একটি জীবন্ত সংহতি। মনুষ্যেতর বিশ্বভুবনও একই প্রকারে মানুষের সঙ্গে যুক্ত। এ হল মানবিক ভুবন। আমার এই ভাবনা-সূত্রের সত্যতা ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে আর মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনায়।

আইন্‌স্টাইন॥ বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে পৃথক্ দুটি ধারণা রয়েছে— ১. সৃষ্টি হল মানবনির্ভর একটি সংহতি আর ২. সৃষ্টির আছে একটি স্বতন্ত্র সত্তা, মানব-অতিরিক্ত।

রবীন্দ্রনাথ॥ আমাদের এই সৃষ্টি যখন মানুষের নিত্যসত্তারই সুরে বাঁধা থাকে তখনই তাকে আমরা সত্য ব'লে জানি, সুন্দর ব'লে বোধ করি।

আইন্‌স্টাইন॥ সৃষ্টি সম্পর্কে এটি 'নির্ভেজাল' মানুষী ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ॥ অন্যরূপ ধারণার সম্ভাবনা কোথায়? এই বিশ্বভুবন যে মানবিক বিশ্বভুবন; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পর্যন্ত বিজ্ঞানী মানুষেরই দৃষ্টি। বিচার এবং বোধের একটি কোনো নীতি-অনুযায়ী তার সত্যতা, নিত্য-মানবেরই সেই নীতি, নিত্যমানবের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে।

আইন্‌স্টাইন॥ এ হল মানবিক সত্তার আত্ম-আবিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথ॥ হাঁ, নিত্যমানব-সত্তার। আমাদের আবেগ-অনুভূতিতে তার অনুভব, কর্মের ভিতরে ভিতরে তার ক্রিয়া। আমরা জানি সেই পরাৎপর মানব ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রকাশিত, অথচ সকলপ্রকার ব্যক্তিত্বের সীমার অতীত। বিজ্ঞানের বিষয় হল তাই যা ব্যক্তিগত নয়; নৈর্ব্যক্তিক মানবভুবনের সত্যই তার সত্য। ধর্মসাধনার পথে এই সত্যই আমাদের সত্তার গূঢ় গভীর প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে থাকে, সত্য সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা ও উপলব্ধি একটি সার্বভৌমিকতায়, সার্বজনীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যের বিশেষিত মূল্য বা তাৎপর্য আছে, সত্যের সঙ্গে আপনাকে সুরে বেঁধে সত্যকেই কল্যাণ ব'লে জানা যায়।

আইন্‌স্টাইন॥ সত্য বা সুন্দর তবে তো মানব-অতিরিক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ॥ না।

আইন্‌স্টাইন॥ সৃষ্টি থেকে মানুষ যদি লোপ পেয়ে যায়, অপরূপ অ্যাপোলো মূর্তির সৌন্দর্য বা অপরূপতা সেই সঙ্গেই লোপ পাবে?

রবীন্দ্রনাথ ॥ হাঁ।

আইন্‌স্টাইন ॥ সুন্দর সম্পর্কে এ উক্তি আমি মেনে নিই, কিন্তু সত্য সম্পর্কে না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ নয় কেন ? মানুষের মধ্যে দিয়েই তো সত্যের ধ্যান-ধারণা।

আইন্‌স্টাইন ॥ আমার বিশ্বাসের অনুকূলে কোনো প্রমাণ আমি দিতে পারি নে, তবু এই বিশ্বাসই আমার ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এক দিকে, পরিপূর্ণ সমন্বয়ের বা সংগীতির যে কল্পরূপ বিশ্বসত্তায় উদ্ভাসিত, নিখিল সৌন্দর্যের সেই হেতু, অন্য দিকে বিশ্বমনের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ যে ধারণা তারই নাম সত্য। মনে মনে আমরা ব্যক্তিগত ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, সঞ্চীয়মান অভিজ্ঞতার সাহায্যে, ব্যক্তিচৈতন্যের আলো জেলে, ঐ সত্যের দিকে অগ্রসর হই— সত্যকে জানবার অন্য উপায় কী আছে ?

আইন্‌স্টাইন ॥ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে পারি নে যে, মানুষকে বাদ দিয়েও সত্যতা থাকে, এমনভাবেই সত্যকে ধারণা করা চাই— তবু এরই অনুকূলে আমার সুদৃঢ় প্রতীতি। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলা যায়, জ্যামিতিতে পীথাগোরাসের উপপত্তিটি (the Pythagorean Theorem) এমন একটি তত্ত্বকে উপস্থিত করছে যা বিশ্বসংসারে মানুষ থাক্ বা না-থাক্ সত্য হবার বাধা নেই। মোট কথা, মানুষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো 'সৎ' যদি থাকে, তৎসম্পর্কিত সত্যও নিশ্চয়ই আছে ; আর, অমানব 'সৎ' যদি না থাকে তেমন সত্যও কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথ ॥ সত্য আর বিশ্বসত্তা একই— সেটি হল মানবিক। না হলে ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য ব'লে যা-কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায়— অন্তত, বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে তো যুক্তিবিচার অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক মনের মধ্যস্থতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মই নির্বিশেষ সত্য, ব্যক্তিমন তাকে আলাদা ক'রে ধারণা করতে অক্ষম। বাক্যে তার বর্ণনা হয় না, কেবল তার আনন্দে আপনাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে ব্যক্তি তা'ই হতে পারে। কিন্তু এই সত্য তো বিজ্ঞানের এলাকায় নেই। আমরা আলোচনা করছি প্রতীয়মান সত্য নিয়ে— মানুষের মনের কাছেই যার সত্যতা, অতএব যা মানবিক, যাকে আমরা মায়াও বলি।

আইন্‌স্টাইন ॥ তা হলে আপনার মতে, অথবা ভারতীয় মতে, এ মায়া বা 'স্বপ্ন' ব্যষ্টিমনের নয়, সমগ্র মানবজাতির ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল এই যে, ব্যক্তিমনের সীমা ও সংকীর্ণতা, ত্রুটি ও ভ্রান্তি, বাদ দিতে দিতে, বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে ধারণা সম্ভব সেই দিকেই আমরা যেতে চাই।

আইন্‌স্টাইন ॥ সমস্যা তো এইখানে, সত্য, আমাদের জ্ঞান বা চেতনা -নিরপেক্ষ কি না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমরা যাকে সত্য বলি সে হল সৎ-বস্তুর ব্যক্তিগত আর বিষয়গত দুটি দিকের যুক্তিযুক্ত একটি সমন্বয়ে বা সংগতিতে, তার যথার্থ স্থান ব্যক্তি-অতীত মানবে।

আইন্‌স্টাইন ॥ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও, আমাদের ব্যবহারের জিনিসগুলিতেও, মানুষ-নিরপেক্ষ একটি বাস্তবতা আমরা স্বীকার না করে পারি নে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যুক্তিসিদ্ধ একটি সম্পর্কে ও শৃঙ্খলায় বাঁধতে হলে এ দরকার। ধরুন-না কেন, বাড়িতে কেউ রইল না, ঘরের টেবিল তবু তো ঘরেই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ হাঁ, ব্যক্তিমনের বাইরে পড়ে রইল টেবিলটা, বিশ্বমনের বাইরে নয়। আমার জ্ঞানগোচর টেবিলটা আমার জ্ঞানের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

আইন্‌স্টাইন ॥ মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মানুষের সহজ স্বাভাবিক ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রমাণ করা যায় না মানি, তবু এটি সব মানুষেরই ধারণা— আদিবাসীরাও বাদ যায় না। সত্যে মানব-অতিরিক্ত বাস্তবতা আমরা অবশ্যই কল্পনা করি; আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মন, এ-সবের অতীত একটি সত্যবস্তু না হলে আমাদের চলেই না— কেন, কী অর্থে, তা অবশ্য বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, টেবিল যে একটা কঠিন পদার্থ এটা ইন্দ্রিয়ের অনুমান মাত্র, মানুষের মন যদি না থাকে মানুষের মনের ধারণায় ধরা সাধারণ টেবিলটাও থাকে না। কী থাকে? এটাও তো বলতে হবে, ও যে কেবল অচিন্ত্যবেগবান্ ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন-পুঞ্জেরই ঘূর্ণাবর্ত, টেবিল সম্পর্কে, তার 'শেষ সত্য' সম্পর্কে, এই অ-সাধারণ ধারণাটিও মানবমনেরই সৃষ্টি।

সত্যের অবধারণ ব্যাপারে, বিশ্বমানবমন আর ব্যক্তিতে-বদ্ধ মন দু'য়ের একটি চিরদ্বন্দ্ব আছে। তারই চিরসমাধান হয়ে চলেছে মানুষের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মনীতিতে। সে যাই হোক, একেবারেই মানুষের কোনো অপেক্ষা নেই এমন সত্যবস্তু যদিবা থাকে আমাদের কাছে তার একেবারেই না-থাকা।

এমন মনের কল্পনা করা কঠিন নয় যার সামনে বস্তুপারম্পর্য নেই দেশ জুড়ে, আছে কেবল ঘটনার পরম্পরা কালের ভিতরে। স্বরের বিন্যাস যেমন সংগীতে। এরূপ মনে সত্যের সত্যতা-বোধ, সুরের বোধের সঙ্গেই তুলনীয়; সেখানে পীথাগোরীয় জ্যামিতির কোনো অর্থ আর থাকে না। কাগজের বাস্তবতা আর কাগজে-ছাপা সাহিত্য-বস্তু উভয়ের মধ্যে অপরিসীম ব্যবধান। গ্রন্থকীট কাগজ বা বই পুরোপুরি চিবিয়ে খেলেও, সাহিত্যের অস্তিত্ব তার কীট-মনের কাছে কোনোখানেই নেই; অথচ মানুষের মনের কাছে তো কাগজের তুলনায় (হরপেরও তুলনায়) সাহিত্য শতগুণ বেশি ক'রেই আছে। তেমনি, মানুষের মনের কাছে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ হিসাবে হোক, আর যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ ধারণা-রূপে হোক, গোচর নয়, এমন কোনো সত্য থাকলেও সে নেই যতক্ষণ আমরা মানুষ আছি।

আইন্‌স্টাইন ॥ তা হলে দেখছি, আস্তিক্যবুদ্ধি তো আপনার থেকে আমারই বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমার ব্যক্তিসত্তাটি ব্যক্তি-অতীত মানবে, শাশ্বত মানবে মেলানো, এই নিয়েই আমার আস্তিক্যবুদ্ধি বা অধ্যাত্মবিশ্বাস। এইটেই আমি 'মানুষের ধর্ম' ব'লে ব্যাখ্যা করেছি।[১]

---

১ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেরই আগস্ট মাসে কবি ও বিজ্ঞানী উভয়ের আর একটি সাক্ষাৎকার ঘটে; সমসাময়িক *Asia* পত্রে সেই আলাপ-আলোচনার বিবরণ প্রকাশিত হয়। পর বৎসরে, ১৩৩৮ আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় উহার একটি বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপরিচয়

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল এম. এ. সম্পাদিত। বিশ্বভারতী। পৃ ৫৯৩। মূল্য পনর টাকা।

এইখানি সম্পূর্ণরূপে একখানি নূতন ধরণের বই হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬৫২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই শত বংসর ধরিয়া পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের কতকগুলি জেলায় প্রাপ্ত এইখানি প্রাচীন চিঠিপত্রের সংগ্রহ। ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকোণ এখন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। আগে ইতিহাস বলিলে আমরা রাজরাজড়ার কথাই বুঝিতাম, সনতারিখ যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধি-মিলন প্রভৃতি রাজাদের ব্যাপার লইয়াই ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস বলিলে কোনও একটি বিশেষ জনসমাজের সাধারণ মানবের সমষ্টিগত কাহিনীই বুঝি। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ইয়োরোপে নূতন করিয়া আসিয়াছে এবং সহজভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন ভারতের লোকেও মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝি। অবশ্য "ইতিহাস" শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত সংজ্ঞা এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুমোদিত সংজ্ঞা, এই দুইএর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য মৌলিক নহে। আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই নবীন আদর্শ আসিয়া যাওয়ায় কিছুকাল হইল স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ও ফকিরচন্দ্র দত্ত মহাশয় "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" নাম দিয়া বাঙ্গালাদেশের কয়েকটি প্রাচীন অভিজাত বংশের সম্বন্ধে প্রচলিত গালগল্পের সঙ্কলন করিয়া একটি সুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন কিন্তু তাহা ঠিকমত বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ছিল না। সেদিকে সচেতনভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার "বাঙ্গালীর ইতিহাস"এ। কিন্তু এই বই কতকগুলি সাহিত্যিক এবং প্রত্নলিপি সম্বন্ধীয় আধারের উপরে রচিত— ইহাতে ইতিহাস-সঙ্কলকের নিজের পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এই বই কেবল মুসলমানপূর্ব্ব যুগ লইয়া, এবং ইহাতে বঙ্গভাষী জাতির উৎপত্তি এবং তাহার প্রাথমিক যুগের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ও ধার্ম্মিক ইতিহাসের সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ আছে।

আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য অন্য ধরণের। ইহা পুরাতন বাঙ্গালার ঘরোয়া পত্রের একটি সঙ্কলন। সঙ্কলয়িতার উদ্দেশ্য— এই পত্রগুলি হইতেই তখনকার সমাজের নানা দিক এবং পত্রলেখকগণের মনের কথা আধুনিক বাঙ্গালার পাঠক জানিতে পারিবেন। এই ধরণের পত্রের সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে যে হয় নাই তাহা নহে। স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহাশয় *Types of Early Bengali Prose* নাম দিয়া কতকগুলি পুরাতন পত্র ও দলিলদস্তাবেজ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯২২)। কিন্তু তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার প্রগতি দেখানো। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ভারত সরকারের নথীপত্রের নয়া দিল্লীস্থিত মহাফেজখানার পুরাতন নথীপত্রের সঞ্চালক থাকাকালীন ঐ স্থানে রক্ষিত বাঙ্গালা ভাষায় লেখা অনেকগুলি চিঠিপত্র দলিল দরখাস্ত ইত্যাদির একটি লক্ষণীয় সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এই সংগ্রহ প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য— খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের

দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া উত্তর পূর্ব্ব ভারতের নানা রাজকীয় ঘটনার দিগ্‌দর্শন করা— এই সমস্ত ঘটনার পাত্র ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পূর্ব্ব ভারতের বিভিন্ন ছোট বড়ো রাজ্যের রাজা উজীর প্রভৃতি পরিচালকগণ; সাধারণ মানুষের কথা ইহাতে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত চিঠি diplomatic correspondence অর্থাৎ রাজনৈতিক পত্রব্যবহার পর্য্যায়ের, এইগুলি বিশেষ যত্ন করিয়া এবং হিসাব ' করিয়া লেখা— ঘরোয়া চিঠিপত্রের স্বাভাবিকতা এইরূপ পত্রে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" নাম দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্রের পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে যে সমস্ত ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে সেগুলির একটি অতি মনোজ্ঞ সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সে যুগের সমাজের একটি দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে, কিন্তু এহ বাহ্য। প্রস্তুত "চিঠিপত্রে সমাজচিত্র"-র মধ্যে আমরা যে ছবি পাই তাহার মস্ত বড়ো কথা হইতেছে যে সে ছবি যেন একেবারে ফটোগ্রাফের মতো সত্য অবস্থাকে ধরিয়া তুলিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে Letters বা পত্রলিখন একটি যেন সাহিত্যিক প্রকারভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক বড়ো বড়ো চিন্তাশীল লেখক "চিঠি" নাম দিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রবন্ধের মতো এবং প্রথম হইতেই সেগুলি সাহিত্যের পর্য্যায়েরই বস্তু। লেখক যেন তাঁহার ভবিষ্যৎ পাঠকদের দিকে আড়চোখে চাহিয়াই লিখিয়াছেন, কোথায়ও বা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদেরই মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু যেখানে সে উদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ পত্র লিখিত হয় নাই সেখানে সহজাত সারল্যের গুণে এইরূপ পত্র সকলের মনে একটা সাড়া জাগাইয়া তোলে। পঞ্চানন বাবুর সঙ্কলিত চিঠিগুলি এই ধরণের। যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা অতি সহজভাবে উপস্থিত তাগিদ মিটাইবার জন্যই লিখিয়াছেন—তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা হর্ষ-বিষাদ, ছোটখাট সাময়িক প্রয়োজন বা দীর্ঘস্থায়ী কায়েমী বন্দোবস্ত এ সমস্তই without reservation অর্থাৎ কোনও রকম সঙ্কোচ বা গোপন না করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। জীবনের কত দিকে মানুষ নিজের প্রকাশ করিয়া থাকে! তাহার ঘর স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় এবং তাহার বাহিরের সমাজ শিক্ষা ধর্ম্ম রাজদ্বার ব্যবসায় জমি জেরাৎ প্রভৃতি সব কিছুই তাহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার সব চিন্তায় ও কাজে জড়াইয়া আছে।— এই যে নিতান্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তি ও একাধারে সামাজিক মানুষ তাহারাই নিজেকে ধরা দিয়াছে এই সব চিঠিপত্রে। তাহারা একে একে নিজের কথা বলিয়াছে কিন্তু তাহাদের পারিপার্শ্বিকের হাওয়া এবং মনের ভিতরের হাওয়াও একসঙ্গেই এই সব চিঠির মধ্যে বহিতেছে।

সঙ্কলনকার মুখ্যতঃ সেই মানবিকতার এবং সামাজিকতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই চিঠিগুলি একত্র করিয়াছেন এবং এগুলিকে বিষয় ও সময় ধরিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মন অনেক সময় এক অদ্ভুত রসে আপ্লুত হয়। মানুষ তাহার নিজের মনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া যেমন খুসী হয় তেমনি অপ্রত্যাশিত অবস্থার পরিচয় পাইয়াও সে প্রীত-বিস্মিত হয়। এই সব চিঠির মধ্যে পুরাতন কালের মানুষকে তাহার স্বরূপে ঠিকমতো এবং অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় বলিয়াই এগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ হইয়া থাকে। পুরাতনের সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে সে দিনের ছোটখাট খুঁটিনাটি কথা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বব্রুর মনের দরদ দিয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন—বিশেষ সমীচীনতার সহিত সঙ্কলয়িতা সেই কবিতাটি তাঁহার পুস্তকের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আজিকার জীবনের যাহা তুচ্ছ অতি সাধারণ, তাহা কালপ্রভাবে বিশিষ্ট এক রূপ ধারণ করিয়া বসে—সময়ের গুণে সাধারণও অসাধারণত্বের পর্য্যায়ে গিয়া উঠে। বোধহয় কালের ব্যবধান সহজেই আপনা হইতেই এক প্রকারের সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করিয়া থাকে; রবীন্দ্রনাথের কথায়

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

সামান্য একটি উৎসবের ফর্দ্দ কিংবা কোনও বিবাহের জন্য পত্র কিংবা সামাজিক অভয় বা প্রতিকারপ্রার্থী কোনও ভীত নিপীড়িত ব্যক্তির কাতরতা, সংসারের নানা অভাব অভিযোগে মানুষের মনের বিতৃষ্ণা প্রভৃতি কত শত দৈনন্দিন ঘটনা আমাদের এ যুগের মতো তখনকার লোকদিগকে বিব্রত করিয়াছে, তাহার কথা এই চিঠিপত্রে পাইয়া আমরা যেন চোখের সামনে প্রাচীন জীবনের চলচ্চিত্র দেখিতে পাইতেছি। ইহার মধ্যে যে সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায় তাহা জীবনেরই প্রতিফলন বলিয়া উপন্যাস হইতে প্রাপ্ত রসের অনুরূপ।

প্রস্তুত খণ্ডে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু তাঁহার আলোচনার আধারস্বরূপ ছয় শত বত্রিশখানি চিঠি ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রস্তূয়মান প্রথম খণ্ডে এই সমস্ত পত্রের উল্লিখিত বিষয়বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা দিক হইতে বিচার বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইবে। তখন এই একনিষ্ঠ সাহিত্য ও ইতিহাসের সাধকের চোখে আমরা আড়াই শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের একটি তাঁহার স্বরচিত নিখুঁত বর্ণনা পাইব, যে বর্ণনাকে সঙ্কলনকার তাঁহার নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোক দ্বারা পূর্ণভাবে প্রকাশযুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। বইখানির ছাপা এবং বাহ্যসৌষ্ঠব সুন্দর এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এইরূপ মূল্যবান একখানি বই বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিতেছেন বলিয়া তিনি ও বিশ্বভারতী উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির অতলে—শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল। মিত্রালয়। মূল্য সাড়ে চার টাকা

পুরাতন প্রসঙ্গ মানুষ কখন লেখে কখন পড়ে, এই দুটি প্রশ্ন অবশ্য এক জাতের নয়। মানুষে পুরানো কাহিনী বলতে ও লিখতে চায় বার্ধক্যের আগমনে; এবং পড়তে ও শুনতে চায় প্রধানত শৈশবাবস্থায়, কিংবা যৌবনের প্রায় শেষে যেখানে সৃষ্টির অথবা মান সৃষ্টির একটা পরিমাণের প্রয়োজন ওঠে, যখন মূল্যসন্ধানের আবেগ তীব্র হয়। কিন্তু দুটি প্রশ্নের সহজ মিলন ঘটে যখন শিশুসুলভ কৌতূহল অতীত সম্বন্ধে আগ্রহকে অনুপ্রাণিত করে। সহজ মিলনের প্রক্রিয়া নিছক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নয়, ঠিক জ্ঞানস্পৃহাও নয়, মাত্র বিস্ময়। মিলনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আর প্রশ্নাকারে থাকে না, রূপান্তরিত হয়ে যায় সচকিত অনুভূতিতে, যার ফলে ক্ষেত্রটাও পরিণত হয় আবহাওয়াতে। ব্যাপারটা একটু রোম্যাণ্টিক ধরনের, কারণ রোম্যাণ্টিক মনোভাবের মূল কথাই হল বিস্ময়। এবং জার্মানিতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল তার প্রেরণা ছিল ঐ রোম্যাণ্টিক আদর্শেরই। অতএব পুরাতন কাহিনী কওয়া, লেখা, শোনা ও পড়ার মধ্যে ঐতিহাসিক আগ্রহেরই পরিচয় রয়েছে। এবং সেই জন্যই শ্রীঅমিয়নাথ

সান্ন্যাল যখন 'স্মৃতির অতলে' বইখানির ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে তিনি ইতিহাস লিখতে বসেন নি তখন মনে হয় যে তিনি অধ্যাপকীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস বিবেচনা করেছেন। যে শৈলী আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সমর্থ, এবং যে বাতাবরণ আমাদের অজানিতে পরম্পরা ও ঐতিহ্যের মূল্যকে সহজে অনুভূতিতে পরিবর্তিত করে, এই দুয়ের সমাবেশে যে কাহিনী তৈরি হয়, তাই হয় জনসাধারণের ইতিহাস, এবং সেই ইতিহাসই অমিয়নাথ লিখেছেন। সংগীত সম্বন্ধে এমন অপূর্ব কাহিনী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

অতটা ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও অমিয়নাথ-বর্ণিত পুরানো কাহিনীর সঙ্গে আমিও যুক্ত। অমিয়বাবু যে সব গায়ক-গায়িকার সম্বন্ধে লিখেছেন আমিও তাঁদের গানবাজনা শুনেছি, এবং প্রায়ই একই সময়ে প্রায় একই আসরে। ঐ ভেইয়া সাহেব, মৈজুদ্দিন, বসির, মীর্জা, বাদল খাঁ, গিরিজাবাবু, বিশ্বনাথ রাও, গহর, মল্‌কা, আবেদ আলি, ঐ ১০১ হ্যারিসন রোড, ঐ নাটোরের বাড়ি, সবই আমার পরিচিত। ফৈয়াজ খাঁকে প্রাণভরে শুনতে আরম্ভ করি ১৯২৩ সাল থেকে, এবং কালে খাঁর গান ঐ বছরেই মাত্র দুদিন শুনি লক্ষ্ণৌ-এ। অমিয় ছিলেন করিৎকর্মা। তাঁর গলায় ঠুংরির সূক্ষ্ম রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠত, আর এসরাজে তাঁর হাত ছিল অতি মধুর। লাচাও ঠুংরিতে অমিয় ছিলেন পোক্ত, আর আমার ঝোঁক ছিল ধ্রুপদ-ধামারের ওপর। তা ছাড়া, আমার অনুরাগ অন্যান্য বিষয়ে বিভক্ত হয়ে যায়; অমিয়র কেবল ডাক্তারিতে। সে যাই হোক, আমরা ছিলাম সমসাময়িক এবং সংগীতানুরাগী। উপভোগের ক্ষেত্রে যৎসামান্য পার্থক্য থাকলেও আমাদের মিলটাই ছিল প্রধান। আমরা উভয়েই একই যুগের লোক, একই পরিবেশে লালিত-পালিত। সেই জন্যই বোধহয় 'স্মৃতির অতলে' আমাকে যতটা নাড়া দিয়েছে ততটা সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে দেবে না।

আমার ব্যক্তিগত উপভোগের কথা ছেড়ে বইখানির কৃতিত্ব সম্বন্ধে গোটা কয়েক সাধারণ মন্তব্য করছি।

'স্মৃতির অতল' থেকে উদ্ধার করার বিপদ অনেক। সব সময় মোতি ওঠে না। মোতির বিচার হয় ডাঙায় ব'সে। অতএব অবচেতনার মধ্যেই তার বসবাস এ-কথা ভুল। স্মৃতি-উদ্ধারের মধ্যে নির্বাচনবুদ্ধি সক্রিয়। এইখানেই সুরুচির কথা ওঠে। বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শ্যামলালবাবু ও তাঁর গোষ্ঠীর রুচি মার্জিত হয়েছিল, সে-রুচির অংশীদার ছিলেন অমিয়। এই অর্জিত রুচিই অমিয়কে সাহায্য করেছে স্মৃতির অতল থেকে মৈজুদ্দিন, ফৈয়াজ, কালে খাঁ প্রভৃতির মতন মহাগুণীকে উদ্ধার করতে। হয়তো ফৈয়াজ খাঁর বেলায় উদ্ধার কথাটি প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি মাত্র সেদিন গত হয়েছেন, এবং এখনও আমাদের কানে তাঁর সুকণ্ঠের দরবারী আওয়াজ, তাঁর বোল-তানের কেরামতি, তাঁর ছন্দের দোলা অনুরণিত হচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা এখনও মুহ্যমান। কিন্তু মৈজুদ্দিন, কালে খাঁ এখন নাম মাত্র। অতএব তাঁদেরই বেলা উদ্ধার কথাটি খাটে। কিন্তু অমিয় মৈজুদ্দিন ও কালে খাঁর সম্বন্ধে অত উচ্ছ্বসিত কেন? তার কারণই হল অমিয়র রুচি। এই রুচির সাহায্যেই মৈজুদ্দিনের অশিক্ষিতপটুত্বকে প্রতিভা বলতে অমিয় দ্বিধা করেন নি। আমার যতদূর মনে পড়ে, ভাতখণ্ডেজী মাত্র দুজন গায়ক সম্বন্ধে বলতেন, 'ওঁদের কথা আলাদা'— এক মৈজুদ্দিন আর আবদুল করিম খাঁ। মৈজুদ্দিন (এবং আবদুল করিম খাঁ) ছিলেন নিয়মবহির্ভূত। তাঁদের সম্বন্ধে নিয়মসংগত বিচার চলত না। তাঁরা কখন কি ক'রে বসবেন, কখন আস্থায়ী ছেড়ে অন্তরা ধরবেন, কখন কোন্ স্বর প্রয়োগ করবেন, কখন কোন্ অদ্ভুত তান তুলবেন, কখন কি লয়কারি দেখাবেন, আগে থাকতে বিশেষজ্ঞ শ্রোতাও বলতে পারত না। অথচ তাঁদের গায়ন অরাজকতার নামান্তর ছিল না। রাগরূপকে লণ্ডভণ্ড তাঁরা নিশ্চয়ই করতেন না; রাগের নতুন রূপই দিতেন। মৈজুদ্দিনের ভৈরবী, টোড়ি, পুরিয়া-ধানশ্রী, তাঁর

নিজের সৃষ্টি ছিল। এই নিজস্বতা আমাদের চমক লাগাত; এবং অনেক সময়, বিস্ময়ের বশে গঠনপদ্ধতির ব্যতিক্রম মার্জনা করা অতি সহজেই সম্ভব হত। নসীরুদ্দিন খাঁ, রামকৃষ্ণ ওয়াজে, আল্লাদিয়া খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, মোস্তাক হোসেন, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার, বিলায়েৎ খাঁ, দলীপকুমার বেদী প্রভৃতির গায়ন-পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে পর-পর গড়ে তোলার চিহ্ন স্পষ্ট। যেন ধীরে ধীরে একটি প্রাসাদ গড়ে উঠছে। মৈজুদ্দিনের মধ্যে এই প্রকার architechtonic ছিল না। মনে হত জাদুবলে সে গন্ধর্বপুরী থেকে এক অপূর্ব হর্ম্য তুলে এনে সামনে রাখলে। আবদুল করিম খাঁর অ-নিয়ম একটু ভিন্ন প্রকারের ছিল। তিনি ধ্যানের সাহায্যে রূপ ফোটাতেন। যে নাটকীয় গুণ মৈজুদ্দিনের ছিল সেটি আবদুল করিমের ছিল না। তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব মঞ্চের নয়, বেদীর। তবু দুজনেই মহাগুণী। এই মহাগুণের আবিষ্কারে যে-রুচির প্রয়োজন সেটি শাস্ত্রসম্মত রুচি না হতে পারে, তবু সেটি মার্জিত ও অভ্রান্ত রুচি।

প্রমাণ বইখানির ছত্রে ছত্রে। অমিয় রাগরূপের বিচার করছেন না, সৃষ্টির অপূর্বতা, মনোহারিত্বেরই সমাদর সর্বদা করছেন। এটা তাঁর একপ্রকার আর্টিস্ট-মনের নিদর্শন। সে-প্রকারটিকে মোটামুটি রোম্যান্টিক বলা যায়। এবং এইটেই অমিয়র পক্ষে স্বাভাবিক। ঠুংরির প্রকৃতিই তাই। আমি তিলমাত্র নিন্দা করছি না, বরঞ্চ সুখ্যাতিই করছি। ঠুংরি শিক্ষা ও উপভোগের মধ্যে বিশেষ করে সৃষ্টির সাবলীলতার উপরই বেশি ঝোঁক পড়ে, যেটা ধ্রুপদ, ধামার এবং ধ্রুপদ-ঘেঁষা বিলম্বিত খেয়ালের মধ্যে পড়ে না। আর নজর পড়ে ব্যক্তিত্বের উপর। অবশ্য জাকরুদ্দিন, আলাবন্দে, নসীরুদ্দিন, রাধিকা গোঁসাই-এর আলাপ-ধ্রুপদ-ধামারেও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। কিন্তু সেটা নিতান্ত পরোক্ষভাবে। মৈজুদ্দিন ও ফৈয়াজ খাঁর ঠুংরি গানে ব্যক্তিত্ব ছিল নিতান্ত সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। সেইজন্য 'স্মৃতির অতলে' রাগরূপের অপেক্ষা রূপস্রষ্টাদেরই প্রতিকৃতি জাজ্বল্যমান। ভাতখণ্ডেজীর মুখেও পুরানো ওস্তাদের অনেক গল্প শুনেছি। একদিনের কথা মনে হচ্ছে। শেষ বয়সে তিনি প্রায় পুরোপুরি বধির হয়েছিলেন। বড় দুঃখ হত। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভালো গান শুনতে পান না বলে আফশোষ হয় না?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'মোটেই না। রোজ রাতে একটা-না-একটা রাগ আমার সামনে উপস্থিত হয়। কাল এল মঙ্গল রাগ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একজন মুসলমান ওস্তাদের মুখে শুনেছিলাম। তারপর জোর দু-একবার। কাল মঙ্গল রাগ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিমার মতন নিদ্রার মধ্যে আবির্ভূত হল।' এই বলে গম্ভীর কণ্ঠে মঙ্গল রাগটি গাইলেন। কথা ছিল না, সারগম ছিল না, ছিল মাত্র রাগের স্বররূপ। স্মৃতির আশ্রয়ে এই formal রূপ খোলে অন্য-ধর্মী আর্টিস্টের মনে। সে-মন অমিয়র নয় বোধ হয়। তাতে দুঃখ নেই মোটেই। যে-মন যে-রুচির পরিচয় তিনি দিয়েছেন সে-মন সে-রুচি এখন দুর্লভ। তার মতন গুণগ্রাহী শ্রোতা আমার বন্ধুদের মধ্যে নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর রুচির উদারতায় আমি চিরমুগ্ধ। তাঁর জ্ঞানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অমিয়নাথের সুরুচির আর-একটি প্রমাণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। যাঁরা evocative রচনা করেন তাঁদের মন্তব্যের মধ্যে একটা রায়-বিচার প্রায়ই গোপন থাকে। (বার্নার্ড শ'র বেলা সেটা নিতান্তই খোলাখুলি। তাঁর সংগীত ও অভিনয় সংক্রান্ত রচনা একই সঙ্গে evocative ও didactic)। অমিয় যখন কালে খাঁ, মৈজুদ্দিন সম্বন্ধে লিখেছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে যে এমনটি আর হয় নি, হবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজে এমন কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছেন না যে ঠুংরি মৈজুদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়েছে, এবং আর যেন কেউ ঠুংরি না গায়। এ-প্রকার ইঙ্গিত দিলে অস্বাভাবিক হত

না, আমাদের বয়সী লোকেরা হয়তো খুশীই হতেন। কিন্তু এ ইঙ্গিত তিনি দেন নি। না দেওয়াটা কেবল ভদ্ররুচির পরিচয় নয়, ঐতিহাসিক জ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি ইতিহাস লিখছেন না বললে কি হবে— তিনি যথার্থ ঐতিহাসিকের মতনই অভিব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। সংগীত, এমন কি ভারতীয় সংগীতও চলছে তিনি জানেন। তাঁর না জেনে উপায় ছিল না, কারণ তিনি নিজে ১০১ নম্বর হ্যারিসন রোডের সংগীত-বিপ্লবীদেরই একজন। ১৯১০ সাল থেকে বাংলা দেশে সংগীতে বিপ্লব এসেছিল ঠুংরি খেয়াল (ও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন প্রভৃতির রচনার) মাধ্যমে। অমিয়নাথ এই বিপ্লবের অংশীদার। (তাই তিনি রবীন্দ্র-সংগীতেরও ভক্ত)। অতএব স্মৃতির অতলে nostalga থাকলেও ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার ও ঔদার্যের চিহ্ন বর্তমান। তাঁর কাছে অতীত বর্তমানের বুকে বাসা বেঁধেছে— কলিংউডের ভাষায় incapsulated হয়েছে।

যে-বাসা সৃষ্টি হল সেটি আবহাওয়া। সৃষ্টির প্রক্রিয়া দুটি। এক আবেগময়, ভাবসম্পন্ন ভাষা। আমার এ-ভাষা পছন্দ নয়। সে ভাষার মধ্যে যে সব উর্দু বুখ্‌নি আছে সেগুলো আমার লক্ষ্ণৌ-কানে লাগে। তবে ঐ প্রকার উর্দু জবানই ঐ গোষ্ঠীতে প্রচলিত ছিল। গায়ন-পদ্ধতির উপভাষার বেলাও তাই। এই সব দোষ সত্বেও, এমন কি আমার মনে হয় অনেকটা এই সব দোষের জন্যই, আবহাওয়াটা অমিয়নাথ জমাতে পেরেছেন। ওস্তাদসমাজে অতিরঞ্জন ও ঠাট্টাতামাসা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, উর্দুর সঙ্গে, এমন কি ভুল উর্দুর সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের যোগ প্রায় অচ্ছেদ্য। আজকাল সে যোগ ছিন্ন হচ্ছে। আজকের দরবার মধ্যবিত্তের, অতএব দরবারী সংগীতের আসরে আজকাল উর্দু না বললেও চলে। উর্দুর এই feudal exclusiveness আবহাওয়া-সৃষ্টির পরিপন্থী। কিন্তু আজকালকার শ্রোতা ও পাঠকদের মনের উপর এই ধরনের প্রক্রিয়াটি কতটা সার্থক হবে জানি না। আমার কাছে যে হয়েছে তার কারণ অমিয়নাথের ও আমার স্মৃতির ভাণ্ডার প্রায় একই। দুই, ওস্তাদের ব্যক্তিগত স্বরূপ বর্ণনা, তাঁদের সম্পর্কে নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ। এই প্রক্রিয়া সব দিক দিয়ে যথাযথ। অবশ্য নিছক রাগরূপের আবহাওয়া সৃষ্টি করা তর্কের ক্ষেত্রে সম্ভব ; কিন্তু যখন আমাদের notation নেই, তখন প্রায় অসম্ভব। মৈজুদ্দিনের গাওয়া ভৈরবীর রূপ মৈজুদ্দিনের মাথার সাফা ও চোখের কাজল বাদ দিয়ে কেবল রে গা ধা নি-র আশ্রয়ে কি ভাবে ধরে দেওয়া যায় বুঝি না। মৈজুদ্দিনের প্রতিভা রহমত খাঁর পাগলামিতে ও জগদীশের জন্য ব্যাকুলতায় অতি সুন্দর ভাবেই ধরা পড়েছে। তেমনি ফৈয়াজ খাঁর বেলাতেও। গহরজানের সঙ্গে ব্যবহারে ফৈয়াজ খাঁর যে-ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়েছে সেই রাজকীয় আত্মপ্রতিষ্ঠাই ফৈয়াজ খাঁর টোড়ি, নটবেহাগ, দরবারীর প্রাণবস্তু ছিল। গহরের সঙ্গে 'নখাড়া' তাঁর পরজে, হোলিতে, গজলে পরিস্ফুট। এঁদের ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব। মৈজুদ্দিনের সামনে কোনো খেয়ালী-ধ্রুপদী গলা খুলতে সাহসী হতেন না আমি জানি। একতানেতেই সে পাকা গানের আসর ভেঙে দিতে পারত। আর ফৈয়াজের পার্সন্যালিটির কথা তো সকলেই জানেন। (কালে খাঁর গান আমি দুবার শুনেছি— অতএব তাঁর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে পারি না। তবে এখন সন্দেহ হয় যে ওস্তাদ একটু নেগেটিভ ধরনের লোক ছিলেন)। মোদ্দা কথা এই, অমিয়নাথ সংগীতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন প্রধানত ব্যক্তিত্ব-বর্ণনার মাধ্যমে। ব্যক্তিত্ব কেবল ওস্তাদবর্গের নয়, শ্যামলালবাবু, তনুবাবু, রাজাবাবু, দুনিচাঁদ, ননীবাবু প্রভৃতির মতন সংগীতানুরাগীদেরও। শ্যামলালবাবুর মধুর ও পবিত্র চরিত্রটি এই গোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছিল। অমিয়নাথ এই তথ্যকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। গহরজানের চটুলতা, মালকাজানের গাম্ভীর্য আমার চোখের

সামনে ভেসে উঠছে। গহরজানের সম্বন্ধে আরো কিছু লিখলে আমি খুশী হতাম। তাঁর মতন প্রতিভা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো বাইএর মধ্যে দেখি নি।

অমিয়নাথের কাছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে অনেক পুরানো কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে সব কথা অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের তলায় চাপা পড়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এই যে, তিনি সংগীতের মতন কলার, যাঁর স্মৃতি রেকর্ড ভিন্ন ধরে রাখা যায় না, সেই কলার একটি সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। তারিখের ভুল হয়তো দু-একটা আছে। কিন্তু তাতে আসে যায় না। অমিয়নাথ থিসিস্ লেখেন নি। 'স্মৃতির অতলে' যে সব মোতি পড়ে আছে সেগুলিকে উদ্ধার করে এবং নির্বাচন করে আমাদের সামনে রেখেছেন। বর্তমান যুগের পাঠক যদি সেগুলিকে মোতি বলে স্বীকার করেন তা হলেই অমিয়নাথ সার্থক হবেন, এবং আমিও কৃতজ্ঞ হব। আমার কৃতজ্ঞতার কারণ সহজ। আজকালকার সংগীত উপভোগের মান নেই মনে হয়। মৈজুদ্দিন, ফৈয়াজ, কালে খাঁর গায়ন-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানলে একটা মান পাওয়া যাবে আমার বিশ্বাস। যে-ব্যক্তি, যে-রচনা আমাকে স্ট্যাণ্ডার্ড স্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারি না।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি

সেই তো আমি চাই—
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা—
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই॥
এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি দু'হাত মেলি—
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই॥

কথা ও সুর॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি॥ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

II { সা -া রা। মজ্ঞা -রসা। রা -গা I মা -পা -া। -া -া। -া -া I
সে ই তো আ° °° মি ° চা ° ° ° °

I (মগা -া -মা। গমা -পমা। -জ্ঞরা -জ্ঞা)} I সা সা -রজ্ঞা। জ্ঞা -রা। জ্ঞা -া I
চা° ° ই রে° °° °° ° সা ধ °° না ° যে °

I জ্ঞা -রমা মজ্ঞা। রা -া। সা -া I সা সা -ণা। ধা -পা। মগা -রগা I
শে °ষ্ হ বে ° মো র্ সে ভা ব্ না ° তো° °°

I গা -মা -া। -া -া। -া -া I পধা -পা -র্সা। র্সণা -ধা। -পা -া II
না ° ° ° ° ° ই না° ° ই রে ° ° °

[র্সা র্সণা -ধপা]
II { মপা পা -া। পা -া। পা -ধা I না -া র্সা। র্রর্সা -না। র্সা -া I
ফ লে র্ ত ° রে ° ন য়্ তো খোঁ° ° জা °

I র্স জ্জা জ্জা -া । জ্জ র্রা -া । র্সাঃ -ণঃ I র্সর্রা র্র র্সা -া । ণা -ণধা । (ণা -ধর্রা)} I পমা -গমা I
কে ব ই বে ০ সে ০ বি০ ষ ম্ বো ০ ঝা ০ ০ ঝা০ ০ ০

I পা -র্সা র্স না । র্সা -না । র্সা -নর্রা I র্র র্সা র্স ণা -া । ধা -পা । মগা -মা I
যে ই ফ লে ০ ফ ০ ল্ ধু লা য়্ ফে ০ লে০ ০

I পণা ণা -া । ণধা -পা । মগা -রগা I গা -মা -া । -া -া । পা -ধা I
আ০ বা র্ ফু ল্ ফু০ ০০ টা ০ ০ ০ ই ফু ০

I পধা -পা -র্সা । র্স ণা -ধা । -পা -া II
টা০ ০ ই রে ০ ০ ০

II {সা -রজ্জা জ্জা । জ্জা -রা । মজ্জা -া I জ্জরা -মা মজ্জা । রা -া । সা -া I
এ ০ ম্ নি ক ০ রে ০ মো০ র্ জী ব ০ নে ০

I সা সা -ণা । ণধা -পা । মগা -রগা I গা মা -া । -া -া । -া -া I
অ সী ম্ ব্যা ০ কু০ ০০ ল তা ০ ০ ০ ০ ০

I মা -পা পা । পা -া । পা -া I পধা ধপা -মগা । গা -মা । মা -া I
নি ০ ত্য ন্ ০ ত ন্ সা০ ধ ০০ না ০ তে ০

I মা -গপা পমা । জ্জা -রা । সা -রজ্জা I জ্জরা সা -া । -া -া । -া -া } I
নি ০ ০ ত্য ন্ ০ ত ০ ন্ ব্য থা ০ ০ ০ ০

[র্র্সা ণা -ণধা]
I মপা পা -া । পা -া । পা -ধা I না নর্সা র্সা । র্র্সা -না । র্সা -া I
পে লে ই সে ৹ তো ৹ ফু রি৹ য়ে ফে৹ ৹ লি ৹

I র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞর্রা -া । র্সা -াণ I র্সর্রা র্র্সা -া । ণা -ধা । (ণা -ধর্রা)} I পমা -গমা I
আ বা র্ আ ৹ মি ৹ দু৹ হা ত্ মে ৹ লি ৹৹ ালে৹ ৹৹

I পা -র্সা না । র্সা -না । র্সা -নর্রা I র্র্সা র্সণা -া । পধা -পা । মগা -মা I
নি ৹ ত্য দে ও য়া ৹৹ ফু রা৹ য়্ না ৹ যে৹ ৹

I পা -ণা ণা । ণধা -পা । মগা -রগা I গা -মা -া । -া -া । -া -া I
নি ৹ ত্য নে ও য়া৹ ৹৹ তা ৹ ৹ ৹ ৹ ৹

I পধা -পা -র্সা । র্সণা -ধা । -পা -া II II
তা৹ ৹ ই রে ৹ ৹ ৹

দুর্গা   শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৬২

কুমুদিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী রাধারানী দেবীকে লিখিত পত্র

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্র-পরিষদে আমার লেখাসম্বন্ধে আলোচনা করবে শুনে খুব খুসি হলুম। "ঘরে বাইরে" বইখানির উপরে তুমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলে সেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েচে— ভালো লাগল— সে লেখার প্রশংসা অনেক গুণজ্ঞ লোকের মুখেই শুনেচি। ওর মধ্যে বিচারের গভীরতা আছে। এই ভাবে তুমি আমার অন্য গল্পগুলির যদি ব্যাখ্যা করো সাহিত্যে সেগুলি সুপথ্য হবে।

কুমুর আরো কিছু বিস্তারিত পরিচয় তুমি আমার কাছে শুনতে চাও। রচয়িতা সাহিত্যসৃষ্টির যে পরিচয় দেন সে সঙ্কলনের দ্বারা, বিচারক তার পরিচয় দেন বিকলনের দ্বারা। কুমুর জীবনের অনেক-কিছুকে এক করে তুলে তার সমগ্র ছবি খাড়া করা হয়েচে— এইটে হোলো আমার কাজ— তোমার কাজ হচ্চে সেই এককে অনেকের মধ্যে বিকীর্ণ করে তার পরিচয়টিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যাচাই করে নেওয়া। এই দুই বিপরীত কর্ত্তব্য আমাকে দিয়ে সমাধা করবার চেষ্টা করো কেন? তবু একটা গোড়াকার কথা তোমার লক্ষ্যগোচর করে দিই।

সেকালের বনেদীঘরের মধ্যে কুমুর জন্ম। বনেদীঘর সাধারণত আপন পাকা দেয়ালের মধ্যে আপন সাবেক কালকে বেষ্টন করে রাখে। সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে আপন আভিজাত্যরীতির দায়িত্ব প্রাণপণে স্বীকার করে, যে কোনো ব্যবহার তার কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কুলগৌরবের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্ব্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জ্জন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের বাইরে যে সব পরিবর্ত্তন দ্রুতবেগে ঘটচে তার মধ্যে আভিজাত্যের দায়িত্বগৌরব নেই— তাই তার ভাষায় ভাবে কামনায় কর্ম্মে ভ্রষ্টতার, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম বংশের সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে জন্মেচে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েচে কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসম্ভ্রমের একটা বাঁধা রীতি ছিল। কুমুর জন্ম তারই মধ্যে। বাইরের সমাজ যে কতই পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইয়ের স্নেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী— এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় তার স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল

হয়ে উঠেচে। যে-যৌবনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে অন্তরে নিজের অগোচরেও আকর্ষণ করেচে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠা করেচে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। সেই ঠাকুরকে সে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেচে। এমন কুমু্‌ আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন— স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্‌বে। হয়তো ভক্তির জোরে তাই হতে পারত— হয়ত স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে সে সোনা করে তুল্‌ত কিন্তু মধুসূদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে— এইখানেই ট্র্যাজেডি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আমলের কৃতী পুরুষ— ধন ও বাহ্য মান উপার্জ্জনে সিদ্ধিলাভেই তার একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্মানী ছিল কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাঁকে লিপ্ত হয়ে তাদের আত্মসম্ভ্রমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে ধনের গৌরবকেই সে সব চেয়ে বড়ো বলে দাম্ভিকতায় স্ফীত হয়েছিল— এমন অবস্থায় কুমু্‌ তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না— তাতে তার আত্মসম্মানে নিরতিশয় ঘা দিলে— এতবড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য— এ যেন দেবতার অবমাননা— নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হোলো। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই।

আমার একান্ত সময়াভাব। ইতি ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিধিরামের নির্বন্ধ

রাজশেখর বসু

নিধিরাম সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তাঁর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনায় তাঁর জীবনান্ত হল।

নিধিরাম সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। তাঁর মনে নিরন্তর সংশয় উঠত— সুরেন বাঁড়ুজ্যে না বিপিন পাল, বেঙ্গলী না ইংলিশম্যান—কার উপদেশ ভাল? গান্ধীজী না দেশবন্ধু, নেতাজী না পণ্ডিতজী—কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিস্ট আর সমাজতন্ত্রী দল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হয় নি। দেশের হিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে খেপান নি, ডাকাতি করেন নি, সুতো কাটেন নি, জেলে যান নি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে নৈরাশ্য আর চিন্তাবিষে জর্জর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর এক শাস্ত্রজ্ঞ বন্ধু বললেন, মরবেই তো, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। আর এক ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু বললেন, কেয়ার কিল্‌ড এ ক্যাট।

নিধিরাম পরলোকে এলে বিধাতা তাঁকে বললেন, বৎস, তুমি সন্দেহাকুল কর্মবিমুখ হলেও তোমার চরিত্রটি প্রায় নিষ্পাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এসেছ। কি আনন্দ ভোগ করতে চাও তা বল।

নিধিরাম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, যাতে রক্ষা পায় তাই করুন।

বিধাতা বললেন, তুমি দেখছি মরে গিয়েও ভববন্ধনে জড়িয়ে আছ। ওহে নিধিরাম, পৃথিবী নেই, তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়েছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিই তুমি।

—প্রভু, সলিপ্‌সিজ্‌ম আর অদ্বৈতবাদ আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি মরে গেলেও জগৎ থাকবে না কেন? সমস্ত পৃথিবীর ভাল যদি নাও করেন তবে অন্তত ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন।

—ভালই তো চিরকাল করে আসছি।

—তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, যা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা।

—ও, আমার লীলাখেলা তোমার পছন্দ নয়, তোমার ফরমাশী খেলা চাও? 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।'—এই তোমার আবদার? বেশ, তোমার দেশের কিরকম ভাল চাও তাই বল।

—মানুষ ভাল না হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, তারাই বাকী সবাইকে শোধরাতে পারবে।

—আচ্ছা, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো?

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে নিধিরাম বললেন, ওঁরা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—ভারতের সিকি লোক মানে ন কোটি। যদি ন কোটি ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য বা শ্রীরামকৃষ্ণের তুল্য হয়ে যায় তা হলে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো?

মাথা চুলকে নিধিরাম বললেন, ভগবান, ওঁরা যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশের চার আনা লোক যদি বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বারো আনা তাদের অনুসরণ করে তবে সংসার যে ছারখারে যাবে। আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংসারী সৎপুরুষ। ত্যাগী ভক্ত সন্ন্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে।

—উত্তম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তাঁর প্রচুর ছিল। যদি ভারতের ন কোটি লোক রবীন্দ্রনাথের তুল্য হয়ে যায় তা হলে খুশী হবে তো ?

নিধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রভু, এক শ বৎসরে যদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় তাতেই দেশ ধন্য হবে। কিন্তু যদি বিস্তর আসেন তবে আদি রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য যে খর্ব হবে, তাঁকে হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

—আচ্ছা, যদি ন কোটি মহাত্মা গান্ধীর মতন জ্ঞানী কর্মী জনহিতৈষীর আগমন হয় ?

—একই আপত্তি প্রভু। মহাত্মা গান্ধীকেও সস্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাধু অকর্মণ্য চোর ঘুষখোর বজ্জাত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার সচ্চরিত্র সাধারণ কাজের মানুষ। লোকোত্তর পুরুষ খুব কম হলেই চলবে।

—বুঝেছি, লোকোত্তর পুরুষের ইনফ্লেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের সিকি লোক জওহরলালের মতন হয়ে যায় তা হলে চলবে তো ?

একটু ভেবে নিধিরাম বললেন, নেহরুজী জ্ঞানী কর্মী দূরদর্শী জনহিতৈষী সৎপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমস্ত মন্ত্রী আর সরকারী আপিসের কর্তারা যদি তাঁর মতন হয়ে যায় তা হলে দেশের অশেষ মঙ্গল হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের উপযুক্ত কাজই দেশে নেই, তাঁদের দিয়ে তো মোটা কাজ করানো চলবে না।

—আচ্ছা যদি ন কোটি উদ্‌যোগী কর্মবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা হলে তোমার আশা মিটবে তো ?

—আপনি পরিহাস করছেন প্রভু। ন কোটি ব্যবসাদার কর্মবীরের স্থান কোথায় ? কার ধন নিয়ে তাঁরা ধনপতি হবেন ? অরণ্যের চার আনা পশু যদি বাঘ হয় আর বাকী বারো আনা যদি হরিণ হয় তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘরা না খেয়ে মরবে। আমার নিবেদনটি শুনুন। ন কোটি মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী, বা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বা রাজনীতিজ্ঞ সুশাসক হলে চলবে না। আর, ন কোটি ব্যবসায়ী ধনকুবের তো উপদ্রব স্বরূপ। নানারকম সাধারণ সচ্চরিত্র কর্মীরই দরকার — চাষী কারিগর শিল্পী বাস্তুকার যন্ত্রী বিজ্ঞানী শিক্ষক বিচারক পরিচালক কেরানী ইত্যাদি। তা ছাড়া অল্প গুটিকতক কলাবিৎ অর্থাৎ লিখিয়ে আঁকিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়েও চাই। লোকোত্তর পুরুষ কোটিতে এক-আধটি হলেই ঢের।

—তুমি যে রকম চাচ্ছ সে রকম কাজের লোক তো দেশে আছেই।

—কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিস্তর মূর্খ আর দুর্বৃত্ত লোক আছে, তারাই দেশের মঙ্গল হতে দিচ্ছে না।

—ওহে নিধিরাম, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেয়োখেয়ি মারামারি করে আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার পর কালক্রমে সুবুদ্ধি সৎপুরুষের আবির্ভাব হবে।

—তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এক্সপেরিমেণ্ট করতে পারেন, কিন্তু দেশের লোকের অত ধৈর্য নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাল মন্দ উপায় খুঁজছে। আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের সুপথে চালাতে পারেন।

—আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই। সৃষ্টি স্থিতি লয় ঘড়ির কাঁটার মতন যথানিয়মে হচ্ছে, জাগতিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না।

—ভগবান, বেশী কিছু তো চাচ্ছি না, লোকে যাতে অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল আর সমাজদ্রোহী না হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

—দেখ নিধিরাম, সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থার জন্যই তোমার দেশে চাতুর্বর্ণ্য স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এখন তার পরিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুমি যে রকম চাচ্ছ তা পাবে ইতর প্রাণীর মধ্যে, তারা কখনও স্বজাতির ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষ চিরকালই নিজের মতলবে চলে।

—প্রভু, যদি একজন জবরদস্ত অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলাক্রমে সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপন করতে পারবেন।

—তুমি কি মনে কর সিভিলিয়ানদের মতন একদল অবতার আমি পুষে রেখেছি আর তোমাদের দরকার হলেই পাঠাব? মানুষ মাত্রেই অবতার, কেউ কম, কেউ বেশী। জনসমাজের অল্পাধিক মঙ্গল যে করতে পারে সেই অবতার। তোমারও সেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার জন্মগ্রহণ করে তোমার জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার।

—আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রভু? আমার কথা শুনবেই বা কে?

—বুড়োরা না শুনুক, তারা আর কদিনই বা বাঁচবে। ছেলেরা শুনতে পারে, তারা এখনও ঝানু হয়ে যায় নি।

—হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না!

—শোনো নিধিরাম। ছেলেরা বুড়োদের কথা না শুনুক, সমবয়সীদের কথা শুনতে পারে। তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিস্মর না হলেও তোমার সদিচ্ছার সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর যুবকদের তুমি সুমন্ত্রণা দিও।

—আমি একটি মন্ত্রণাই জানি,— আগে বিনয় ও শিক্ষা, তার পর কর্মপথ।

—বেশ তো, ওই মন্ত্রণাই দিও।

—আমার কথায় কেউ যদি কান না দেয়?

—তোমার চাইতে যাঁরা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো, তাতেই তোমার জন্ম সার্থক হবে। এক বারে কিছু করতে না পারলে বার বার অবতরণ ক'রো। যদি অনন্ত কালেও কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষতি হবে না।

অল্‌-বীরূনী ও সংস্কৃত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবু রয়্‌হান মুহম্মদ ইব্‌ন্‌ অহ্‌মদ অল্‌-বীরূনী (অথবা অল্‌-বেরোনী) ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক খীরা রাজ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের গজনী নগরে ১০৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে খীরা রাজ্যের নাম ছিল খ্বারিজ়্‌ম্‌, এবং প্রাচীনকালে গ্রীকেরা এই দেশকে Chorasmia 'খোরাস্মিয়া' বলিত। অল্‌-বীরূনী মধ্যযুগের এক অতি বিরাট্‌ পণ্ডিত বলিয়া সুপরিচিত। এই বহু-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত একাধারে গণিত এবং ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিষ এবং দর্শন, রসায়ন এবং ঐতিহাসিক কাল-নির্ধারণ, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব, ও চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় তাবৎ বিদ্যায় সমান-ভাবে পারদর্শী ছিলেন। উপরন্তু তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ভারত-বিদ্যাবিৎ ছিলেন, এবং তাঁহার মতো ভারত-সম্বন্ধে এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশীদের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একদিকে ছিল তাঁহার সর্বগ্রাহী এবং সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্য, আর অন্যদিকে ছিল তাঁহার এক প্রশস্ত উদারতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা; এই উভয়বিধ গুণের জন্য, অল্‌-বীরূনীকে সমগ্র মানবজাতির প্রমুখ বা শ্রেষ্ঠ চিন্তানেতাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। বিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত Edward Sachau এডুয়ার্ড জ়াখাউ, যিনি অল্‌-বীরূনীর দুইটী মুখ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নিকট আধুনিক জগৎ অল্‌-বীরূনীর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় পুস্তকের আরবী-ভাষার মূল এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের জন্য বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ থাকিবে, তিনি (এডুয়ার্ড জ়াখাউ) অল্‌-বীরূনীর পাণ্ডিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবত্তা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহার গুণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। (মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডন হইতে, এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে)। জ়াখাউ পণ্ডিত এবং মানুষ হিসাবে অল্‌-বীরূনীর কৃতির যে শ্রদ্ধোজ্জ্বল প্রশস্তি করিয়াছেন, সে প্রশস্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই প্রাপ্য; এবং উপরন্তু, ধীর বাচংযমতার জন্য যে প্রশস্তি সকলেরই মনে প্রভাব আনয়ন করে, তাহা—এবং সর্বোপরি, অল্‌-বীরূনীর গ্রন্থের স্বকীয় মূল্যবত্তা—এই সকল মিলিয়া, অল্‌-বীরূনীর আসনকে স্থাপিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। অল্‌-বীরূনী, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, আরও বেশি করিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষের প্রথম বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার-রূপে দেখা দেন। মনে হইতেছে যে, এখন এতদিন পরে অল্‌-বীরূনী তাঁহার উচিত সমাদর লাভ করিবেন; কারণ তাঁহার তিরোধানের প্রায় ৯০০ বৎসর পরে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার পণ্ডিতসমাজ তাঁহার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে পারিসে যে একবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে "অল্‌-বীরূনী সহস্রবার্ষিকী" উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল, এবং তাহার পরে কলিকাতায় ইরান-সমিতির উদ্‌যোগে অল্‌-বীরূনী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যদিও অল্‌-বীরূনীর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল ইহারই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি নিছক পণ্ডিত ছাড়া আরও বড়ো ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়ধর্মী মানুষ;

তাঁহার নিজের বিশিষ্ট ধর্মবিচার ও আস্থা, সম্পূর্ণ অন্য বাতাবরণের মধ্যে যাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে এমন অন্য একটী জনসমাজের সভ্যতাবিষয়ক কৃতিত্বকে কখনো ক্ষুণ্ণ করিতে অথবা হেয় প্রতিপন্ন করিতে দেয় নাই। সার-সত্যকে কেবল নিজেরই আয়ত্ত বলিয়া মনে করা, এবং অন্য ধর্ম-মতকে সেই একই সত্যের সন্ধানে সহযাত্রী-রূপে দেখিয়া সহানুভূতির সহিত তাহাদের আলোচনা এবং প্রণিধান পক্ষে প্রায়ই যাহা অনুকূল নহে, এইরূপ বিশেষ-শাস্ত্র-নিবদ্ধ গোঁড়া-মতের ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অল্‌-বীরূনীর মন বিশেষ লক্ষণীয়-ভাবে মুক্ত ছিল। সত্য বটে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অল্‌-বীরূনীর পুস্তকের সম্পূর্ণ আরবী নামকরণ একজন গোঁড়া মুসলমান-ধর্মে-বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকোণ হইতে হইয়াছিল যথা—"যাহা স্বীকার্য্য এবং যাহা বর্জনীয় এইরূপ উভয়বিধ বস্তু লইয়া হিন্দুচিন্তার সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ের এক যথাযথ বর্ণনা" (কিতাব…ফী তহ্‌কীক মা-ল্‌-হিন্দ মিন্‌ মক্‌লূহ্‌ মুক্‌বূলহ্‌ ফী-ল্‌-'অক্‌ল্‌ অরি মিরধুলহ্‌), তথাপি এই পুস্তক বাগ্‌বিতণ্ডাময় অথবা প্রচার-মূলক নহে, এবং বিশেষ একটী দৃষ্টিকোণকে অন্য সমস্ত দৃষ্টিকোণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে নাই। হিন্দুরা ঐ সময়ে জীবনসংগ্রামে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের নিকট হারিয়া যাইতেছিল, এবং সেইজন্য বাহির হইতে আগত একজন বিশ্বাসী মুসলমান ও উপরন্তু পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার মনে যে হিন্দুদের তুলনায়, স্বজাতির সম্বন্ধে একটী সহজবোধ্য শ্রেষ্ঠতার ভাব থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; এইজন্য ইনি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এবং সহজভাবে একথা ধরিয়াই লইয়াছেন যে তাঁহার ইসলামী মনোভাব, হিন্দু মনোভাব অপেক্ষা আরও অধিক আন্তর্জাতিক এবং যুক্তিতর্কানুমোদিত বলিয়া, উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই বোধ সত্ত্বেও, তিনি মানদণ্ড সমান করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু-জগতে যে সমস্ত বস্তু এবং বিচার, অনুষ্ঠান এবং ভাবধারা, বৈজ্ঞানিক ও সহজবুদ্ধির মানুষ বলিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করে নাই, তিনি সেগুলিকে কেবল "বিধর্মী বা কাফেরের পশুপ্রকৃতিক আচার-প্রণালী" বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার লেখা পড়িয়া মনে হয় যে, এই-সব বিষয়ে হিন্দুরা অতি সাধারণ মানবের মতোই ছিল, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন; এবং পৃথিবীর অন্য অংশের মানবসমাজের মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ বিষয় বা বস্তুর নজির সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে তিনি সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন—যেমন প্রাচীন গ্রীকদের অথবা প্রাচীন আরবদের মধ্য হইতে। তাঁহার আরবী গ্রন্থের মুসলমান পাঠকবৃন্দ যদি ভারতবর্ষের লোকেদের সম্বন্ধে ঘৃণা বা তুচ্ছতার ভাব পোষণ করিতে আগ্রহশীল হইত, সেই আগ্রহ এই উপায়ে তিনি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-পূত মনের উপযুক্ত এই পৃথক্‌ বা ঊর্ধ্বে অবস্থান অথবা নির্বৈয়ক্তিকতা, ধর্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত অথবা জাতি-সংক্রান্ত কোনো পক্ষপাতিতা যাহাতে নাই, অল্‌-বীরূনীর মনে সেই গুণ থাকার দরুন, ভারতের হিন্দু আমাদের তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং এই জন্য সমগ্র বিজ্ঞান-অনুশীলক পণ্ডিতসমাজের উচিত তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। মানবিকতার দিক্‌ হইতে বিচার করিলে, অল্‌-বীরূনীর এই দৃষ্টিভঙ্গী, নিছক পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আরও অধিক মহার্ঘ্য বস্তু।

তাঁহার সময়ে অল্‌-বীরূনী ছিলেন একজন অদ্ভুত দৃষ্টির পণ্ডিত। যখন তিনি তাঁহার মানসিক জীবনের পূর্ণ এবং পরিণত কালে বিদ্যমান ছিলেন, ধরা যাউক আনুমানিক ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৯০০ বৎসরেরও অধিককাল আগে, তখন নিঃসন্দেহ-রূপে তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বিদ্বান্‌ এবং সকলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বন্ধর পণ্ডিত ছিলেন। চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে সেই সেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ

পণ্ডিতদের দৃষ্টি কেবল চীন অথবা ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল; এই দুই দেশের এমন কেহ ছিলেন না যাঁহার মনে পশ্চিমের অর্থাৎ ইসলামিক জগতের—তথা প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের—বিরাট্ সভ্যতার সম্বন্ধে অল্পমাত্র ধারণারও অবকাশ ছিল। ওদিকে ইটালিকে ধরিয়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে ঐ যুগ ছিল এক অন্ধকারময় যুগ—তখন পশ্চিম-ইউরোপে লাতিন ভাষার মাধ্যমে একটু খ্রীষ্টান ধর্মের জ্ঞান, এবং প্রাচীন লাতিন লেখকদের দুই চারিখানি পুস্তক যাহার পাঠ অল্প কয়জন উৎসাহী পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত, এইটুকুই ছিল বিদ্যার পরিধি। পূর্ব-ইউরোপে খ্রীষ্টান গ্রীক অর্থাৎ Byzantine বা বিজান্তীয় পণ্ডিতদের মধ্যেও তেমনি আরব ও অন্য প্রাচ্যদেশীয় জাতির সাহিত্য অথবা সংস্কৃতির সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। মুসলমান আরব সাম্রাজ্য, সিরিয়া, মিসর, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন ও সিসিলি-দ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হইল। অল্-বীরূনীর মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতা অসাধারণ-ভাবে দেখা দেয়। তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ফারসী; কিন্তু তুর্কীভাষী খারিজ্‌ম্ দেশের মানুষ ছিলেন তিনি, এবং পরে তিনি গজ্‌নী নগরের তুর্কীভাষী অভিজাত সমাজে বিচরণ করিতেন, এইজন্য তুর্কীভাষাও তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাঁহার মতন জিজ্ঞাসু এবং সর্ববিষয়ে রসগ্রহণেচ্ছু পণ্ডিতের পক্ষে এই দুই ভাষায় যতটুকু সাহিত্য হাতের কাছে তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, এমন অনুমান করা যায়। আরবী ভাষা তখন ছিল সমগ্র ইসলামিক জগতের ধর্মশাস্ত্র এবং সংস্কৃতির ভাষা; এবং এই আরবী তিনি খুব ভালো রকমই জানিতেন—ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখকগণের মধ্যে ইংরেজীর জ্ঞান যতটা গভীর ও ব্যাপক রূপে দেখা যায়, অল্-বীরূনীর আরবীর জ্ঞান অন্ততঃ ততটা ছিল, ইহা অনুমান করা যায়; সম্ভবতঃ তাঁহার আরবীর জ্ঞান আরও গভীর ছিল। এই আরবী ভাষাতে অনুবাদ পাঠ করিয়া, প্রাচীন গ্রীক এবং বিজান্তীয় বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান গ্রীক, তথা সিরিয়ান, জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটার,—এবং উপরন্তু গণিতে ও জ্যোতিষ-বিদ্যায় ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার একটা বড়ো অংশের—সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। বগদাদ-নগরে আরবের ইসলাম সভ্যতার দ্বিতীয় যুগ হইতে, আরবী ভাষা, আরবদেশের আশ-পাশের দেশগুলিতে প্রাচীনতর যে-সমস্ত সভ্যতা ছিল, সেগুলির সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অল্-বীরূনী প্লাতোন Plato এবং অরিস্তোতল Aristotle-এর লেখা হইতে তাঁহাদের বক্তব্য উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন; এই প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গ্রন্থের সঙ্গে, সিরিয়ান ভাষায় অনুবাদের আরবী অনুবাদ হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই ভাবে দুই হাত ঘুরিয়া আসিলেও, তিনি মূল দার্শনিকগণের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্য এবং উপযোগিতা ভালো ভাবেই বুঝিতেন। এদিকে আবার তিনি সমান পরিচয় ও জ্ঞানের সহিত কপিল এবং ব্যাস হইতে, বরাহমিহির হইতে, সংস্কৃত পুরাণসমূহ হইতে উদ্ধার করিতেছেন; এবং আরও বড়ো কথা এই যে, এই ভারতীয় লেখকগণের মূল ভাষা তিনি জানিতেন—এবং এইরূপ জ্ঞান তাঁহার স্বজাতির মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০-এর দিকে, ভারতীয় হিন্দু, আরব-ইরানীয় এবং তুরানীয় অর্থাৎ তুর্কী-সমেত সমগ্র ইসলামীয়, এবং উপরন্তু সোজাসুজি গ্রীকের মারফৎ না হইলেও প্রাচীন গ্রীসের—এতগুলি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্য জগতের সহিত তুল্য পরিচয় রাখা, সহজ ব্যাপার নহে; এবং যতদূর জানা যায়, সমগ্র সভ্য জগতে এইরূপ পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন মাত্র ছিলেন—তিনি ছিলেন অল্-বীরূনী।

যে রাজার অধীনে অল্-বীরূনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, তাঁহার ৪৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৮ বৎসর পর্যন্ত—

বাস করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মহামহিম গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ; এবং কতগুলি রাজনীতিক ঘটনা-পরম্পরার কারণে, এই রাজার পক্ষে অল্‌-বীরূনীর একজন বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, যদিও এইরূপ পৃষ্ঠপোষক হওয়া তাঁহার উচিত ছিল। কেন যে এইটী হয় নাই, তাহার কারণাবলী জ্‌.থাউ বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহ্‌মূদের দরবারে, মহ্‌মূদের শত্রুপক্ষীয় অন্য রাজ্যের প্রতিভূ বা জামিন হিসাবে অল্‌-বীরূনী আসিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য নিশ্চয়ই সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত, কিন্তু রাজনীতিক কারণে তিনি উপযুক্ত সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত ছিলেন। গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ এক অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন; এবং, অন্ধবিশ্বাস-পূর্ণ ধার্মিক আগ্রহ তথা ধনরত্ন-লুণ্ঠনের উগ্র প্রবৃত্তি, এই উভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি অভিযান চালাইয়াছিলেন, যে অভিযান-সমূহের দ্বারা তিনি প্রতিবেশী হিন্দুগণের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তিনি বধ করেন, এবং দাস করিয়া ধরিয়া লইয়া যান, এবং বহু নগর, মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করেন, ও কোটি কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া যান। এই সকল অভিযানের ফলে, হিন্দু জনসমূহের মনে মহ্‌মূদ ও তাঁহার তুর্কী সেনার প্রতি কোনো অনুকূল বা মিত্রতার ভাব আসিবার সম্ভাবনা ছিল না; এবং হিন্দুদের মধ্যে "তুর্ক" এই নামটী, ভয়ের এবং ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়ানো স্বাভাবিক ছিল। ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে মহ্‌মূদ তাঁহার সাম্রাজ্যে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশ সংযুক্ত করিয়া লইলেন। এইভাবে, যদিও দেশের অধিবাসী প্রায় সকলেই হিন্দু ছিল, একজন মুসলমান রাজার অধীনে আসায় এই দেশ এক "শান্তির দেশ" (দারু-স্‌-সলাম) হইয়া দাঁড়াইল, যেখানে মুসলমান ধর্মের প্রসার অবাধে বাড়িতে লাগিল, এবং যে দেশে সিপাহি হোউক অথবা পণ্ডিত হোউক, যে-কোনো মুসলমানের অবাধ চলাফেরা সহজ হইল। এইরূপ অবস্থা অল্‌-বীরূনীর পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল—তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এবং সেখানে অবস্থান করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ পাইলেন। ইহার পূর্বে, জ্যোতিষ এবং গণিতের আলোচক-রূপে এই দুই বিজ্ঞানের বিষয়ে হিন্দুদের লেখা বই যাহা আরবী অনুবাদের মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহাই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাধ্য হইয়া তাঁহার নিজের দেশ খ্বারিজ্‌মের জামিন-রূপে ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাকে গজনীতে থাকিতে হইল। তখনই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সোজাসুজি জ্ঞান-অর্জনের সুযোগ তাঁহার জুটিল। ঐ সময়ে গজনী নগরী ছিল এশিয়াখণ্ডে অন্যতম বিশাল মুসলমান রাজ্যের কেন্দ্র; এবং মহ্‌মূদের মতো শক্তিশালী ও কৃতকর্মা শাসকের রাজধানী বিধায়, নিঃসন্দেহরূপে অস্তিক-প্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয়ার সমস্ত অংশ হইতে লোকে গজনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিত; এবং গজনীর নানাজাতীয় জনসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষেরও অভাব ছিল না। বহু ভারতীয় সৈন্য ও শিল্পী রাজা-রাজড়া ও পণ্ডিতলোক গজনীতে যুদ্ধবন্দী-রূপে ছিলেন; এবং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ভাগ্যে হয়তো ভারতবর্ষে আবার ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁহাদের ফিরিয়া যাওয়া ঘটিলেও, ভারতবর্ষে ঐ যুগে সাধারণ হিন্দুজনগণের এতদূর মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিয়াছিল যে, তাহারা নিজেরা কোনো ক্রমে তুর্কীদের নিকট হইতে বহুদূরে থাকা অথবা অন্য কারণে বাঁচিয়া গেলেও, এই-সমস্ত হিন্দু [illegible] বিদেশী ম্লেচ্ছ তুর্কীদের মধ্যে বাস করা তাহাদের পক্ষে অনপনেয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, এবং স্বসমাজে এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব ছিল। এ ছাড়া, আফগানিস্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাস করিত এমন হিন্দু প্রজা ছিল, যাহারা ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মতো মূলোৎখাত হয়

নাই; এবং মুসলমান তুর্কী শাসনের প্রথম যুগে এই হিন্দু প্রজাগণ, নিজের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। অনুমান করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধবন্দী এবং আফগানিস্থানের হিন্দু প্রজা, এই উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইরূপ সুবুদ্ধি লোক নিশ্চয়ই মিলিত, যাহারা তাহাদের ধর্ম এবং চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতিশীল তুর্কী রাজার জাতির একজন বিশিষ্ট এবং সম্মানিত পণ্ডিতের আগ্রহ মধ্যে দেখিয়া খুশীই হইত। সম্ভবতঃ গজনীতে বসিয়াই অল্-বীরূনী ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চর্চা আরম্ভ করিয়া দেন, এবং গজনীতে তিনি সংস্কৃত এবং পশ্চিম পঞ্জাবের কথ্যভাষা (যাহা সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল) শিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন। পঞ্জাবে তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের কোনো-কোনো স্থানে গিয়াছিলেন, এবং এইসব স্থানে তিনি ব্রাহ্মণ এবং অন্য পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবে। ঐ সময়েই মূলতান-নগরী হিন্দুদের একটী প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীরা মূলতানের সূর্য্যমন্দিরে আসিত, এবং এরূপ একটী তীর্থস্থানে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম অর্ধ ধরিয়া সংস্কৃত জ্ঞানের চর্চা কিছুটা থাকা সম্ভব ছিল। অল্-বীরূনী মূলতানে হয়তো কিছুকাল অবস্থান করিয়া থাকিবেন।

অল্-বীরূনীর সংস্কৃতের জ্ঞান কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে জ.খাউ তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু ইহা কার্য্যকর ছিল; এবং Charles Wilkins ও William Jones-এর সময় হইতে, ভারতে বসিয়া যে-সমস্ত ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ গবেষণার কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের মতো অল্-বীরূনীও সম্ভবতঃ শাস্ত্রী বা পণ্ডিতের সহায়তা লইয়াই কার্য্য করিতেন। অনুমান হয়, অল্-বীরূনী তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য্যের জন্য বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ সহায়ক বা সহকর্মীর উপর নির্ভর করিতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ পণ্ডিতগণ, যে-সমস্ত গ্রন্থপাঠ তাঁহার আবশ্যক ছিল সেগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতেন—এই অনুবাদ, উভয় পক্ষের পরিচিত কোনো ভাষাতেই নিশ্চয়ই হইত, এবং সেই ভাষা নিশ্চয় ছিল, হয় পশ্চিম-পঞ্জাবের কথ্য ভাষা যাহা অল্-বীরূনী কিছুটা শিখিয়া লইয়াছিলেন, অথবা ফারসী ভাষা। ইহাই তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের প্রধান আধার ছিল। তবে তিনি নিজেও এইরূপ অনুবাদের অথবা ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়া কিছুটা সংস্কৃত শিখিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত বই পড়িয়া থাকিবেন, এবং এই সকল অনুবাদের আধারে তিনি ফারসী বা আরবীতে তাঁহার মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কথিত আছে যে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতে কতগুলি পুস্তক অনুবাদ বা রচনা করেন, এবং এ ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন—বিষয়-বস্তু বা আশয় মুখে-মুখে শুনিয়া এই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত শ্লোকে অল্-বীরূনীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। জ.খাউ সংস্কৃত ভাষায় অল্-বীরূনীর কৃতিত্বের অতি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত মূলের সহিত তাঁহার আরবী অনুবাদ মিলাইয়া অল্-বীরূনীর কৃতিত্ব কত দূর এবং তাঁহার বিদ্যার সীমা কত দূর ছিল, তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান্ জর্মান পণ্ডিত, যিনি একাধারে অদ্ভুতভাবে আরবী এবং সংস্কৃত দুইটীই দখলে আনিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ আলোচনা কম কথা নহে।

ইরানের ইতিহাসে, সাসানীয় সম্রাট্দের যুগে (২২১-৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) খানকয়েক সংস্কৃত পুস্তক মধ্যযুগের ফারসী ভাষা পহ্লবীতে অনূদিত হইয়াছিল। পরে এই-সব বই পশ্চিমের ভাষা সিরিয়ান, আরবী ও গ্রীকে পহ্লবী হইতে অনূদিত হয়। আরব মুসলমান আব্বাস-বংশীয় খলীফা বা রাজাদের রাজত্বকালে বগদাদ নগরে

আরবী ভাষায় যে গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, সেই অনুবাদ এই-সকল সাসানী অনুবাদের ধারা অনুসরণ করিয়াই হয়। ভারতবর্ষের চিন্তার ইরান ও পশ্চিম-এশিয়াতে প্রচারের এই ধারা, গ্রীকদের যুগ এবং তার আগেও গিয়া পৌঁছায়। কমপক্ষে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক হইতে কতগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসী (ইঁহারা প্রায়ই সকলেই ভবঘুরে'-প্রকৃতিক ছিলেন এবং বিপদ্‌কে ইঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না—এই ধরণের ভ্রমণশীল পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী এখনও মাঝে-মাঝে দেখা দেন) পশ্চিমের দেশসমূহে পর্য্যটন করিতে যাইতেন এবং গ্রীস পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেন। ইঁহারা বিদেশে রসজ্ঞ এবং সমানধর্ম্মা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিতেন, এবং আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাপারে ইঁহারা নিজেদের বিচার-ধারা প্রচার করিতেন। এইরূপ অন্ততঃ একজন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা গ্রীক-সাহিত্যে আমরা পাই, ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৪০০-এর পূর্বে আথেন্স-নগরীতে গিয়াছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিক সোক্রাতেস্ Sokrates-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্সান্দর Alexander ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে কালানোস্ Kalauos অর্থাৎ "কল্যাণ" নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে নিজের সঙ্গে লইয়া যান, কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পর্য্যন্ত যান, এবং সেখানে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং অন্তিক-প্রাচ্যের কতকগুলি দেশে ভিক্ষু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন—সিরিয়াতে, ম্যাসিডনে, এপিরসে, মিসরে এবং উত্তর-আফ্রিকায় কিরেনে বা সাইরিনি দেশে। সম্ভবতঃ এই-সকল ব্যক্তি ভারতীয় দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে মৌখিক উপদেশ দিতেন, এবং এই উপদেশেরই আধারে গ্রীক এবং সিরিয়ান জগতের জিজ্ঞাসুরা ভারতীয় চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে অল্প-কিছু সংবাদ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই-সকল পণ্ডিত, প্রাচীন পারসীক, সিরিয়ান অথবা গ্রীক প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষায় সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ অথবা রূপান্তরিত করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই; এইরূপ কোনো বই থাকিলেও তাহা টিঁকিয়া যাইতে পারে নাই, এবং এই প্রকারের কোনো বইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায় নাই। ইহার পরে কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে যখন ইরানে পরাক্রান্ত সাসানীয় রাজবংশ, ভারতবর্ষে ইহার সমসাময়িক আর্য্যাবর্তের গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্য সাম্রাজ্যের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে, তখন হইতে পহ্লবী ভাষায় রীতিমত ভাবে ভারতীয় গ্রন্থসমূহের অনুবাদ, সাসানীয় রাজাদের আনুকূল্যে হইতে থাকে। (ইতিপূর্বে অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায় মধ্য-এশিয়ার ইরানী ভাষায়—প্রাচীন খোতনী ভাষায় এবং চুলিক বা সোগ্‌দীয় Sogdian ভাষায়—বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ-কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রভাব ইরানের মধ্যে, বিশেষতঃ রাজদরবারে, তেমন করিয়া আসিতে পারে নাই)। বিরাট্ এবং শক্তিশালী সাসানীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরবের দিনে, ইরান-দেশে মানসিক এবং সাহিত্যিক পুনর্জ্জাগৃতি আরম্ভ হইয়াছিল; এবং ঠিক সেই সময়েই একদিকে গ্রীক ও সিরিয়ান ভাষা হইতে যেমন চিকিৎসা ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানের ও দর্শনের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদ হইতে থাকে, তেমনি অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের পুস্তকও অনূদিত হইতে আরম্ভ করে। পহ্লবী গ্রন্থ Dīn-kart দেন-কর্ত্ হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে গ্রীস হইতে দার্শনিক বা পণ্ডিত (pat Hrōm filisōkfāy অর্থাৎ রোম বা বিজান্তিয়ম হইতে আগত দার্শনিক) সুপ্রাচীন গ্রীস বা হেল্লাস্-এর এবং অর্বাচীন রোমান-প্রভাবিত বিজান্তীয় গ্রীসের বিদ্যা (Yonāyik এবং Hromāyik অর্থাৎ যোন বা যবন বা প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় বা অর্বাচীন গ্রীক—এইভাবে সাসানীয়

যুগে ইরানীয়গণ গ্রীকবিদ্যায় এই পরম্পরা নির্দিষ্ট করিয়াছেন) ইরান-দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, ও এই উপায়ে ইরানের মন ও ইহার সাহিত্য, এই উভয়কে, তাঁহাদের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। অনুরূপ ভারতীয় বিদ্বদ্‌গণ (pat Hindūkān dānāk) সাসানীয় রাজাদের সভায় তাঁহাদের গুণের এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের আদর প্রাপ্ত হন, এবং কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদের কথা আমরা জানিতে পারি। (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, H. W. Bailey কৃত বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ Zoroastrian Problems in Ninth Century Books—Ratanbai Katrak Lectures, Oxford, 1943, পৃষ্ঠা ৮০-৮৬।) এই-সমস্ত বইয়ের মধ্যে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান (Kalatak u Damnak অর্থাৎ করটক ও দমনক, পঞ্চতন্ত্রে উল্লিখিত এই দুই বৃষের কাহিনী) পাওয়া যায়, এবং trk' অর্থাৎ তর্ক-শাস্ত্রের বইয়ের অনুবাদের কথা জানা যায়। যে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত ঐ যুগে ইরান-দেশে আসা-যাওয়া করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ইরানের বাতাবরণ প্রতিকূল ছিল না—ইরান-দেশের তখনকার দিনের জ়রথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম এবং তাহার অগ্নি-প্রতীকের মাধ্যমে উপাসনা, ভারতীয় হিন্দু অভিজ্ঞতার বা আচারের সঙ্গে খাপ খাইত। সাসানীয় যুগে হিন্দুদের মধ্যে ছুৎমার্গের এত বাড়াবাড়ি হয় নাই, এবং আর্য্য এবং ম্লেচ্ছ, জাতিভেদ ও জাতিনাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা মুসলমানদের আগমনের পরে যতটা কঠোর হইয়াছিল, তখনও ততটা কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; এবং এইজন্য অনুমান হয় যে, ঐ সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতেরা সহজে ইরানে যাইতেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজে ঠেকা হইয়া থাকিতেন না। আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের জন্মের দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে ইরানীয় Magos নামধারী পুরোহিতগণ, ভারতবর্ষে নূতন করিয়া "মিহির" নামে সূর্য্যদেবের পূজা লইয়া আসেন, এবং তাঁহারা হিন্দুসমাজে "মগ-ব্রাহ্মণ" বা "শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত হন। ("মিহির" শব্দটী পহ্লবী Mihr-এরই ভারতীয় রূপ, সংস্কৃত "মিত্র" = অবেস্তা "মিথ্র", এবং ইহা হইতে পহ্লবী Mihr।) খ্রীষ্টপূর্ব কালে প্রাচীন যুগে এ-বিষয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আরও উদার ছিলেন। কিন্তু ইরান-দেশে ইসলামের মতো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, যে ধর্ম অন্য কোনো জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি বা সমন্বয়ের ভাব রাখিত না এবং ইসলাম-বহির্ভূত প্রায় তাবৎ ধর্ম ও মতবাদকে "কাফের" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের ধর্ম বলিয়া বর্ণনা করিত—তখন ইরানের অবস্থা অন্য প্রকারের হইয়া দাঁড়াইল। যে স্বল্পসংখ্যক সংস্কৃতজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিত বগদাদ-এর মত মুসলমান-বহুল স্থানে যাইতেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা সেইখানেই থাকিয়া যাইতেন; এবং আমরা এইরূপ ভারতবাসীর ইসলাম-ধর্ম গ্রহণের কথাও পাঠ করি। ইহা হইতে মনে হয় যে, যাঁহারা কোনো ক্রমে ইরাকের মত মুসলমান দেশে গিয়া পৌছিতেন, দেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বসমাজে তাঁহাদের পুনর্গৃহীত হওয়ায় বাধা ঘটিত। বিশেষতঃ যখন সে সময়ে হিন্দুভারত, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান তুর্ক ও ইরানীর সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। গজনী-নগর ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায়, এবং অল্‌-বীরূনীর মতো জিজ্ঞাসু পণ্ডিতের পক্ষে তাঁহাকে হিন্দু জ্ঞান ও বিচার ধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পাওয়া সহজ হওয়ায়, এই ইরানীয় মহাপণ্ডিত, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে, নিজে মুসলমান থাকা সত্ত্বেও এবং সেই হেতু হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও, হিন্দু বিজ্ঞান ও দর্শনের রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অল্‌-বীরূনী তাঁহার গ্রন্থে কুত্রাপি "সংস্কৃত" এই শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি একবারও "প্রাকৃত" ও

"অপভ্রংশ" শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। মধ্যযুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল, এবং যাহা আজ পর্য্যন্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যমান আছে যে, সংস্কৃত এবং কথ্যভাষাগুলি বস্তুতঃ পৃথক্ ভাষা নয়, পরন্তু একই আর্য্য বা সংস্কৃত ভাষার দুই বিভিন্ন "পাঠ" বা রূপ, অল্-বীরূনীও অনুরূপ মত মানিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ধ্বনি বা উচ্চারণগত পরিবর্তন আনয়ন করিয়া ও "সুপ্‌তিঙ্" ও বিভিন্ন প্রত্যয়ে এবং ব্যবহৃত শব্দে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আনয়ন করিয়া, প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষাকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা সহজ ছিল; এবং ইহার বিপরীতও অনুরূপভাবে সহজ ছিল। অল্-বীরূনীর মৃত্যুর শত বৎসরের মধ্যে, উত্তর ভারতে—সম্ভবতঃ কাশীতে—বসিয়া, লোকভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য দামোদর পণ্ডিত নামে এক আচার্য্য "উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ" আখ্যা দিয়া যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন: যেমন "কৃতপ্রায়শ্চিত্তা পতিতা ব্রাহ্মণী পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরাইয়া পায়", সেইভাবে প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার শব্দ ও রূপ সংস্কৃতে পুনরায় উন্নীত হইতে পারে। ঐ যুগে যেরূপ লোক-ব্যবহার ছিল, তদনুসারে শুদ্ধ ব্যাকরণানুগত সংস্কৃত, এবং লোকভাষার প্রয়োগ অনুসারে বিকৃত সংস্কৃত, ইহাদের মধ্যে পূরা পার্থক্য অল্-বীরূনী রক্ষা করেন নাই। স্থানে-স্থানে তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত রূপের পরিবর্তে অথবা সঙ্গে-সঙ্গে প্রাকৃত বা ভাষার রূপও দিয়াছেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ সম্বন্ধে আবার তিনি সব সময়ে অবহিত হন নাই। তাঁহার উচ্চারণে বিভিন্ন দেশের রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। ইহার একটা কারণ ইহা হইতে পারে যে, তিনি যে-সকল সংস্কৃত-জানা লেখক অথবা সহকর্মীর সহযোগিতা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হয়তো এক-ই প্রকারের সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে জ়াখাউ নিজেই এ কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক ইঁহারা ছিলেন।

প্রশ্ন এই, এই-সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রধানতঃ ভারতের কোন্ অংশের লোক ছিলেন? জ়াখাউ অল্-বীরূনীর পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃত ও অন্য ভারতীয় নাম ও শব্দের সূচী দিয়াছেন—মূল গ্রন্থের আরবী লিপিতে লিখিত রূপ, এবং সেগুলির মূল সংস্কৃত রূপ, উভয়ই। সে যুগে যে কুফী ছাঁদের আরবী লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহা নানা বিষয়ে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, অল্-বীরূনী এই অসম্পূর্ণ লিপির সাহায্যে সংস্কৃত শব্দের যে প্রতিলিখন দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে পশ্চিম পঞ্জাবের সংস্কৃত এবং স্থানীয় লোকভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আবিষ্কার করা যায়।

অল্-বীরূনীর প্রতিলিখন বা প্রত্যক্ষর হইতে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণের হদিস আমরা পাই। তাঁহার প্রদত্ত শব্দগুলি হইতে আমরা বিশেষ এক স্থানের উচ্চারণের প্রমাণ পাই না—শুধু পশ্চিম পঞ্জাবের অথবা মধ্যদেশ অথবা অন্তর্বেদের উচ্চারণ ইহা নয়, কিন্তু ইহার মুখ্য আধার হইতেছে—সংস্কৃত বানানের অনুসারী এক প্রকার উচ্চারণ, যাহা সংস্কৃতের লিপির সঙ্গে এবং লিপির প্রত্যেকটী বর্ণের সাধারণ সর্বজন-গৃহীত উচ্চারণের সহিত পরিচিত কোনো সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশীর প্রত্যক্ষর-করণের চেষ্টা, এবং এই বিদেশী বিভিন্ন প্রকার প্রান্তীয় উচ্চারণের ধারা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিফ-হাল ছিলেন না। সাকল্যে ২৫০০-এরও অধিক ভারতীয় শব্দ অল্-বীরূনীর বইয়ে আরবী লিপিতে লেখা পাওয়া যায়। এই সকল প্রত্যক্ষরীকরণে দুই দিক্ দিয়া ভুল-চুকের পথ মিলে। এক তো কুফী ছাঁদে আরবী লিপির একান্ত অসম্পূর্ণতা; এবং দ্বিতীয়, Shefer শেফর পুঁথি, যেখানিতে অল্-বীরূনীর ভারতবর্ষ-বিষয়ক গ্রন্থ রক্ষিত আছে, সেটী অল্-বীরূনীর নিজের হাতের লেখা পুঁথির ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা প্রতিলিপি হওয়া সত্ত্বেও (খ্রীষ্টীয় ১০৩১ সালের প্রথমে অল্-বীরূনী নিজের লেখা

সমাপ্ত করেন), নকল-নবিশ সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত অপরিচিত থাকার দরুন, মূল পুঁথির অসম্পূর্ণ প্রত্যক্ষরে আরও ভুল-ভ্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। আজকালকার প্রচলিত আরবী (এবং ফারসী) লিপিতে নোক্তা বা বিন্দু দিয়া বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য প্রকাশিত হয়; যেমন, একই অক্ষরে তলায় একটী বিন্দু দিলে "ব", তিনটী বিন্দু দিলে "প", এবং উপরে দুইটী দিলে "ত"। তদ্রূপ আরও একটী বর্ণে বিন্দু না দিয়া যথাযথ লিখিলে ":হ"-ধ্বনি, উপরে একটী বিন্দু দিলে উষ্ম "খ", নীচে একটী বিন্দু দিলে "জ", ও তিনটী বিন্দু দিলে "চ"; তেমনি এই নোক্তার ব্যবহারের দ্বারা "দ" এবং উষ্ম "ধ", তথা "শ" এবং "স"— ইহাদের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অল্-বীরূনীর সময়ে প্রচলিত কুফী ছাঁদের আরবী লিপিতে এইরূপ নোক্তা বা বিন্দুর ব্যবহার বিরল থাকায়, বিদেশী নামের পাঠ অতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়— যেমন পর পর লিখিত অক্ষর তিনটী, "হবস্" পড়া যায়, আবার "জসন্"-ও পড়া যায়। অল্-বীরূনী, যতদূর এই Schefer শেফর পুঁথি বইতে দেখা যায়, নোক্তা ব্যবহারের দ্বারা ও অন্য চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করিবার একটী প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, তিনি "প", "চ", "ত", "গ" প্রভৃতি কতগুলি ধ্বনির যথাযথ প্রতিলিখন সম্বন্ধে তেমন অবহিত হন নাই, এবং ভারতীয় ভাষার মহাপ্রাণ "খ", "ঘ", "থ", "ধ" প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লন নাই। তিনি সাধারণতঃ আমাদের ভারতীয় মহাপ্রাণ "ধ"-এর জন্য আরবী "ধ.াল" বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ এই আরবী বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী this, then, bathe প্রভৃতি শব্দের th বা dh-এর মতো উষ্ম "ধ"-কারের উচ্চারণ। অল্-বীরূনী, কি ভাবে আরবী লিপিতে বিশিষ্ট ভারতীয় মূর্দ্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির নির্দেশ করা যায়, তাহার পথ খুঁজিয়া পান নাই। সেইজন্য তিনি "ট", "ড"-এর জন্য "ত", "দ" ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যেখানে শব্দের অভ্যন্তরে অবস্থিত "ড"-অক্ষর "ড়"-এর মতো উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি "র" ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন, krb = "কুড়ব়", by'ry = "ব্র্যাডি", drwr = "দ্রবিড", drmr = "দ্রমিড", n'ry = "নাড়ী", byrwrj = "বৈডূর্য", ইত্যাদি।*

অল্-বীরূনী কিন্তু মূর্ধন্য "ণ"-এর সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন, কারণ এই ধ্বনি এখনও পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাবে— কি পশ্চিম-পঞ্জাবে কি পূর্ব-পঞ্জাবে— ও সিন্ধু-প্রদেশে প্রচলিত আছে, এবং উপরন্তু ইরানী-গোত্রের অন্তর্গত পষ্‌তো ভাষাতেও ইহা বিদ্যমান। কখনো-কখনো অল্-বীরূনী আরবী লিপিতে n+r বা r+n ব্যবহার করিয়া এই "ণ"-এর ধ্বনি বিশেষ করিয়া জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; যেমন p'nrn = "পাণিনি" (দুই এক স্থলে এই শব্দ ভুলক্রমে p'nrt লিখিতও হইয়াছে) এবং brnj = "বণিজ্, ব়ণিজ্"; এবং কখনো-কখনো তিনি সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়া দন্ত্য "ন" স্থানে মূর্ধন্য "ণ"-এর প্রতিলিখন করিয়াছেন— যেমন bh'nr, bh'r = "ভাণু", আবার bh'n, bh'nw = "ভানু"। সংস্কৃত শব্দের হ্রস্ব বা দীর্ঘ

---

* আলোচনার সুবিধার জন্য আমি এখানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আরবী লিপির রোমান প্রতিলিখন অনুসরণ করিতেছি—মূল আরবীতে যেমন "হরকৎ" অর্থাৎ স্বরচিহ্ন সাধারণতঃ দেওয়া হয় না, এই প্রতিলিখনেও তদ্রূপ স্বরবর্ণ দেওয়া যাইতেছে না: ' = "অলিফ", বা "অলিফ হমজ়া"; b = "বা (বে)"; t = "তা (তে)", θ = "থা (বা সে)", j = "জীম", c = "চে", h: = ":হা (বা বড়ী-হে)", x = "খ়া (বা খে়)", δ = "ধ়াল (বা জ়াল)", z' = "ঝে়", s' = "শীন্", s: = "স্বাদ (বা সোআদ)", d: = "দ্বাদ (বা জো়আদ)", t: = "ত্বা (বা তোএ)", δ: = "ধ্বা (জো়এ)", ' = "অয়ন্", w = "ৱাৱ (ওআও)", y = "য়া"।

ধ্বনি উভয়ই নিতান্ত অবহেলার সহিতই নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, এবং বহুস্থলে হ্রস্ব স্বরধ্বনি দেখানোই হয় নাই যেমন b'r = "বারু"।

অল্‌-বীরূনী তাঁহার প্রতিলিখনে বা প্রত্যক্ষরে সাধারণতঃ যে উচ্চারণ অনুসরণ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা যাইতেছে। তিনি প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত অন্তঃস্থ "ব়"-এর স্থলে b-, -b-, -b লিখিয়াছেন ; শব্দের আদিতে কখনও w = "ব়" লিখেন নাই, এবং এবং অতি অল্প কয়েকবার ব়-ফলা স্থলে অথবা শব্দের মধ্যে অবস্থিত "ব়"-এর জন্য w লিখিয়াছেন। ব-ফলা বহুস্থলে আরবী প্রত্যক্ষরে প্রদর্শিত হয় নাই, এবং ইহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রাকৃত বা ভাষার অনুসারে উচ্চারণ ধরিয়া লিখিয়াছেন, যে উচ্চারণে ব-ফলা দ্বারা পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব-ভাব আসিয়া যায় ও ব-ফলার উচ্চারণ হয় না। অল্‌-বীরূনীর প্রতিলিখনে "ব" = "ব়"-এর নিদর্শন— blnb = "বিলম্ব়িন্", 'bykt = "অব়্যক্ত", blbh = "ব়লভী", prd অর্থাৎ brd = "বৃদ্ধি", prk অর্থাৎ brk = "বৃক", brn = "ব়র্ণ" ও "ব়রুণ", bds' = "ব়িদিশা", b'lmyk = "ব়াল্মীকি", b'mn = "ব়ামন", b'ndw = p'ndw = "পাণ্ডব়", plb = "প্লব়", byn অর্থাৎ byd-by'as = "ব়েদব়্যাস", t'mrbrn = "তাম্রব়র্ণ" ; s'wyt = "শ্বেত", bywswt = "ব়ৈব়স্বত" ; drs'dbd = "দৃষদ্ব়তী", rb = "রব়ি", k'b = "কাব়্য", ইত্যাদি। সংস্কৃত "সরস্বতী" শব্দ দুই ভাবে লিখিত হইয়াছে—srst এবং srsft ; এবং "ব়ৈশ্বানর" শব্দের প্রতিলিখন হইয়াছে bys'f'nr, এবং "নন্দিকেশ্বর"-স্থানে লিখিত হইয়াছে nndks'yfr, অর্থাৎ nndkys'fr। এইখানে "শ্ব" ও "স্ব"-তে যে অন্তস্থ "ব়", "ব"-ফলা রূপে আসিতেছে, তাহার "f"-রূপে উচ্চারণ আমরা দেখিতেছি— অর্থাৎ অঘোষ উষ্ম "শ" ও "স"-এর প্রভাবে পড়িয়া, অন্তস্থ "ব়" = v, অঘোষ f-তে পরিবর্তিত হইত। ইহা একটু লক্ষণীয় ব্যাপার যে অল্‌-বীরূনী গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া অন্তস্থঃ ব়-কার (w, v) স্থানে বর্গীয়-ব (b) লিখিয়াছেন। পঞ্জাবে ও সিন্ধু প্রদেশে কিন্তু প্রায় সর্বত্রই অন্তঃস্থ "ব়", "ব়"-ই রহিয়া গিয়াছে (v, w), ইহা বর্গীয় "ব" অর্থাৎ b-তে পরিবর্তিত হয় নাই। অল্‌-বীরূনী কেন এইরূপ করিলেন ? তাঁহার মনে কি এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের উচ্চারণ অপেক্ষা গাঙ্গেয় উপত্যকার উচ্চারণ আরও প্রামাণ্য ছিল ? অথবা তিনি এমন কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এই বর্গীয় ব-উচ্চারণই (b-ই) শুনিয়াছিলেন, যাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল ? ইউরোপীয় ভাষার দন্তৌষ্ঠ ধ্বনি v-এর নির্দেশের জন্য মিসর-দেশে ও অন্যত্র আজকাল তিনটী নোক্তা-দেওয়া "ফা" বা "ফে" অক্ষর প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, এবং অল্‌-বীরূনীর পুঁথিতে এই বিশেষ বর্ণটীও দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা myv'r = "মেব়াড়"।

মধ্যযুগের ভারতে, ঠিক কখন তাহা আমরা জানি না, কিন্তু সম্ভবতঃ আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, যখন উত্তর ভারতের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া পশ্চিমী বা শৌরসেনী অপভ্রংশ সাহিত্যের ভাষা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তখন সংস্কৃতের মূর্দ্ধন্য "ষ"-এর "খ"-উচ্চারণ ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই উচ্চারণ এতই সাধারণ হইয়া দাঁড়ায় যে, বহু স্থলে উত্তর ভারতে লেখায় "খ"-বর্ণটীর ব্যবহার হইত না, মূর্দ্ধন্য "ষ" দিয়াই "খ"-এর কাজ চালানো হইত। পঞ্জাবের গুরুমুখী লিপিতে দেবনাগরী মূর্দ্ধন্য "ষ"-ই, "খ"-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই উচ্চারণ অতি সাধারণ থাকার দরুন, শাহ-জাহানের পুত্র রাজকুমার দারা শিকোহ যখন ফারসী ভাষায় সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদ করেন, তখন সেই অনুবাদ ফারসীতে "উপনিখত" ('pnkht) রূপেই লিখিত হয়। কিন্তু অল্‌-বীরূনী সাধারণতঃ সংস্কৃত মূর্দ্ধন্য "ষ"-এর জন্যও s'-ই ব্যবহার করিয়াছেন ;

এবং "খ"-এর উচ্চারণ ধরিয়া আরবী লিপির "x" এবং "k"="kh"-ও, অতি অল্প কয়েক স্থানেই ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন skht="শিষ্যহিত" (উচ্চারণে "শিখ্যহিত"); এবং "নিষধ" শব্দ nxδh="নিখধ" এবং ns'δ="নিষধ" এই দুই প্রকার উচ্চারণ ধরিয়া দুইভাবে লিখিত হইয়াছে; তদ্রূপ 's'ryxyn="শ্রীষেণ" ("শ্রীখেণ"), ghwk="ঘোষ" অর্থাৎ "ঘোখ"; bxw="ৱিষুৱ" (উচ্চারণে "বিখুৱ")। দর্শনীয়, pxkl'wt="পুষ্কলাবতী", pxkr="পুষ্কর"; এইরূপ বানান হইতে বুঝা যায় যে, অল্-বীরূনী মূর্ধন্য-"ষ" এর বিশুদ্ধ প্রাচীন উচ্চারণ (অর্বাচীন "খ"-উচ্চারণ নহে) প্রদর্শন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে সংস্কৃতের তালব্য-"শ" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া দন্ত্য "স"-এ পরিবর্তিত হইয়া যায়, এবং সংস্কৃত তৎসম শব্দেও এই উচ্চারণ সংক্রামিত হয়। কিন্তু অল্-বীরূনী মূল সংস্কৃতের তালব্য "শ"-এর উচ্চারণ বহু স্থলে s' অর্থাৎ "শীন্" অক্ষর দিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একথা মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দী, পঞ্জাবী, লহন্দী (বা হিন্দকী) এবং সিন্ধী প্রভৃতি ভাষায়, তদ্ভব শব্দে মূল মূর্ধন্য "ষ", "খ" হয় নাই,— দন্ত্য "স" হইয়া গিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আদি-আর্য্য-ভাষার বা সংস্কৃতের "শ", "ষ", "স" প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া সর্বত্র দন্ত্য "স" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবে ও সিন্ধের ভাষায় এই দন্ত্য "স"-এর স্থলে আমরা পাই "হ"; যেমন সংস্কৃতে "ৱিংশতি", "ৱিংশ"=হিন্দী "বীস" (bīs), কিন্তু পঞ্জাবী "ৱীহ্" (wīh); সংস্কৃত "দেশ"=হিন্দী "দেস্", সিন্ধী "ডেহু"; সংস্কৃত "স্নুষা"=মারাঠী "সুন্", পঞ্জাবী "নুহ্"; সংস্কৃত "আষাঢ়"=হিন্দী "অসাঢ়", পঞ্জাবী "হাড়"; সংস্কৃত "ত্রাস"=পঞ্জাবী "ত্রাহ"; ইত্যাদি। অল্-বীরূনীর প্রত্যক্ষরীকরণে তালব্য "শ" ও মূর্ধন্য "ষ"-স্থানে s' অর্থাৎ "শীন" অক্ষর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: k's'y="কাশী", k'ys'b=k's'yb="কাশ্যপ"; ts'=তিষ্য; bbs', bhbs'="ভবিষ্য", bh'rθbrs'="ভারথর্ষ" ("ভারতবর্ষ" স্থলে); ks'yr="ক্ষীর"; ks'knd="কিষ্কিন্ধ্যা"; ks'="কুশ"; k's't="কাষ্ঠা"; s'nk="শঙ্খ"; s'ntn="শান্তনু"; s'ys'="শেষ"; s'ylst'pt="শৈলসুতাপতি"; s'kt="শক্তি"; s's'lks'="শশিলক্ষ"; s's'="শিষ্য"; s'str="শাস্ত্র"; s'q="শক"; s'krb'r="শুক্রবার"; 's'="ইষু", "আশা"; s'r'bn="শ্রাৱণ"; s'rw="শরভ, শরৱ"; s'j=s'c="শুচি"; ইত্যাদি, ইত্যাদি। কতকগুলি অদ্ভুত বানান পাইতেছি, যেমন tkrs'l="তক্ষশীলা"; pywrn="পয়োষ্ণী; 'rt="অষ্ট", m'nsrtg="মাংসাষ্টক"; pwr'rtk="পূরাষ্টক"—এই শব্দগুলিতে s' স্থলে r পাইতেছি. ইহার কারণ ঠিক বুঝা যাইতেছে না; সম্ভবতঃ ইহা মূর্ধন্য "ষ"-এর বিকারজাত কোন ঘোষবৎ উষ্ম ধ্বনি নির্দেশ করিবার চেষ্টায় হইয়া থাকিবে—s' (sh)-এর স্থলে z' (zh)-এর মতন ধ্বনি, এবং এই ধ্বনি সহজেই r বা "র"-এর মতো শুনাইতে পারে। কতকগুলি স্থানে তালব্য "শ" এবং মূর্ধন্য "ষ", উভয়ের জন্য s "সীন" অক্ষর অর্থাৎ দন্ত্য "স" লিখিত হইয়াছে; জ.খাউ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ অনবধানতা-বশতঃ ইহা হইয়া থাকিবে। nixrb= "নিখর্ব"—এখানে সংস্কৃত অঘোষ মহাপ্রাণ "খ" স্থলে অঘোষ উষ্ম x-ধ্বনি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওদিকে যেমন সংস্কৃত অন্তঃস্থ "ৱ"-এর বর্গীয় "ব"=b-র উচ্চারণ পাইতেছি, সেইরূপ এদিকে অন্তঃস্থ "য়"-র (y-এর) বর্গীয় "জ"=j-উচ্চারণ তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা লোকভাষার উচ্চারণের অনুসারী, এবং অল্-বীরূনী সাধারণতঃ এই বর্গীয় "জ" উচ্চারণ-ই মানিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টান্ত—jbn, j'wn="য়ৱন"; j'njblk="য়াজ্ঞবল্ক"; j'm="য়াম্য"; j'dw="য়াদৱ"; 'jwdhh="অয়োধ্যা"; jnjw, jnjwy=

"*জণ্ণোঈ" (সংস্কৃত "যজ্ঞোপবীত" শব্দের পুরাতন পঞ্জাবী রূপ); 'rjbhr—"আর্যভট" (উচ্চারণে "আর্জভড়"); 'rj'prt অর্থাৎ 'rj'brt, ও 'rj'vrt—"আর্য্যাবর্ত"; jδs'tr—"যুধিষ্ঠির"; jm—"যম"; 'rjk—"আর্য্যক"; 'rjm—"অর্য্যমা"; jwz'n—"যোজন"; 'jrd'—"আয়ুর্দা"; jwg—"যুগ"; 'j'rj—'c'rj—"আচার্য"; njwt, nywtn—"নিযুত"; p'rz'tr—"পারিয়াত্র"; srjw—"সরযু", srw—"সররূ" ("সরযূ" নামের প্রাকৃত রূপ); srj't—"শর্যাতি"। সংস্কৃত "সহ্য" পর্বতের নাম sj রূপে লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ অল্‌-বীরূনী বাঙ্গালার মতো "সজ্ঝ" এই প্রাকৃত উচ্চারণ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন।

অল্‌-বীরূনী সংস্কৃত "জ্ঞ" এই সংযুক্ত বর্ণের প্রচলিত ভাষায় উচ্চারণ "গ্যঁ" অথবা "গ্য" শুনিয়াছিলেন, এবং এই উচ্চারণ এখন প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত, ও দক্ষিণ-ভারতেও বহুস্থানে প্রসার লাভ করিয়াছে। তিনি "যজ্ঞ" শব্দ jgnu রূপে লিখিয়াছেন, এবং "যাজ্ঞবল্ক্য" শব্দ j'njblk এবং j'gbnlk এই উভয় পদ্ধতিতেই লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি সংস্কৃত "জ্ঞ"—"জ্ঞ" স্থলে nj লিখিয়াছেন, এবং একস্থানে s'n অর্থাৎ "শ্‌ন্‌"-ও লিখিয়াছেন, s'nh—সংস্কৃত "জ্ঞ"। বহু স্থানে তিনি "ত"—t স্থানে "দ"—d প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমন—mds, mts—"মৎস্য" (উপরন্তু এই শব্দের প্রাকৃত "মচ্ছ" রূপও ধরিয়াছেন এবং এই রূপটীর জন্য mj অর্থাৎ mc লিখিয়াছেন); 'dr—"অত্রি" এবং "অদ্রি", উপরন্তু "অত্রি"-র জন্য 't:r রূপও তিনি দিয়াছেন; 'dby—"আটব্য (আডব্য)"; bds—bts—"বৎস" ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি হইতে এবং তদ্‌বিষয়ে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহাতে, কোন্‌ রীতি অনুসারে অল্‌-বীরূনী তাঁহার সময়ের প্রচলিত কুফী লিপিতে সংস্কৃত শব্দ ধরিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধান করা যাইবে। আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় আছে, সেগুলি ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণের ধারা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরবী লিখন-প্রণালী, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিচার করিয়া ধরিতে হইবে। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০-এর আশ-পাশে যেসময়ে নব্য-ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল এবং যখন মধ্যযুগের এক অভিনব সংস্কৃত উচ্চারণের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির আলোচনায় অল্‌-বীরূনীর পুস্তকে ভারতীয় শব্দের আরবী লিপিতে লিখন-প্রয়াস হইতে, এই প্রয়াসে নানা ভ্রম-প্রমাদ এবং লিপিকর-প্রমাদ থাকা সত্ত্বেও, বহু তথ্য আমরা পাইতে পারি।†

অল্‌-বীরূনী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ প্রচলিত ভাষা, সাহিত্যের ভাষা হইতে পৃথক্‌ ছিল; অর্থাৎ লোকে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ বা ভাষায় কথাবার্তা কহিত, কিন্তু উচ্চসাহিত্যে সংস্কৃত ব্যবহার করিত। অল্‌-বীরূনী বিভিন্ন প্রকারের মধ্য-আর্য্য (অর্থাৎ প্রাকৃত বা অপভ্রংশ) অথবা নব্য-আর্য্য ভাষার পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তিনি সংস্কৃতেতর ভাষাগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পশ্চিম-পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের হিন্দুদের ভাষাই শিখিয়া থাকিবেন, এবং এই দুইটী ঐ যুগে সম্ভবতঃ একই ছিল, এবং সিন্ধু-প্রদেশের ভাষা ইহা হইতে বেশী পৃথক্‌ ছিল না। আভ্যন্তর ভারতের অর্থাৎ "পছাহাঁ" বা পশ্চিমী-হিন্দী প্রান্তের, তথা "পূরব" অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব উত্তর-প্রদেশ ও বিহারের ভাষাসমূহ,

† এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য আমার লেখা প্রবন্ধ—*Sanskrit in Perso-Arabic Script—A Sidelight on the Medieval Pronunciation of Sanskrit in Kashmir and North India, Indian Linguistics,* Quarterly Bulletin of the Linguistic Society of India, Volume VII, Part 3, 1939, Calcutta, pp. 131-166.

তথা গুজরাট-রাজস্থানের ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। ঐ যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশ সমগ্র আর্য্য-ভাষী ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পাশে একটী মুখ্য সাহিত্যের ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছিল। অল্-বীরূনী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার বইয়ের মধ্যে অপেক্ষিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে উত্তর-পশ্চিমের কথ্য ভাষার রূপ ধরিয়াছেন, এবং তদনুসারে তিনি আরবী লিপিতে অক্ষরান্তর করিয়াছেন। এইরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণ- ও ধ্বনি- বিষয়ক অভ্যাস ও প্রবৃত্তি অনুধাবন করিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ "স"-এর ধ্বনি (যাহা সংস্কৃত "শ", "ষ", "স" হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল) এই ভাষায় 'হ"-কারে পরিবর্তিত হইত—শব্দের মধ্যে, এবং কখনও-কখনও, আদিতে। অল্-বীরূনী কর্তৃক ধৃত এইরূপ কয়েকটী শব্দ—krwh = "*ক্রোহ" = সংস্কৃত "ক্রোশ" ; by'h = "*বিআহ, বিয়াহ = ব্রিাহ" = সংস্কৃত "বিপাশা" ; āh'ry = "*আহাড়ী" = সংস্কৃত "আষাঢ়িকা" ; bhnd = "বহন্দ" = "ব্রহন্দ" = সংস্কৃত "বসন্ত" ; lwh'wr = "*লৌহারর" = "*হলারর" = সংস্কৃত "শালাতুর" ; dhyn = "*দহীঁ" = সংস্কৃত "দশমিকা" ; y'hy = "*এআহী" = "*এআঅহী" = সংস্কৃত "একাদশিকা" ; dw'hy = "*দুরাহী" = "দ্বাদশিকা" ; তদনুরূপ trwhy, cwdhy, pnc'hy "ত্রিরহী, চৌদহী, পঞ্চাহী" = "এয়োদশিকা", "চতুর্দশিকা", "পঞ্চদশিকা"। এই ভাষায়, আদ্য-ভারতীয়-আর্য্য অর্থাৎ সংস্কৃতের নাসিক্য বর্ণ + অঘোষ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, এই প্রকারের সংযুক্ত বর্ণ, নাসিক্য + ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয় ; এবং নাসিক্য বর্ণ + ঘোষবৎ অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণ, দ্বিত্বরূপ নাসিক্য বর্ণে পরিণত হয় ; যেমন, অল্-বীরূনীর উদাহরণ হইতে, সংস্কৃত "সাংখ্য" = s'ng অর্থাৎ "সাঙ্গ" বা "সাঙ্ঘ" ; "বসন্ত" = bhnd "বহন্দ" ; "সামন্ত" = s'mnd "সামন্দ" ; "ত্রিপঞ্চাশিকা" = trnj'y "ত্রিয়ঞ্জাহী" ; এবং সংস্কৃত "ডোম্ব" = dwm = "ডোম্ম" ; সংস্কৃত "উদ্দণ্ডপুরা" = 'dnpr = "উদ্দন্নপুরি" ; তুলনীয়, আধুনিক পঞ্জাবী "দন্দ্" = সংস্কৃত "দন্ত" ; "চম্বা" = সংস্কৃত "চম্পক" ; "চন্নণ" = "চন্দন" ; সিন্ধী "কাণ্ড" = "কণ্টক", ইত্যাদি। পঞ্জাবী "চন্নাব" = "চন্নহা = প্রাকৃত চন্দহাআ, সংস্কৃত চন্দ্রভাগা" ; "চন্দহাআ" + ফারসী "আব্ = জল", ইহা হইতে "চন্নাব, চনাব" নামের উৎপত্তি। খ্রীষ্টাব্দ ১১০০-এর দিকে আমাদের মহাভারতের উপাখ্যান আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, এবং মহাভারতের এই আরবী রূপে "কুন্তী", qud এইরূপে লিখিত হইয়াছে এবং এই qud উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভাষার রূপ "কুন্দি"-রই প্রত্যক্ষর ; তদ্রূপ সংস্কৃত "পাণ্ডু" = প্রাকৃত "পণ্ডু" = উত্তর-পশ্চিমের ভাষায় ছিল "পন্নু", এবং এই "পন্নু"-রূপ আরবী লিপিতে fnn-রূপে লিখিত হইয়াছিল। এই ভাষাতে উপরন্তু আদি-আর্য্য-ভাষা বা সংস্কৃত সংযুক্ত "ক্র", "ত্র" প্রভৃতি যথাযথ রক্ষিত হইয়াছিল ; যেমন সংস্কৃত "ক্রোশ" = krwh = "ক্রোহ" , সংস্কৃত "তৃতীয়" = tryh = "ত্রীয়" = "ত্রিঈয়"।

এইভাবে দেখা যায় যে, অল্-বীরূনীর লেখা বইয়ের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবী লিপিতে পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি ভারতীয় আর্য্য-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে এইভাবে কৃত সংস্কৃত ও ভারতীয় শব্দের আরবী প্রত্যক্ষরীকরণ, সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু।

অল্-বীরূনী সংস্কৃত হইতে আরবীতে কতকগুলি বইয়ের অনুবাদ করেন। কি কি বই তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়, এবং কোন্ পদ্ধতিতে তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় জ়াখাউ দিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই উক্তি প্রমাণে, তিনি উপরন্তু কতকগুলি আরবী বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ

করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার সহকর্মী ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। জ়াখাউ অল্‌-বীরূনীর মূল আরবী বইয়ের সংস্করণের ভূমিকায় ইহার আলোচনা করিয়াছেন। ভারত-বিদ্যা বিষয়ে অল্‌-বীরূনীর কৃতি, সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃত অনুবাদ সমেত, জ়াখাউ উল্লেখ করিয়াছেন—এই-সমস্ত রচনা তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ "ভারত-বিবরণী" (অল্‌-তহ্‌কীক অল্‌-হিন্দ)-এর বহির্ভূত। তিনি অন্ততঃ তিনখানি বইয়ের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন—গ্রীক গণিতবিদ্যাবিদ্‌ ইউক্লীড-এর জ্যামিতি শাস্ত্রের লঘু সূত্র (Elements of Geometry), জ্যোতিষ সম্বন্ধে গ্রীক ভৌগোলিক প্তোলেমিঁর Ptolemy-র একখানি গ্রন্থ, এবং Astrolabe অর্থাৎ সমুদ্রে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের বিষয়ে রচিত তাঁহার নিজের একখানি পুস্তক। জ়াখাউ-এর কথন অনুসারে, "সম্ভবতঃ তিনি এই সকল বই-য়ের অর্থ পণ্ডিতদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তাঁহারা তাঁহার বক্তব্য সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত করিয়া দিতেন"। অনুমান হয় যে, আরবী এবং ইসলামী বিজ্ঞানের এই-সকল সংস্কৃত অনুবাদের দ্বারা, অল্‌-বীরূনী, কাশ্মীর এবং আভ্যন্তর-ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের সহিত একটী যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই-সমস্ত সংস্কৃত অনুবাদের অস্তিত্ব আর নাই।

• • • •

একটী ক্ষুদ্র ব্যাপারে (ব্যাপারটী ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটী বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ছিল), আমাদের মনে হয় আমরা অল্‌-বীরূনীর হাত দেখিতে পাই, এবং ইহার দ্বারা অল্‌-বীরূনী কি ভাবে সংস্কৃতে অনুবাদ করিতেন তাহার একটা দিগ্‌দর্শন আমরা যেন পাই। উপরন্তু এই ব্যাপারের দ্বারা, ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অনুরাগী-রূপে, ও সমস্ত জাতির যে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আছে, এইরূপ বিচারের মানুষ-রূপে, অল্‌-বীরূনীকে দেখা যাইতেছে।

১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ যখন খীবা রাজ্য জয় করিলেন, তখন অল্‌-বীরূনী তাঁহার দেশের জামীন-রূপে গজনীতে আসিতে বাধ্য হইলেন। মনে হয় যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, যদিও সম্ভবতঃ তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার কার্য্যের জন্য তিনি সুলতানের দরবারে কোনোরূপ পৃষ্ঠপোষকতা বা দাক্ষিণ্য বা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। সে যাহা হউক, তাঁহার সমসাময়িক এই পরাক্রান্ত সুলতানের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ হইবার কোনো কারণ তাঁহার ছিল না। উপরন্তু, তাঁহার গবেষণার কার্য্য চালাইবার জন্য সময় এবং অর্থ এর দুইয়ের-ই অভাব-হেতু যে প্রতিবন্ধক তাঁহার আসিত, সে সম্বন্ধে তিনি অভিযোগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গজনীর সুলতান মহ্‌মূদের দরবারে আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি ছিলেন কবি ফিরদৌসী, যিনি সুলতানের দাক্ষিণ্য-লাভের আশায় পারস্য-দেশের জাতীয় মহাকাব্য "শাহ্‌-নামা" বা রাজকথা নামে বিরাট্‌ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তিনি সুলতানের নিকট হইতে আশানুযায়ী ও প্রতিশ্রুতির অনুরূপ অর্থ না পাইয়া বিশেষভাবে মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আন্তরিক সহানুভূতির অভাব এবং মহ্‌মূদের প্রধান মন্ত্রীর বিরোধিতা, এই দুই কারণে সুলতান মহ্‌মূদ তাঁহার সময়ের এই দুই মহান্‌ ব্যক্তির উপযুক্ত সমাদর করেন নাই, এবং অল্‌-বীরূনী ও ফিরদৌসী উভয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

সুলতান মহ্‌মূদ একজন কৃতকর্মা শাসক ছিলেন। তিনি উদার-হৃদয় এবং সত্যকার শূর-বীর ছিলেন, এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের একজন উচ্চদরের উৎসাহ-প্রদাতা ছিলেন। তিনি ইসলামের এবং তুর্কীজাতির

ইতিহাসের দ্বিতীয় বীরযুগের ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ এবং কাফেরের দেশ লুঠপাট করিয়া ধন-সংগ্রহের সহজ পন্থা, এই উভয়ই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল। তাঁহার এক শতাব্দী পরে পশ্চিম-ইউরোপের Frank বা ফিরাঙ্গী অর্থাৎ ফরাসী ও জার্মান জাতীয় খ্রীষ্টান Crusader বা ধর্মযোদ্ধগণ নিজেদের সম্বন্ধে যেরূপ মনে করিত, স্থলতান মহ্‌মুদের মনে তদ্রূপ অনুমাত্র সংশয় ছিলনা যে তিনি এবং তাহার তুর্কী যোদ্ধগণ ঈশ্বরের সমক্ষে উচ্চ আদর্শের মানুষই ছিলেন—তাঁহারা ছিলেন পরমেশ্বর আল্লার নির্বাচিত সেনা; বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিয়া, লুঠপাট করিয়া ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়া এবং মুসলমানের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, তাহারা ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছিল। আল্লার এই সেবার জন্য তাহারা ভারতবর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত ধনরত্ন এবং বিজিত হিন্দুদের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র দাসদাসী পাইয়া ইহজগতে পুরস্কৃত হইত, এবং পরজগতে কোরানে বর্ণিত জিন্নৎ বা স্বর্গের সমস্ত সুখ ও আনন্দের অধিকারী হইত। এই-সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া, মহ্‌মুদ ইসলাম-ধর্মের প্রচারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা শক্তিশালী হইয়া, তাঁহার সু-নিয়ন্ত্রিত তুর্কী এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের সাহায্যে, "খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত" এবং দুর্বল অধঃপতিত হিন্দুদের জয় করিয়া, নিজের শাসনক্ষেত্র আরও পরিবর্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন; এবং হিন্দুরা, তাহাদিগের প্রাচীন ও সে-যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী যুদ্ধের রীতি লইয়া মহ্‌মুদের সম্মুখে কোথাও দাঁড়াইতে পারে নাই। অল্‌-বীরূনী এই ব্যাপারের সম্বন্ধে নিজে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন: "স্থলতান মহ্‌মুদের বীর-কার্য্য অদ্ভুত ছিল, এবং ইহার সমক্ষে হিন্দুরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় হইয়াছিল; এবং তাহাদের কথা, মানুষের মুখে প্রাচীন জনশ্রুতির মতন হইয়া দাঁড়াইতেছিল"; এবং ৩০ বৎসর ধরিয়া মহ্‌মুদ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে-সমস্ত ধ্বংস এবং লুণ্ঠন-মূলক অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা, "দেশের সমৃদ্ধি একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন"। গজনীর মহ্‌মুদ কর্তৃক ভারতবর্ষের মধ্যে এই-সকল লুণ্ঠনের অভিযান, হিন্দুজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকর বিপত্তি-রূপে দেখা দিয়াছিল; এবং হিন্দুদের মনে এই ভীষণ "বুত্‌-শিকন্‌" অর্থাৎ মূর্তিভগ্নকারী মহ্‌মুদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব থাকা সম্ভবপর ছিলনা। কারণ জাতি-হিসাবে তিনি তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবীবের মতন এ-যুগের একজন নিরপেক্ষ মুসলমান ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন যে, স্থলতান মহ্‌মুদের আচরিত এই "তুর্কী পদ্ধতি"তে ইসলাম-ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; এবং বরঞ্চ ইহার বিপরীত ফল-ই হইয়াছিল। এই "ঝঞ্ঝা আক্রমণের" এবং ধ্বংসের কার্য্য যাহা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আফগানিস্থানের তুর্কীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, এবং পরবর্তী একাদশ ও দ্বাদশ শতকে যাহা আরও প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকর হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইরানের প্রখ্যাতনামা সূফী দার্শনিক ও রহস্যবাদী কবি জলালুদ্দীন রূমী (মৃত্যুকাল খ্রীষ্টীয় ১২৭৪ সাল) এইভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন—

"হিন্দুয়ক্‌-ই-হস্তী-রা তু তুর্কানা নগ্‌মা কুন্‌"

(যেভাবে তুর্কগণ অপদার্থ হিন্দুদের নিজের অধীনে আনে, সেইভাবে তুমি জীবনকেও নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনো।)

ক্রমে মুসলমান ইরানী ও তুর্কী মুসলমান জগতে অনেকে বুঝিতে পারিলেন যে, মহ্‌মুদের এই তুর্কী

পদ্ধতি— "তুর্কানা তরীকা"— অনুসারে লুঠপাট, হত্যা ও ধ্বংসের পথে ভারতবর্ষের লোকেদের—কি অভিজাত শ্রেণীর এবং কি নিম্নশ্রেণীর লোকেদের—ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবে না। অন্য এক পথ এদিকে ইসলাম-প্রচারের কার্য্য করিতেছিল— সে ছিল শান্তির পথ, সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দু জন-সাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে, সহজ সরল ভাবে ইসলামের মূল তত্ত্বকথা আনিয়া এবং নানাপ্রকারের অলৌকিক প্রক্রিয়া দেখাইয়া (অর্থাৎ কেরামতি জাহির করিয়া) ইহাদিগকে স্বমতে অথবা ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনা। এই "সূফিয়ানা তরীকা" অর্থাৎ সূফী সাধকের পদ্ধতি, ইসলাম-প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছে। সূফী সাধক-গণ তাঁহাদের কোমল ভাব, সর্ব ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান-ধারণা লইয়া তাঁহাদের জীবন-যাপন, এই-সব গুণ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করায়, মুসলমান রাজশক্তির কেন্দ্রসমূহ হইতে বহু দূর অঞ্চলে জন-সাধারণের মধ্যে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করিতে এই রীতির শান্তিপূর্ণ প্রচার বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। এই জন্য দিল্লী, আগ্রা, লখনৌ, জৌনপুরের আশ-পাশে যেখানে শতকরা ১৫ কি ২০ জন মুসলমান, সেখানে সুদূর পূর্ব-বঙ্গে কোনো-কোনো জেলায় শতকরা ৮০ জনের উপর হিন্দু এখন মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়াছে। সুলতান মহ্‌মূদ অবশেষে যখন ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের এক অঞ্চল পঞ্জাব অধিকার করিয়া গজনীর সাম্রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দিলেন, তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান করা তাঁহার জীবনের যেন প্রধান ব্রত হইয়াছিল।

পঞ্জাব জয় করিবার পরে এবং তাহাকে গজনীর সাম্রাজ্যের এক অংশে পরিণত করিবার পরে, হিন্দুদের এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রবল শত্রু, মন্দির- ও দেবমূর্তি-ধ্বংসকারী বিদেশী মুসলমান রাজা, তাঁহার অধীনে আগত এই নূতন ভারতীয় প্রদেশের হিন্দু প্রজাবর্গের জন্য এক নূতন ধরণের মুদ্রার প্রচলন করিলেন। এই মুদ্রার উপরে তিনি যে লেখ উৎকীর্ণ করাইলেন, তাহাতে এমন একটী অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল, যাহা মুসলমান মুদ্রালেখের ইতিহাসে ইহার পূর্বে কখনও হয় নাই, এবং ইহার পরেও আর কোনো মুসলমান শাসক কোথাও করেন নাই। ওময়্যা Omayya-বংশীয় আরব মুসলমান খলীফা বা সম্রাট্‌দের সময় হইতে যে বিশিষ্ট ইসলামীয় রীতির মুদ্রা মুসলমান জগতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় সব সময়ে পাওয়া যায়; [১] প্রথম থাকে, কলিমা বা কলমা অর্থাৎ আরবী ভাষায় রচিত ইসলামীয় ধর্মের আস্থা-মন্ত্র— "লা-ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ, মুহম্মদ রসূলু-ল্লাহ", অর্থাৎ অল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই, এবং মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত পুরুষ; [২] মুদ্রার প্রবর্তক রাজার বা শাসকের নাম ও বিরুদ; [৩] যে স্থানে বা টাঁকশালে মুদ্রাটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ, আরবী ভাষায় এইভাবে লিখিত হয়— "দ্বুরিবা (বা জ়ুরিবা) হাধা অল্‌-দিরহম্‌ (অথবা অল্‌-দীনার) ফী···" (অর্থাৎ এই দিরহম বা রৌপ্য মুদ্রা অথবা দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা অমুক স্থানে আহত হইয়াছে বা প্রস্তুত করা হইয়াছে); এবং শেষে থাকিত— [৪] হিজরা সংবৎসর ধরিয়া মুদ্রা-প্রবর্তনের বর্ষের উল্লেখ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত সুলতান মহ্‌মূদের মুদ্রায় আমরা দেখি, দুইটী ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে—ইহাই ইহার প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। একদিকে মুসলমান রাজাদের মুদ্রায় আমরা যেমন পাই— উপরে লেখা এই চার দফা উল্লেখ, আরবী ভাষায়; এবং মুদ্রার অন্যদিকে পাইতেছি, এই সম্পূর্ণ আরবী লেখের ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ— এবং এই ব্যাপারটী বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বস্তু। একজন মুসলমান রাজা,

যিনি সারা জীবন বিধর্মী বলিয়া হিন্দুদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছেন, এবং যে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনো আস্থা বা দরদ থাকিবার কথা নয়, তিনি তাঁহার নিজ ধর্মের পবিত্র বীজ-মন্ত্রটী এই বিধর্মী ঈশ্বরাভিশপ্ত জাতির দেবভাষা সংস্কৃতে অনুবাদ করাইলেন—ইহা এক অভাবনীয় ঘটনা। এই মুদ্রায় সংস্কৃতে আরবী কলমার এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে:—"অব্যক্তম্ একম্, মুহম্মদ অবতার।" ইহা অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ নহে, এবং পণ্ডিত মুসলমান এই অনুবাদ সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইবেন না—বিশেষতঃ কলমার দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ। কারণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা যে ভাবে incarnation বা "অবতার" মানে, নবী মুহম্মদকে সে ভাবের "অবতার"-রূপে মুসলমানগণ কল্পনা করেন না। মুহম্মদ ছিলেন পূরাপূরি মানুষ, এবং তিনি নিজেও সে কথা বার-বার বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতকে ইসলামের জগতে, বিশেষ করিয়া ইরান, আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানে, নবী মুহম্মদের ব্যক্তিত্ব প্রায় দেবত্বে উন্নীত হইয়া গিয়াছিল—ইসলামের অভ্যুত্থানের ৩।৪ শত বৎসর পরে। কোরানের সরল সহজবোধ্য ধর্মমত, নানাভাবে অলঙ্কৃত ও পল্লবিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল। সূফীগণের কল্পনা-প্রবণতার দরুন ইহা অনেকটা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র, নবী মহম্মদের মানবাতিগতা সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই সাধারণ; এবং মিলাদ বা মৌলুদ শরীফের মতো ধর্মকথার আসরে, মুসলমান পুরাণ-অনুসারে সৃষ্টির কথা এবং মুহম্মদের আবির্ভাব ও জীবনীর কথা, এবং তদনন্তর শেষে "রোজ কিয়ামৎ" অর্থাৎ পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ দিনের কথা, যখন "ওয়াইজ." বা ধর্মোপদেশক বর্ণনা করেন, তখন ইহা প্রচারিত হয় যে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টির বহুপূর্বে, এমন কি পরমেশ্বরের সত্তার অংশ-রূপে, স্বর্গে আল্লা-তায়ালা "নূর-ই-মুহম্মদী" অর্থাৎ মুহম্মদের জ্যোতি বলিয়া এক বিশেষ জ্যোতির্ময় শক্তি সৃজন করিয়াছিলেন, এবং তাহা যুগ যুগ ধরিয়া স্বর্গে অবস্থিত ছিল; পরে এই জ্যোতির্ময় শক্তির অংশ লইয়া স্বর্গের "ফেরেস্তা" বা দেবদূত এবং অন্য নানাপ্রকারের প্রাণী সৃষ্ট হয়; এবং অবশেষে এই "নূর-ই-মুহম্মদী" ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া মুহম্মদের মাতা দেবী আমিনার গর্ভে ভবিষ্যৎ নবী বা রসূল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই কল্পনোজ্জ্বল পৌরাণিক কাহিনী ভারতবর্ষে নবী মুহম্মদের জীবনকথা-রূপে এক অদ্ভুত রসপূর্ণ "ভক্তমাল" কথার ন্যায় আসিয়া পৌঁছে, এবং বিশ্বাসী মুসলমান সকলেই আগ্রহের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রহণ করেন। সুতরাং এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, মুহম্মদকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করা তেমন অনুচিত বলা যায় না; এবং ঐ সময়ে জনপ্রিয় সূফী প্রচারকগণ ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তথা যাহাদের ইসলাম ধর্মে আনা সম্ভবপর হইত এইরূপ হিন্দুদের কাছে, মুহম্মদের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কথা তাহাদের মানসিক চিন্তাধারা অনুসারে এইরূপ উপাখ্যানের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছিল।

কলমা-মন্ত্রের এই সংস্কৃত অনুবাদ লইয়া শেষে আলোচনা করিতেছি।

রাজার ও টাঁকশালের নাম এবং সন-তারিখের কথা লইয়া আরবীতে এই মুদ্রায় যাহা লেখা আছে, তাহা বেশ যত্নের সহিত যথাযথভাবে অনূদিত হইয়াছে ("অয়ং টঙ্কঃ মুহমদপুরে ঘট্টে আহতঃ"—এই টঙ্ক বা টাকা মুহম্মদপুর অর্থাৎ লাহোরের ঘট্ট বা টাঁকশালে আহত হইয়াছে অর্থাৎ প্রস্তুত হইয়াছে); "নৃপতি মহমূদ"; "জিনায়ন-সংবতি…" ("জিন" অর্থাৎ বিজেতা, অর্থাৎ নবী মুহম্মদের অয়ন অর্থাৎ নির্গমন বা যাত্রার…বর্ষে)। মুসলমান অব্দের নাম "হিজরা" (অর্থাৎ "পলায়ন" বা "নির্গমন"), বিশেষ চিন্তার সহিত এই শব্দটীর সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হিজরা অব্দের সম্পূর্ণ নাম হইতেছে "হিজ্রতু-ন্-নবী"

অর্থাৎ নবী বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের পলায়ন বা নির্গমনের বৎসর—ইহার সংস্কৃত হইয়াছে "জিনের বা বিজেতা পুরুষের অথবা ধর্মগুরু বা ধর্মোপদেশক মহাপুরুষের অয়ন বা নির্গমন"। এই দুই ভাষার লেখ-সম্বলিত মুদ্রার বিভিন্ন তারিখের অঙ্ক সম্বলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রতি পাওয়া গিয়াছে (যথা ৪১২ হিজরী অব্দ, ৪১৯ হিজরী অব্দ—যথা ক্রমে ১০২১ ও ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ), এবং এই বিভিন্ন প্রতিতে পাঠভেদও কিছু আছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে একটীতে "বি-স্মি-ল্লাহ" এই বাক্যটী যথাযথ অনূদিত হইয়াছে এইভাবে—"অব্যক্ত-নামে" অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের নাম লইয়া।*

এইভাবে সংস্কৃতে আরবী কলমার অনুবাদ দিয়া মুদ্রার প্রবর্তন, গোঁড়া মুসলমানের দৃষ্টিতে "জি.ম্মি" অর্থাৎ করপ্রদাতা বিজিত বিধর্মী প্রজার প্রতি অশেষ এবং অনুচিত অনুগ্রহ বলিয়াই মনে হইত। ঐ সময়ে যখন প্রায় সর্বত্র সাধারণ বিশ্বাসী মুসলমানের মনে একটী আরব-জাতির গৌরব-স্বীকারের মনোভাব বিদ্যমান ছিল, এবং আরবী ভাষার পাশে এইভাবে বিধর্মী হিন্দুর ভাষার স্থান দেওয়া অনেকেরই ভালো লাগিত না, তখন, আমাদের মনে আশ্চর্য্য লাগে, কেমন করিয়া গজনীর অধিপতি সুলতান মহ্‌মূদ, যিনি জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুদের সহিত লড়িয়াছিলেন, তাঁহার নববিজিত হিন্দু প্রজাদের প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং ইসলামের মূল কথা তাহাদের নিকট তাহাদের আপন ভাষায় প্রচার করিলেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রাজ্যের মুদ্রায় তাহাদের ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনে হয় তিনি যেন হিন্দুদের জাতীয়তা-বোধের পরিপোষক কর্মই করিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে তিনি কূট রাজনীতিক চাল-রূপেই এই কার্য্য করিয়াছিলেন—সম্ভবতঃ মহ্‌মূদ তাঁহার সাম্রাজ্যের নবজিত হিন্দু প্রজাদের বিরোধী করিয়া রাখিতে চাহেন নাই, কারণ এই হিন্দুরা তখন তাঁহার সাম্রাজ্যে সংখ্যায় বিশেষ অল্প ছিল না। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে, এই ব্যাপারে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত উদারতার স্বাভাবিক ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারি না যে, এই সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রায় অঙ্কিত করার পিছনে হিন্দুজাতির প্রতি যে সহানুভূতিশীল তথা সংস্কৃতিপূত এবং বিশ্বজনীন মনোভাব কার্য্য করিতেছে, তজ্জন্য অল্-বীরূনী আমাদের সাধুবাদের পাত্র। যতদূর জানা যায়, সুলতান মহ্‌মূদের দরবারে অল্-বীরূনীর মতো ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না। হিন্দুদের ভাষাকে রাজকীয় মুদ্রায় স্থান দিয়া ইহার প্রতি যে মর্য্যাদা দেখানো হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনো ব্রাহ্মণ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই ব্যাপারে যে কোনো হাত ছিল,

---

* এই মুদ্রা সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী: (১) Edward Thomas, 'On the Coins of the Kings of Ghazni, 961-1171 A. D.,' London 1848, p. 57; (২) Charles J. Rodgers, 'Catalogue of Coins collected by Chas. J. Rodgers and purchased by the Government of the Panjab', Part II, Miscellaneons Muhammadan Coins, Panjab Government Publication, Calcutta 1894, p. 28, coins no. 38 ff.; (৩) Stanley Lane Poole, 'Catalogue of Coins in the British Museum', referred to by K. N. Dikshit; (৪) K. N. Dikshit, 'A Note on the Bilingual Coins of Sultan Mahmud of Ghazni', JRASB., Letters, Vol. II, 1936, No. 3, issued 1938, Numismatic Supplement, p. 29; (৫) Stanley Lane Poole, 'Mediæval India ('Story of the Nations' Series), London, 1906, p. 27—৪১৮ হিজরা = ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত এই ধরণের একটী মুদ্রার চিত্র আছে; (৬) জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার—'ইতিহাস-প্রবেশ' (হিন্দী পুস্তক), প্রথম খণ্ড, প্রয়াগ, ১৯৩৯, পৃঃ ২১৩, ২১৬।

তাহাও মনে হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকদিগের কথন-অনুসারে, গজনীর সুলতান মহ্‌মূদ যে সকল প্রকার বিদ্যার বিষয়ে গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। একবার কতকগুলি তুর্কী সৈনিক ভারতবর্ষে জনৈক রাজপুত রাজার রাজধানীতে কতকগুলি ছাড়া হাতীকে আয়ত্তে আনিয়া শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল, এবং তাহাদের এই সাহস ও শৌর্য্যের কথায়, "হিন্দী" অর্থাৎ তখনকার যুগের অপভ্রংশ ভাষাতে কবিতা রচনা করিয়া, প্রশস্তিবাদ করা হইয়াছিল। এই কবিতাগুলি পরে ঐ রাজা সুলতান মহ্‌মূদের কাছে ভেট-স্বরূপ পাঠাইয়া দেন; এবং মহ্‌মূদ ঐ ভাষা বুঝিতেন না বলিয়া, কতকগুলি পণ্ডিত অর্থাৎ উক্ত ভাষার সহিত পরিচিত ব্যক্তিকে দিয়া ঐ কবিতা অনুবাদ করাইয়া লন এবং পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি যে কোনো ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনো হিন্দুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, আপন মুদ্রায় এই সংস্কৃত অনুবাদ মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

এই ব্যাপারে যদি কেহ সুলতান মহ্‌মূদকে প্রেরণা দিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্র অল্‌-বীরূনী-ই হইতে পারেন। এবং যে ভাবে কতকগুলি আরবী শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছিল, তাহাতে অল্‌-বীরূনীর-ই চিন্তাধারা দেখা যায়। আরবী "নবী" বা "রসূল" অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা ভাববাদী, সংস্কৃতে "জিন" শব্দের দ্বারা অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার ভারত-বর্ণন গ্রন্থে "জিন" শব্দ অল্‌-বীরূনী দুইবার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তিনি এই শব্দটী "বুদ্ধ" শব্দের প্রতিশব্দ-রূপে ধরিয়াছেন (জিনু র-হুর-অল্‌-বুদ্দু)। তিনি ধরিয়াছিলেন যে কাষায়-বস্ত্র পরিহিত "সামানী" অর্থাৎ "শ্রমণ" বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন "বুদ্ধ", এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রচলিত "জিন" শব্দ (যাহার এক অর্থ হইতেছে "বিজেতা"), অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দের অভাবে, আরবী "নবী" বা "রসূল" শব্দের কাজ-চালানো প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কলমার প্রথম অংশের অনুবাদে অল্‌-বীরূনীর হাত দেখিতেছি। "অল্লাহ্‌ ব্যতীত উপাস্য নাই", ইহার অনুবাদ হইয়াছে—"অব্যক্তম্‌ একম্‌"; অর্থাৎ যিনি অরূপ, তিনি এক বা অদ্বিতীয়। এই অনুবাদ একটু ব্যাখ্যাত্মক, কিন্তু অল্‌-বীরূনীর মত-অনুসারে ইহার উপযোগিতা আছে। আরবী ভাষায় "ইলাহ্‌" শব্দের অর্থ "যাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করা যায় এমন কোনো সম্মান বা পূজার পাত্র; প্রতিমার আকারে কোনো দেবতা"—এই শব্দের দ্বারা কোনো দৈবী শক্তি বা ভাব আরবদের মধ্যে প্রকাশিত হইত না। কিন্তু "অল্লাহ্‌" শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব একেবারে ইহার বিপরীত—"অল্লাহ্‌" কোনো দৃশ্যমান "ইলাহ্‌" বা দেবতা নন, ইনি দৃশ্যমান দেহ-রূপের অতীত ঈশ্বরীয় সত্তা। এইরূপ ঈশ্বরীয় শক্তি বা দেবতা, যাঁহার কোনো রূপ নাই, তিনিই একমাত্র সত্তা; এবং অন্য কোনো "ইলাহ্‌" বা রূপ-যুক্ত দেবতার কথা অল্লাহের সমক্ষে উঠিতেই পারে না। অতএব "অব্যক্ত বা অরূপ দেবতাই এক"—এইরূপ অনুবাদ, কলমা-মন্ত্রের প্রথম অংশের অসঙ্গত অনুবাদ বা অপব্যাখ্যা নহে, এবং এইরূপ অনুবাদের পিছনে আছে ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত প্রধান মনোভাব, রূপ বা প্রতিমার বিরোধ। উপরন্তু এইরূপ অনুবাদ, হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তা বা দর্শনের বাক্য-ভঙ্গীর অনুকূল, এবং এইরূপ অনুবাদের দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের "একং সৎ" এবং "একম্‌ এবাদ্বিতীয়ম্‌" প্রভৃতি কতকগুলি বচনকে মনে করাইয়া দেয়। অল্‌-বীরূনী তাঁহার পুস্তকে "অব্যক্ত" শব্দের আরবী ভাষায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,— 'bykt 'y s'y" bl' s:wrth অর্থাৎ "অব্যক্ত, অয়্যু শয়্যুন্‌ বিলা স্বূরৎ" (যাহার কোনোও রূপ বা আকার নাই, এইরূপ সত্তা)। "অব্যক্ত" শব্দের নানা অর্থের মধ্যে এইটী একটী অন্যতম। মূল অর্থ অবশ্য "যাহা ব্যক্ত বা প্রতিভাত হয় নাই"—কিন্তু এই "ব্যক্ত বা প্রতিভাত হওয়া"

দেবতাত্মা হিমালয় — শ্রীনন্দলাল বসু

কেবল রূপ-গ্রহণের মধ্যেই সীমিত নহে, এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ধরিতে, ছুঁইতে, দেখিতে বা অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার সবই "ব্যক্ত"। "অল্লাহ্" শব্দের অনুবাদ-রূপে "অব্যক্ত" যে সুষ্ঠু অনুবাদ, তাহা বলা চলে না। কিন্তু "অল্লাহ্"-এর "সূরত" বা রূপের অতীত থাকাই যদি এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত "অব্যক্ত"-শব্দের ব্যাপক অর্থ-সমূহ হইতে যদি কেবল এইটীকেই নির্বাচিত করিয়া লইয়া, ইহাকে রূপাতীত "অল্লাহ্"-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা খুব অনুচিত হয় না।

"অল্লাহ্"-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ যিনিই নির্ধারিত করিয়া থাকুন, তিনি যে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট। চীনদেশের বিখ্যাত দার্শনিক লাউ-ৎসূ রচিত "তাও-তেঃ-কিঙ্" গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে—আসাম (প্রাগ্‌জ্যোতিষ)-এর রাজা ভাস্করবর্মার আগ্রহে চীনদেশের পণ্ডিতেরা চীনের সম্রাটের আহ্বানে এই কার্য্যে অবতীর্ণ হয়। তখন চীনা শব্দ "তাও", যাহা লাউ-ৎসূর দর্শনের মুখ্য কথা, তাহার অনুবাদ লইয়া হিউএন্-ৎসাঙ প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লাউ-ৎসূর মতানুযায়ী চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দেখা দিয়াছিল। আজকালও দুইটী বিভিন্ন ভাষার ও ধর্মের নিজ নিজ বিশিষ্ট ভাব ও শব্দের সামঞ্জস্য সাধন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। অল্‌-বীরূনী যে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ আরবীতে অনুবাদ করিবার কাজে অবতীর্ণ হইয়া, বহুল অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সর্বগ্রাহিতার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে—গ্রীক, ইসলামী ও হিন্দু দর্শনের তুলনাত্মক আলোচনা তাঁহাকে এইভাবে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল, এবং সেজন্য Comparative Religion বা তুলনাত্মক-ধর্মানুশীলন বিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ তাঁহাকে বলা যায়।

অতএব অনুমান করিতে বাধা নাই, সুলতান মহ্‌মূদের মুদ্রায় "অল্লাহ্" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে "অব্যক্ত" শব্দের ব্যবহার অল্‌-বীরূনীর দ্বারাই হইয়াছিল। এবং ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে, অল্‌-বীরূনীরই চেষ্টায় এই মুদ্রায় আরবী লেখের পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে অল্‌-বীরূনীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রের মধ্যে আমরা এক নূতন প্রকারের মহত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি। তিনি সংস্কৃতের ও ভারতের প্রতি আকৃষ্ট তো হইয়াছিলেন-ই—পরন্তু উচ্চ সভ্যতার উত্তরাধিকারী মানবসমাজ-সমূহ যাহাতে নিজ নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সব জাতির পক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা আবশ্যক, এই ভাবের ভাবুকও তিনি ছিলেন। পৃথিবীর সর্বজাতির মানব, নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করুক, ইহাই বুদ্ধদেব কামনা করিয়াছিলেন। একটী বিশেষ ভাষাকে ধর্মের ভাষা বা রাজার ভাষা বলিয়া, অন্য সমস্ত জাতির ঘাড়ে ইহাকে চাপাইবার চেষ্টা প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। ইহা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার যে, নিজ ভাষায় ইসলামের বীজ-মন্ত্রের সহিত পরিচিত হইবার অধিকার, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যেই, পঞ্জাব তুর্কীদের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই, পঞ্জাবের ভারতীয় প্রজাগণ পাইয়াছিল। যাঁহার ন্যায়দর্শিতার ফলে সম্ভবতঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই মানব-শ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ অল্‌-বীরূনীর স্মৃতির প্রতি, তাঁহার জীবৎকালের প্রায় সহস্র বৎসর পরে সমগ্র সভ্য জগতের শ্রদ্ধা নিবেদন করা কর্তব্য—তিনি তাঁহার কালের ও সর্বকালের বিশ্বমানবিকতার আদর্শের পুরোহিত ছিলেন, এবং মানবের মানসিক প্রগতির পথে এক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

[মন্তব্য—এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পরে বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাসুদেবশরণ অগ্রবালের নিকট হইতে

জানিতে পারিলাম যে তিনি এই মুদ্রার সংস্কৃত লেখটীর একটু অন্যভাবে পাঠ করিয়াছেন। তিনি প্রায় সমস্ত লেখটীর পূর্ব আলোচকদের দ্বারা নির্ধারিত পাঠ একরকম মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "জিনয়ান-সংবতি" এই অংশটুকু "তাজিকীয়ের-সংবতি" অর্থাৎ "তাজীক" বা আরব জাতির সংবৎ বা অব্দ বলিয়া পাঠ করিতে চাহেন। এই পাঠে -"য়ের" অংশটী কিন্তু গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, কারণ -"য়ের" প্রত্যয়ের কোনও সঙ্গত অর্থ মিলিতেছে না। ডাক্তার অগ্রবালও মনে করেন যে এই সংস্কৃত অনুবাদ অল্-বীরূনীর হওয়াই সম্ভব। ইঁহার প্রবন্ধ Journal of the Numismatic Society of India, Vol. V, Part II-তে, ও পরে Journal of the United Provinces Historical Society, Vol. XVII, Part II, December 1944, Lucknow-তে প্রকাশিত হইয়াছে।]

আধুনিক ধাতুযুগ

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

ইউরেনিয়ম, থোরিয়ম, টাইটেনিয়ম ও জারকোনিয়ম এই চার ধাতুর এবং তাদের কয়েকটি যৌগিকের উৎপাদন ও জনকল্যাণে প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। এককালে এদের বিরল মনে করা হত ব'লে রসায়নের বইয়ে এখনও এদের উল্লেখ ও আলোচনা বিরল—মৌলিকদলের মধ্যে দেখা যায়। কতকটা সেই কারণে খনিজ থেকে এদের উন্নততর প্রণালীতে নিষ্কাশন এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ ইত্যাদি স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি অবহেলায় বদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

লোহা এবং সোনার আদর যদিও চিরকালের, তবু সকলেই জানেন এমন কাজও আছে যা শুধু লোহার ডাণ্ডা বা সোনার চাকতি দিয়ে সেরে ফেলা যায় না। সংসারে তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল ইত্যাদি ধাতুরও উপযোগিতা আছে, বার্ষিক লক্ষ লক্ষ টন এদের খনিজ ভূভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে প্রয়োজনের রকম এবং আয়তন বেড়েই চলেছে, উপরন্ত এক-একটা যুদ্ধবিগ্রহের সময় অপরিমিত অপব্যয় আছে। এককালের বিশাল বসুন্ধরা ক্রমশঃ মানুষের চোখে ছোট হয়ে আসছে।

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, গত এক শত বছরে ধাতুর উৎপাদন এবং ব্যবহার অভূতপূর্ব রকমে বেড়েছে। যে পরিমাণ ধাতুর আকর এই সময়ের মধ্যে উত্তোলন, নিষ্কাশন ও ব্যয় করা হয়েছে, পূর্বের হাজার হাজার বছরেও তা হয় নি। ধাতু, মিশ্রধাতু এবং যৌগিকের আকারে এদের প্রয়োগক্ষেত্র রন্ধনশালা থেকে রণক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি বছরেই আরও খনিজ সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং অবিরাম যোগান দেওয়া চলছে।

পৃথিবীতে খনিজের ভাণ্ডার ধরিত্রীর আজন্ম সঞ্চয়, প্রকৃতির সকুংকৃত দান। এই ভাণ্ডার সুবৃহৎ কিন্তু অনন্ত নয়। সম্পদ থাকলে খরচ করা ভালো, কারণ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারেই দেশের সুখ ও শক্তির উৎকর্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি সজাগ থাকতে হলে সেই সম্পদের মোট পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার। দূরদৃষ্টিহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য, এ কথা তিন হাজার বছরের প্রাচীন ঋষিবাক্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন খনিজের পরিমাপ করলে অনেক বিস্ময়কর এবং আশঙ্কাজনক তথ্যের সম্মুখীন হতে হয়। হিসাবে দেখা যায়, বর্তমান হারে নিষ্কাশন চললে কয়েক শত বছরের মধ্যেই সীসা দস্তা ইত্যাদি বহুল প্রচলিত ধাতুর আকর নিঃশেষিত হবে। ততদিনে সমুদ্রের তলা থেকে নতুন আকর আবিষ্কার ও উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি না জানি না, নতুবা এদের খরচ কমাতে হবে, ব্যবহৃত ফেলে-দেওয়া দ্রব্য থেকে পুনরুদ্ধার করে চালাতে শিখতে হবে এবং সম্ভবস্থলে ধাতুর বদলে প্ল্যাস্টিক বা অন্য কিছু দিয়ে কাজ চালাতে হবে। গৃহকর্মে পিতল ও কাঁসার পাত্রের বদলে অ্যালুমিনিয়ম, স্টীল ও পোসিলেনের পাত্র চলবে।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে নরওয়ের বৈজ্ঞানিক গোল্ডস্মিথ এক বিশ্ববিশ্রুত গবেষণার ফল তালিকার আকারে প্রকাশিত করেন, ভূপৃষ্ঠের কতকগুলি মৌলিক পদার্থ মৌলিক ও যৌগিক অবস্থায় সর্বসমেত শতকরা কতটুকু ভাগ বর্তমান। ভূপৃষ্ঠ অর্থে ভূমির উপরে ও নীচে মোট প্রায় পঁচিশ মাইল পরিসর, বায়ুমণ্ডল ও সাগর সমেত। এর বাইরের জগৎ মানুষের আয়ত্ত-ভাণ্ডারের মধ্যে এখনও আসে নি। গোল্ডস্মিথের তালিকা

তার পরে অনেক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এই তালিকা দেখে অনেক প্রচলিত, অল্প-পরিচিত ও অপরিচিত ধাতু সমগ্রভাবে কতখানি প্রচুর বা অপ্রচুর তা জানা যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণার ওলটপালট হয়।

জানা যায় ভূপৃষ্ঠে সব চেয়ে প্রচুর ধাতু হল অ্যালুমিনিয়ম, তার পর লৌহ, শতকরা আট ও পাঁচ ভাগ। দু-দশ হাজার বছরের মধ্যে এদের খনিজ ফুরোবার কোনো আশঙ্কা নেই। তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম হল ক্যালশিয়ম, সোডিয়ম ও পটাশিয়ম, এদের ধাতু আকারে আমরা বড় দেখতে পাই না, কারণ জলে বাতাসে ও তাপে এরা সহজে বিকৃত হয় অর্থাৎ যৌগিকে পরিণত হয়। ব্যবহারযোগ্য ধাতুর তালিকায় তৃতীয় হল ম্যাগনেশিয়ম। এই লঘু ধাতু এখন সমুদ্রবারি থেকে তৈরি হয়, সুতরাং কার্যতঃ এর ভাণ্ডার অক্ষয় বলা চলে। এর ব্যবহার এখনও অল্প, প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে মিশ্রধাতু করে এরোপ্লেন ও অন্য আকাশযানের বহিরঙ্গ প্রভৃতি হালকা অথচ শক্ত জিনিস বানানো হয়।

প্রাচুর্য অনুসারে ম্যাগনেশিয়মের পরেই আসে টাইটেনিয়ম। তামা দস্তা ও রাং-এর মিলিত পরিমাণের আঠারো গুণ বেশি। অথচ পনেরো বছর আগে এই ধাতু তৈরি করার চেষ্টা কেউ করত না; ইউরেনিয়ম ধাতু আজ স্বর্ণের চেয়ে লোভনীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু ১৯৪০ সালে যখন প্রথম এর প্রয়োজন পড়ে, তখন পৃথিবীর সব দেশের ভাণ্ডার খোঁজ করে শুদ্ধ ধাতু কয়েক গ্র্যামের বেশি যোগাড় করা যায় নি। ভূপৃষ্ঠে এই ধাতুর পরিমাণ পারদের আট গুণ, রুপোর চল্লিশ গুণ। ইউরেনিয়মের চেয়ে তিন গুণ বেশি থোরিয়ম পাথরে বালিতে ছড়ানো আছে। জারকোনিয়ম টাইটেনিয়মের মত প্রচুর নয় বটে, তবু নিকেলের আটগুণ। ট্যাণ্টালম নামে এক বিরল ধাতুর পাত ও পাত্র অ্যাসিড গরম করা ইত্যাদি কাজে অন্ততঃ ত্রিশ বছর শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অথচ জারকোনিয়মের অনুরূপ ক্ষয়রোধী ধর্ম এবং ভূপৃষ্ঠে তার পরিমাণ ট্যাণ্টালমের এক শত গুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার নেই।

এমনি আরও উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে অপ্রচলিত অনেক ধাতু বিরল বলে মনে করা হলেও তারা আসলে বিরল নয়, এবং প্রচলিত কতক ধাতু যথা ক্যাড্‌মিয়ম, বিস্‌মথ, পারদ, অ্যান্টিমনি বস্তুতঃ ধরাপৃষ্ঠে বিরল। বিরল ধাতু প্রচলিত হয়, আর প্রচুর ধাতু অপরিচিত ও অপ্রচলিত থাকে কি করে?

দুই কারণ থেকে এ রকম ঘটে। যে ধাতু যৌগিক অবস্থায় অল্প অল্প করে বহুত্র ছড়িয়ে আছে, তার সমগ্র পরিমাণ অনেকখানি হলেও তার নিষ্কাশনে ঝঞ্ঝাট বেশি, সুতরাং তার উৎপাদন-শিল্প সহজে গড়ে ওঠে না। অপেক্ষাকৃত বিরল-ধাতু যদি উৎকৃষ্ট আকারে অল্প কয়েক স্থানে জমা হয়ে থাকে, সেদিকে শিল্পব্যবসায়ীদের নজর আগে পড়ে। এ রকম বিরল-ধাতু যদি আকর থেকে সহজ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা যায় তা হলে আরও সহজে লোকে আকৃষ্ট হয়। যথা, পারদের আকরকে শুধু বাতাসে পুড়িয়ে ধাতু পাওয়া যায়। দস্তা, রাং, ক্যাড্‌মিয়ম এদের আকরকে শুধু কয়লা মিশিয়ে গরম করতে হয়। সীসার আকর গ্যালিনাকে সাবধানে বাতাসে পোড়াতে থাকলে গলা ধাতু বার হয়ে আসে। আবার কোনো কোনো বিরল-ধাতু মুক্ত অবস্থায় নুড়ি বা বালুকণার আকারে পাওয়া যায়, যেমন সোনা, রুপো। তামার অপরিষ্কৃত চাপড়া আমেরিকার লেক সুপীরিয়র অঞ্চলে দেখা যায়। এই ধরনের ধাতু প্রাচীন যুগেই অথবা তৎপরবর্তী কালে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা আরম্ভ হয়ে যায়। তামা ও রাংএর মিশ্রধাতুর ব্যবহার অতি প্রাচীন। লৌহযুগের আগে এক রকমের কাঁসা থেকে অস্ত্রাদি তৈরি হত।

টাইটেনিয়ম জারকোনিয়ম ইত্যাদি পর্যাপ্ত ধাতু বিরল-ধাতুর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ যে তাদের নিষ্কাশন সহজ নয়। উপযুক্ত চাহিদা ও ব্যবহারক্ষেত্র জানা না থাকলে ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিতে নতুন ধাতু উৎপাদনের ঝুঁকি কেউ নিতে চান না, অথচ নিয়মিত উৎপাদন না করতে থাকলে পদ্ধতির উন্নতিসাধন হয় না, এবং সহসা নতুন দিকে কেউ তাকে ব্যবহার করার সাহসও পান না। এই উভসংশয় কাটিয়ে উঠতে গেলে এক পক্ষের সাহস দরকার। আমাদের আলোচ্য ধাতু চারটির উৎপাদন-শিল্প আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদেশের গভর্নমেণ্টের ঘনিষ্ঠ সহায়তার ফলে।

অল্পস্বল্প ধাতু অতীত যুগে তৈরি হত বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে এদের বিপুল পরিমাণে অবিরাম উৎপাদন বৈজ্ঞানিক যুগের যোজনা। বিজ্ঞানের মূল কথা হল, কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর যদি নিজের ধারণা বা ধ্যানশক্তির মধ্যে না খুঁজে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মধ্যে খোঁজা যায়, তাহলে সে উত্তর মৌন প্রকৃতির নানা সংকেতে ধরা পড়ে। সেই সংকেত আশ্রয় করে গত তিন শত বছরের মধ্যে প্রকৃতিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূবিদ্যা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ক্রমশঃ অনেকেই বুঝলেন প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি হল এই বিজ্ঞান। তখন সাধক থেকে সাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হল, তত্ত্বের সঙ্গে অর্থের সমন্বয়ে শিল্প গড়ে উঠল, এবং দেশে দেশে বিজ্ঞানচর্চা রাজানুগ্রহ লাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসল।

বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বণিগ্‌বৃত্তির সমবায়ে আরও পাঁচ রকম উদ্যমের সঙ্গে ধাতুশিল্পও আজ বিরাট আকার ধারণ করেছে। দিনে দিনে যেভাবে এক-এক ধাতুর নিষ্কাশন ও ব্যবহার বেড়ে চলেছে, তাতে ধরণীর ভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়া আর দূরভবিষ্য কল্পনা নয়। একটা উদাহরণ হাতের কাছে রয়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে যুদ্ধের তাগিদে আমেরিকা দেশের আকর থেকে ৩৬ লক্ষ টন দস্তা আহরণ করেছিল। ১৯৪৫ সালে এই হিসাব উল্লেখ করে মার্কিন দেশাভ্যন্তর-বিভাগের সেক্রেটারি টিপ্পনী করেন, "আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে আর-একটা বড় যুদ্ধ আমাদের আর করা চলবে না কারণ, এককথায়, আমাদের অত দস্তা নেই।" অবশ্য যুদ্ধ যদি কেউ করতে চায় তার দস্তার জন্য আটকাবে না। তবু কথাটা উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, এই ভাবী অনটনের ভয় থেকে, এবং আরও কতকটা আধুনিক যুগের নতুন নতুন ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে, অপ্রচলিত ধাতুদের নিষ্কাশন ও তাদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দশ বছরের মধ্যে অন্ততঃ দুটি নতুন ধাতু শিল্পজগতে সুপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে, টাইটেনিয়ম আর জারকোনিয়ম।

আর যে দুই ধাতু আমাদের আলোচ্য, তাদের ধাতু আকারে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হয় নি, তবে তাদের কোনো কোনো যৌগিক পূর্বে শিল্পে ব্যবহার করা হত। অথচ এই দুটি ধাতুর জন্যে জগতে এখন হুলস্থুল পড়ে গেছে। ইউরেনিয়ম থেকে আণবিক বোমা হয়, থোরিয়ম থেকেও একদিন কেউ করবে। দু-এক সের ইউরেনিয়ম পরমাণু ফাটিয়ে দশ-বিশ হাজার টন টি-এন্-টির সমপরিমাণ প্রলয়শক্তি সৃষ্টি করা যায়, ইত্যাদি অনেক পিলে-চমকানো বৈজ্ঞানিক সংবাদ অল্পবিস্তর এখন অনেকেরই শোনা হয়েছে। যা হোক প্রলয় হল চরম ব্যাপার, বোমা ফাটিয়ে তো দেশের নিত্যকার দুঃখ অভাব অক্ষমতা ঘুচবে না। অতএব প্রলয়শক্তির মধ্যে শক্তি কথাটাই ভাবী মানবের কাছে সত্য। আণবিক শক্তিকে তাপশক্তি বিদ্যুৎশক্তির মত কাজে লাগানো চাই।

সমগ্র দেশের সুখসমৃদ্ধি বাড়াতে গেলে মানুষের কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে প্রভূত অন্য শক্তির সহায়তা

লাগে। পুরাকাল থেকে গৃহপালিত পশুর দৈহিক বল কাজে লেগেছে, কিন্তু এ যুগে সে শক্তি যৎসামান্য, যদিও তুচ্ছ নয়। সূর্যকিরণে বিপুল পরিমাণ তেজ ও তাপশক্তি নিত্য পৃথিবীর উপর এসে পড়ছে কিন্তু দুই সহস্র বর্ষেও মানুষ এই শক্তি আহরণ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করতে তেমন সক্ষম হয় নি। দুই প্রকারের শক্তিকে মানুষ মোটামুটি সব ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহার করছে, রাসায়নিক শক্তি আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। কয়লা বাতাসে পোড়ালে অক্সিজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, ফলে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তাকে দিয়ে স্টীম উৎপাদন ক'রে নানারকম মেশিন চালানো হয়, যথা, রেলগাড়ির এঞ্জিন, স্টীম টার্বাইন। অথবা উঁচু থেকে ধরা জলকে মাধ্যাকর্ষণের বেগে নীচে পড়তে দিয়ে তজ্জনিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাতেও নানারকম মেশিন চলে এবং অন্য কাজ হয়। যে দেশের এলাকার মধ্যে বড় নদী উৎস থেকে সাগরে এসে পড়ছে, সে দেশে দ্বিতীয় পন্থায় শক্তি উৎপাদন করার সুযোগ আছে, যেমন ভারতবর্ষ, আমেরিকা, রাশিয়া। অন্য দেশ প্রধানতঃ কয়লা, পেট্রোলিয়ম এমন কি কাঠ ইত্যাদি দাহ্য বস্তু বাতাসে জ্বালিয়ে মুক্ত রাসায়নিক শক্তিকে সর্ব কাজে ব্যবহার করছে।

ভূগর্ভে প্রোথিত বৃক্ষাদি কোটি কোটি বছরে কয়লায় পরিণত হয়। বিপুল শক্তির ঘনীভূত উৎস এই কয়লা। ভূগর্ভে কয়লার ভাণ্ডার সুবৃহৎ, কিন্তু স্থানে স্থানে নিবদ্ধ, পরিমাণ কোথাও কম কোথাও বেশি। বছরে বহুশত কোটি টন কয়লা আজকাল তোলা হয়। হিসাবে প্রকাশ যে, এতাবৎ ব্যয়িত কয়লার বারো আনা অংশ গত পঞ্চাশ বছরে তোলা ও খরচ করা হয়েছে। এভাবে চললে কোনো কোনো দেশে অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহার্য শক্তির দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে ব'লে বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এবং সূর্যালোকের শক্তি আহরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বেলজিয়মের কয়লা এখনই প্রায় ফুরিয়েছে। ফ্রান্স ও ইটালির অবস্থাও মন্দ, জলপ্রপাতের শক্তি সাধ্যমত কাজে লাগিয়েও কয়লার ঘাটতি পূরণ করা যাচ্ছে না। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উদ্‌যোগের ফলে যদি কয়লার ব্যবহার আন্দাজ দশ গুণ বেড়ে যায় তবে আগামী পঞ্চাশ বছরে তারও জানা সমস্ত খনির কয়লা নিঃশেষিত হবে, এই মত ডক্টর মেঘনাদ সাহা লোকসভার সদস্যদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভারতে অবশ্য নির্ঝরশক্তির উৎপাদন সম্ভব, সে চেষ্টাও চলছে। এর সুবিধা যে প্রখর রৌদ্র ও হিমগিরির সহযোগিতার ফলে একে বার বার ফিরে পাওয়া যায়, কয়লার মত ফুরিয়ে যায় না, তবে মোটামুটি একটা বাঁধা পরিমাণ এবং সংকীর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইংলণ্ডে জলশক্তি উৎপাদনের সুযোগ নেই, সে দেশ বার্ষিক বিশ কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে তার ঘর গরম ও শিল্প চালু রাখছে। ইংলণ্ডের এখন কয়লার অভাব তত নয় যতটা কয়লা তোলার মজুরের। রাশিয়ার খবর আমার জানা নেই। রাশিয়া বাদ দিলে প্রাচ্যে একমাত্র চীনের ও প্রতীচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়লার সম্পদ প্রায় অপরিমিত বলা চলে।

রাসায়নিক শক্তি হল দুই বা ততোধিক বস্তুর অণুদের ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন শক্তি। কয়লার অণু অক্সিজেন অণুর সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে কার্বন মনো-অক্সাইড বা কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু হয়। পেট্রোলিয়মের অণু ও অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক যোগে জলের অণু এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু সৃষ্টি করে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন কণা হল অণু, রাসায়নিক ক্রিয়াতে এদের ভাঙাগড়া নিত্য চলছে। দেহমধ্যে খাদ্যের অণু বিশ্লিষ্ট হয়ে পেশীমধ্যে শক্তিসঞ্চার করছে। সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই যে শক্তি পাওয়া যায় এমন নয়, কোনো কোনো ক্রিয়া ঘটাতে তাপ বা বিদ্যুৎশক্তির যোগান দিতে হয়। যথা, বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন

-অণু মেঘ থেকে বিদ্যুতের শক্তি শোষণ করে নাইট্রিক অক্সাইডের অণু গঠন করে, এবং পরে বারিপাতের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড অবস্থায় জমিতে পৌঁছে নাইট্রেট সারে পরিণত হয়।

পরমাণুদের এক-এক ধরনের দলবন্ধনে এক-এক ধরনের অণুর তথা সমস্ত বস্তুজগতের সৃষ্টি হয়েছে। অক্সিজেনের দুই পরমাণু মিলিয়ে অক্সিজেনের অণু, কার্বনের এক আর অক্সিজেনের দুই পরমাণু মিলিয়ে এক কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু। পরমাণু সচরাচর মুক্ত অবস্থায় থাকে না, কোথাও থাকলে সেখানে পরমাণুকেই অণু বলা হয়, যেমন আর্গন গ্যাসের অথবা পারদ ধাতুর অণু। অণুর মধ্যে একাধিক পরমাণু রাসায়নিক শক্তিবলে যুক্ত থাকে। এক অণু অন্যে পরিবর্তিত হবার সময় তারই কিছু অংশ তাপ বা অপর শক্তির রূপে মুক্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নতুন অণুর মধ্যে পরমাণুদের যুক্ত রাখে। রাসায়নিক ক্রিয়ার আগে পরে সকল সময়েই পরমাণু সকল থাকে অক্ষত। শুধু ঘর বদলায়।

রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ অসামান্য। এক সের কয়লাকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করলে সেই তাপে বারো সের বরফ-গলা জলকে স্টীম করা সম্ভব, যদিও আসলে অতটা হয় না কারণ তাপ চারদিকে ছড়িয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু এক পরমাণু যখন ভেঙে অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত হয়, তার ফলে যুক্ত শক্তির মাত্রা রাসায়নিক শক্তিমাত্রার প্রায় দশ লক্ষ গুণ। এই শক্তিকে যথার্থ পারমাণবিক শক্তি বলা উচিত, তবে চলিত কথায় আণবিক শক্তি বলে। পরমাণু এত ক্ষুদ্র এবং তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কেন্দ্রস্থল এত নিরেট যে মানুষের চেষ্টায় পরমাণুকে টুকরো করা অতি অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের এক পরীক্ষায় এই ঘটনা প্রথম ঘটে। প্রায় বিশ বছর পরে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক ফার্সি, জর্মান বৈজ্ঞানিক হান ইত্যাদির গবেষণায় ইউরেনিয়মের পরমাণু খণ্ডিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং তজ্জনিত শক্তির বিপুল মাত্রার আন্দাজ ল্যাবরেটরির সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়ে।

তার পর থেকে ক্ষিপ্তপ্রায় বেগে অর্থশালী ও শক্তিকামী দেশসমূহে যে আণবিক গবেষণার গুপ্ত অধ্যায়ের আরম্ভ হয়, তার ফলস্বরূপ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংস। যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল। সকলে জানল আণবিক শক্তির ভাণ্ডার মানুষ খুলতে পেরেছে, সে ভাণ্ডার অপরিমিত। একটা অজ্ঞাত নতুন যুগে সভয়ে প্রবেশ করছি।

আপাততঃ শুধু ইউরেনিয়ম, আর সম্ভবতঃ থোরিয়ম, ধাতুর পরমাণু থেকে আণবিক শক্তি উদ্ধার করা গেছে। ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিস্ফোরণজাত শক্তিকে কিভাবে আণবিক চুল্লীর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার্য তাপ অবস্থায় বার করে নেওয়া যায়, সে পন্থা অনেকখানি জানা হয়েছে। তাপ থেকে স্টীম, স্টীম থেকে বিদ্যুৎ এই ভাবে আণবিক শক্তি কাজে লাগবে। কয়লা অথবা জলধারা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের তুল্য অথবা কম খরচ পড়বে কি না, তা প্রমাণসাপেক্ষ। তবু ইংলণ্ড এখনই আণবিক শক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদনে নেবে পড়েছে, কারখানা গড়ে তুলছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে সেই কারখানা পঞ্চাশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে বার্ষিক অন্ততঃ দুই কোটি টন কয়লার খরচ বাঁচাবে। এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি একটা দশ লাখ জনসংখ্যার মাঝারি শহরের মোটামুটি সকল প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের দেশে আণবিক শক্তি উৎপাদনের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, তবে এখনও খানিক অনিশ্চিত। ইউরেনিয়ম দেশে কত আছে জানা নেই। আণবিক শক্তির উৎপাদনে থোরিয়ম ধাতু কাজে লাগাতে আমরা পারব কি? কয়লার শীর্ণ ভাণ্ডার দেখে এই শক্তির এবং অন্যান্য সকল প্রকারের শক্তির

উৎপাদনে আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। ১৯৪৮ সাল থেকে গভর্নমেণ্ট-মনোনীত এক আণবিক শক্তি কমিশন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন অন্য দেশে আছে। এই কমিশনের দায়িত্ব হল আণবিক শক্তির উৎপাদন, গবেষণা ও আনুষঙ্গিক সর্ববিধ প্রচেষ্টার উদ্‌যোগ এবং সহায়তা করা। একটা ছোট আণবিক চুল্লী প্রথমে দেশে বসাতে হবে, তাতে কাজ করে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হবে তার সাহায্যে ক্রমশঃ বড় কাজ হাতে নেওয়া যাবে। যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ফ্রান্স ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে কিছু সহযোগিতা পাবার আশা আছে।

একটা ছোটখাট আণবিক চুল্লীতে কমবেশি দশ টনের মত অতিবিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম লাগবে। ইংলণ্ডের দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় পঞ্চাশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে বছরে ২০০ থেকে ২০০০ টন পর্যন্ত ইউরেনিয়ম লাগতে পারে। আমাদের দেশে ইউরেনিয়মের উৎপাদন বহু গুণ না বাড়াতে পারলে এ রকম বড় পরিকল্পনা করা নিরর্থক।

ইউরেনিয়মের বদলে থোরিয়ম ধাতুর ব্যবহারের কথা দেশে ও অন্যত্র অনেকে বলেছেন। আমেরিকায় এ সম্বন্ধে যা গবেষণা হয়েছে, অন্য দেশেও হয়ে থাকবে— তার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয় নি। থোরিয়ম পৃথিবীর কম দেশেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট আকর যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু সেই আকর (মনাজাইট) রপ্তানি করা গভর্নমেণ্ট আইন দ্বারা বন্ধ করায় ইংলণ্ড আমেরিকা ইত্যাদি দেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে জানা দুরূহ হবে বলে আশঙ্কা হয়। হয়তো নিজ চেষ্টাই সম্বল করতে হবে। সে চেষ্টায় সফল হলে অবশ্য ভারতবাসী আণবিক শক্তিতে প্রধান শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে গণ্য হবে সন্দেহ নেই। আপাততঃ ইউরেনিয়ম-চুল্লী অপরিহার্য, কারণ ইউরেনিয়মের সাহায্য বিনা সোজাসুজি থোরিয়ম ধাতু থেকে আণবিক শক্তি পাওয়া যায় নি।
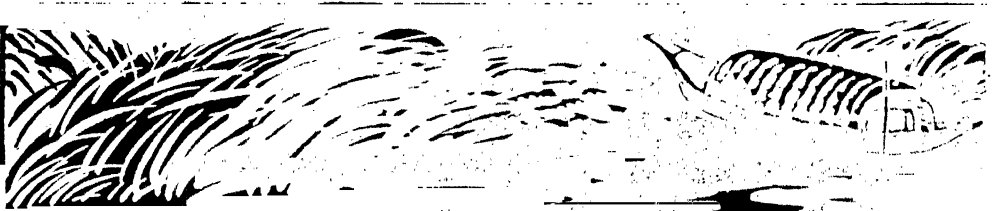
ব্রজবুলির কাহিনী

শ্রীসুকুমার সেন

বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস অন্তত পাঁচ শ বছর ধরে একটানা চলে এসেছে। এখানে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বৈষ্ণব গীতিকবিতা পাওয়া যাচ্ছে এবং ঐ গীতিকবিতা-রচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হয়ে এসেছে প্রায় অক্ষুণ্ণ ভাবে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই বৈষ্ণব পদাবলীর রচনার আরম্ভ নয়, তারও অনেক আগে থেকে তা শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনো নিদর্শন হস্তগত না হওয়ায় সে সম্বন্ধে অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। তবে সে অনুমান একেবারে ফাঁকা নয়। বাংলা দেশের লাগোয়া তীরহুত বা মিথিলায়—যা ছ-সাত শ বছর আগে লোকযাত্রায় বাংলা দেশের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না—সেখানে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ব-ইতিহাসের পদচিহ্ন রয়ে গেছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরানো বৈষ্ণব গীতিকবিতা যা আমরা পেয়েছি তা মিথিলায় লেখা চতুর্দশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে। মিথিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা হরিহরসিংহের এক মন্ত্রী উমাপতি ওঝা এই পদাবলী লিখেছিলেন। উমাপতির প্রায় এক শ পঁচিশ বছর পরে মিথিলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতিকে পাচ্ছি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম প্রধান রচয়িতা রূপে। বিদ্যাপতি কতগুলি পদ লিখেছিলেন তা জানি না, মনে হয় তা খুব বেশি নয়, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পুরানো ইতিহাসে তাঁকে বেদব্যাসের আসন দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাপতি যদি ব্যাস হন তাহলে বাল্মীকি চণ্ডীদাস। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের প্রকটকাল থেকেই বাংলায় চণ্ডীদাসকে আদি কবির সম্মান দেওয়া হয়েছে। আর তাঁর পরেই বিদ্যাপতি বন্দিত হয়ে এসেছেন। সেও শ্রীচৈতন্যের দরুন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এই নাম দুটি যে বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও রসায়ন দ্যোতনা করে এসেছে তার মূলে আছে এঁদের গানে শ্রীচৈতন্যের পরম প্রীতি।

নাম দুটির আরও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বাংলা দেশে যে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়ে এসেছে তাতে পরস্পর সম্পর্কিত অথচ পৃথক্ দুটি ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সোজাসুজি বাংলা, আর-একটি ঠিক বাংলা নয় কতকটা যেন হিন্দীর মত। এই দ্বিতীয় ভাষাটি ব্যাকরণে ছন্দে বাংলা থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র, তবুও ভাষা দুটির মধ্যে এতটা তফাত গোড়ার দিকে ছিল না যাতে পরস্পর অবোধ্য হয়। চণ্ডীদাস লিখেছিলেন প্রথম ভাষায় অর্থাৎ বাংলায়, বিদ্যাপতি লিখেছিলেন দ্বিতীয় ভাষায় যাকে আমরা এখন ব্রজবুলি বলে থাকি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেছিলেন, না, তাঁর মাতৃভাষা মৈথিলীতে। এর উত্তর একটু পরেই মিলবে।

ব্রজবুলি নামটি আধুনিক কালের। যতদূর মনে পড়ছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখায় এই নাম প্রথম পেয়েছি। কিন্তু নামটির ইতিহাস এত অর্বাচীন নয়। শংকরদেবের শিষ্য কবি মাধবদেব ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব পদাবলীর এই বিশিষ্ট ভাষা বা বাক্‌রীতিকে বলেছেন 'ব্রজাবলী'। প্রাচীন অসমীয়া শব্দ 'সোনাবলী' 'রূপাবলী' একদা বাংলা ভাষাতেও প্রচলিত ছিল, পরে শব্দ দুটি বাংলায় 'সোনালী' 'রূপালী' হয়েছে। এই অনুসারে প্রাচীন বাংলায় সম্ভাব্য শব্দ 'ব্রজাবলী' পরে হওয়া উচিত ছিল 'ব্রজালী'। তা হয় নি 'বুলি'

শব্দটির প্রভাবে অথবা সমাক্ষরলোপের জন্য। প্রথমে যা ছিল "ব্রজাবলী বোলি", পরে যা হওয়া উচিত ছিল "ব্রজালী বুলি", তা হয়ে পড়ল "ব্রজবুলি"। প্রাচীন পদকর্তারা ভাষাটিকে 'ব্রজাবলী' নাম দিয়েছিলেন এই স্বাভাবিক ধারণাবশে যে, এই প্রাচীন ধরনের ভাষাই বুঝি ছিল ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভাষা। তাঁরা এটাও জানতেন, যা ব্রজমণ্ডলের কথ্য ভাষা—অর্থাৎ ব্রজভাষা—তার সঙ্গে এই পদাবলীর ভাষার বেশ খানিকটা মিল আছে—উচ্চারণে ছন্দে এবং কিছু কিছু ব্যাকরণে। বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার যোগ ঘনিষ্ঠ হলে পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে খাস বৃন্দাবনের ব্রজভাষাতেও অল্পস্বল্প পদরচনা শুরু হয়। কিন্তু পদকর্তারা কখনো ব্রজবুলিকে ব্রজভাষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন নি।

এখন ব্রজবুলি ভাষার কিঞ্চিৎ স্বরূপ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ধরা যাক এই পদটি—

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা।
ঘর সঞে নিকসই যৈছন চোর
নিশবদ পথগতি চললিহ থোর।
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার।
লীলা-কমল উপেখলি রামা
মন্থরগতি চলু ধরি সখি শ্যামা।
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥

প্রথমেই লক্ষ্য করি উচ্চারণ। এখানে অকারান্ত শব্দের শেষে 'অ' লুপ্ত হয় নি। দীর্ঘস্বর পড়তে হয় টেনে টেনে। ছন্দে শ্বাসের ঝোঁক রয়েছে প্রবল। অনেক শব্দের চেহারা অপরিচিত, অ-বাংলা। যেমন—কাজর, রয়নি, তছু, যৈছন, থোর। করু, নিকসই, চললিহ, তেজল, উপেখলি, চলু, নিঃসরু, ভেল—এমন ক্রিয়াপদ বাংলায় অচল। শব্দরূপে কখনো বিভক্তি আছে, কখনো নেই। যেমন—যতনহি, থোর, ঘর সঞে নিকসলি, নিঃসরু নগর দুরন্তা। অঙ্গক—এমন সম্বন্ধ পদ বাংলায় নেই।

পদটিকে যদি খাঁটি বাংলায় পরিবর্তিত করি তবে ব্রজবুলির বিশিষ্টতা স্পষ্ট হবে—

কাজলের রুচিহারী রজনী বিশালা
তারপরে (=সেই কালে) অভিসার করে ব্রজবালা।
ঘর হৈতে বাহিরিল যেমন সে চোর
নিঃসাড়ে পথে গতি চলিয়াছে ধীর।
সুঅঙ্গের আভরণ বাসে অতি ভার
নূপুর কিঙ্কিণী আর তেজিল যে হার।
লীলা-কমল হাতে উপেক্ষিল রামা
মন্থরগমনে চলে ধরি সখী শ্যামা।
সযতনে নিঃসরিল দুরন্ত নগরে
শেখর সে আভরণ বহিয়া চলে রে।

এখানে প্রথমেই লক্ষ্য করি যে ব্রজবুলির দীর্ঘ স্বর বাংলায় হ্রস্ব হয়েছে এবং তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে

অতিরিক্ত অক্ষর বা শব্দ যোগ করে। তা ছাড়া পরিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াপদের, তার কিছু কম নামপদের। মানে সব না বুঝলেও কানে এইটুকু ধরা পড়ে যে ব্রজবুলিতে বচনভঙ্গি আঁটসাঁট ছন্দ খর-তাল, আর বাংলায় বচনভঙ্গি শিথিল ছন্দ ঢিমা-তাল। ব্রজবুলিতে ঝংকার আছে, বাংলায় আছে মীড়। গাঢ় কথাবন্ধ ও সুমিত ছন্দঝংকারের জন্যই কীর্তনে ব্রজবুলি পদ জমে উঠত অনায়াসে। সেকালে ব্রজবুলি পদাবলীর অক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তার রহস্য এইখানেই।

এখন প্রশ্ন হল ব্রজবুলির উৎপত্তি নিয়ে।

প্রায় বছর কুড়ি আগে আমি যখন ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস লিখি তখন ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে সর্বসমর্থিত গ্রীয়র্সনের মতই সমর্থন করেছিলুম। সে মত হচ্ছে এই যে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে পদ লিখতে গিয়ে বাঙালী পদকর্তারা জ্ঞাতসারে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ মৈথিলী ভাষা ব্রজবুলির জননী এবং বাংলা ভাষা তার ধাত্রী।

কিন্তু নানা কারণে এ মত এখন সমর্থন করতে পারছি না। প্রথমত, বিদ্যাপতির সময়ের মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্য আছে সে কথা সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে যে কিছু কিছু অসাদৃশ্যও আছে তাও সত্য। বিদ্যাপতির প্রায় এক শ পঁচিশ বছর আগেকার কবি উমাপতির পদাবলী আলোচনা করলেও সমসাময়িক মৈথিলী (গদ্য) ভাষার সঙ্গে পদাবলীর ভাষার পার্থক্য ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়ত, মৈথিলী পদাবলীর অনুকরণে তীরহুত-প্রত্যাগত বাঙালী কবির পদরচনার ফলে ব্রজবুলির সৃষ্টি—এটা নিছক অনুমান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা-তীরহুতের সংযোগ নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। মিথিলায় যেমন বাঙালী ছেলে পড়তে যেত, বাংলায়ও তেমনি মৈথিল ছেলে পড়তে আসত। পদাবলী রচনার শৈলী দু দেশেই সমান ছিল, অন্তত পক্ষে জয়দেবের দেশ বাংলায় তা কিছুতেই তীরহুতের চেয়ে কম ছিল না এমন মনে করা অসংগত নয়। এমন অবস্থায় মৈথিলী ভাষার ঠাট পুরাপুরি নিয়ে যে বাংলায় একটা নতুন কাব্যধারা সৃষ্টি হল দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—সে কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে করবার কারণ নেই। বরং বিপরীত ধারণার হেতু কিছু আছে। ব্রজবুলি যদি মৈথিলীর অনুকরণ হত তাহলে প্রথম দিকের রচনায় মৈথিলীর সঙ্গে মিল ঘনিষ্ঠতর হত এবং ক্রমশ সে মিল কমে আসত। আসলে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। বাঙালীর লেখা সবচেয়ে পুরানো পদাবলীতে দেখি যে, সেখানে মৈথিলীর সঙ্গে মিল ততটা ঘনিষ্ঠ নয় যতটা পরবর্তী কালের পদাবলীতে। গোবিন্দদাসের পূর্বগামীদের ব্রজবুলি রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান। এখন কি করে বলি যে ব্রজবুলির উৎপত্তি মৈথিলীরই অনুকরণে।

না হয় মৈথিলীর অনুকরণে না বলে বিদ্যাপতির অনুকরণেই বলা গেল। কিন্তু সেখানেও ঠেকা আছে। দু-চারটি ছাড়া বিদ্যাপতির পদাবলী সব বাংলা দেশেই মিলেছে। বিদ্যাপতির নাম ও কীর্তি বাঙালী বৈষ্ণব মহাজনেরাই বাঁচিয়ে রেখে বর্তমান কালে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলেই জানতেন, এবং তাঁরা খুব ভুল করেন নি। বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি পদাবলী লিখেছিলেন, আর ওঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুন রস ও শক্তি সঞ্চার করে গেছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে তার অনেকগুলিই এই বাঙালী বিদ্যাপতির রচনা মনে করতে বাধা নেই। যাঁরা পুরানো বাংলা সাহিত্যের খোঁজ রাখেন তাঁদের কাছে এ কথা নতুন

নয়। বাঙালীই হোক তীরহুতিয়াই হোক, কোনো এক বা একাধিক বিদ্যাপতির পদাবলী অনুসরণ ও অনুকরণ করে পদ লিখেছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ যত ব্যাপকভাবে এমন আর কেউ নয়; কিন্তু তাঁর আগে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবিরা বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখেছিলেন এই অনুমানের সমর্থনে বিচারসহ প্রমাণ কই।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় কৃষ্ণলীলা, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণলীলা। এ জিনিস মৈথিলী বা বাংলা কোনো বিশেষ একটি সাহিত্যের নিজস্ব সৃষ্টি বা ধার-করা সম্পত্তি নয়। দু সাহিত্যেরই এ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কবিতা খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে। এই চার-পাঁচ শ বছর ধরে আর্যাবর্তে অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত আর্যভাষী ভারতবর্ষের সর্বত্র সমসাময়িক কথ্য ভাষার সর্বভূমিক সাধুরূপ অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাষাকে সেকালের ও একালের পণ্ডিতরা নানা নামে অভিহিত করেছেন—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, অবহট্‌ঠ, দেশী, ভাষা, অর্বাচীন অপভ্রংশ, ইত্যাদি। এর মধ্যে অবহট্‌ঠ নামটিই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়। সমসাময়িক রচনায়ও এই নামটি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর অব্যবহিত পূর্বতন রূপ বিদ্যমান ছিল অবহট্‌ঠে—এ অনুমান অপরিহার্য। অবহট্‌ঠ কবিতায় আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়-ঘটিত পূর্বসূত্র পাচ্ছি। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে উদ্ধৃত এই নৌকালীলার কবিতাটি সুপরিচিত। রাধা যমুনা পার হচ্ছেন কৃষ্ণের নৌকায়। মাঝনদীতে কৃষ্ণ ভয় দেখাচ্ছেন নৌকাটিকে টলমল করিয়ে। রাধা ভয় পেয়ে বলছেন—

অরে রে বাহহি কাহ্নু নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি নঈহি সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

ওরে কৃষ্ণ, নৌকা ঠিকমত বাও, টলমলানি ছাড়, নদীতে ডুবিয়ে আমাকে দুর্গতি দিও না। তুমি এই নদীতে পার করে দিয়ে তার পর যা চাও তা নিও।

এক প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থের বাঙালী লেখক অপভ্রংশ ছন্দের উদাহরণ বলে একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এটিতে বাংলা দেশে অবহট্‌ঠে লেখা রাধাকৃষ্ণলীলা-কবিতার সবচেয়ে পুরানো ও দুর্লভ নমুনা পাই। কৃষ্ণ এসেছেন রাধার কাছে তাঁর বাড়িতে। রাধা তাঁকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটলেন। তাতে জানিয়ে দিলেন কৃষ্ণ যেন বৃন্দাবনের কোনো একটি বিশেষ নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করেন, তিনি একটু পরেই গিয়ে মিলিত হবেন।

রাই দোহড়ী পঢ়ণ সুনি হসিউ কাহ্নু গোআল।
বৃন্দাবন ঘন কুঞ্জঘর চলিউ কমন রসাল॥

রাইয়ের দোহা পড়া শুনে কানু গোয়াল হাসলেন আর বৃন্দাবনের কোনো এক নিভৃত কুঞ্জঘরের দিকে কেমন রসাল মনে চললেন।

যে উদাহরণ দুটি দেওয়া গেল তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর বস্তুর পূর্ব-ইতিহাসটুকু আছে, গীতিকবিতার পরিপূর্ণ রূপটি নেই। কিন্তু সে রূপ যে অবহট্‌ঠ সাহিত্যেও দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ জয়দেবের পদাবলী। জয়দেবের পদাবলী সংস্কৃতে লেখা কিন্তু তার ঠাট সংস্কৃতের নয়। সে ঠাট অবহট্‌ঠের ও প্রাচীন বাংলার।

প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতিতে আর জয়দেবের পদাবলীতে একই রূপ পাই। অবহট্‌ঠেও মিলছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকের একরকম সাধনসংগীতে—যাকে তাঁরা বজ্রগীতি নাম দিয়েছিলেন। বজ্রগীতির একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি। এর মধ্যে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের প্রেমরসাবেশের গাঢ়তা অনুভূত হবে। তবে নায়ক-নায়িকার ভূমিকা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর বিপরীত।

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা মানিনী কৃষ্ণ অনুনয়শীল, বজ্রগীতিটিতে নিরঞ্জন শূন্য মহাপ্রভু নিদ্রানির্ভর নৈরাত্মা যোগিনী অনুনয়শীলা। যোগিনী সুপ্ত নিরঞ্জনকে জাগাচ্ছেন এই বলে—

কিচ্চেঁ নিচ্চঅ বিসাঅ-গউ
লোঅ নিমন্তিঅ কাইঁ
তহ বত্তা ণ জই সম্ভরসি
উট্‌ঠহি সকল বিসাইঁ।
কজ্জ অপ্পাণ বি করিঅ পিঅ
মা কর সুন্ন বিছিত্ত
ভব ভঅ পড়িয়া সকল জন্ম
উঠ্‌ঠহি জোইনি-মিত্ত।
পুর্ব পইজ্জহ সম্ভলসি
মা কর কাজ্জ-বিসাউ
তই-অথ মিল্ল সঅল জণ্
পত্তিঅউ জগ অবসাউ।
মিচ্ছেঁ মাণ মা করেহি পিঅ
উঠ্‌ঠই সুন্ন-সহাব
কামহি জোইনি-বিন্দ তুঈ
ফিট্টউ অহবা ভাব।

নিত্যকৃত্যে বিষাদগত হলে কেন তুমি লোক নিমন্ত্রণ ক'রে, সে খবর যদি স্মরণ না কর সকলে বিষাদে উঠে যাবে। হে প্রিয়, নিজের কাজ তো করতে হবে, অতএব শূন্য বিক্ষিপ্ত কোরো না। সকল লোক ভবভয়ে পতিত। হে যোগিনী-মিত্র, ওঠ তুমি। পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, কাজে বিমুখ হোয়ো না। তোমার তরে সকল জন মিলেছে, এখন জগতের অবসাদ দূর হোক। প্রিয়, মিছামিছি মান কোরো না শূন্যস্বভাব অবলম্বন ক'রে। যোগিনীবৃন্দকে কামনা কর, অথবা ভাব দূর হোক।

এই অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা মৈথিলী হিন্দী রাজস্থানী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাগুলি অল্পবিস্তর পূর্ণপরিণত রূপ ধরবার পরেও অবহট্‌ঠের আদর কমে নি দরবারী সাহিত্যে, বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে। এই পরবর্তী অবহট্‌ঠ, যার উপর মৈথিলী প্রভৃতি স্থানীয় ভাষার প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি রূপ নিয়েছিল। সুরদাস প্রভৃতি প্রাচীন ব্রজভাষা-কবিদের রচনায় যে অল্পস্বল্প অ-হিন্দী শব্দ ও পদ আছে তা এই পরবর্তী অবহট্‌ঠ বা প্রাচীন ব্রজবুলি যাই বলি-না কেন তার। সুতরাং ব্রজবুলি কোনো প্রদেশবিশেষের সম্পত্তি নয়, তা আর্যভাষার সাধারণ সম্পত্তি এবং এক হিসাবে কনিষ্ঠতম সর্বভারতীয় সাধু আর্যভাষা।

বিদ্যাপতি অর্বাচীন অবহট্‌ঠে গদ্যে পদ্যে একখানি বই লিখেছিলেন—কীর্তিলতা। তার মধ্যে এমন

অনেক অংশ আছে যা স্বচ্ছন্দে ব্রজবুলি বলে নেওয়া যায়। এর থেকে অবহট্‌ঠ ও ব্রজবুলির মধ্যেকার অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অভ্রান্ত প্রমাণ মিলছে। যেমন—

পাএঁ চলু দুঅও কুমর, হরিহরি সব হুমর।
বহুল ছাড়ল পাটি পাঁতরেঁ, বসল পাএল আঁতরে আঁতরে।
জহাঁ জাইঅ জেহে গাঞো, ভোগাই রাজাক বড়ি নাঞো।
কেহু কাপর কেহু ঘোর, কেহু সম্বল কেহু থোর।
কাহু পাতী ভেলি পৈঠি, কাহু সেবক লাগু ভৈঠি।
কেহু দেল ঋণ উধার, কেহ করলহি নদী পার।
কেহু ওবহল ভার বোঝ, কেহু বাট কহল সোঝ।
কেহু আতিথ বিনয় করু, কতক দিবস বাট সন্তরু।

দুই কুমার পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। সকলে হরি হরি স্মরণ করলে। বহু পত্তন ও প্রান্তর ছাড়লেন, স্থানে স্থানে বিশ্রাম পেলেন। যেখানে যে গাঁয়ে যান সর্বত্র ভোগীশ্বর রাজার বড় নাম। কেউ কাপড় দিলে, কেউ ঘোড়া। কেউ প্রচুর অর্থ দিলে, কেউ অল্প। কোথাও প্রবেশ করতে লাইন দিতে হল, কোথাও সেবক ভেট দিতে লাগল। কেউ দিলে ঋণ ধার, কেউ করে দিলে নদী পার। কেউ বয়ে দিলে ভার বোঝা, কেউ বলে দিলে রাস্তা সোজা। কেউ বিনয়ে আতিথ্য জানালে। কতক দিনে পথ চলা শেষ হল।

ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল তীরহুত মোরঙ্গের রাজসভায়। তুর্কি আক্রমণের ফলে দক্ষিণ বিহার ও বাংলা বেশ কিছুকালের জন্য রাজসভা-পুষ্ট সাহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কবিপণ্ডিতেরা আশ্রয় পেয়েছিলেন নেপালে তীরহুতে মোরঙ্গে। তাই ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে সাহিত্য-চর্চার খোঁজ ঐ সব দেশের রাজসভার কাহিনীর মধ্যে গুপ্ত ও লুপ্ত হয়ে গেছে। নেপালের রাজসভায় বাংলা বিহার কাশী ও অন্যান্য দেশ থেকে কবিপণ্ডিতেরা আসতেন এবং সাদরে গৃহীত হতেন। তাঁদের দ্বারাই বিবিধ দেবলীলাগীতি পরিপুষ্ট হতে থাকে। অনেকের ধারণা আছে যে কৃষ্ণলীলা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত। সে কথা ঠিক নয়। তিন হাজার বৎসর আগে কি ছিল বলতে পারি না, তবে আড়াই হাজার বছর ধরে কৃষ্ণলীলা-সাহিত্যের যে ইতিহাস পাচ্ছি তাতে কৃষ্ণলীলাগীতিকে লোকসাহিত্য বলা যায় না। লোক-সাহিত্য তাকেই বলি যা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় এবং যে রচনায় কোনো রকম সাহিত্যিক ছাঁদ অনুসৃত হয় নি। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসমাজে চলিত হলেই তা লোকসাহিত্য হবে এমন কথা নেই। সাহিত্যে ও শিল্পে কৃষ্ণলীলাকাহিনী বরাবর মুখ্যস্থান পেয়ে এসেছে। কৃষ্ণের কংসনিধন-কাহিনী পাণিনি থেকে শুরু করে পতঞ্জলির সময় পর্যন্ত যে কথকতার ও অভিনয়ের একটি প্রধান বিষয় ছিল তার প্রমাণ আছে। গোটা মহাভারতটাই প্রমাণ করছে সাহিত্যে কৃষ্ণমাহাত্ম্যের সর্বাতিশায়িত্ব। গুপ্তযুগের শিল্পে কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ কাহিনী সবিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কৃষ্ণের গোপীলীলাও অর্বাচীন নয়। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর উপলক্ষ্যে কালিদাস যে ভাবে বৃন্দাবনের ও গোবর্ধনগিরির উল্লেখ করেছেন তাতে দৃঢ় ধারণা হয় যে বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমবিলাস তাঁর সময়ে অজ্ঞাত ছিল না।

সুনন্দা ইন্দুমতীকে শূরসেনের রাজা সুষেণের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর গুণ বর্ণনা করছে—

সম্ভাব্য ভর্তারমমুং যুবানং মৃদুপ্রবালোত্তরপুষ্পশয্যে।
বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে নির্বিশ্যতাং সুন্দরি যৌবনশ্রীঃ॥

এই যুবাকে পতি রূপে বরণ করে, হে সুন্দরি, তুমি চিত্ররথের উদ্যানের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয় যে বৃন্দাবন যেখানে কোমল পল্লব আস্তৃত পুষ্পশয্যায় যৌবনশ্রী সফল কর।

অধ্যাস্য চাম্ভঃপৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্ধনকন্দরাসু॥

বর্ষায় গোবর্ধনের রমণীয় গুহাগুলিতে জলকণাসিক্ত, শিলাজতুর গন্ধময় শিলাতলে বসে তুমি ময়ূরের নাচ দেখো।

গোবর্ধন পর্বতের যা অবস্থা তাতে সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছাড়া বাসযোগ্য গুহার কল্পনা কোনো কবির সাধ্য নয়।

বাংলা দেশে সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকতার সূত্রপাত পাল-রাজাদের সময় থেকে। সে সময়ে শিল্পে কৃষ্ণলীলার প্রাধান্যের পরিচয় আবিষ্কৃত হয়েছে পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিচিত্রাবলীতে। সাহিত্যে তার সাক্ষ্য রয়েছে বহু প্রকীর্ণ শ্লোকে এবং 'রাধা', 'সত্যভামা', 'উৎকণ্ঠিত মাধব' প্রভৃতি অধুনালুপ্ত নাট্যরচনার নামাবলীতে।

সেন-রাজাদের আমলে, বিশেষ করে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক রচনা সবিশেষ উৎকর্ষ পায়। লক্ষ্মণসেন নিজে, তাঁর পুত্র ও আত্মীয়রা কবিতা লিখতেন, তাঁর সভাকবিরা কৃষ্ণলীলা-কবিতা লিখতে উৎসাহিত হতেন। একজন সমসাময়িক বড় কবি উমাপতিধর, লক্ষ্মণসেন তাঁর পিতা বল্লালসেন ও পিতামহ বিজয়সেন—এই তিন পুরুষের আমলে দীর্ঘকাল ধরে মহামন্ত্রিত্ব করেছিলেন। বলতে গেলে সেন-রাজত্বের ঐশ্বর্যের মূল স্তম্ভ ছিলেন তিনি। এই উমাপতিধর অনেক ভালো শ্লোক লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্। আমরা জানি যে শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীতে একটু বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন, রাধাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় করে ধরেছিলেন। মথুরা ও দ্বারকা লীলার অনেক ঊর্ধ্বে বৃন্দাবনলীলা—এ তত্ত্বও তিনি (বা তাঁর মুখ্য ভক্তরা) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উমাপতিধরের কবিতায় এই তত্ত্বেরই নিশ্চিত পূর্বাভাস রয়েছে।

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পায়ান্ মসৃণযমুনাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ॥

প্রায় আড়াই শ বছর আগে এক কবি শ্লোকটির এই অনুবাদ করেছিলেন—

রত্নাকর মাঝে সাজে দ্বারাবতী পুরী
নানারত্নময় অতি শোভা মনোহারী।
তথি অতি উচ্চ দীপ্ত মন্দির সুঠান…
নানাচিত্রময় হয়ে সমুদ্র মাধুরী।
সে মন্দির মাঝে চিত্র শয্যা বিরচিত
তথি বিলসয়ে কৃষ্ণ রুক্মিণী সহিত।
আলিঙ্গনে প্রবল পুলক অঙ্গে হয়
তথাপি কৃষ্ণের চিত্তে নহে সুখোদয়।
শীতল যমুনাতীর বানীর কুঞ্জেতে
রাধা কেলি ভর পরিমল স্মরণেতে।

কান্তা আলিঙ্গিত সেই শয্যার উপরি
স্পন্দন বিহীন মূর্চ্ছাপন্ন সে মুরারি।
উমাপতিধর নামা কবির রচনে
সেই মূর্চ্ছা করু বিশ্বজীবন রক্ষণে॥

বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল লক্ষ্মণসেনের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁরই সভায়। গীতগোবিন্দ-পদাবলী যে তাঁর আসর জমাত সে কথা নিছক অনুমান নয়। লক্ষ্মণসেনের পুত্রের অনুশাসনে তার কিছু সাক্ষ্য মিলবে। পিতার প্রাত্যহিক কার্যাবলীর প্রসঙ্গে বিশ্বরূপসেন বলেছেন—

প্রত্যুষে নিগড়স্বনৈর্নিয়মিতপ্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরটিপ্রোদ্গালঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনীজনরণন্মঞ্জীরমঞ্জুধ্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ।

প্রত্যূষে বন্দী বৈরী রাজাদের শৃঙ্খলঝংকারে, মধ্যাহ্নে গঙ্গায় জলপানের জন্য ধাবমান হস্তিগণের উৎকট ঘণ্টারবে, সন্ধ্যায় নটীদের কিঙ্কিণী-নূপুরের মধুর নিক্বণে যিনি তিন সন্ধ্যা আকাশকে বিচিত্রশব্দমুখরিত করে সকল করতেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হবার পরে বৈষ্ণব গীতিকাব্যের এই সভাসিদ্ধ প্রথা চলে আসে নেপালে তীরহুতে ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত-সভায়। নেপালে ব্রজবুলি পদাবলীর চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল। নেপালের রাজারাও ব্রজবুলিতে পদ লিখতেন। যেমন, শ্রীনিবাসমল্লের রচনা—

উপমিঅ আনন নীরজ-পঙ্কজ শশধর দিবস-মলিনে
ভৌঁহ অনুপম অধর সোহাঞন নবপল্লবরুচি জিনে।
শুন পেঅসি কী মোর পরল গরুঅ অপরাধে
দহ মলয়ানিল জার কলেবর ন কর মনোরথ বাধে॥

নেপালের রাজসভায় যে ব্রজবুলির চর্চা হত তা বাংলার প্রভাব-বর্জিত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা এই পদটিতে এই অনুমানের সমর্থন মিলবে—

সঘন বরিষে মেহা সুমরি সুবন্ধু-নেহা
জীব ছুটুপুটু নীদ না আএ বিরহ দগধ দেহা।
মন পংখি হয়া যাইব জাহা গিয়া লাগ পাইব
হাতে ধরিয়া পাএ পড়িয়া গলায় তুলিয়া লইব।
চন্দন চির ন ভাএ কুসুম-সাজ শুখাএ
অঙ্গ মোরি মোরি আঙ্গন ঠারি মন চৌদিক ধাএ।

মিথিলায় ব্রজবুলি প্রথম পাওয়া গেল চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় উমাপতি ওঝার লেখায়। রাজা হরিহর-সিংহের রণজয় উপলক্ষ্যে ইনি পারিজাতমঙ্গল নামে একটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন সংস্কৃতে। তাতে যে কটি গান দিয়েছিলেন তা সবই ভাষায় অর্থাৎ ব্রজবুলিতে লেখা পদ। পদগুলি সবই চমৎকার। তার মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাপতির রচনায় প্রবেশ করেছে।

একটি উদাহরণ দিই। সখী সুমুখী কৃষ্ণের কাছে মালিনী সত্যভামার বিরহাবস্থার বর্ণনা করছে—

কি কহব মাধব তনিক বিশেষে, অপনহু তনু ধনি পাব কলেশে।
অপনুক আনন আরসি হেরি, চাঁদক ভরম কাঁপ কত বেরি।
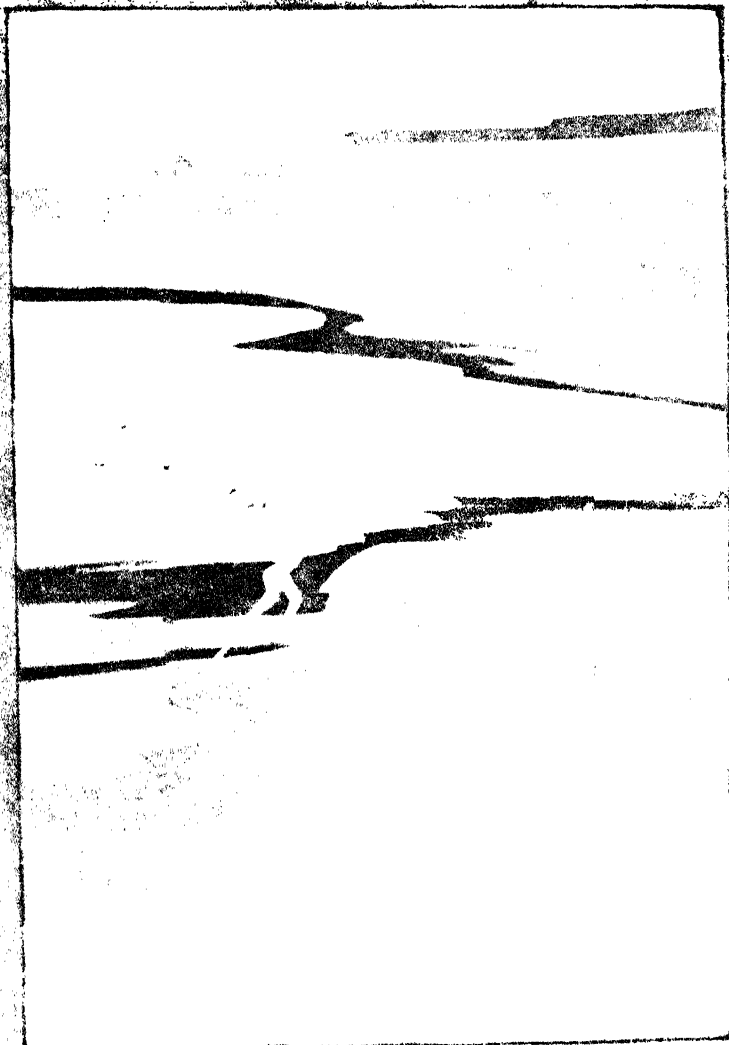
যাত্রা　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভরমহু নিঅকর উর পর আনি, পরসই তরস সরসীরুহ জানি।
চিকুরনিকর নিঅ নয়ন নিহারি, জলধরজাল জানি হিয় হারি।
অপন বচন পিকরব অনুমানে, হরিহরি তেহ পরিতেজয় পরানে।
মাধব আবহু করিও সমধানে, সুপুরুষ নিঠুর ন রহয় নিদানে।
সুমন্তি উমাপতি ভন পরমানে, মাহেশরি দেই হিন্দুপতি জানে॥

মাধব, তার সম্বন্ধে আর কি বেশি বলব। আপনার দেহ নিয়ে ধনী কষ্ট পাচ্ছে। আরশিতে নিজের মুখ দেখে সে চাঁদ ভ্রম ক'রে কতবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিজের হাত বুকের উপর পড়লে পদ্মকোরকের স্পর্শ মনে করে ভয় পায়। নিজের কেশরাশি চোখে দেখে সে মেঘাড়ম্বর মনে করে হৃৎকম্প বোধ করে। আপনার বাক্য শুনে কোকিল-রব অনুমান করে এবং প্রাণত্যাগ করতে যায়। হে মাধব, এখনি মীমাংসা কর। সুপুরুষ কখনো শেষ পর্যন্ত নিঠুর রয় না। সুমন্ত্রী উমাপতি প্রমাণবাক্য বলছে, তা জানে মাহেশ্বরী দেবীর পতি হিন্দুপতি।

উমাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর লোক, বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীর। তাঁর কথা সুবিদিত। পুনরুক্তি অনাবশ্যক। এই তো গেল মিথিলায় ব্রজবুলির কথা। ব্রজবুলি পদাবলীর রীতি পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় উড়িষ্যায় এবং আসামে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলায় এ রীতি যেমন স্থায়ী ও ফলবান্ হয়েছিল এমন অন্যত্র নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা বলে নিতে পারি পুরানো ব্রজবুলি পদ উড়িষ্যায় একটি মাত্র পাই। সেটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখাও হতে পারে। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের এক প্রধান কর্মচারী ছিলেন রামানন্দ রায়। কবি পণ্ডিত এবং রসিকভক্ত বলে শ্রীচৈতন্য এঁকে খুব সমাদর করতেন। রামানন্দ রায় জগন্নাথবল্লভ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। তাতে অনেকগুলি সংস্কৃত গান দিয়েছিলেন জয়দেবের ধরনে। ইনি ব্রজবুলি পদও লিখতেন। তার একটিমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সেই পদটির প্রথম দু ছত্র নিশ্চয়ই জানেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।

রামানন্দ রায় ছিলেন রাজসভাপুষ্ট কবি তাই ভনিতায় রাজার নাম—

বর্ধন রুদ্রনরাধিপ মান
রামানন্দ রায় কবি ভান॥

বাংলায় সবচেয়ে প্রাচীন যে ব্রজবুলি পদটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি হুসেন শাহার এক কর্মচারী যশোরাজ-খানের লেখা। পদটির মধ্যেই কবির ও কবির মনিবের পরিচয় লভ্য। কৃষ্ণ গোষ্ঠ থেকে ফিরছেন, রাধিকা উৎকণ্ঠিত হয়েছেন তাঁকে চক্ষুগোচর করতে। সখী কৃষ্ণকে সে কথা বলছেন—

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত আর সহজই গোর
হিম-ধরাধর কনকভূধর কোলে মিলল জোর।
মাধব তুয়া দরশন-কাজে
আধপদচারি করিঞা সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে।
দাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত ধবল রহল বাম
নীলধবল কমল যুগলে পুজল কত কাম।
শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সোই এ রস জান
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভনে যশোরাজখান॥

এক পয়োধর চন্দনচর্চিত অপরটি স্বাভাবিক গৌরবর্ণ, যেন হিমালয় ও কনকাচল কোলে জোড় মিলেছে। হে মাধব, তোমার দর্শনের জন্য সুন্দরী রাধা আধ পায়চারি করছে বাহির দেউড়িতে। তার ডান চোখে কাজল বাঁ চোখ শাদা, যেন নীল সাদা দুই পদ্ম দিয়ে কামের কত পূজা হয়েছে। জগতের ভূষণস্বরূপ ঐশ্বর্যে ইন্দ্রতুল্য পঞ্চগৌড়ের রাজা শ্রীযুক্ত হুসন, তিনিই এ রস জানেন। এ কথা বলছে যশোরাজখান।

এই হুসেন শাহা ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহার দরবারে এক বড় কবিকে পাই, যিনি কবিশেখর ও বিদ্যাপতি ভনিতা নাম দিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ লিখেছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল গৌড়-দরবারে সভাকবিত্ব করেছিলেন কেননা একটি পদে হুসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান, হুসেন শাহার এক পুত্র, গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহার উল্লেখ পাই।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিসময়ে ব্রজবুলি তথা বৈষ্ণব পদাবলীতে নূতন জীবন সঞ্চার করলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন জীবগোস্বামী। গোবিন্দদাসের ব্রজবুলি রচনায় দেখা গেল মুখ্যভাবে শব্দঝংকার ও ছন্দ-চপলতা এবং সেই সঙ্গে ভাবের সংহতি ও ভাষার গাঢ়তা। একটি পদের ভনিতায় গোবিন্দদাস বলেছেন—

রসনারোচন শ্রবণবিলাস,
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

এ কথা এঁর রচনায় সর্বথা যথার্থবাদ। গোবিন্দদাসের দুটি পদ উদ্ধৃত করছি। বর্ষার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনী, রাধা অভিসারে উদ্যত। সখী নিষেধ করলে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট, চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তহি অতি দূরতর বাদলদোল, বারি কি বারই নীল নীচোল।
সুন্দরি কইছে করবি অভিসার, হরি রহ মানস-সুরধনী পার।
ঘনঘন ঝনঝন বজর নিপাত, শুনইতে শ্রবণমরম জরি যাত।
দশদিশ দামিনী-দহন বিথার, হেরইতে উচকই লোচন-তার।
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ, প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার, ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

ঘরের বাহিরে যেতে কঠিন দরজা, চলতে গেলে রাস্তায় কাদা। তাতে অত্যন্ত ঝঞ্ঝাবাদল। নীল নিচোলে কি জল আটকাবে? সুন্দরি, অভিসারে তুমি যাবে কি করে। কৃষ্ণ তো রয়েছেন মানসগঙ্গার ওপারে। ঘনঘন ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজ পড়ছে, শুনলে কানের মর্মভেদ হয়। দশদিকে বিদ্যুতের আগুন বিস্তৃত, দেখলে চোখের তারা ঠিকরে পড়ে। এতেও যদি সুন্দরী গৃহত্যাগ করিস তাহলে প্রেমের জন্যে দেহত্যাগ করবি। গোবিন্দদাস বলছে—এতে বিচারবিবেচনার কিছু নেই। যে বাণ ছোঁড়া হয়েছে অশেষ চেষ্টা করলেও তা আর ফেরে না।

উত্তরে রাধা সখীকে বলছেন—

কুলমরিযাদ-কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠকি বাধা,
নিজ মরিযাদ-সিন্ধু সঞে পঙরলু তাহে কি তটিনী অগাধা।
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর,
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর তাহে কি জলদজল লাগি,
প্রেমদহনদহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি।

বন্ধু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু তাহে কি তনু অনুরোধ,
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ সহচরী পাওল বোধ।

কুলমর্যাদারূপ কপাট উদ্‌ঘাটন করেছি আমি, তার কাছে কি কাঠের বাধা লাগে? নিজ মর্যাদারূপ সমুদ্র পেরিয়েছি আমি, তার কাছে কি ছোট নদী অগাধ? সখি, আমাকে পরখ করা ছাড়। কেমন মন নিয়ে কৃষ্ণ আমার পথ চেয়ে আছেন সে কথা ভেবে ভেবে মন কাঁদছে। কোটি কোটি কুসুমশর যার উপর বর্ষিত হচ্ছে তাকে কি মেঘের জল লাগে? প্রেমের দাবদাহ যার হৃদয় সইছে তার কাছে বজ্রাগ্নি কিছু নয়। যার পদতলে নিজের জীবন সঁপেছি তার কাছে কি শরীরের দায়? গোবিন্দদাস বলছে—থামো রাধা, সখী বুঝতে পেরেছে।

আসামে শংকরদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রজবুলি পদাবলী রচনা করে কামতা-কামরূপকে মাতিয়েছিলেন। আসামের প্রথম বৈষ্ণব-পদকর্তা শংকরদেব। এঁর রচনায় ভক্তির প্রকাশই মুখ্য। শংকরদেবের ব্রজবুলি পদে ভাষার বিশুদ্ধির সঙ্গে ভাবের গাঢ়তা আর ছন্দের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। যেমন এই পদটিতে—

সোই সোই ঠাকুর মোই জো হরি পরকাসা,
নাম স্মরত রূপ ধরত তাকেরি হামু দাসা।
পণ্ডিতে পঢ়ে শাস্ত্র মাত্র সার ভকতি লিজে,
অন্তর জল ফুটয় কমল মধু মধুকর পিজে।
জাহে ভকতি তাহে মুকতি ভকতে তত্ত্ব জানা
জৈছে বণিক চিন্তামণিক জানি গুণ বখানা।
কৃষ্ণকিঙ্কর কহ শঙ্কর ভজ গোবিন্দক পায়ি
সোহি পণ্ডিত সোহি মণ্ডিত যো হরিগুণ গায়ি॥

সেই— সেই আমার ঠাকুর, যে হরি সর্বত্র প্রকাশিত। নাম স্মরণ করে রূপ ধ্যান করে আমি তাঁরই দাস। পণ্ডিতে শুধু শাস্ত্র পড়ে; সার নিতে হয় ভক্তি। জলের মধ্যে কমল ফোটে, সে মধু খায় মধুব্রত। যাতে ভক্তি তাতেই মুক্তি—ভক্ত জানে এ তত্ত্ব, যেমন বণিক চিন্তামণি জেনে তার গুণ বর্ণনা করে। কৃষ্ণকিংকর শংকর বলে— গোবিন্দের চরণ ভজনা কর। সেই পণ্ডিত, সেই সফলজীবন যে হরিগুণ গায়।

মাধবদেবের কোনো কোনো ব্রজবুলি পদে হিন্দীর ছাপ পড়েছে। এই প্রার্থনা-পদটি মীরাবাঈয়ের রচনা স্মরণ করায়—

গোবিন্দ দীনদয়াল স্বামী, তুহুঁ মেরি সাহেব চাকর হামি
কাকু করিয়ে তুয়া চরণে লাগোঁ, অরুণ চরণে চাকেরি মাগোঁ।
তেরি চরণে মেরি পরণাম, চাকেরি মাগো-নাহি আন কাম।
আপুন করমে জনম যাহাঁ হোই, তাহেঁ তুয়া চরণে চাকর রহুঁ মোই।
মাধবদাস কহয় মতিহীনা, গতি মেরি নাহি তুয়া পদ বিনা॥

বাংলায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ব্রজবুলি একটু বাঁকা পথ নিলে পদ ও ইডিয়মের ব্যবহারে শিথিলতায়। এর মূলে অবশ্যই খানিকটা ছিল নূতনত্বের প্রয়াস আর খানিকটা ছিল অনভিজ্ঞতা। ফল কিন্তু খুব খারাপ হয় নি। পদাবলীর ধারাবাহিক একঘেয়েমির মধ্যে ভাষায় ও ছন্দে একটু তরলতার নবীনত্ব আনলে। তার সাহিত্যিক মূল্য বেশি কিছু নয়, তবে কীর্তনগানে নূতন রস সঞ্চারিত হয়েছিল। যেমন শশিশেখরের এই পদ, কৃষ্ণবিরহিণী রাধার দশম দশার বর্ণনা—

অতিশীতল	মলয়ানিল	মন্দ-মধুর-বহনা,
হরিবৈমুখি	হামারি অঙ্গ	মদনানলে-দহনা।
কোকিলকুল	কুহুকুহরই	অলি ঝংকরু কুসুমে,
হরিলালসে	তমু তেজব	পাওব আন জনমে।
সব সঙ্গিনী	ঘেরি বৈঠলি	গাওত হরিনামে,
যৈখনে শুনে	তৈখনে উঠে	নবরাগিণী গানে।
ললিতা কোরে	করি বৈঠত	বিশাখা ধরে নাটিয়া,
শশিশেখরে	কহে গোচরে	যাওত জিউ ফাটিয়া॥

অতিশীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বইছে, তাতে হরিবিমুখ আমার অঙ্গ মদনানলে বেশি করে পুড়ছে। কোকিলকুল কুহুরব করছে, কুসুমে অলি ঝংকার করছে। কৃষ্ণলালসায় আমি তনুত্যাগ করব এবং অন্য জন্ম পাব তাঁর সঙ্গে মিলবার জন্য। এই কথা বলতে বলতে রাধা মূর্চ্ছা গেলেন। সঙ্গিনীরা সব ঘিরে বসে হরিনাম গাইতে লাগল। যেই কৃষ্ণনাম কানে যায় অমনি নবানুরাগের উল্লাসে রাধা উঠে বসতে চায়। ললিতা কোলে করে বসে আছে, বিশাখা নাড়ী টিপছে। শশিশেখর সবার গোচরে বলছে—প্রাণ বুঝি ফেটে যায়।

রাধার প্রাণরক্ষার জন্যে সখীদের একজন দূতী হয়ে চলল মথুরায় কৃষ্ণকে খুঁজে বার করে আনতে। গোকুলানন্দের এই পদে তার বর্ণনা—

রাই, ধৈর্যং রহু	ধৈর্যং রহু	গচ্ছং মথুরায়ে,
ঢুঁড়ব পুরী	পতি প্রতক্ষে	যাঁহা দরশন পাওয়ে।
অতি ভদ্রং	অতি ভদ্রং	শীঘ্রং কুরু গমনা,
অবিলম্বে	মথুরাপুরী	প্রবেশ করিল ললনা।
এক রমণী	অল্পবয়সী	নিজ প্রয়োজন পুছে,
নন্দ-জাত	কৃষ্ণ খ্যাত	কাহার ভবনে আছে।
শুনি সো ধনী	কহই বাণী	সো কাঁহা ইহাঁ আওব,
বসুদৈবকী-সুত	কৃষ্ণ খ্যাত	কংসরিপু মাধব।
সোই সোই	কই কই	দরশনে মঝু আসা,
গোকুলচন্দ্র	কহে যাও যাও	ওই যে উচ্চ বাসা॥

রাই, ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর, আমি মথুরায় যাচ্ছি। সেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খুঁজে দেখব সেখানে যদি দর্শন পাই। দূতীর কথা শুনে রাধা বললেন, খুব ভালো খুব ভালো, শীঘ্র গমন কর। দূতী অবিলম্বে মথুরাপুরীতে গিয়ে হাজির হল। এক অল্পবয়সী মেয়েকে দেখে দূতী নিজের আবশ্যকমত জিজ্ঞাসা করলে, নন্দের নন্দন বিখ্যাত কৃষ্ণ কার বাড়িতে থাকেন। শুনে তরুণী বললে, সে এখানে কি জন্যে আসবে। এখানে থাকে সেই বিখ্যাত কৃষ্ণ যিনি বসুদেব-দেবকীর পুত্র, যিনি কংসঘাতী, যিনি মাধব। দূতী বলে উঠল, সেই বটে সেই বটে, তার দর্শনেই আমার আসা। গোকুলচন্দ্র তরুণীর হয়ে বলছে—যাও, যাও, ঐ যে উঁচু বাসাবাড়ি দেখা যাচ্ছে।

ব্রজবুলি পদাবলীর ইতিহাসের আর জের টেনে লাভ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনার অনুবৃত্তি অষ্টাদশ শতাব্দী পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁচেছে। সে কেবলই রসহীন শুষ্কপত্রের মর্মর। তবে ব্রজবুলি পদাবলীর ইতিহাসে যিনি সমাপ্তির দাঁড়ি টেনে দিলেন তিনি শুধু বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর ব্রজবুলি কবিতার কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ বালককালে বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার অনুকরণে ব্রজবুলিতে কয়েকটি গান ও কবিতা লিখেছিলেন। অনেকগুলি রচনা প্রথম বর্ষ ভারতীতে বার হয়েছিল (১২৮৪)। তার প্রায়

বছর পাঁচেক পরে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' প্রকাশিত হয়। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী হুবহু বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁদে লেখা, মায় ভনিতা পর্যন্ত। ভনিতায় কবি "ভানু" "ভানুসিংহ" নাম নিয়েছেন। ভানু রবির সমার্থক শব্দ। সেকালে তাঁর কোনো কোনো গদ্য রচনায় স্বাক্ষর আছে "ভ"; এটি ভানুরই সংক্ষিপ্ত রূপ। "সিংহ"টুকু নিয়েছিলেন অজ্ঞাতসারে কবি পিতার বন্ধু, ও নিজের গীতরসগুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহের নাম থেকে, এইরকমই আমার মনে হয়। অথবা কষ্ট কল্পনা করলে বলতে পারি বিদ্যাপতির পদে যেমন কবির নাম ও শিবসিংহের নাম আছে—তেমনি রবীন্দ্রনাথ সেই নামদুটিকে যোগ করে ভানুসিংহ তৈরী করেছিলেন।

ভানুসিংহের পদাবলী বালকের রচনা, কৃত্রিম রচনা, প্রাণহীন অমার্জিত রচনা—এ কথা কবি নিজে বার বার বলে গেছেন এবং আমরাও তা মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলীর মত এগুলিও সুরের অভিষেক পেলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিছুতেই মনে হয় না যে, বহুকালান্তরিত ভাষায় বালকের লেখা নকল রচনা। যে কারণেই হোক ভানুসিংহের পদাবলীর অনেকগুলি গানের মধ্যে প্রাণ আছে, সে জন্যে ১৫০০ সালের ভাষায় ১৮৭৬ সালে পনের-ষোল বছর বয়সের ছেলের লেখা গানগুলি এখনও কিছুমাত্র সজীবতা হারায় নি॥

কাঠখোদাই রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'প্রমেথিউস্'-কাহিনী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গ্রীক দেবতারা বিচিত্র— গ্রীকদের কথা বলি কেন, ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা, কি দেবতা মাত্রই, যে দেশের হোক-না, সকলেরই লীলা প্রায় একরকম। তা মানুষেরই মতন, সময়ে সময়ে মানুষেরও অধম— মানুষের যে সব হীনতর প্রাকৃত প্রবৃত্তি তাই দিয়েই যেন গড়া দেবতাদের স্বভাব। ঈর্ষা, দ্বেষ, অক্ষমতা কি কম দিয়েছে দেবতাদের পরিচয়? প্লেটো তাই কবিদের উপর এত বিরূপ ছিলেন (যদিও তাঁর নিজের ছিল এক গভীর নিবিড় কবিপ্রকৃতি)— হোমর এত বড় কবি, দেবতাদের কি প্রকৃতি দিয়েছেন তিনি?

প্রাচীন গ্রীসের প্রবীণতম নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর সুবিখ্যাত "শৃঙ্খলিত প্রমেথিউস্"* নাট্যে পাঠকদের ব্যাখ্যাকারদের কাছে অনুরূপ সমস্যা তুলেছেন। সমস্যা এই, প্রমেথিউস্ নিজে দেবতা, কিন্তু দেবরাজ জিউস্ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন— কারণ প্রমেথিউস্ মর্ত্যমানুষের সাহায্য করেছে, মানুষকে আগুন এনে দিয়েছে; মানুষ আগে আগুন বস্তুটিকে চিনত না জানত না, প্রমেথিউসই মানুষকে এই আগুনের ব্যবহার শিখিয়ে সংস্কৃত মার্জিত শক্তিমান করে তুলেছে। পৃথিবীর নশ্বর জীবটির উপর তার বড় অনুরাগ। এই অনুরাগই জিউসের আবার বিরাগের কারণ। জিউস্ মানুষকে দেখতে পারেন না। এ কি ব্যাপার? দেবরাজ যিনি— যাঁর কাছে আশা করি মহত্ত্ব ঔদার্য দিব্যদৃষ্টি, তাঁর এ কি ক্ষুদ্রতা? কথাটা তা হলে বুঝি একটু।

প্রমেথিউস্-কাহিনী একটা সুপ্রাচীন পৌরাণিক গল্প। কিন্তু পৌরাণিক গল্প আজকাল আর নিছক গল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তার মধ্যে দেখা হয় সেকালের মানুষের প্রকৃতি স্বভাব চরিত্র আর তার সমাজের আলেখ্য বা ইতিকথা। তাছাড়া অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে এসব কাহিনী একটা রূপক, তার পিছনে রয়েছে মানুষের বাহ্যজীবনের ইতিহাস নয়, তার অন্তরের অভিজ্ঞতার, একটা নিগূঢ় জ্ঞানের চিত্র। Mythology একদিকে history হয়তো, কিন্তু আরো সত্যতর ভাবে হল mystery—

---

* ইংরেজীতে আমরা বলি "প্রমেথিউস্", "এসকিলস্"— অনেকটা গ্রীক শব্দের ও উচ্চারণের কাছাকাছি। তবে গ্রীক ও লাতিন ভাষায় অন্তঃস্থ এই অস্, উস্ হল সংস্কৃতের বিসর্গ (অস্ ভাগান্ত যাকে বলে)। ফরাসীরা তাই বোধ হয় অত্যন্ত ন্যায়সংগত ভাবে এই প্রত্যয়টি পরিত্যাগ করেছে। তারা "প্রমেথিউস্" (প্রমেথেউস্) না বলে বলবে "প্রমেতে" থ উচ্চারণ তারা করতে পারে না, "এসকিলস্" (গ্রীক আইস্খুলস্) না বলে, সরাসরি বলবে "এসিল" (Eschyle)। সফোক্লিজ, ইউরিপিদিজ, হেরোডোটস্ না বলে বলবে সোফোক্ল, ইউরিপিদ্, হেরোদোত্। বাংলায় আমরা কি করব? ফরাসীর অনুকরণে বাংলায় আমি লিখেছিলাম একসময়ে সোফোকলা, ইউরিপিদ, এসকিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধহয় প্রমেথিউস্কে "প্রমাথী" করেছিলেন সর্বপ্রথম। ইংরেজীতে বলি আমরা প্লেটো, গ্রীকে তা প্লাতোন, ফরাসীরা বানিয়েছে প্লাতঁ। বাংলায় আমি করতে চেয়েছিলাম "প্লাতন"। হিন্দীতে আরবীর অনুসরণে প্লেটোকে বলা হয় ইফ্লাতুঁ, আর আরিস্টটলকে আরিস্তূঁ। আর আলেকজান্দের যে সিকন্দর তা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু ইংরেজীর প্রভাব এত স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে আমাদের উপর যে ইংরেজী ধ্বনি একটু শ্রুতিকঠোর হলেও, পরিচিত বন্ধু যেন হয়ে উঠেছে। তবে ইংরেজীতেও বলি হোমার (হোমর), গ্রীকে যদিও তা "হোমেরস্", ফরাসীতে হোমের। সমস্যাটি এখনও বিচারাধীন রাখা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

কি রকম? বৈদিক সরস্বতী শুধু একটা নদী নয়, তা ছিল আবার সত্যজ্ঞানের ধারা (সূনৃতানাং চোদয়িত্রী)। শুনঃশেফ তিনটি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন যূপকাষ্ঠে বরুণদেবের কৃপায় তাঁর মুক্তি হল— এ কেবল যজ্ঞীয় গল্প বা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়— এর গভীরতর অর্থ আছে। মর্ত্য মানুষ, মনোময় জীব, আবদ্ধ নিম্ন প্রকৃতির কঠোর বন্ধনে। প্রকৃতির তিনটি পাশ— দেহ, প্রাণ আর মন। বরুণ হল বৃহৎ চেতনা— মানসাতীত বৃহত্ত্বের উপলব্ধিই মানুষকে এনে দিল মুক্তি। এই হল শুনঃশেফ-কাহিনীর মর্মকথা।

আমাদের বিশ্বাস জিউস্-প্রমেথিউস্ কাহিনীর পিছনেও রয়েছে একটা অনুরূপ আন্তর তত্ত্বকথা। বলি সে কথা, তবে আমাদের মত অর্থাৎ আধুনিক মনের মত করে। মানুষ আগে, গোড়ায় আগুন বা অগ্নি কি বস্তু জানত না— স্বর্গ হতে তাকে নামিয়ে আনলে প্রমেথিউস্। অগ্নি স্বর্গের জিনিস— অগ্নির যে বীর্য যে জ্যোতি তা স্বর্গীয়, তা কেবল দেবভোগ্য। দেবতারা দেবতা— জ্যোতির্ময় বীর্যময়— কারণ তাঁরা অগ্নিময়। আমরা বেদের আদিমন্ত্র স্মরণ করতে পারি এখানে— অগ্নিমীলে পুরোহিতং দেবম্— অগ্নিকে পূজা করি দেবতা যিনি রয়েছেন সকলের পুরোভাগে। প্রথমেই তাই প্রশ্ন ওঠে মানুষকে এ জিনিস দেওয়া কেন? গ্রীক কবি সেই প্রশ্ন তুলেছেন— ভারতীয় কবি বা ঋষি কোনো আপত্তি তোলেন নি; ব্যাপারটিকে সহজ সত্য বলে গ্রহণ করে তার নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করেছেন। অগ্নি যদি মানুষের অধিকারে আসে, তবে দেবতা-মানুষে কোনো পার্থক্য থাকবে না, মানুষ হয়ে উঠবে দেবতা। আমাদের বৈদিক ঋষির সেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বলেছি আপত্তি করাও চলতে পারে— একটা বিপদের বিভ্রাটের সম্ভাবনাও আছে। সেই দিকটাই গ্রীক কাব্যে ও নাট্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা প্রাচ্যে বিশেষভাবে বলেছি দেবাসুর-সংঘর্ষের কথা, ওরা পাশ্চাত্যে বলেছে দেবতা-মানুষে সংঘর্ষের কথা। প্রথমতঃ গ্রীকদের ধারণা ছিল, সৃষ্টির কতকগুলি মূল নিয়ম, বিধি বা ধর্ম আছে (nomoi)— তা লঙ্ঘন করলে হয় প্রত্যবায়, মহাপাপ; ফলভোগ করতে হয় নিদারুণ। এ হল যেন উৎকট কর্ম এবং তার উৎকট ফল। নিয়তি হলেন দেবী আনাঙ্কে (Anangke— অনিবার্যতা); আর তাঁর দণ্ডবিধাতৃ সাঙ্গোপাঙ্গ এটী (Ate), এরীনিয়েস (Erinyes)। দেবতার ধর্ম ও নিয়তি এক, মানুষের ধর্ম ও নিয়তি ভিন্ন। প্রমেথিউস্ চেয়েছে দুটির মিশ্রণ— অর্থাৎ আমরা যাকে বলি, বা এক যুগে যাকে বলা হত "বর্ণসঙ্কর", যার ফল সমাজের সৃষ্টির উৎসাদন, ধ্বংস সাধন।

কারণ আরো নিবিড় ভাবে একটু দেখলে আমরা বুঝতে পারি এবং যাঁরা চক্ষুষ্মান্ তারা বলে থাকেন— মানুষকে দেবত্বের গুণ গ্রহণ ও ধারণ করতে হলে, তার অধিকারী হওয়া চাই অর্থাৎ চাই স্বভাবের পরিমার্জনা, প্রকৃতির একটা পরিশুদ্ধি। মানুষ হল ক্ষুদ্র-চেতন, জরামৃত্যুর দাস, সে কি রকমে অমরত্বের ভার গ্রহণ করতে পারে? সে ভার চাপিয়ে দিলে তার উপকার হবে না, সে ভেঙেচুরে পড়বে। প্রমেথিউসের আগুন নিয়ে মানুষ আজ কি খেলছে? মানুষ আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে— চলেছে নাকি আত্মবিলোপের পথে?

উপনিষদের সাধক নচিকেতা অগ্নিবিদ্যা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা অধিগত করবার জন্যে তাঁকে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল, একটা শিক্ষা বা সাধনা বা তপস্যার ধারা অনুসরণ করতে হয়েছিল। ঋষিরা বলতেন অপকভাণ্ডে তীব্র সোমরস রাখা যায় না— ভেঙে যায়, গলে যায়। মাটির পাত্র— মানুষ মাটির পাত্র বই কি— তাকে পুড়িয়ে শক্ত সমর্থ করতে হয় আগে।

কিন্তু প্রমেথিউস্ কি করলেন? তিনি কেন বাছবিচার করলেন না— উপকার করবার আবেগে, যাকে

বলা হয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা, তা করলেন না, যদিও তাঁর নামের অর্থ "অগ্রবিবেচক।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল— তোমার এ দুর্দশা কেন, তুমি কি পাপ করেছিলে যে দেবরাজ তোমার উপর এমন রুষ্ট? তিনি বললেন, মানুষকে তিনি আগুন এনে দিয়েছিলেন তাই— বুদ্ধির আগুন, মানসিক চাতুর্যের আগুন, হাতের শাণিত কৌশল— যার ফলে শিল্পকলা, শিক্ষাসভ্যতা মানুষের। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আর কি করেছিলেন? আগুন এনে দিয়েছিলেন কিরকম ব্যবস্থার মধ্যে? চারদিকে শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে! কি রকম? মানুষের দৃষ্টি হরণ করলেন— দৃষ্টি থাকলে মানুষ হয়তো ভয় পাবে, কি নির্জীব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, এইরকম ধারণায়। সাক্ষাৎজ্ঞানের পরিবর্তে অন্ধ আশা! অন্ধ আশা আর প্রাণে আগুন— এই তো সহজ মানুষ; এইভাবে ধূমাচ্ছন্ন অগ্নি মানুষের বুকে প্রজ্জ্বলিত হল। কিন্তু উচিত ছিল না কি আগে মানুষের অন্তর-বেদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, প্রশান্ত নির্মল করা, অগ্নি সমিদ্ধ হলে যাতে ক্রমে ধূমশূন্য হয়ে বিশুদ্ধ ঔজ্জ্বল্যে, জ্যোতির্ময় তেজে পরিণত হয়?

ফল হল তাই বিপরীত। প্রমেথিউস্ ভাঙলেন সনাতন অর্থাৎ প্রাচীন ধর্ম, লঙ্ঘন করলেন বিধির লিপি। তাই তিনি নিয়ে এলেন যথাবিহিত চয়ন-করা ঔপনিষদিক অগ্নিদেব নয়, কিন্তু পার্থিব আসুর আগুন— একটা খাণ্ডব দাহন, তাতে নিজে দগ্ধীভূত হলেন, বিশ্বও হল দগ্ধীভূত। এসকিলস এইভাবে দেখালেন উৎকট কর্মফল— poetic justice।

তবে বলা বাহুল্য, এতখানি তত্ত্ব ভেবে চিন্তে যে এসকিলস তাঁর গল্পটি রচনা করেছেন তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু গল্পটির অন্তরালে এইরকম একটা উপলব্ধি আগে হতেই ছিল বা এইরকম একটা উপলব্ধিকে মূলতঃ আশ্রয় করে গল্পটি প্রথম রূপ গ্রহণ করে— এ অনুমান আমরা করতে পারি— পরে কথাটি শাখা-প্রশাখায় পত্রে-পল্লবে অলংকৃত, বিভূষিত পরিবর্তিত হয়ে বিশাল কাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে। আমি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি অন্তরের সূক্ষ্ম সূত্রটি।

সে যা হোক— প্রমেথিউসের দিক থেকে তাঁর কর্মের পক্ষে যে সদ্‌যুক্তি নেই তাও আবার নয়। আমরা বলেছি মাটির পাত্র পুড়িয়ে শুদ্ধ করা শক্ত করা দরকার— তার জন্যেই তো আগুনের দরকার আগেই। কিন্তু এ জবাব হল আধুনিক মনের। এসকিলস্ তাঁর আর-একখানি নাটকে বন্দী প্রমেথিউস্‌কে মুক্ত করেছেন— কিন্তু সে নাটকটি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে তার মূল ভাবটা অনুমান করা হয়েছে। প্রমেথিউস্ মুক্তি পেল, স্বেচ্ছায় শেষে জিউসের অনুগত হয়ে। কিন্তু এ পরিণাম আধুনিক মনের অনুমোদিত নয়। প্রমাণ ইংরেজ কবি শেলী।

২

প্রমেথিউসের কথা বলতে গিয়ে শেলীর নাম না করলে চলে না। এই ইংরেজ কবি এসকিলসের অভাব পূরণ করে দিয়েছেন, অবশ্য তাঁর নিজের ভঙ্গিতে। শেলীর "শৃঙ্খলমুক্ত প্রমেথিউস্" বিখ্যাত নাটক এবং অনেক হিসাবে একখানি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এখানে যে আশার আস্পৃহার দৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন কাব্যগত চমৎকারিত্বের সঙ্গে, তাতে আরো এই ভারতীয় সিদ্ধান্তটির প্রমাণ হয় যে, কবি আর ঋষির মধ্যে নিবিড় মিল রয়েছে কোথাও— যদিও সনাতনী মতে শেলীকে পাষণ্ডের দলে (Satanic poets) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শেলীর পাষণ্ডত্ব অর্থ আধুনিকত্ব। এসকিলস্ যে দৃষ্টি দিয়ে দেবতাদের দেখেছেন, জিয়ুস্‌কে প্রমেথিউস্‌কে চিত্রিত করেছেন, শেলীর কাছে তা আশা করতে পারি না। দেবতা বা জিউস অর্থ তাঁর কাছে অত্যাচার উৎপীড়ন প্রাচীনের প্রভুত্বপ্রিয়তা। আর প্রমেথিউস্ হল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সে মুক্তির স্বাতন্ত্র্যের, শান্তির প্রেমের বিগ্রহ। পাষণ্ডেরা— আধুনিকেরা— অনেক সময়ে দেখি পুরাতন পরিচিত সংজ্ঞাগুলির অর্থ বদলে, উল্টে দিয়েছেন। তাঁদের মতে দেবতাই অসুর, আর অসুরই হল দেবতা। এইরকম একটা রুচিবৈপরীত্য মিস্টিক কবি ব্লেক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন— স্বর্গ হয়েছে নরক আর নরক হয়েছে স্বর্গ।

পুরাতন-সনাতন-বিরোধী, সংস্কার-প্রয়াসী প্রাণ-প্রবেগ মনের মধ্যে এই রকম একটা মূল্য-বিপর্যয় ঘটায়। ধার্মিক আস্তিক কবি মিলটন পর্যন্ত এই রকম প্রভাবের হাত থেকে উদ্ধার পান নি— তাঁর কবিপ্রাণ শয়তানকে যতখানি জীবন্ত, সহানুভূতিযোগ্য করে ধরেছে, কোনো এঞ্জেল এমন কি ভগবান স্বয়ং সে আনুকূল্য লাভ করেন নি। আমাদের মধুসূদনে মেঘনাদ প্রমীলা বা রাবণ যে সত্য ও সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে, রামসীতা তার কাছে ম্লান হয়ে পড়ে নি ?

যা হোক আমি বলছিলাম দেবতার বিরুদ্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। দেবতা ভগবানকে কল্পনা করা হয় এই ভাবে যে তাঁরা রয়েছেন উর্ধ্বে, স্বর্গে, এখানকার দুঃখ দৈন্য মালিন্য তাঁদের স্পর্শ করে না— তাঁরা আনন্দ করেন, মজা করেন মর্ত্যজীবের শোক কষ্ট দেখে, দেখে শুধু নয় আবার, শোক কষ্ট দিয়ে। এ হেন দৈব বা দানবীয় শক্তির অনুগত কোনো বীরহৃদয় হতে পারে না— তার একমাত্র ব্রত বিদ্রোহ।

আমি চিরবিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির !···
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !

প্রমেথিউস্ এই বিদ্রোহী বীর। সে নিজেই শেষে ভেঙে চুরমার হয় কি না, সে খেয়াল তার নেই।

সৃষ্টির একটা নিয়মই কি এই ? অত্যাচারী শাসকের, একচ্ছত্র প্রভুর বরাবর থাকবে বংশ-পরম্পরা কি যুগ-পরম্পরা আর তার বিরুদ্ধে থাকবে উৎপীড়িতের বিদ্রোহ-পরম্পরা ? প্রমেথিউস্ দাঁড়ালেন যার বিরুদ্ধে তিনি হলেন জিউস্ (মনু-শাসিত এক-এক মন্বন্তরের কল্পনা ভারতবর্ষে করা হয়েছে— তবে বলা চলতে পারে সে কল্পনা যথাসম্ভব সাত্ত্বিক প্রকৃতির)। এই জিউস্ নিজেও তাঁর পিতা ক্রনসকে (Cronos) পদচ্যুত করে তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন। এই ক্রনসও আবার ছিলেন তাঁর পিতা— আউরানস-এর (Ouranos) বিদ্রোহী পুত্র। এ ধরনের জীবকে আধুনিক চিত্ত যে দেবতা বলে মেনে নিতে, পূজা করতে পারেন নি, তা স্বাভাবিক।

এই রকম প্রভু বা বিধাতার কবলে পড়ে পৃথিবী হয়েছে নরক অর্থাৎ অজ্ঞানের স্বার্থপরতার ক্রুরতার রাজ্য, সকলরকম দীনতার হীনতার পীঠস্থান। পৃথিবীর এ রকম থাকা চলবে না, তাকে হতে হবে স্বর্গভূমি। মানুষকে তার সবরকম কায়িক মানসিক দৈন্য দূর করে হতে হবে জ্যোতির্ময় জীব। মানুষ বদলে যাবে, তার দেহ হবে সুন্দর, তার মন হবে সুন্দর, তার প্রাণ হবে সুন্দর— সে হবে সৌন্দর্যময়। এমন কি স্থূল প্রকৃতি অবধি— নদনদী, প্রান্তর-পর্বত, তরুলতা— সব নূতন একটা জীবনে সজীব হয়ে উঠবে। সব হবে প্রেমের প্রীতির আলোর আনন্দের প্রকাশ। এই হল শেলীর স্বপ্ন।

এ কাজ সংসাধিত হবে প্রমেথিউসের আত্মদানে ও আত্মসিদ্ধিতে। কে এই প্রমেথিউস্? শুধুই তিনি বিদ্রোহী ধ্বংসকারী নন,— আসলে তিনি একজন স্রষ্টা। প্রমাথী হলেন অগ্নিধারী, অগ্নিবাহক। বাহ্য অগ্নি বটে— যে অগ্নি অরণি-মন্থনের ফল— যার দান হল যন্ত্রপাতি এবং মানুষের সভ্যতা। কিন্তু বাহ্য অগ্নি একটা আন্তর অগ্নির বিগ্রহ বা প্রতীক— তা হল চিন্ময় অগ্নি, ঊর্ধ্বগতির ক্রমারোহণের আস্পৃহার অগ্নি। এ অগ্নির আদিনিবাস উত্তরলোকে, দেবধামে, তুরীয় চেতনায় (তুরীয় অর্থ চতুর্থ— দেহ, প্রাণ আর মনের ওপারে)। তবুও পৃথিবীর সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ। প্রমেথিউস্ দেবতা বটে, কিন্তু তাঁর মা হলেন পৃথিবী (হয়তো এর অর্থ অতিচেতনায় অন্তর্নিহিত যে পৃথিবী বা ক্ষিতিতত্ত্ব, আর তার গর্ভস্থ শক্তিই হল অগ্নি)।

তাই পার্থিব জীব মানুষ তাঁর সহোদর। এই জন্যই মানুষের উপর তাঁর আকর্ষণ। মানুষকে তিনি যে অগ্নি-সম্পদ দিতে চান তাও স্বাভাবিক।

অগ্নির শিখায় ভর করে মানুষকে ঊর্ধ্বে উঠে চলতে হবে, তার চেতনাকে প্রকৃতিকে সমুন্নত সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, মানুষকে তেজোময়, জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় হতে হবে। কিন্তু উঠতে হবে বাধা ভেদ করে। বাধা হল অতীত নিয়মের ব্যবস্থার অত্যাচার, গতানুগতিকের উৎপীড়ন— রবীন্দ্রনাথ যার সুন্দর নাম দিয়েছেন "অচলায়তন"। এক গভীর অর্থে কেবল অতীত নয়, ঊর্ধ্ব অর্থাৎ ঊর্ধ্বস্থ দেবলোক পর্যন্ত এই অচলায়তন। কি রকম? দেবতারাও হলেন এক-একটি অহং। তাঁরাও এই হিসাবে অসুরই— ঊর্ধ্বতর স্তরের অসুর। বৈদিক দেবতাদের একটি বিশেষণই হল অসুর, যদিও তার অর্থ হল বীর্যবান্ (কথাটির ব্যুৎপত্তি অসু+র; অ+সুর নয়)। প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ ধর্মকর্মের বিগ্রহ। দেবতারা যেখানে ভগবানের, সচ্চিদানন্দের একান্ত অঙ্গীভূত সেখানকার কথা আলাদা। কিন্তু নিম্নতর লোকে দেবতারা গ্রহণ করেছে স্ব-স্ব-প্রধান মূর্তি। এই সব স্বর্গলোকে— মৃত্যু-দেবতা নচিকেতাকে যেখানকার লোভ দেখিয়েছিলেন— অপরিবর্তনীয় বিধান। সেখানে উন্নতি নেই, অবনতিও নেই। প্রত্যেকে এক-একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর সিদ্ধি। কিন্তু মানুষ পরিবর্তনশীল, তার উন্নতির সীমা নেই, তার গতির সীমা নেই। যত অতলে পড়ে থাক্, ঊর্ধ্বে উঠবার ক্ষমতা তার আছে, যত উচলে উঠে যাক, আরো উঠে যাবার সম্ভাবনা তার আছে। তাই এমনও বলা হয় ভারতীয় শাস্ত্রে যে দেবতারা যদি চায় মুক্তি তবে তাদেরও মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

ঊর্ধ্বে যে দেবতারা নিজের নিজের কোট বজায় রাখতে আগ্রহশীল, তাঁদের রাজা মানুষের মত চিরগতিমান্ চঞ্চল বিদ্রোহীকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না। শেলী এই লড়াইয়ের দিকটা এবং তার পরিণাম মানুষের জয় দেখিয়েছেন যে চিত্র বা রূপকের আশ্রয়ে তার মধ্যে একটা নিগূঢ় তত্ত্বের ছায়া লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিতই হই— বলতে ইচ্ছা হয় কবি তিনি, ঋষি হতে হতে থেমে গিয়েছেন।

দেবলোক মানুষ অধিকার করবে কি রকমে? অন্য কথায় দেব-পতির পতন ঘটবে কি উপায়ে? দেব-পতির পতনে হবে প্রমেথিউসের মুক্তি। প্রমেথিউসের মুক্তি অর্থ মানুষের নব সৃষ্টি— পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য। দেবপতির পতন হবে দেবপতির আপন সন্তানের হাতে— যেমন পূর্বাপর ঘটে এসেছে, নূতনের বীজ পুরাতনের মধ্যেই। পুরাতন স্বর্গের মধ্যে নূতনের বীজ উপ্ত হল— জিউস্ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন সমুদ্রতনয়া বারুণী থেটিস-এর সঙ্গে। এই সমুদ্র ও সমুদ্রতনয়াকে আমরা ঐহিক বা স্থূল ভৌতিক আবেষ্টনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। ঊর্ধ্বের ও নিম্নের, স্বর্গের ও মর্ত্যের উদ্বাহেই তো নবতর সৃষ্টি।

কিন্তু শেলী এখানে গভীরতর গুরুতর একটি রহস্যের কথা বলেছেন। তাঁর ডেমগরগন (Demogorgon) তত্ত্ব। দেবলোকের ঊর্ধ্বে যে ভবিষ্য-জীব বা সত্তা জন্মাল তাকে তো রূপ গ্রহণ করতে হবে, স্থূলদেহ ধারণ করতে হবে, নতুবা পৃথিবীর রাজত্ব তার কি রকমে হবে? আর সে রূপ সে দেহ এমন হওয়া চাই যা শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য অভেদ্য— ঠিক আত্মারই মত হবে অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং। কোথায় সে উপকরণ? শেলী তো পেয়েছেন ডেমোগরগন-এর কাছে। ডেমোগরগন অর্থ "মহৎ যক্ষ", ঔপনিষদিক ভাষায়— ডাইমোন+গরগন * (গ্রীকে গরগন অর্থ বৃহৎ বিপুল মহৎ আর ডাইমোন অর্থ অলৌকিক সত্তা, দেবশক্তি ইত্যাদি)। এই যক্ষের স্থান পৃথিবীর অন্তর-গহ্বরে, অতলে পাতালে। সেখান থেকে উঠে সে চলবে ঊর্ধ্বে স্বর্গে জিউসের লোকে। আমি ব্যাখ্যা দিই, ডেমোগরগন মহৎ যক্ষ হল অচেতনা বা অবচেতনা, সৃষ্টির স্থূল প্রকাশের প্রতিষ্ঠা যা, যাকে ধরেই মূর্ত সব এখানে। এ হল স্বয়ং প্রকৃতি— স্থূল প্রকৃতির নিজস্বশক্তি, জড়ের মধ্যে নিহিত লুক্কায়িত যে চিন্ময় শক্তি। মানুষ যে এতদিন দাসত্ব করে এসেছে, সে যে আপনার মুক্তি সাধন করতে পারে নি, পৃথিবী যে দৈন্যের দুঃখের পীড়ার অজ্ঞানের পাপের আধার হয়ে আছে, তার কারণ মানুষ খুঁজে পায় নি, আহরণ করে নি, প্রয়োগ করে নি এই তার অবচেতন শক্তিকে, যা হল লৌকিক বা প্রকট প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাশক্তি। এরই একটু কণা বা ছায়ার আভাস পেয়েছে জড়বিজ্ঞান আজ, যখন সে আবিষ্কার করেছে এই তথ্য যে জড়কণা জমাট শক্তি বা তেজ ছাড়া আর কিছু নয়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং গুহ্যবিদ্যা বলছে ঊর্ধ্বতমকে পূর্ণ আবির্ভূত করা যেতে পারে এই এখানে, নিম্নতমের পূর্ণ প্রকটনে ও ঊর্ধ্বায়নে। দার্শনিকের ভাষায় বলব, জড় যেমন হল স্থির শক্তি, অচেতন (বা অচিৎ) হল আবার তেমনি অবচেতন মাত্র— অর্থাৎ চেতনার (চিৎশক্তির) সংবৃতি, আত্মসংহরণ, বা আত্মসংহতি। পৃথিবী যদি স্বর্গ না হয়ে থাকে, তার কারণ পৃথিবীকে আমরা সংস্কার করতে চেয়েছি মনের বুদ্ধির শক্তি দিয়ে— মনের বুদ্ধির শক্তি অতি সীমাবদ্ধ, তার সামর্থ্য নেই মানুষের স্বভাবকে জগৎ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারে। সে সামর্থ্য এক আছে পৃথিবীর নিজস্ব শক্তির, পৃথিবীর দেহাভ্যন্তরে নিমজ্জিত যে মহৎ যক্ষ তার। এই পার্থিব সন্তান উঠে এসে পৌঁছিবে দেবলোকে, সেখানে যে দেবশিশু সঞ্জাত তাকে দেবে প্রকট রূপ, করবে শরীরী— এই অপরূপ সম্মিলনে গঠিত যে নবজীব নবসত্তা সেই জিউসের স্থান অধিকার করবে। পুরাতন বিধানকে পর্যুদস্ত করবে, যে বিধানকে বলা হত অলঙ্ঘ্য নিয়তি, যার স্থায়িত্ব নির্দেশ করা হত যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ তার পরিবর্তে আসবে নববিধান, সংঘর্ষের নয় মৈত্রীর, দ্বেষের নয় প্রেমের, অজ্ঞানের নয় আলোর সাম্রাজ্য— সেই নবদেবতাই পৃথিবীতে জিউসের দাসরাজ্যের পরিবর্তে স্থাপন করবে ধর্মরাজ্য, সত্যযুগ। ডেমোগরগনের এই হল অপূর্ব দৌত্য।

প্রমেথিউস্ তখন হবে নবস্রষ্টা। প্রমেথিউস্ অর্থ ভাবীদ্রষ্টা বা মন্তা (প্রো, পূর্ব হতে, মান্থানো, আমি মনন করি— সংস্কৃত মন্ ধাতু, যদিও মন্থ্ ধাতুর সঙ্গে একটা সাজুয্যও থাকতে পারে)। সে হল মানুষের মধ্যে, শরীরের মধ্যে যে তেজোময় অন্তর্যামী প্রচ্ছন্ন, যাঁর দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে সুদূর ভবিষ্যতে, ভাবীসিদ্ধি সার্থকতার উদ্দেশ্যে, যিনি চলেছেন, চালিয়ে নিতে চেয়েছেন মানুষকে শরীরীকে।

* কোনো কোনো টীকাকার বলছেন ডেমস+গরগন=বৃহৎ+জন বা লোকসংঘ। কিন্তু এখানে ডেমো মনে হয় "ডাইমো"র অপভ্রংশ।

কিন্তু বর্তমানে এই শরীরের মধ্যে, বর্তমানের ব্যবস্থা মধ্যে তিনি ক্লিষ্ট নিপীড়িত। তিনি হলেন জড়ের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ জীবপুরুষের প্রথম প্রতিকৃতি— ক্রুশবদ্ধ খ্রীষ্টের আদি স্বরূপ। মানুষের মধ্যে ভগবানের আত্মাহুতি, মর্ত্যের মধ্যে অমৃতের মন্থন— তারই আলেখ্য এ, যাতে মানুষ ভগবান হয়ে ওঠে, মর্ত্য হয়ে ওঠে মূর্ত অমৃত।

বলেছি, এসকিলসের অবশ্য দৃষ্টি ছিল ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। তিনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন নি —সৃষ্টির ত্রুটিবিচ্যুতি, মানুষের সংস্কারস্পৃহা, এ সব জিনিস আলোচনা করতে তিনি যান নি। তাঁর বিষয় ছিল "ধর্মরাজ" বা "সনাতন ধর্ম" অর্থাৎ যাকে মেনে নেওয়া সনাতন ধর্ম বলে তার মহিমা কীর্তন— যে অলিখিত বিধি সৃষ্টির ললাটে লিখিত।

কবি সফোক্লিজও ঠিক এই কথাই বলেছেন —

দেব-অনুশাসন অলিখিত অবিচল—
এ জিনিস আজকের নয়, কালকের নয় রয়েছে চিরকাল, কেউ জানে না
কবে থেকে তা দেখা দিয়েছে।— আন্তিগোনা

আমাদের ঋগ্‌বেদীয় ঋষি বলছেন অনুরূপ ভাবে "অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি"—বরুণদেবের অলঙ্ঘ্য বিধান— এই বরুণদেবের নিকটেই পাশমুক্তির প্রার্থনা করছেন শুনঃশেফ।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির— দেবতার ব্যক্তিত্ব হোক আর মানুষেরই হোক— ইচ্ছা বা বাসনা এই মহাবিধানকে ব্যাহত করে না, টলায় না— তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেই ব্যক্তিই চূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং বিজ্ঞতা হল তাকে মেনে নেওয়া, তার অনুগত হওয়া। তা ভালো কি মন্দ বিচার করবার অধিকার বা সামর্থ্য কোনো সৃষ্ট জীবের নেই। প্রত্যেকের আছে নিজস্ব স্থান, বিশ্বব্যবস্থায় আছে স্থানের উপযোগী কর্ম, তাকেই বলে স্বাধিকার। স্বাধিকারে অপ্রমত্ত থাকা— মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনং— এই ছিল প্রাচীনের অনুশাসন। নিয়ম-শৃঙ্খলা, বাধ্যতা-আনুগত্য— কর্তা যিনি নেতা যিনি তাঁর ইচ্ছা বা বিধি অনুসারে। এই সত্যের ব্যাখ্যাতা এসকিলস্‌। এই সত্যটি জাজ্বল্যমান করে ধরবার জন্যেই কর্তা জিউস্‌কে যেমন একান্ত অত্যাচারী করে দেখিয়েছেন, অন্যদিকে বিদ্রোহী প্রমেথিউস্‌কেও তেমনি উগ্রতার পরাকাষ্ঠায় নিয়ে ধরেছেন। আমাদের দেশেও একযুগে এইরকম একটা সমস্যা যেন দেখা দিয়েছিল, বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল বলা উচিত, কারণ এ সমস্যা যুগে যুগে দেখা দেয়— শ্রীকৃষ্ণ যখন এলেন তাঁর যুগান্তকারী নববিধান নিয়ে। কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ পুরাতনে আর নূতনে ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতূহলের বিষয় আরো এই যে ভীষ্ম বা দ্রোণের মত জ্ঞানী বিজ্ঞ মহাপুরুষও ছিলেন সনাতনী— শ্রীকৃষ্ণকে জেনে মেনেও তাঁর পক্ষ নিয়ে লড়াই করতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কি নূতন জগৎ কি নববিধান নিয়ে এলেন তা আলোচনা করবার স্থান এখানে নেই, তার প্রয়োজনও নেই।

এসকিলস্‌ যে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই— বিশ্বের বিধানকে যে মানে না তারই মহদ্‌ভয় মহতী বিনষ্টি ঘটে। দোষ বিধানের নয়, দোষ আপন কর্মের। কেউ কাকেও বিপদের মধ্যে ফেলে না, দেবরাজেরও ক্ষমতা নেই— প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ফাঁদের মধ্যে পা দেয়— নিজের নিজের দুর্গতি ডেকে আনে। শেলী দেখিয়েছেন কিন্তু এই দুর্গতি থেকে একটা মুক্তির পথ।

বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান

রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ

বিনয় ঘোষ

সভা-সমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি-অ্যাসোসিয়েশন হল এ যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয়, অপরিহার্য সহচর বললেও ভুল হয় না। আদিম মানবসমাজেও ক্লাব সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন ছিল দেখা যায়। কোথাও বয়স-ভেদে, কোথাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি কোথাও কোথাও মর্যাদা-ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও। ব্যক্তি পরিবার ও 'ক্ল্যান', প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে।[১] সভ্যসমাজের সভা-সমিতির বৈশিষ্ট্য হল তার গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য। এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।[২]

বিদ্বৎ-সভা কেবল বিদ্বৎ-জনের সভা হলেও, সমাজ-জীবনে তারও প্রভাব আছে। সমাজে সভা-সমিতির প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বিদ্বৎ-সভা সম্পর্কে আলোচনার আগে সে-সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের সভা-সমিতি প্রাচীন বা মধ্যযুগে ছিল না, আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক অধিকার বা ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তা না থাকলে সভা-সমিতির বিকাশ হতে পারে না। টলেমিদের যুগে (খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দে) আলেকজাণ্ড্রিয়ার মিউজিয়ামে পণ্ডিতেরা যে বিদ্যাচর্চার জন্য মিলিত হতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যরা যে সভা করতেন, তা প্রধানতঃ রাজার আদেশে ও বিশেষ প্রয়োজনে হত, স্বাধীনভাবে হত না। মধ্যযুগের রাজসভায় কবি-পণ্ডিতদের যে সভা বসত, তা 'রত্নসভা' হলেও, আধুনিক যুগের বিদ্বৎ-সভা বা অন্য কোনো সভা-সমিতির সঙ্গে তার কোনো মূলগত সাদৃশ্য নেই। আধুনিক সভায় প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের জন্য মিলিত হন। বিদ্বৎ-সভার বিশেষ উদ্দেশ্য হল, জ্ঞানবিদ্যার চর্চা ও আলোচনা। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজের শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য, বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য, যে সভা স্থাপন করেন, তাকেই "বিদ্বৎ-সভা" বলে। রাজনৈতিক সভা, বাণিজ্যিক সভা, অন্যান্য সাধারণ সভা-সমিতি বা ক্লাব-অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে তার আদর্শগত পার্থক্য আছে, কিন্তু গড়নের পার্থক্য নেই। মূলে

১। Robert H. Lowie, *Primitive Society* (London, 1949), ১০ ও ১১ অধ্যায়, ২৪৫-৩২৩ পৃষ্ঠা।

২। *Encyclopaedia of Social Sciences* (1951 print), vol. 6, "Family" by Margaret Mead and Carl Brinkmann; এ ছাড়া J. C. Flugelএর *The Psycho-analytic Study of the Family* (London, 1926) এবং *The New Generation*; ed. by V. F. Calverton and S. D. Schmalhausen (New York, 1930), এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আছে ব্যক্তিস্বাধীনতার ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির স্বাধিকার। এসব আধুনিক যুগের দান।

আধুনিক যুগের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যে সব শক্তিশালী শ্রেণীর আবির্ভাব হল, তার মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্যতম। সমাজে মধ্যশ্রেণী আগেও যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার রূপ ছিল অন্যরকম। সমাজে তার কোনো স্বাধীন গতিশীল শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য ও সত্তা ছিল না। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে এল। সমাজে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়ল। রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের এবং আধুনিক ডেমক্রাসীর আদর্শের প্রবর্তন করলেন তাঁরা।[৩] রিনেস্যান্সের আদিকেন্দ্র ইটালিতে "অ্যাকাডেমি" কয়েকটি স্থাপিত হল, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ১৪৩৩ সালে অ্যাণ্টনিও বেক্কাদেল্লি প্রতিষ্ঠিত "অ্যাক্কাডেমিয়া পণ্টানিয়ানা" (Accademia Pontaniana), ১৪৭৪ সালে লরেঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত "অ্যাক্কাডেমিয়া প্লেটোনিকা" (Accademia Platonica), ১৫৮২ সালে সাহিত্যের "অ্যাক্কাডেমিয়া দেল্লা ক্রাস্কা" (Accademia della Crusca), ১৬০৩ সালে বিজ্ঞানের Accademia dei Lincei (গ্যালিলিও এই সভার সভ্য ছিলেন), ১৬৫৭ সালে ফ্লোরেন্সের Accademia del Cimento, ১৭৫৭ সালে Reale Accademia delle Scienze ইত্যাদি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইটালির এই সব অ্যাকাডেমির মডেলে ইয়োরোপের সর্বত্র (বল্‌কান অঞ্চল ছাড়া) বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৬৩৫ সালে রাজকীয় পোষকতায় ফ্রান্সে Academie Francaise প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই শাখা হিসেবে ১৬৬৩ সালে Academie des Inscriptions et Belles-letters স্থাপিত হয়। ১৬৬৬ সালে Academie des Sciences প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালে সমস্ত অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ আইনতঃ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার দু বছর পরে Institut National স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অ্যাকাডেমিগুলি তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] জার্মানিতে ও ইংলণ্ডেও এই ধরনের সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবযুগের কর্মমুখর প্রত্যেকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইটির গুঞ্জন শোনা যায়। কলরব নয়, মৃদুগুঞ্জন।

নতুন বাণিজ্যলব্ধ মূলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালব্ধ চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবাদের অবাধ অগ্রগতি হতে থাকে। নতুন সমাজে 'Money' ও 'Intellect'-এর মর্যাদা প্রায় অভিন্ন হয়ে ওঠে। সেকালের কুলকৌলীন্যের বদলে নবযুগে অর্থকৌলীন্য ও বিদ্যাবুদ্ধির কৌলীন্যই সামাজিক শ্রেণীনিয়ন্তা হয়ে ওঠে। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর (Intelligentsia) উপশ্রেণী গড়ে ওঠে। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এবং সেরকম কোনো সম্পর্ক অভিজাত বিদ্বৎ-জনেরা স্বীকার না করলেও, রিনেস্যান্স আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিত্তবানদের মধ্যে অনেকে 'ইণ্টেলিজেন্সিয়ার' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দেখা যায়।[৫] আমাদের বাংলা দেশের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। সভা ও সোসাইটি প্রধানতঃ তাঁদের উদ্‌যোগেই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নতুন শিল্পবাণিজ্যের যুগেই

৩। A. F. Pollard, *Factors in Modern History* (London, 1932) Chapter 3, "The Advent of the Middle Class".

৪। *Encyclopaedia of Social Sciences* ; vol. 9, "Learned Societies" by Frederic A. Ogg.

৫। Alfred Von Martin, *Sociology of the Renaissance* (1945 reprint) : ২৭-৩৬ পৃষ্ঠা।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হল। এই মধ্যবিত্তের বিকাশ যদি না হত, তাহলে রিনেস্‌ঁাস বা রিফর্মেশন কোনোটাই সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন :[৬]

Without commerce and industry there can be no middle-class ; where you had no middle-class, you had no Renaissance and no Reformation.

নতুন যুগের বণিকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে, নগরে নগরে সাহিত্যসভা, দর্শনসভা, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্বৎ-সভার প্রতিষ্ঠা হতে থাকল। বিত্তবান্ ও বিদ্বান্‌রা এই সব সভায় মিলিত হয়ে নবযুগের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। লাইব্রেরি ও বিতর্ক-সভার বিস্তার হতে লাগল। নবজাগরণ ও নতুন সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠল এই সভাগুলি।

Closely connected with the growth of education and enlightenment among the younger generation of merchants is the creation of Literary and Philosophical Societies in the leading mercantile towns···societies of this type became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic illumination[৭].

ররার্ট ওয়েন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন, যৌবনে "ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটি"র সভ্য ছিলেন তিনি এবং এই সোসাইটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে। রসায়নবিদ্ ড্যাল্টন ও ওয়েন ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টার সোসাইটির সদস্য। ম্যাঞ্চেস্টারের মতন লিভারপুল শহরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক সোসাইটি ও অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশেও নবযুগের জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা শহরে অনেক অ্যাকাডেমি, সোসাইটি ও সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কলকাতার দেখাদেখি কাছাকাছি বর্ধিষ্ণু স্থানে (যেমন বর্ধমানে, কৃষ্ণনগরে) ক্রমে সভাস্থাপনের একটা ঢেউ এসেছিল একসময়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার রিনেস্‌ঁাস ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সব সভা-সমিতি। প্রথমে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এদেশের ইংরেজ শাসক-বণিক্‌রাই উদ্‌যোগী হয়ে এই ধরনের সোসাইটি স্থাপন করতে আরম্ভ করেছিলেন। তার পর নবযুগের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ বিত্তবান্ ও শিক্ষিত বাঙালীরা উদ্‌যোগী হয়ে সভাস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। তখন থেকেই আসল আদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় এবং জাগৃতি-আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ-জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে যে-ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে এদেশে রাজদণ্ড ধরতে আরম্ভ করেন, তাঁরা আমাদের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর সামাজিক আদর্শের ধারক ও বাহক ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষা বা রুচির দিক্ দিয়ে, কোনো পার্থক্যও ছিল না তেমন। এদেশের নবাগত ইংরেজদের প্রসঙ্গে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ

৬। পোলার্ডের পূর্বোক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। "Middle Class" by Alfred Meusel in *Encyclopaedia of Social Sciences*, vol. 10.

৭। *Johnson's England* : An Account of the Life and Manners of his Age ; ed, by. A. S. Turberville (Oxford, 1933) ; vol. 1, pp. 210-211.

অনেক সময় আমরা এদেশে ইংরেজের আবির্ভাবটাকেই নবযুগের ও নবীন আদর্শের আবির্ভাব বলে মনে করি। তা একেবারেই সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মধ্যযুগের অবসান হলেও, প্রকৃত নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্লবের পরে। আমাদের দেশেও তখন নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যুগচেতনার বিকাশ হচ্ছে। দুই দেশের নতুন বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর নবজাগ্রত চেতনার মিলন প্রায় একই সময়ে হয়েছে। হেস্টিংস-ক্লাইভ-কর্নওয়ালিসের যুগে ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা, মদ্যপান, ডুয়েলিং ইত্যাদির রেওয়াজ ইংলণ্ডের অভিজাত ও নতুন বণিক্‌সমাজে ছিল, এবং আমাদের বাংলা দেশের নতুন রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের সমাজে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।[৮] দীর্ঘকাল পর্যন্ত আভিজাত্যের উপসর্গরূপে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত। ১৮৪০এর সমাজেও বাঙালী বণিক্‌শ্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলার কি রকম রেওয়াজ ছিল, সে-সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লিখে গেছেন :[৯]

The native merchants are now commonly seen on the race-course, booking their bets, and acting like 'knowing ones'. This is a practice of very modern introduction, but has become so common as to be noticed even in newspaper doggerels.

একটি ছড়া লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করেছেন। তার মধ্যে রাধামাধব (?) ও মতিলাল শীলের নাম আছে :

Sugar is rising
Silk is likewising
So now let us baboos the joys of sport feel ;
I'll not a ledger look,
But take my betting-book,
Like Radamadub and Muttyloll Seal.

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর "পুরাতন প্রসঙ্গে" এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরা তখন আলাদা রেসকোর্স করেছিলেন। উত্তর-কলকাতায় পোস্তার রাজাদের বাগানে ঘোড়দৌড় হত। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল না। Starter ছিল, Jockey ছিল, Booking Betting সবই ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। শরৎবাবু নিজে Jockeyও হতেন। শীতকালে ছাতুবাবুদের মাঠে বুলবুলির লড়াই হত। অনেক তাঁবু পড়ত মাঠে। পোস্তার রাজা নরসিংহ ও ছাতুবাবু প্রত্যেকে দেড় শ করে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিজয়ীদলের লোকেরা

৮। G. M. Trevelyan, *English Social History* (London, 1948) ; Chapter 10, pp. 293-338.

৯। George W. Thomson, *The Stranger in India*, or Three Years in Calcutta (London 1843), vol 2, pp. 67-68. জর্জ টম্‌সন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন।
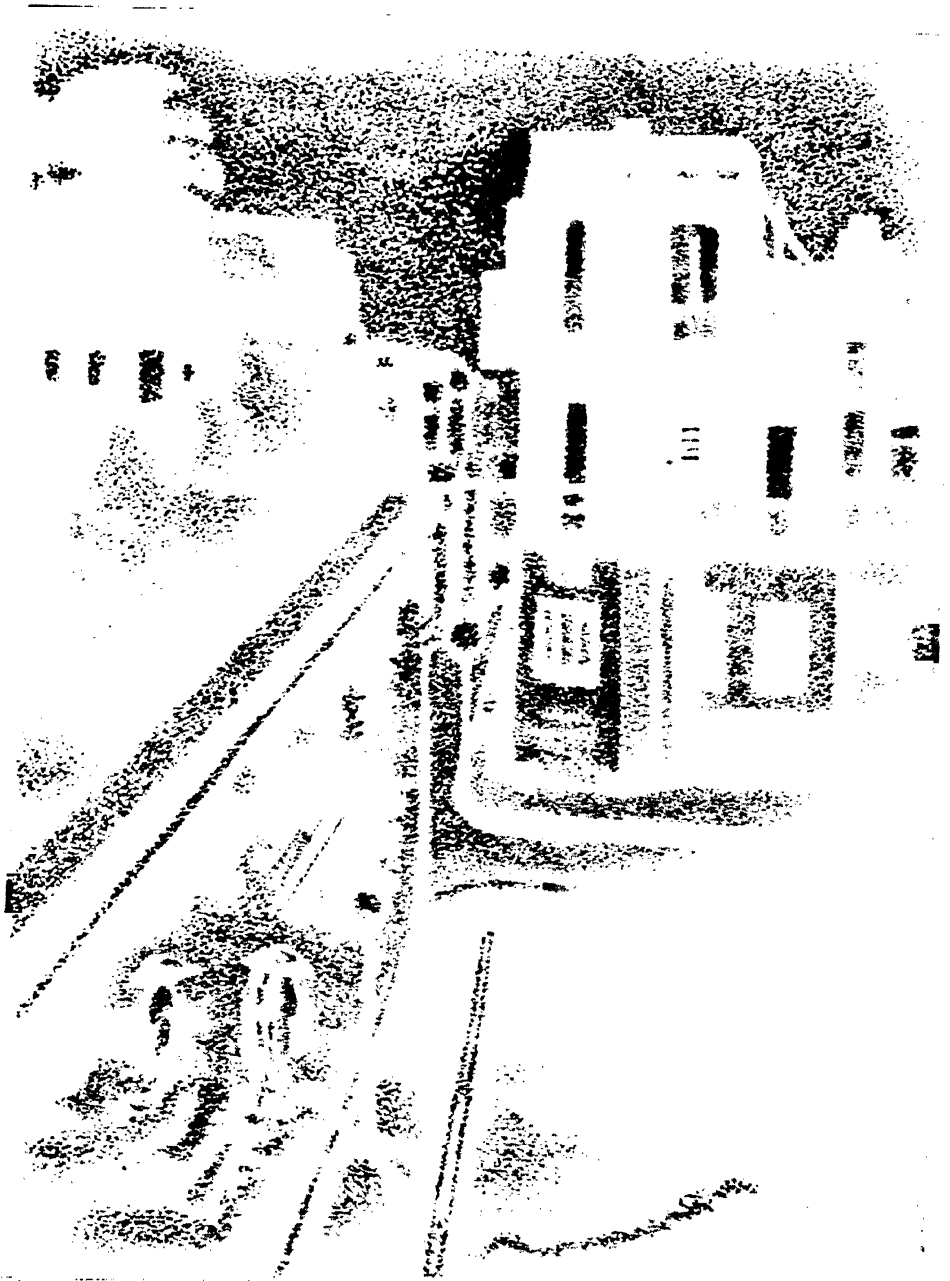
কলকাতায় বর্ষা
উড-এনগ্রেভিং

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠত 'বো মারা' ব'লে। দুপুরবেলা, বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত বুলবুলির লড়াই হত। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও তাই হত। ট্রেভেলিয়ান মুরগির লড়াই সম্বন্ধে লিখেছেন—At cock-fighting all classes shrieked their bets round the little amphitheatre—এবং ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে বলেছেন—"Horse-racing presented much the same spectacle in a more open arena: the spectators, most of them on horse back, galloped up the course behind the race, yelling with excitement [১০]

দুই দেশের মধ্যেই মধ্যযুগের এই বিকৃত কালচারের লেনদেন হয়েছিল প্রথম যুগে এবং আমাদের দেশের নতুন ধনিকসমাজে তার জের ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। ধনিকরা যা আভিজাত্যের লক্ষণ বলে মনে করতেন, আসলে তা আপজাত্যের লক্ষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওদেশের মতন এদেশের ধনিকদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যক্ষভাবে রিনেস্যান্স আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সভা-সমিতি, সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তাঁরাও কম উদ্‌যোগী ছিলেন না। রক্ষণশীল সভা নয় শুধু ('ধর্মসভা' যেমন), প্রগতিশীল সভাতেও ধনিকদের একাংশ যোগ দিয়েছিলেন। "আত্মীয় সভা", "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge), "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সকলে সব সময় ঘোড়দৌড়, বুলবুলির লড়াই আর সখের থিয়েটারের মধ্যে ডুবে থাকেন নি। তা ছাড়া, এইসব বিদ্বৎ-সভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রম-বিস্তারের ফলে, শহরের নতুন অভিজাতশ্রেণীর বংশধরেরা ক্রমে পূর্বপুরুষদের নবাবী কালচারের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে উঠছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে, প্রধানতঃ কলকাতা শহরে, সভা-সমিতির যে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য দেখা যায়, তা সত্যই বিস্ময়কর। কেবল এই সব সভা-সমিতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নবযুগের বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। সুতরাং সমস্ত সভার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় এখানে। সকল প্রকারের সভাও আমার আলোচ্য নয়। ধর্মসভা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সভার কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করলেও, বিদ্বৎ-সভাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিদ্বৎ-সভায় ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, হয়েছেও, কিন্তু তা হলেও অন্যান্য সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। ইংরেজিতে Learned Society বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে আরও ব্যাপক অর্থে আমি 'বিদ্বৎ-সভা' কথার ব্যবহার করছি। অবশ্য সম্প্রতি Learned Society কথাটিও অন্যান্য দেশে অনেক ব্যাপক ও 'পপুলার' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগের বিদ্বৎ-সভা, সেকালের অ্যাকাডেমির সংকীর্ণতা কাটিয়ে অনেক বেশি উদার হয়ে উঠছে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য শিক্ষিত বাঙালীদের যে-কোনো সভাকে আমি "বিদ্বৎ-সভা" ব'লে গণ্য করেছি। উনবিংশ শতাব্দীকে দুটি পর্বে ভাগ করে (১৮০০-১৮৫০ এবং ১৮৫০এর পর), প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, বাংলার রিনেস্যান্স-আন্দোলনের গতিধারার উপর তার প্রভাব বিচার করাই আমার লক্ষ্য। আলোচনার

১০ পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪; Trevelyan, পূর্বোক্ত গ্রন্থ: ঐ

সুবিধার জন্য প্রথম পর্বকে দুটি 'যুগে' ভাগ করেছি—একটি রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ, আর-একটি ইয়ং বেঙ্গলের যুগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রধানতঃ ইংরেজরা উদ্‌যোগী হয়ে যেসব বিদ্বৎ-সভা স্থাপন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ তখন বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। এইসব সভার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য—"এশিয়াটিক সোসাইটি"। সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্‌সের উদ্‌যোগে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম যে সভা হয় (১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪), তাতে—"Thirty gentlemen attended…and they represented the elite of the European community in Calcutta at the time". এই সভায় জোন্‌স সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন—"Whether you will enrol as members any number of learned Natives you will hereafter decide." ১৮২৯ সালের ৭ই জানুয়ারির এক সভায় (অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩৫ বছর পরে) উইলসন সাহেব সর্বপ্রথম কয়েকজন এদেশীয় লোকের নাম প্রস্তাব করেন, সোসাইটির সদস্যপদের জন্য এবং তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১] এদিকে ১৮২৯ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেরাই উদ্‌যোগী হয়ে অনেক সভা-সমিতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভা", "ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি", "ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি", "হিন্দু কলেজ", "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন", "সংস্কৃত কলেজ" ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যানুরাগী ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েই উদ্‌যোগী হয়ে এই সব সভা সোসাইটি ও শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। তারপর "এশিয়াটিক সোসাইটির" সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তার আগে হয় নি।

রামমোহনের "আত্মীয় সভা"

বাঙালীর উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত রামমোহন রায়ের "আত্মীয় সভার"। প্রথমে রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভার অধিবেশন হত, পরে তাঁর সিমলের বাড়িতে সভা স্থানান্তরিত হয়। প্রধানতঃ ধর্মসংস্কারের আদর্শ নিয়ে এই সভা স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালের "ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি" (সেপ্টেম্বর ১৮২১) অথবা "ব্রাহ্মসমাজের" (আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে "আত্মীয় সভার" পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভা কেবল ধর্মোপাসনার সভা ছিল না। যদিও সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হত, ব্রহ্মসংগীত হত, তাহলেও কেবল তাতেই সভার কাজ শেষ হত না। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিচ্ছিন্ন বিবরণ, যা প্রাচীন সংবাদপত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে সভার অধিবেশন কেবল রামমোহনের গৃহেই হত যে তা নয়, যোগদানকারী সদস্যদের গৃহেও মধ্যে মধ্যে হত। অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হত না, নানা রকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হত। ইংরেজি "ক্যালকাটা জার্নাল" পত্রিকা থেকে আত্মীয় সভার বৈঠকের মাত্র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি। বৈঠকটি ১৮১৯ সালের ৯ মে, রবিবার, ব্রজমোহন

১১। Centenary Review of A. S. B. from 1784-1883: Part 1: History of the Society: By Rajendra Lal Mitra.

মজুমদারের গৃহে হয়েছিল। ১৮ই মে, "ক্যালকাটা জার্নাল" পত্রে এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় এই মর্মে:

At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules respecting the intercourse of several castes with each other, and of the restrictions on diet, etc was *freely discussed*, and generally admitted— the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy— the practice of Polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned— as well as all the superstitious ceremonies in use amongst idolaters······— *Calcutta Journal*, vol 3, Tuesday, May 18, 1819, No 89 (Italics লেখকের)

এই একটি মাত্র বিবরণ থেকে "আত্মীয় সভা" যে কি ধরনের সভা ছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যে-সভায় নানাবিষয় "was freely discussed", সে-সভা কেবল উপাসনা-সভা ছিল না, পরিপূর্ণ আলোচনা-সভা ছিল (আধুনিক অর্থে)। আলোচ্য বিষয়গুলির বৈচিত্র্য ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। জাতিভেদ সমস্যা, নিষিদ্ধ খাদ্যসমস্যা, বালবিধবাদের সমস্যা, বহুবিবাহের সমস্যা, সতীদাহ-সহমরণের সমস্যা, পৌত্তলিকতার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় সভার অধিবেশনে স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনা হত। যদি আত্মীয় সভার অধিবেশনের কোনো মুদ্রিত Proceedings পাওয়া যেত, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, "ইয়ং বেঙ্গল"-যুগের ভিতর দিয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রান্ত পর্যন্ত, বাংলার রিনেস্যান্স ও রিফর্মেশন আন্দোলনের ধারা যে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একটা মোটামুটি খসড়া রামমোহনের "আত্মীয় সভার" অধিবেশনেই রচিত হয়েছিল। নবযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আত্মীয় সভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মীয় সভার সভ্যদের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত। সভ্যরা সকলেই রামমোহনের আদর্শ সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-আন্দোলনের সময় কেউ কেউ ভয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেও, অধিকাংশই তাঁর অনুরাগী সহচর ছিলেন! তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, তাঁর পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার কালীনাথ রায়, রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জাস্টিস অনুকূলচন্দ্রের পিতা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আন্দুল রাজবংশের রাজা কাশীনাথ প্রমুখ আরও অনেকে। ইয়োরোপে নবযুগের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিশীল ভাবধারার মুখপাত্ররূপে, নতুন বিত্তবান্‌শ্রেণীর সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল, বিত্ত ও বিদ্যার যে অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, বাংলার নবযুগের ইতিহাসেও ঠিক তাই হয়েছিল দেখা যায়। নবযুগের বাঙালী বিত্তবানেরা বিদ্বৎ-জনদের সঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভায়। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার শ্রেণীগত বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। বাংলার নবযুগের এই উদ্‌যোগপর্বে বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার ঐতিহাসিক সম্মিলন হয়েছিল আত্মীয় সভায়। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম্ (Karl Mannheim) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে

বলেছেন— "…it is essential to note how with the rise of modern capitalism, the wealthy merchant and banking families play their part in cultural life."[১২]

"হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয়, ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি, সোমবার। 'আত্মীয় সভা' কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। শিক্ষালয়ের সংস্কার ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার জন্য "ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি" (জুলাই, ১৮১৭) ও "ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি" (সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) স্থাপিত হল। বাঙালী ও ইংরেজরা একত্রে উদ্‌যোগী হয়ে এই সব সোসাইটি ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল, নতুন শিক্ষার। নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও সোসাইটিও এই সময় স্থাপিত হল অনেক। ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর মন সভা-সমিতি-সচেতন হয়ে উঠল। প্রধানতঃ ইংরেজদের উদ্‌যোগে এই সময় (১৮১৮-১৮২৮) যেসব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— Literary Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural and Horticultural Society, Commercial and Patriotic Association (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়, রামমোহন রায় এই অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন), Ladies' Society (১৮২৮ সালে স্থাপিত হয়—রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও কাশীনাথ মল্লিক এই সভা প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে), Calcutta Medical and Physical Society ইত্যাদি। বাঙালীদের উদ্‌যোগে প্রতিষ্ঠিত এই সময়কার সভা-সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "গৌড়ীয় সমাজ"।

"গৌড়ীয় সমাজ" স্থাপিত হয় ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেকালের প্রতিপত্তিশালী বাঙালীদের মধ্যে অনেকে উদ্‌যোগী হয়ে "এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জনার্থে" এই সমাজ স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজে সভাস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম যে সভা হয়, তাতে দেখা যায় যে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল উভয় দলের লোক যোগদান করেছিলেন। রামমোহনের দলভুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন, আবার ওদিকে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, এঁরাও ছিলেন। এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ হল, ১৮২৩ সালে রামমোহনের আন্দোলন সমাজে এমন তরঙ্গবিক্ষোভের সৃষ্টি করেনি, যার ফলে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলির উৎপত্তি হতে পারে। ১৮২৯ সালে বেণ্টিঙ্ক যখন সতীদাহ ও সহমরণ বিধিবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৮৩০ সালে সনাতনপন্থীরা যখন ধর্মরক্ষার্থে "ধর্মসভা" স্থাপন করলেন, মতামতের সংঘাত ও দলাদলি তখন থেকে তীব্রভাবে আরম্ভ হল। তার আগে, বিশেষ করে গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠার সময়, বাঙালী সমাজে প্রাচীনপন্থী, মধ্যপন্থী এবং উদার প্রগতিপন্থী, মোটামুটি এই তিন দলের লোক থাকলেও, তাঁদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়নি। গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। সভা-স্থাপনের সময় উদ্‌যোগীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা লক্ষ্য করার মতন।

১২। Karl Mannheim, *Man and Society*, Studies in Modern Social Structure (London 1940); P. 84 footnote.

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়* বলেন, আমাদের দেশে যে সভা-সমিতি সেরকম স্থায়ী হয় না, তার কারণ কি? তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সভা স্থাপন ক'রে আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার ও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেলাম, তাতে যে কতটা আমরা সুখী হয়েছি তা বিবেচনা করা দরকার। রামজয় তর্কালঙ্কার বলেন, সত্যিই এখানে আমরা আজ এমন সব লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি, যাঁদের সঙ্গে হয়ত এক বছর কি ছ মাসের মধ্যেও একবার দেখা হয় না। কাশীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। রসময় দত্ত বলেন, সভায় যদি বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি এর মধ্যে আছি, আর যদি রাজসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, কি ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি নেই। এই রকম সব আলোচনা চলতে থাকে।[১৩] 'আত্মীয় সভার' মতন 'গৌড়ীয় সমাজের' অধিবেশনও মধ্যে মধ্যে সভ্যদের বাড়িতে হত। গৌড়ীয় সমাজের সভ্যদের মধ্যে যে কোনো আদর্শগত ঐক্য ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা না থাকলেও, বিদ্বৎ-সভার সভ্যদের যে উদারতা থাকার প্রয়োজন, তা তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল। সমাজের উন্নতি করা যায় কি করে, তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। সভ্যরা রচনাও পাঠ করতেন, রচিত গ্রন্থের অংশ পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন। গৌড়ীয় সমাজ কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল সঠিক বলা যায় না। প্রবীণদের সভার বদলে যখন নবীনদের সভাস্থাপনের যুগ এল, তখন বিদ্বৎ-সভার রূপও বদলে গেল।

ডিরোজিওর "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন"

এর মধ্যে হিন্দুকলেজের বয়স দশ বছরের বেশী হয়ে গেছে। হিন্দু বিত্তবান পরিবারের সন্তানেরা অনেকে মহাবিদ্যালয়ে নতুন উচ্চশিক্ষা পেয়ে, বাল্যকাল থেকে যৌবনকালে পদার্পণ করেছেন। বেকন, লক্, হিউম, রুশো, টম্ পেইন প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। নবযুগের আদর্শগুরু তাঁরা, কেবল ইংলণ্ডের বা ইয়োরোপের নয়, সমগ্র বিশ্বের। হাতে-লেখা পুঁথিতে তাঁদের বাণী আর পুরোহিত-যাজকের কুক্ষিগত হয়ে নেই, মুদ্রিত গ্রন্থাকারে সেই বাণী দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম থেকে পূর্বেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলা দেশের কলকাতা শহরে পর্যন্ত। বাংলার নতুন শিক্ষিত যুবকরা সেই বাণী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। Age of Reasonএর অভ্যুদয় হয়েছে। কুসংস্কারের মেঘাচ্ছন্ন মধ্যযুগের আকাশে প্রথম উষার আলোকরেখা দেখা গেছে। বিজ্ঞানের আলো, যুক্তির আলো। মানুষের মনে নতুন প্রশ্ন, নতুন মূল্য-বোধের বিকাশ হচ্ছে। প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড মার্টিন নবযুগের মানুষের এই অনুভূতি ও মনোভাব সম্বন্ধে বলেছেন:[১৪]

Men felt that they had at last attained their majority in matters economic, political and intellectual. The new conditions of life brought with them new attitudes and new valuations. The assertvie self-consciousness of the *novus homo* made him reject any power which would impose limits.

---

* এই রাধামাধবই বোধ হয় পূর্বোদ্ধৃত ইংরেজী doggerelএর 'Radamadub'

১৩। সমাচার দর্পণ, ৮ মার্চ ১৮২৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ১ম খণ্ড, ৯-১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৪। Martin, *Sociology of the Renaissance*, pp. 39-40.

"ইয়ং বেঙ্গল" ও হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। সমস্ত রকমের বন্ধন ও কর্তৃত্ব থেকে তাঁরাও মুক্তি চেয়েছিলেন। স্থবির ও প্রবীণেরা যখন রক্তচক্ষু মেলে সেই বন্ধন আরোপ করতে চেয়েছেন, তখন তাঁদের "assertive self-consciousness" তা প্রত্যাখ্যান ক'রে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যাঁরা বেকন পড়েছেন, লক্ পড়েছেন, হিউম পড়েছেন, তাঁরা কর্তৃত্ব মানবেন না, শাস্ত্রের বিধান প্রশ্নাতীত ব'লে স্বীকার করবেন না। তাঁরা কেবল সংশয় প্রকাশ করবেন, প্রশ্ন করবেন, যুক্তির অবতারণা করবেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তাই করতেন :

The young men brought up in the Hindu College began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkley, of Hume, of Reid, and of Douglas Stewart. A thorough revolution took place in their ideas··· They began to reason, to question, to doubt.[১৫]

ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি নিজে ছিলেন কলকাতার "ধর্মতলা অ্যাকাডেমির" ছাত্র এবং সেখানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কড়া প্রকৃতির কুঁজো স্কচ্ম্যান ডেভিড ড্রামণ্ড। অভিভাবকেরা ড্রামণ্ডের কাছে ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। দার্শনিক হিউমের শিষ্য ড্রামণ্ড ছিলেন সর্ববিষয়ে ঘোর সংশয়বাদী এবং শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার নির্ভীক সমর্থক।[১৬] গুরু ড্রামণ্ডের সুযোগ্য শিষ্য তৈরি হয়েছিলেন ডিরোজিও। চোদ্দ বছর বয়সে অ্যাকাডেমির শিক্ষা শেষ ক'রে তিনি কিছুদিন বাইরে চাকরি করেন। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ এবং তরুণ বয়সেই কাব্য ও অন্যান্য রচনার মধ্যে তার পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। পর্তুগীজ পরিবারের সন্তান হয়েও, এদেশকে তিনি স্বদেশ ও মাতৃভূমি ব'লে মনে করতেন। এদেশে তিনিই বোধ হয় প্রথম প্যাট্রিয়টিক কবিতা লেখেন। ১৮২৬ সালে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে, তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গরানহাটায় (চিৎপুরে) হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আট বছরের বালক ডিরোজিও ধর্মতলা অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলেন। তখন কে জানত, এই ডিরোজিওই আর আট-নয় বছরের মধ্যে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হবেন এবং সেখানে তাঁর ছাত্রদের মনোজগতে এক বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করবেন !

তাই করেছিলেন ডিরোজিও। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তাঁর সমবয়স্ক ছিলেন। ভাবী 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই প্রায় তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শীকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলে তাঁর ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, এঁরাও ডিরোজিওর অধ্যাপনাকালে হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। কারণ, ১৮২৬ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কৃষ্ণমোহন ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, রসিককৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। একজন তরুণ শিক্ষককে ঘিরে তরুণ ছাত্রদের এরকম সমাবেশ আর কোথাও কখন হয়েছে কিনা জানি না। কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষকরূপে নয়, নবযুগের আদর্শ শিক্ষকরূপে ডিরোজিও নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক

১৫। Rev. Lal Behari Day, *Recollections of Alexander Duff* (London 1879), Chapter 3, p. 28.

১৬। Thomas Edwards, *Henry Derozio* (Calcutta 1884), Chapter 1, pp. 1-9.

উপস্থিত হননি, যেন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। ছাত্রদের মন যাবতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে, বিহঙ্গের মতন উদার চিন্তার আকাশে যুক্তির ডানা মেলে যাতে অবাধে বিচরণ করতে পারে, এই ছিল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য। মনীষী বেকন ছিলেন তাঁর আদর্শ। শিক্ষার পদ্ধতিও ছিল অভিনব। প্রত্যেক প্রশ্নের ও বিষয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমস্ত বক্তব্যটিকে পেশ ক'রে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দিতেন এবং তার ভিতর থেকে আসল বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথটি তাদের সন্ধান ক'রে নিতে সাহায্য করতেন। ক্লাসের মধ্যে এক বিচিত্র রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হত এবং ছাত্রদের কাছে ডিরোজিও যেন তার নায়ক হতেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতন ছাত্ররা তাঁর কথা শুনত। ডিরোজিওর এই ক্লাস সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাই বলেছেন: "...it was...more like the Academus of Plato, or the Lyceum of Aristotle."[১৭]

বিদ্যালয়ের ক্লাস বিতর্ক-সভায় পরিণত করা সম্ভব নয়, কিন্তু শিক্ষক ডিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্ররা তাতে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ হত যে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের মন বিতর্কের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক ও আলোচনা-সভা হত ডিরোজিওর বাড়ির বৈঠকখানায়। সভার নাম হল "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন" (Academic Association)। মনে হয়, ১৮২৭-২৮ সাল থেকেই এই অ্যাকাডেমির নিয়মিত অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডিরোজিওর বৈঠকখানা থেকে এই বিদ্বৎ-সভা পরে শ্রীকৃষ্ণসিংহের মানিকতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ড্‌স ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়) স্থানান্তরিত হয়। এই অ্যাকাডেমি ও তার অধিবেশন সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি:

Derozio's drawing-room proving too confined a place for these discussions, the young men got up, about the year 1828, a debating society, which they called the Academic Association, or the Academy. In this grove of Academus —and the debating society had a garden attached to it, it being held on the premises now occupied by the Ward's Institution—did the choice spirits of of Young Calcutta hold forth, week after week, on the social, moral and religious questions of the day. The general tone of the discussions was a decided rovolt against existing religious institutions...The young lions of the Academy roared out, week after week, 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!'... [১৮]

"পার্থিনন" (The Parthenon) নামে সভার মুখপত্র প্রকাশিত হল, কিন্তু হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকাখানি হুমকি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সভার কাজ তাতে বন্ধ হল না। কেবল অ্যাকাডেমিতে নয়, ডিরোজিও অন্যান্য শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সভায় (যেমন পটলডাঙার হেয়ার সাহেবের স্কুলে) বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ডিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির আকর্ষণ তরুণদের কাছে বাড়তে লাগল। কলকাতা শহরের শিক্ষিত তরুণরা ডিরোজিও ও তাঁর অ্যাকাডেমির সংস্পর্শে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল অ্যাকাডেমির উদার পরিবেশে। কৃষ্ণমোহন

১৭। লালবিহারী দে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২৯ পৃষ্ঠা।

১৮। ঐ, ৩য় অধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, সকলেই এই অ্যাকাডেমির সভাতেই বক্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক্তা হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধে "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" পত্রিকা লিখলেন : Krishna Mohan was the readiest and most effective speaker, unaffected in manner, calm and unimpassioned, though sometimes bursting into vehemence··· কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর খুব প্রিয়ও ছিলেন।[১৯] অ্যাকাডেমির বিতর্ক-সভায় রামগোপাল ঘোষের বাগ্মিতার বিকাশ হয়েছিল কিভাবে, সে সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু লিখেছেন : "It is said that this debating club was to him what the Oxford club had been to many an English orator. Ramgopal continued to shine as a speaker at the Academic. He was an eloquent speaker, but not so close a reasoner as his colleague Babu Russick Krishna Mullick."[২০]

মানিকতলার বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিদ্বৎ-সভায় প্রবীণ ও বিচক্ষণেরাও যোগদান করার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন না। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিড হেয়ার, ডেপুটি-গবর্নর বার্ড সাহেব, প্রায়ই যেতেন অ্যাকাডেমির অধিবেশনে। তরুণ বাংলার প্রতিভার দীপ্তি দেখে তাঁরা এতদূর চমৎকৃত হতেন যে সভায় না গিয়ে থাকতে পারতেন না। অ্যাকাডেমির তরুণ সভ্যদের মুখে মুখে হিউম, বেকন, লক্‌এর বাণী শোনা যেত। শাণিত যুক্তির তরবারি নিয়ে সত্যিই "The young lions of the Academy roared out, week after week···" এই সময় তাঁর ছাত্রদের, অর্থাৎ অ্যাকাডেমির তরুণ সভ্যদের বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার ক্রমোন্মেষ লক্ষ্য ক'রে, নবযুগের বাংলার শিক্ষাগুরু ডিরোজিও অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের উদ্দেশে লেখেন :

"Expanding like the Petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer hours),
Their wings to try their strength."

পরবর্তীকালের কোনো-কোনো সভার মুদ্রিত বিবরণী যেমন পাওয়া যায়, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সে রকম কিছু পাওয়া যায় না। পরে যেমন সমসাময়িক পত্রিকায় এই সব সভা ও সোসাইটির অধিবেশনের বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, অ্যাকাডেমির সেরকম কোনো বিবরণ বোধ হয় প্রকাশিত হয় নি। অনেক অনুসন্ধান করেও, যা পাওয়া যায় এরকম কোনো সেকালের পত্রিকাতে, আমি কোনো বিবরণ পাইনি। যদি পাওয়া যেত, তাহলে "ইয়ং বেঙ্গল" দলের উন্মেষপর্বের ইতিহাস আমরা আরও সবিস্তারে জানতে পারতাম। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই ছিল ইয়ং বেঙ্গলের আসল ট্রেনিং স্কুল। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব তাই খুব বেশি।

১৯। *Bengal Past and Present*, vols 36 (Part II), 37 (Parts I & II), Rev. Krishna Mohan Banerjee, by Harihar Das.

২০। Amrita Lal Basu, *Speeches of Babu Ram Gopal Ghose*, with a Biographical Sketch (Calcutta, 1885), p. VII.

বাউল-পরিচয়

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পূর্বানুবৃত্তি

জাতিপংক্তি

"প্রেম ও অনুরাগ-পথের সাধকদের যে জীবন্ত ভাবধারা প্রবহমান, তাহাতে নিজেকে সহজে ছাড়িয়া নিজের সাধনার ধারা তাহাতে যুক্ত করাই হইল সত্যসাধনা। কৃত্রিম শাস্ত্রে বা মিথ্যা আচারে নিজেকে বদ্ধ না করিয়া সেই জীবন্ত প্রবাহে নিজকে হারাইতে হইবে। বাউল মদন বলেন—

সেই সহজ ধারা, তাতে আপ্‌নাহারা
তাঁর বাণী শুনে।

বাউলের মধ্যে নানা জাতি আছে। হিন্দু মুসলমান দুই শ্রেণীরই নানা নিম্নবর্ণ আছে কিন্তু সবাই 'বাউল'। আর কোনো পরিচয় নাই। "গঙ্গার ধারাতে যত ধারা পড়ে সবই আপন পূর্বপরিচয় হারাইয়া গঙ্গা হইয়া যায়। ভাবের জীবন্ত ধারায় তেমনি আপনাকে হারাইতে হইবে। নহিলে ভাবধারাটি যে জীবন্ত অর্থাৎ পরকে আপন করিয়া লইতে সমর্থ তাহা বুঝা যাইবে কেমন করিয়া?" বাউলরা এই বলিয়াই সব পরিচয়-জিজ্ঞাসার মূল উচ্ছেদ করিয়া দেন।

বাউলরা যেমন করিয়া সকল ধর্ম সকল জাতিকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন বৈষ্ণবরা তেমন করিয়া পারেন নাই। এজন্য বৈষ্ণবরা বাউলদের উপর নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন—"এদের আচার-বিচার নাই।" আবার বাউলেরাও মনে করেন যে বৈষ্ণবরা একান্ত কৃপার পাত্র। বাউলদের উপর বৈষ্ণবদের অবজ্ঞা যে-কোনো মেলা বা মহোৎসবে গেলেই ধরা পড়ে। তবু বাউলেরা দমিবার নহেন। বাউলরা বলেন, "বৈষ্ণবদের যদি বোধ থাকিত তবে তো বুঝিতে পারিত। গোটাকয়েক শুষ্ক শাস্ত্র ছাড়া ওদের ছিল কি? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিরা তো সহজ মত ভাঙাইয়াই কবিত্ব করিয়াছেন। তাঁহাদের বাণীই কি এই সব বৈষ্ণবেরা ঠিকমত বুঝিয়াছেন? ওঁদের যে প্রেমের গুরু রাধা তাঁকেও তো সহজ মতের কাছেই ওঁরা পাইয়াছেন। ওঁদের ছিল মাত্র বৈধ মার্গে ঐশ্বর্যলোকের লক্ষ্মী, রুক্মিণী প্রভৃতি বিষ্ণুর পত্নী। অনুরাগমার্গে রাধাকে তো এঁরা পাইলেন আমাদের কাছে! কিন্তু শাস্ত্রবদ্ধ জড়বুদ্ধি এমন ধন পাইয়াও তাহাকে মলিন করিয়া ফেলিল। সহজের জ্ঞান না থাকিলে এমন রত্ন পাইয়াও লাভ নাই। প্রেমে কামে, আত্মায় ইন্দ্রিয়ে গোল পাকাইয়া গেল। জাতি-পংক্তি লোপ করিয়া সহজ হওয়ার কথা শুনিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে সাহসে কুলাইল না। তাই বড়জোর ভজন কীর্তন মহোৎসব তক সহজ হইবার চেষ্টা হইল কিন্তু ভোজনে ভজনে জীবনে মন্দিরে পূজায় সাধনায় ইঁহারা শাস্ত্র আঁকড়াইয়া রহিলেন। সর্বত্রই যে জগন্নাথ, সব অন্নই যে তাঁর মহাপ্রসাদ, সদাই যে জাতি-পংক্তি লোপ করা মহোৎসব চলিয়াছে, এ কথা জীবনে স্বীকার করার মত সাহস এঁদের কই? তাহা মুখে উচ্চারণ করিলেও জীবনে ধারণ করার মত সাহস নাই এঁদের। অর্জুনের ধনু শিখণ্ডীর হাতে সহিবে কেন? সহজ যে হয় নাই তার কাছে এতটা বীর্য আশা করাই দুরাশা।"

বাউলদের মধ্যে উচ্চ জাতির মানুষ বড় নাই। যদি দৈবাৎ কেহ আসেন তিনিও সকলের সঙ্গে সমান হইয়া যান। ইহাঁরা বলেন, "আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ কিছু নাই। নৌকার উপরের তক্তার চেয়ে নীচের তক্তায় কি কিছু কম গৌরব?" একবার এক বাউলকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "তোমরা শাস্ত্র মান না কেন?" বাউল বলিলেন, "আমরা কি কুকুর যে পুরাতন এঁটো পাতা চাটব?"

আমরা সবাই কুত্তা নি ভাই
(যে) আইঁঠা পাত্র চাটি?

"সমর্থ সাধকেরা নিজেদের ঐশ্বর্য মুক্ত ক'রে মহোৎসব করেন। যেসব কাপুরুষের উৎসব সৃষ্টি করবার মত শক্তি বীর্য সাহস নেই তাঁরা সাহস ক'রে উৎসব সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁরা কেবল কুকুরের মত উচ্ছিষ্ট পাতা সংগ্রহ করে রাখেন ও তাই বিধিমত চাটেন। তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা বিষয়ী তাঁরা ভাবেন ভবিষ্যতে যদি আর মানবের মহোৎসব না হয় তাই তারা এঁটো এই সব পাতা সংগ্রহ ক'রে ভবিষ্যৎ কালের জন্য বিরাট সঞ্চয় রেখে যান, তার নামই শাস্ত্র। এই রকম করেই এঁটো পাত কুড়িয়ে চার ভাগ করে হল চার বেদ। তেমনি করে পরবর্তী দীর্ঘকালের ছোট ছোট উৎসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁরা করলেন আঠারো ভাগে আঠারো পুরাণ। আজকার এইসব কুক্কুরমতি কাপুরুষেরাই সেই সব এঁটো পাতা চেটে চেটে পূর্বপুরুষদের নামে ধন্য ধন্য করেন— তবু মানবের নিত্য উৎসব সৃষ্টি করবার মত সাহস এঁদের নেই।"

এমন মতিগতি যাঁহাদের তাঁহারা কি আবার ইতিহাসের ধার ধারিবেন? সে সব এঁটো পাতের মিল-অমিল তুলনা অগ্রপশ্চাৎ আলোচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

তবে ইঁহারা যে নাস্তিধর্মাত্মক সাধনায় নিজেদের ভাসাইয়া দেন নাই তার প্রধান প্রমাণ হইল ইঁহাদের অপূর্ব ভাবপ্রকাশ। নাস্তি বস্তুর প্রকাশ সম্ভবে না। ইঁহাদের গান রচনা জীবন সবই সূচনা করে ইঁহাদের অস্তিধর্মাত্মক মূলকে। 'নাই-বস্তু'কে সুন্দর করিয়া দেখানো অসম্ভব। অন্ততঃ সে সৌন্দর্য স্থায়ী হয় না।

দাদূ বলিয়াছেন,

কুছ নহি কা নাঁব্ ক্যা জো ধরিয়ে সো ঝূঠ।—সাচ অঙ্গ, ১৪৫ পদ

"'কিছু নাই'-এর আবার নাম কি? তাহাকে যে নামই দিবে সে নামই মিথ্যা।"

শাস্ত্র

বাউলদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে তাঁহাদের ধর্ম কত কালের— কোন্ ধর্মের পরে বা আগে? তবে তাঁহারা বলেন, "জগতের যত কৃত্রিম ধর্ম সে সব আগে বা পরে কালের শাসনে উদ্ভূত। যে সব ধর্ম সহজ তাহা অকৃত্রিম স্বভাবজ, তাহা কালের শাসনের বাহিরে— 'অকাল'।" তাঁহাদের ধর্মও সহজ কিনা, তাই তাহা নিত্য কালের। তাহার আর আদি অন্ত নাই। তাঁহাদের মতে "পুরাণ স্মৃতি এমন কি বেদও কৃত্রিম, সহজ ধর্ম আরও আগের।" এ কথার মধ্যে একটু সত্য যে না আছে তাহা নয়।

বেদ

তাঁহাদের মধ্যে যে দুই-একজন বেদের নামমাত্র জানেন তাঁহারা বলেন— অন্য বেদে ক্বচিৎ সহজের কথা আছে। কিন্তু অথর্বে নাকি সহজের কথাই সব। তাঁরা বলেন, "বেদেও নাকি বাউলের উল্লেখ

আছে— সেখানে বাউলদের নাম "নিবর্তিয়া" বা নিব্রতিয়া। তাঁহারা কিছু মানেন না অথচ সহজ সত্য পাইয়াছেন বলিয়া সর্ব চরাচর, সকল দিক্ তাঁহাদের আয়ত্ত। যাগযজ্ঞ প্রভৃতির বাঁধন তাঁহাদের নাই। সহজের ঐশ্বর্যে তাঁহারা সর্বজগতের সঙ্গে যোগযুক্ত, তাঁহারা নিত্য সচল।"

অথর্ব

এই লক্ষণযুক্ত অথর্বে দেখিলাম ব্রাত্যের প্রকরণ আছে। পঞ্চদশ কাণ্ডে। তাহার প্রথম অনুবাকের প্রথম পর্যায়ে আছে—

ব্রাত্য আসীদ্ ঈয়মান এব
স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।—১৫,১,১

ব্রাত্য ছিলেন সদাসচল, তিনি প্রজাপতিকেও সচল করিয়া তুলিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে— ব্রাত্য চারিদিকে গমন করিলেন।

তৃতীয় পর্যায়ে আছে— ব্রাত্য এক বৎসর উচ্চে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবতারা কহিলেন, "হে ব্রাত্য, বসিবে না?"

স সংবৎসরমূর্ধ্বোঽতিষ্ঠৎ
তং দেবা অব্রুবন্ ব্রাত্য কিং নু তিষ্ঠসীতি॥ অথর্ব, ১৫,১,৩,১

ব্রাত্য কহিলেন, "বসিবার মত আসন দাও-না!"

আসন্দীং মে সংভরন্তু ইতি।—ঐ, ১৫,১,৩,২

দেবতারা ব্রাত্যকে আসন দিলেন। সেই আসনের দুই চরণ হইল গ্রীষ্ম ও বসন্ত, ও আর-দুই চরণ হইল শরৎ ও বর্ষা।

তস্যা গ্রীষ্মশ্চ বসন্তশ্চ দ্বৌ পাদাবাস্তাং
শরচ্ চ বর্ষাশ্চ দ্বৌ॥ —ঐ, ৪

ব্রাত্য তখন তাহাতে বসিলেন।

ষষ্ঠ পর্যায়ে আছে— ব্রাত্য সর্বদিকে চলিলেন। সবই তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম পর্যায়ে আছে— ব্রাত্য সরস চঞ্চল নিরবলম্ব হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, সেই রস-উচ্ছ্বাস সেখানে তরঙ্গময় অপার অগাধ সমুদ্র হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় অনুবাকে প্রথম পর্যায়ে আছে ব্রাত্য মানবের মধ্যে তখন চলিলেন— তাঁর সঙ্গে সভা সমিতি, সেনা ও সুরা সবই চলিল।

এই অথর্বে বহু হেঁয়ালি আছে, সে সব ঠিক বাউলদের হেঁয়ালির মতই।

"যে মনীষী ব্রহ্মবিৎ সেই জনই সম্পূর্ণ বাক্যকে জানে। সাধারণ মানুষ সেই বাক্যের অংশমাত্র ব্যবহার করে।"

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।—অথর্ব, ৯,১৫,২৭

"জগতের মধ্যে কি এক সত্য নিহিত আছে যাহা না পাইয়া মন কিছুতেই আনন্দ পায় না, তারই খোঁজে জল সদাই প্রবহমান।"

কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তীর্নেলয়ন্তি কদাচন ॥—অথর্ব, ১০,৭,৩৭

"বিশ্বরথে যুক্ত সপ্তরশ্মি কাল-অশ্ব সদাই ধাবমান। সকল ভুবন সকল লোক সেই রথেরই চক্র।"

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ।
তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥—অথর্ব, ১৯,৫৩,১

"পূর্ণস্বরূপ হইতেই জগতের যত পূর্ণতা।"

পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচতি।—অথর্ব, ১০,৮,২৯

অথর্বে দেখি (১১শ, ৯ম), "যাহা উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহা হইতেই জগতের সর্ব সমৃদ্ধি। সমস্ত সৃষ্টিই এই উচ্ছিষ্ট হইতে।"

"ঋত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র শ্রম, ধর্ম, কর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য, লক্ষ্মী, বল— সবই উচ্ছিষ্টের বলে।"

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥—অথর্ব, ১১,৯,১৭

"আনন্দ, মোদ প্রমোদ ও অভীমোদ প্রভৃতি সবই উচ্ছিষ্ট হইতে উদ্ভূত।"

আনন্দা মোদাঃ প্রমুদো ভীমোদমুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্ জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥—অথর্ব, ১০,৯,২৬

"এই মানব এক বিচিত্র মন্দির। এই মন্দির রচিত হইলে পর দেবতা ইহাতে আশ্রয় করিয়া রহিলেন।"

গৃহং কৃত্বা মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥—অথর্ব ১১,১০,১৮

বাউলরা বলেন, "দেহে পৃথিবীতত্ত্ব এবং সেই মহীতেই সর্বতত্ত্ব।" অথর্ব বেদের ১২, ১ মহীসূক্তে মহীর অপার রহস্য বুঝিবার চেষ্টা চমৎকার দেখা যায়। তাহা ছাড়া অথর্ব বেদের ৫, ১; ৬, ১; ৮, ৯—১৫; ৯, ১৪; ৯, ১৫ প্রভৃতি সূক্তের হেঁয়ালি ঠিক বাউলদের হেঁয়ালির মতই। ১০, ২, ১১, ১০ সূক্তে মানব-দেহ সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহার সঙ্গেও বাউলদের বর্ণনার সংগতি আছে। ১০, ৭ স্কম্ভ সূক্ত, ১০, ৮ ও স্কম্ভ সূক্ত। ১১, ৬ তো প্রাণসূক্ত ১১, ৯ সূক্তে উচ্ছিষ্টমহিমা বর্ণন প্রভৃতি প্রকরণে বাউলদের অনেক সত্য ধরিতে পারা যায়। রোহিত বর্ণনায় (অথর্ব ১৩, ঐতরেয় ৫ম), ব্রাত্য বর্ণনায় (অথর্ব ১৫), মহীসূক্তে (অথর্ব ১২, ১) ও অন্যান্য অনেকস্থলে বাউলপন্থীদের সঙ্গে বেদের বিস্তর সামঞ্জস্য ধরা পড়ে। পরেও এই অথর্ব হইতে অনেক একভাবাত্মক বাণী পাওয়া যাইবে।

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্—১০, ৭, ১৭
অপাং ত্বাং পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র ত্বমায়য়া হিতম্ ॥—অথর্ব, ১০, ৮, ৩৪

কোন মায়াতে জলের মধ্যে ফুটে এই পুষ্প? তাহার রহস্যই তোমার কাছে জানিতে চাই।

অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গজ্যোতিষাবৃতঃ ॥—অথর্ব, ১০ ১, ২, ৩১

অষ্টচক্রা নবদ্বারা এই দেবতাদের অযোধ্যাপুরী। ইহাতেই আছে সেই হিরণ্ময় কোশ যাহা স্বর্লোকে যায়, যাহা জ্যোতিতে আবৃত।

তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥—ঐ, ৩২

তাহাতে যে আত্মবান্ অপূর্ব জীব থাকে তাহার খবর ব্রহ্মবিদেরাই জানেন।

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণেভিরাবৃতম্।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥—ঐ ১০, ৮ ৪৩

নবদ্বারা এই পুণ্ডরীক, ত্রিগুণে আবৃত। ইহাতে বিরাজমান অপূর্ব জীবের খবর ব্রহ্মবিদেরাই জানেন।

ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্ত্তস্য অমৃতা গৃহে॥—১০, ৮, ২৬

মর্ত্যের গৃহে এই কল্যাণী অজরা অমৃতা বিরাজমানা।

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্যস্যাৎ পুনর্নবঃ॥—১০, ৮, ২৩

সবাই ইহাঁকেই বলেন সনাতন আজ ইনিই পুনর্ণব হউন।

অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি॥—১০, ৮, ৩২

নিকটস্থ সত্যকে ছাড়িয়া যদি দূরে না যাইতে পারে তবে তাহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।

উর্দ্ধং ভরন্ত মুদকং কুম্ভেনেবোদাহার্যম্।
পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ॥—১০, ৮, ১৪

জল ভরিবার মত কুম্ভে যিনি উর্দ্ধে জল ভরেন তাঁহাকে সকলে চক্ষু দিয়াই দেখে, মন দিয়া তো চেনে না।

আবিঃ সন্নিহিতং গুহা॥—১০, ৮, ৬

যাহা সম্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ তাহার রহস্যই সুগভীর।

যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেধি সমাহিতে।
সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ॥—১০, ৭, ১৫

এই মানবের মধ্যেই অমৃত ও মৃত্যু সমাহিত। ইহাঁরই নাড়ীতে সমুদ্র বহমান। ইত্যাদি

বাউলরা বলেন, "নিত্যকালের অলিখিত সহজ মত হইতে বেদে এই সব সত্য গৃহীত হইয়াছে। এমনি ভাবে পুরাণে তন্ত্রেও সহজসত্য এক-আধটুকু নেওয়া হইয়াছে। তা বলিয়া ইহা যেন কেহ না মনে করেন যে, আমরা সেই সব স্থল হইতে ওসব সত্য গ্রহণ করিয়াছি। আমরা তো মূর্খ। শাস্ত্র বা বেদের কি ধার আমরা ধারি?"

ইহাঁরা বলেন, "বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি ঋষিরাও সেকালের সহজ পন্থের সাধক ছিলেন। সহজসত্য যে সর্ব দেশে ছড়াইয়া আছে তাহা হইতেই সর্ব তন্ত্র ও সর্ব সম্প্রদায়ে অনেক সত্য প্রবেশ করিয়াছে। চৈতন্য-মতে যেদিন নিত্যানন্দ আসিয়া যোগ দিলেন সেদিন তাঁহার সঙ্গে সহজ পন্থের অনেক মতবাদও বৈষ্ণবদের মধ্যে আসিল।" কারণ নিত্যানন্দ কোনো কোনো দিক দিয়া সহজ মতেরই লোক ছিলেন। এই নিত্যানন্দ-শাখার দীক্ষাপ্রাপ্ত কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে এমন অনেক কথা আছে যাহা বাউলরাও সর্বদা ব্যবহার করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বাউল ছিলেন। কৃষ্ণদাস গেলেন শাস্ত্রানুগত বৈষ্ণব ভাব ব্যাখ্যা

করিতে, কিন্তু তাঁহার ভাবের মধ্যে যে সহজ মত প্রবেশ করিয়াছে, তাই তিনি অনেক কথা বলিলেন যাহা ঠিক বৈষ্ণবের কাছে আশা করা যায় না। পরে প্রসঙ্গক্রমে এই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতে হইবে।

মচ্ছ গোরখ প্রভৃতি যোগী, দত্তাত্রেয় রামানন্দ প্রভৃতি সাধক, কবীর রবিদাস দাদূ নানক প্রভৃতি ভক্ত এই সহজ মত হইতে অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসঙ্গস্থলে তাহা বলা যাইবে।

গুরু

সহজপন্থীরা শাস্ত্র মানেন না। তাই মানুষের জীবনে যে সত্য উপলব্ধি হয় তাহা তাঁহাদের কাছে অতিশয় মূল্যবান। সত্যের দুই রূপ— জড় ও জীবন্ত। সত্য তাহার আপনার সত্তাতে যখন বিরাজিত তখন তাহার কোনো মূল্য সাধারণের কাছে নাই। এই সত্যই যখন মানুষের জীবনে গৃহীত হইয়া জীবন্ত হয় তখন সেই জীবন্ত সত্যের মূল্যের আর অবধি নাই। ইঁহারা তুলনা দেন— গাভী যেমন তৃণ খাইয়া দুগ্ধ দেয়, বৃক্ষ যেমন অখাদ্য 'ভূ-রস' খাইয়া খাদ্য ফল দেয়, সাধক তেমনি জড় সত্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন। এই সত্যকে যিনি জীবনে জীবন্ত করিতে পারেন তিনি গুরু। শাস্ত্র মানেন না বলিয়াই ইঁহাদের কাছে গুরু এত মান্য। সর্বকালের সর্বদেশের সত্য মানুষের সাধনার মধ্য দিয়াই মানবের জীবনে প্রবেশ করে। যে সব মানুষের জীবনে জীবন্ত হইয়া প্রাণহীন তত্ত্বগুলি সর্বসাধারণের অধিগম্য হয় তাঁহারাই গুরু। মন্ত্র দিলে বা দীক্ষা দিলেই গুরু হয় না।

বাউলদের মতে গুরু হইলেন ভূত কাল, শিষ্য ভবিষ্যৎ কাল, দীক্ষা হইল বর্তমান, কাজেই গুরুশিষ্য-সমাগমে ত্রিকালের সুসংগতি ঘটে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তাহার মৃন্ময় জীবন আছে। সেখানে মানুষও পশুর মতই খায়-দায় এবং কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয়। আবার মানুষের সেই সঙ্গে চিন্ময় জীবনও আছে। সেখানে মানুষ সত্যকে পায়, সত্যকে সাধনা করে এবং সত্যকে দেয়। এখানে মানুষ দেবতুল্য। প্রদীপের যেমন মাটির পাত্র ও দীপ্ত শিখা দুইই আছে তেমনি মানুষেরও পশু ও দৈব এই দুই স্বরূপই থাকে। গুরুরও দুইটি স্বরূপ। এক চিন্ময় শিবস্বরূপ ও অন্য মৃন্ময় জীবস্বরূপ। শিষ্যেরও এই দুই স্বরূপ। শিষ্যের চিন্ময় অংশ গুরুর চিন্ময় অংশের সঙ্গে যুক্ত হইলেই তবে সত্য দীক্ষা হয়। দীপ্ত প্রদীপের দীপ্তিহীন মৃন্ময় অংশের সঙ্গে অদীপ্ত দীপের মৃন্ময় অংশ যুক্ত হইলে কিছু হয় না। অদীপ্ত দীপের দীপ্য অংশটুকু গুরুর দীপ্ত শিখায় ধরিলে তবে শিখা জ্বলে। তাই ভক্ত নারী ক্ষেমা বলিয়াছেন—

> কোটি বরষ ধরি রাখিয়ে চিৎ ছোয়াড়ি মৃতপাস।
> তবহুঁ নহি প্রগাসিয়ে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস॥

চিৎ ছাড়িয়া মৃৎ-এর কাছে যদি কোটি বৎসর ধরিয়া রাখ তবু জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাস জীবনে প্রকাশিত হইবে না।

গুরু যদি শিখা একবার জ্বালাইয়া দেন তবে জীবনের তৈল অমনি ঊর্ধ্বগামী হইয়া বিন্দু বিন্দু রূপে সেই জ্যোতিতে আত্মদান করিতে থাকিবে। ইহাই বাউলদের মতে ধারাকে সহজভাবে উলটাইয়া দেওয়া, নহিলে এক-একটি বিন্দু যদি চেষ্টা করিয়া উপরে উঠাইতে হইত তবে কি আর উপায় ছিল?

দাদূর কন্যা নানীমাতাও এই সত্যটি বলিয়াছেন—

কৈসে শিব জীবকো জিতৈ অধ-ধারা উর্দ্ধ কূঁ জয়।
দীপ জলৈ তেল জ্যুঁ চঢ়ৈ তনকী তৃষ্ণা নশায়।"

প্রশ্ন, কেমন করিয়া শিব জীবকে জয় করিবে? অধোগামী ধারা ঊর্দ্ধগামী হইবে কেমনে? উত্তর, দীপ জ্বলিলে যেমন করিয়া তেল সহজেই ঊর্দ্ধে উঠে, দেহের তৃষ্ণা তেমনি সহজে নষ্ট হইয়া যায়।

ইহাই হইল "সহজ"ভাবে ধারা উলটানো।

গুরুকে ভক্তি করিতে হয়, কারণ গুরুতে যদি গৌরব না থাকে তবে তাঁহার প্রভাবে শিষ্যের জীবন বদলায় না। অনুরাগীদের ভক্তি দিয়াই গুরুর এই গৌরব।

বহু গুরু

সাধারণতঃ আমাদের দেশের সমাজে গুরু একজনই হন; তান্ত্রিকদের মধ্যে গুরু শিক্ষা ও দীক্ষা ভেদে দুই জন। তাহা ছাড়া পটল গুরুও আছেন। কিন্তু এক বা দুই জনে মন একান্ত বদ্ধ করিলে দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। তাই যাঁরা এক গুরু মানেন তাঁহারাও সংকীর্ণতা যাহাতে না আসে তার জন্য নানা উপায় করিয়াছেন।

প্রতি অঙ্গবাণীর পূর্বে দাদূর গুরু-নমস্কারটি এই—

দাদূ নমো নিরঞ্জনং নমস্কার গুরুদেবতঃ।
বন্দনং সর্ব্বসাধবাঃ নমস্কার পারংগতঃ॥

প্রথম নমস্কার নিরঞ্জন পরব্রহ্মকে, তাঁহাকে বুঝিবার উপায়স্বরূপ গুরুকে তার পরে নমস্কার, কিন্তু সেই এক গুরুতে যদি সংকীর্ণ হইয়া যায় মন তাই সকল ভাবের সকল সাধকদের নমস্কার; তবেই আমাদের নমস্কার সকল সীমার পারে চলিয়া যায়।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনিই আপনার গুরু।"

আত্মনো গুরুরাত্মৈব।—ভাগবত, ১১, ৭, ২০

সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের বাণী, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি চব্বিশজন গুরুই আছেন।

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিসংখ্যকাঃ।

বাউলরা তাই বহু গুরু মানেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রথমেই বন্দনায় দেখি "বন্দে গুরূন্"—গুরুদের নমস্কার করি। কৃষ্ণদাস, আদ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর ছয় গুরুকে প্রণাম করিয়া কহিয়াছেন—

ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।

তাঁহার মতে ভগবানই—

শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ২০ পরিচ্ছেদ,

৭৫০ পৃঃ

এই সহজ ভাব হইতেই তন্ত্রে লেখা হইয়াছে—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

—ষট্‌চক্র নিরূপণ, ৫৪ শ্লোক টীকাধৃত বচন

ভৃঙ্গ যেমন মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যায়, শিষ্যও তেমনি জ্ঞানলোভে গুরু হইতে অন্য গুরুতে গমন করিবে।

নিত্যদীক্ষা

বাউলদের মতে যতদিন জীবন ততদিনই দীক্ষা চলিয়াছে, তাই কর্তাভজারা বলেন 'ষোল আনা' দীক্ষা একদিনে হয় না। কখনো এক আনা, কখনো দুই আনা, কখনো চার আনা— এমনি করিয়া বহু কালে ষোল আনা পূর্ণ হয়।

একবার জয়দেব কেন্দুলীর এক বাউল-মহোৎসবে গিয়া একটি বাউলকে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, "তোমার গুরু কে?" বাউল অমনি গাহিলেন—

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অথিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন।
কারে প্রণাম করবি মন?
গুরু যে তোর বরনডালা, গুরু যে তোর মরণ-জ্বালা,
গুরু যে তোর হৃদয়ব্যথা, যে ঝরায় দু নয়ন।
কারে প্রণাম করবি মন?

তখন আমার বন্ধুটি ব্যর্থকাম হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন, "কবে তোমার দীক্ষা হইয়াছে?" বাউল গাহিতে লাগিল—

যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি।
এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি।
দীক্ষা বিনা চলে না যে একটি প্রাণের শ্বাস
এই কথাতে গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস
(মায়ের) নীর পেয়েছি ক্ষীর পেয়েছি পরান পেয়েছি
তারি সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়েছি।

সকল বস্তুর কাছেই সকলের কাছেই বাউল তার জ্ঞান পায়। তাই মন্দিরে জ্বলন্ত অগুরুকে সম্বোধন করিয়া বাউল বলিতেছে—

কিবা মন্ত্র জান গুরু করি তোমায় নমস্কার!
জ্বলতে জ্বলতে দাও উপদেশ, শিক্ষা তোমার নেওয়া ভার!
যখন জ্বলে তোমার দেহ, তখন যদি শুধায় কেহ,
বল পরম সুখে আছি, শিক্ষা তোমার চমৎকার!
তুমি গুরু পরমগুরু, কে তোমারে কয় অ-গুরু,
কেমনে বুঝ্‌বে মরম তোমার, গুরুর লীলা চমৎকার।

সর্বত্র গুরু

গুরু যে জীবনে কোন্ পথে আসিবেন তাহারও ঠিক নাই, তাই সর্বদিকে ভক্তিভরে তাঁহার জন্য প্রণাম রাখিয়া দিতে হয়—

কোন্ বা পন্থে আস গুরু তোমার অন্ত নাহি পাই।
তাই ভাইবা মরি প্রণাম আমার রাইখা দিমু কোন্ বা ঠাঁই॥

অন্তরে গুরু

গুরু আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছেন— তাই নানা শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সত্যকে খুঁজিতে গিয়া মস্ত ভুল করি। তার চেয়ে যদি সেই গুরুর বাণী শুনিতাম তবে জ্ঞান অনেক সহজ হইত।

তর আপন ঘরে বিরাজ করে গুরু জ্ঞানের মূল।
দীন দুনিয়ার জ্ঞান গুণিয়া করলি মস্ত ভুল॥

আমাদের নিজের কোলাহলে গণ্ডগোলে আমরা সেই গুরুর শান্ত বাণীকে ডুবাইয়া দিই। তাই জ্ঞান আর সহজ হয় না—

অগাধ মন্ত্র বল্‌ছে গুরু মানস চিৎকমলে।
ওরে পাগল করিস না গোল
সেথায় আন্ধার-হরা জ্যোতি জ্বলে॥

তাই কবীরও বলিয়াছেন—

পরমাতম গুরু নিকট বিরাজৈ
জাগ জাগ মন মোর॥— কবীর ১, পৃ ২০

পরমাত্মা গুরু নিকটেই বিরাজমান— হে আমার মন জাগো জাগো।

কবীর বলেন, গুরু অন্তরেই আছেন, যেন কখনো জ্যোতির অভাবে দিশাহারা না হইতে হয়। কবীরের তিনিই গুরু—

সো গুরু পীর হমারা।— কবীর, পৃ ৩৩

বাহ্য গুরুর বিপদ

বাহ্য গুরুরও যে প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপকারের সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনাও বিস্তর। গুরু যদি শিষ্যের নিজ স্বরূপকে জাগ্রত না করিয়া তাঁহার স্বরূপ শিষ্যের উপর চাপান তবে শিষ্যকে আধ্যাত্মিক ভাবে হত্যা করা হয়। দৈহিক হত্যার চেয়েও তাহা ভয়ানক। কারণ, তাহা বাহির হইতে অনুভব করা যায় না। অথচ তাহা একেবারে জীবনের মূলকে বিনাশ করে। তার পর সত্যহীন দেহ থাকায়ও কোনো অর্থ নাই। তাই বাউলরা বলেন, গুরুর সঙ্গে প্রয়োজনমত দূরত্ব থাকা চাই। গুরু যেন দীপ্তি দেন, তাপ ও চাপে যেন নষ্ট না করেন। তাই তাঁহারা বলেন—

দূরে রৈয়া জ্বলেন দীয়া, সূর্য আয়রা দূরে।
বিনা তাপে চাপে গুরু রহেন সত্যপুরে॥"

গুরু তাঁর আপন সত্যপুরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন দেন, ভারে পিষিয়া মারেন না। দীপ ও সূর্য অতি নিকটে আসিলেই বিপদ।

হিন্দুস্থানী সাধকরা বলেন পাখি নিজ ছানা পাখার তলে পোষে, মাছ নিজ সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া ছানা পোষে, কূর্ম দূর হইতে মাত্র ধ্যানের দ্বারা ছানা পোষে। সংস্কৃত যোগশাস্ত্রে ও নানা তন্ত্রে এ কথা আছে। বাউলরা বলেন—

পাখের তলে পোষে পইখ্, সাথে লইয়া মাছে।
দূরে থাইকা পোষে কাছিম, সদ্‌গুরুর হুঁস আছে॥

সদ্‌গুরু জানেন কত দূরে থাকিলে শিষ্যকে চাপিয়া না মারিয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করা হয়।

শূন্য

বাউলদের মধ্যে তাই গুরুকে শূন্যও বলে। শূন্য "না-বস্তু" নয়। ইহা আমাদের জীবনের বিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিরাট মুক্তি। পায়ের তলে মাটি জীবের পক্ষে প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মাথার উপরের অনন্ত মুক্ত আকাশ। মাটির মধ্যে জীবনহীন ঢেলা-পাথর থাকিতে পারে কিন্তু একটুখানি অঙ্কুরকে জাগ্রত করিতে, প্রাণ ও চৈতন্য জাগ্রত রাখিতে মাথার উপর নিত্য এই অপার আকাশ চাই। এই অসীম শূন্যতা এত বড় "অস্তিধর্মাত্মক" যে, পরব্রহ্মকে ইঁহারা 'শূন্য' বলেন।

সন্তেরা বলেন, শূন্য আকাশের মত গুরু মাটির, সব বীজকে প্রাণে বিকশিত হইবার সহজ স্বাধীন অবকাশ দেন। শূন্য না হইলে গুরুর ভাবে শিষ্যের সাধনা পিষিয়া মরিত—

গুরু আকাশ শূন্য বস্তু।— রজ্জবজী

দাদূও বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম শুংনিতহঁ ব্রহ্ম হৈ নিরঞ্জন নিরাকার।
নূর তেজ তহঁ জ্যোতি হৈ দাদূ দেখন হার॥— দাদূ পরচা, কৌ অঙ্গ ১৩০

সেই ব্রহ্ম শূন্যে স্বয়ং নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম বিরাজমান। সেখানে যে দীপ্তি যে তেজ যে জ্যোতি দাদূ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সহজ শুংনি মে রমি রহা জহাঁ তহাঁ সব ঠারঁ।— দাদূ পরচা, অঙ্গ ৫০

সেই সহজ শূন্যে যত্র তত্র সর্বত্র পরমানন্দে বিহার চলিয়াছে।

ভক্ত সুন্দরদাসজী শূন্য অর্থে পরমা শান্তিকে বুঝিয়াছেন। যে শান্তিতে ভক্ত প্রেমযোগে আপনাকে সমাহিত করেন (জ্ঞানসমুদ্র ১২)।

উৎসবে নৃত্যের জন্য একটি মুক্ত প্রাঙ্গণ চাই। বাউলরা বলেন, স্থান ও কালের শূন্যতার মধ্যেই হইল প্রেমলীলার প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের মুক্তভূমি না থাকিলে লীলানৃত্যের উপযুক্ত অবকাশ থাকিত না। তাই প্রেমলীলার জন্য ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্ একটি শূন্য রাখিয়াছেন। এখানেই মানুষ মুক্ত। তার মুক্ত ইচ্ছা মুক্ত চিত্ত চৈতন্য আছে। ইহা যদি বদ্ধ হইত তবে কিছুতেই ভগবানের সঙ্গে প্রেমের লীলাটি জীবন্ত হইতে পারিত না।

শূন্য আকাশ হইল জীবনের অসীম আধার, কায়ার আধার হইল মাটি, চিন্ময় অধ্যাত্মজীবনের আধার হইল শূন্য। গুরুও অধ্যাত্ম আধার বলিয়া তাহা শূন্যস্বরূপ হইতে হয়। নহিলে গুরু পিষিয়া মারিতেন—

শূন্য স্বরূপ গুরু, পোষে কিন্তু পেষে না।

গুরু ও ব্রহ্ম থাকিতেন সাধকের ভিতর বাহির সর্বদিক সদা পূর্ণ করিয়া, শূন্য আকাশের মত। তাহা নিজকে একান্ত নির্গুণ ও নিষ্কর্ম রাখিয়া সকল গুণ ও ঐশ্বর্য প্রকাশোচিত অবকাশ ও মুক্তি দিয়াছে সাধককে। তাই তাহা বায়ুর ন্যায় শক্তিময় জ্যোতির ন্যায় দীপ্তিময়ও নয়, তাহা কেবল মুক্তিময় অবকাশময়। তাহা ভিতরে বাহিরে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবলই মুক্তি দিতেছে। গুরুর ইহাই হইল সবচেয়ে বড় লক্ষণ। কাজেই গুরুকে বাউলরা বলেন শূন্য। ব্রহ্মকেও বলেন শূন্য।

সাধকদের মধ্যে শূন্যেরও আবার নানা ভাবে পরিচয় আছে। গোরখা যোগীদের মধ্যে শূন্যস্বরূপের বহু আছে। মধ্যযুগের হিন্দুস্থানী সাধকদের মধ্যে শূন্যসমাধি নানা ভাবের আছে। সুন্দরদাস তাঁহার জ্ঞানসমুদ্রে চারি প্রকার শূন্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাউলরাও নানা ভাবের শূন্যের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মকে শূন্য বলিয়াছেন। গুরুকেও শূন্য। সমাধি ও নির্বাণও শূন্যপদ। শূন্যের মধ্যে জীবন ও লীলা তাহার আপন মুক্ত অবকাশ ও সুযোগ পায়।

অবশ্য তত্ত্বনিরূপণ এইরূপ হইলেও বাউলদের মধ্যে গুরুর প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য অতি গভীর।

[ক্রমশঃ]

—

আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
রসের লহরী।
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী!
সাঁইয়ের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি
ঘর ছাড়িয়ে।
শুধু কেঁদে মরি— ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে।
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে!

—বাউল

টমাস মান্

জন্ম ৬ জুন ১৮৭৫ ॥ মৃত্যু ১২ আগস্ট ১৯৫৫

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

টমাস মান্-এর মৃত্যুর সঙ্গে য়ুরোপের সাহিত্যে ক্লাসিক ঐতিহ্যের বোধ করি অবসান হল। আজকের সাহিত্যকার জীবনকে রূপ দেন, ভাষ্য দেন না। তিনি কর্মযোগী, একাগ্র শিল্পসাধনার তুরীয় লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো অবকাশ তাঁর নেই। প্রাণের তাগিদ তাঁর কাছে অনেক বেশি অমোঘ, সৃষ্টির আবেদন গৌণ। তাই যে অর্থে তরুণ টলস্টয় বা ফ্লোবেয়র, প্রুস্ত্ বা জীদ্ স্রষ্টা, সে অর্থে আজকের কোনো লেখককে স্রষ্টা বলা যায় কি না সন্দেহ। টমাস মান্ সেই পুরোনো ধারার শেষ সাধক। তাঁর লেখায় একটা সমগ্রতা, এমন-কি একটা মহত্ত্ব আছে, যা অতিআধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে তাঁর 'ডের্ টোড্ ইন্‌ভেনেডিগ্' (ভেনিসে মৃত্যু) গল্পটির কথা স্বতঃই মনে পড়বে। তার নায়ক গুস্‌তাভ্ ফন্ আশেন্‌বাখ্-ও প্রবীণ রুগ্ণ লেখক, ফ্রেড্‌রিখ্ দি গ্রেট্‌কে নিয়ে তাঁরও মহৎ শিল্প-সৃষ্টি। গল্পের শেষে যখন তাঁর মৃত্যু হল, 'তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হল। এবং সেইদিনই সসম্ভ্রমে বিস্মিত জগৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনল।'

আর, মনোবিকারটুকু বাদ দিলে, তারই সঙ্গে সেই মানুষটির সৌন্দর্যতৃষার মধ্যে মান্ কি নিজেকেই প্রতিফলিত করেন নি? যেখানে প্রসাধনচর্চিত তাঁর শিথিল ঠোঁট দুটি অর্ধসুপ্ত মনের বিচিত্র স্বপ্ন যুক্তিময় অসংলগ্ন শব্দগুলি আওড়াচ্ছিল—

"শুনে রাখো ফীড্রস্, একমাত্র সৌন্দর্যই একাধারে স্বর্গীয় অথচ দৃষ্টিগোচর। তাই সৌন্দর্যই ইন্দ্রিয়জীবীর পথ। কিন্তু এ কথা কি তুমি মানো, বন্ধু, যে ইন্দ্রিয়ের পথে যারা আত্মাকে পেতে চায়, তারা কখনো জ্ঞানের বা সত্য মানবিক মর্যাদার অধিকারী হতে পারে? না তুমি মনে করো যে এ পথ মধুর কিন্তু বিপজ্জনক—ভুল পথ, দোষের পথ, মানুষকে দিশাহারা করতে বাধ্য। কারণ তুমি নিশ্চয় জানো যে, আমরা কবিরা সৌন্দর্যের পথে চলতে পারি না অনঙ্গকে সঙ্গে না নিয়ে, তাকে নায়ক না ক'রে। আমাদের পথে আমরা বীর হতে পারি, দৃপ্ত যোদ্ধা হতে পারি, কিন্তু তবুও আসলে আমরা রমণীর মতো, কারণ হৃদয়াবেগই আমাদের উদ্দীপ্ত করে, আর প্রেমই আমাদের চিরকালের কামনা—আমাদের আনন্দ আর অগৌরব। বুঝতে পারছ, নয় কি, যে আমরা কবিরা জ্ঞানী হতে পারি না? আমরা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য, কামনাতুর হতে বাধ্য, আবেগের পথে আমাদের দুঃসাহসিক অভিযান? আমাদের নিপুণ কারুকাজ শুধু মিথ্যা মূঢ়তা ও ছলনা, আমাদের মান-যশ সব প্রহসন, আমাদের উপরে জনগণের অগাধ আস্থা হাস্যকর। শিল্পকলার মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে, বিশেষ তরুণদের, শিক্ষাদান অতি বিপজ্জনক, তা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ অতল গহ্বরের দিকে যার স্বাভাবিক ঝোঁক, সে কী করে শিক্ষাদানের যোগ্য হবে? এ পিপাসাকে অস্বীকার করে আমরা মানের দিকে, জ্ঞানের দিকে হাত বাড়াতে পারি, কিন্তু যে দিকেই ফিরি, তার দুর্নিবার আকর্ষণ রয়ে যায়। ধরা যাক, জ্ঞানকে আমরা চাই না, কারণ শুধু জ্ঞানের মর্যাদা নেই, ফীড্রস;
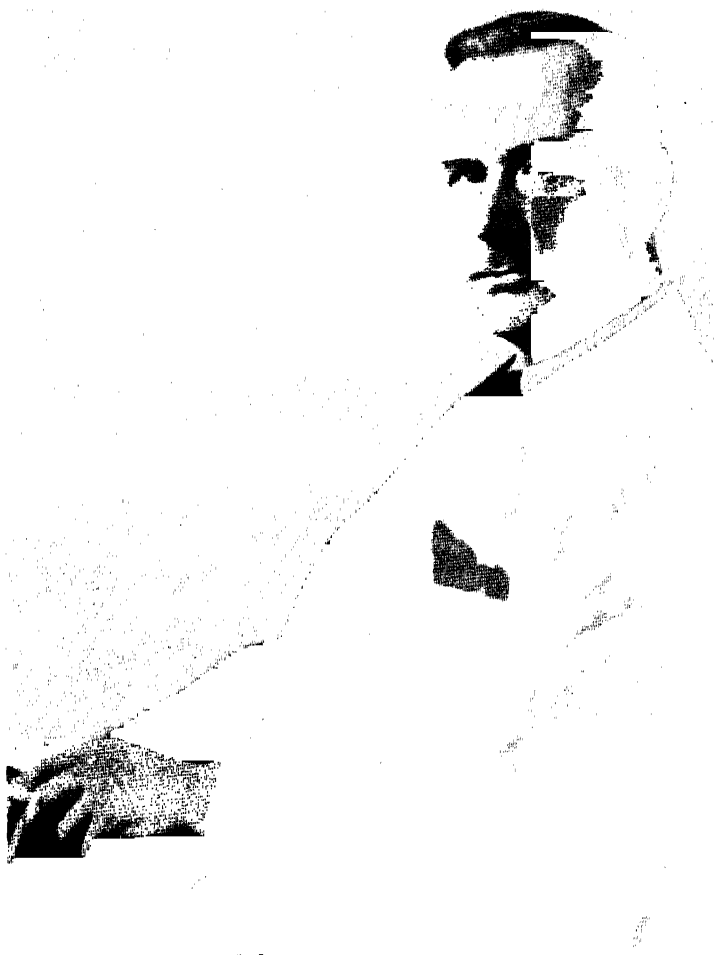
টমাস মান্

নেই কোনো শক্তি। সে সচেতন, সে বোঝে, ক্ষমা করে, কিন্তু তার সুষমা নেই, নেই রূপ। গহ্বরের প্রতি তার সহানুভূতি আছে, কারণ সেই তো অতল। তবে এসো তাকে দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করা যাক— এখন থেকে আমাদের সব চেষ্টাই বিচার করা হবে কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে, অর্থাৎ সরলতা, মহিমা, রূপ, সুষমা, আর নতুন এক স্পষ্টতা দিয়ে। কিন্তু রূপ আর স্পষ্টতা, মনে রেখো ফীড্রস্, নিয়ে যাবে মাদকতা ও কামনার দিকে, মহৎকে নিয়ে যাবে করাল আবেগের দিকে— যে আবেগ আপন সুন্দর সুষমাকে অনাদরে ছেড়ে যায়; নিয়ে যায় অতলের পানে, হ্যাঁ, সেই গহ্বরের দিকেই টেনে নেয়। আর আমরা কবিরা সেইদিকে ধেয়ে চলি, কারণ আমরা নিজেদের প্রতি দুর্বল, অকাতরে গা ভাসিয়ে দিয়ে যাই।— এখন তবে আমি চলি, ফীড্রস্। তুমি থাকো। যখন আমাকে আর দেখতে পাবে না তখন তুমিও যেয়ো।"

প্লেটোর ভঙ্গীতে যিনি শিল্পসাধনার এই নূতন ভাষ্য দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই ক্লাসিকপন্থী। যে টমাস মান্ বিশ্বাস করতেন যে 'শিল্পই আশা', যাঁর প্রিয়তম গ্রন্থকার ছিলেন পাস্ক্যাল্ আর ভল্টেয়র, গ্যেটে, নীট্শে আর শোপেন হাউয়র, এ সেই মান্। তাঁর মৃত্যুতে জগৎ বোধ হয় তার শেষ ধ্রুবপদী সাহিত্য-সাধককে হারাল, যাঁর মধ্যে আছে (তাঁর নিজের ভাষায়) একটা 'অন্তর্নিহিত চিরত্ব'।

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুন জর্মানির ল্যুবেক শহরে তাঁর জন্ম। বাবা জোহান্ হাইন্‌রিখ্ মান্ গণ্যমান্য নাগরিক ছিলেন, সেনেটের সদস্য হয়েছিলেন, দু বার মেয়রও নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর মা ছিলেন জর্মানিক-ক্রিওল বংশের মেয়ে— রূপসী, গীতরসিকা। মায়ের কথা বলতে টমাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, বলেছেন কল্পনাপ্রবণতা তাঁরা মায়ের কাছেই পেয়েছেন। বড়ো ভাই হাইন্‌রিখ্-এর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিলেন না টমাস। তার উপরে আবার 'বসন্তের ঝড়' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে— 'পল টমাস' ছদ্মনামে স্বয়ং তার সম্পাদক— এবং তাতে গল্প কবিতা নাটক লিখে শিক্ষকদের বিরাগভাজন হতে সময় লাগে নি।

১৮৯০ সালে জোহান্ হাইন্‌রিখ্-এর মৃত্যু হল। তাঁদের পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে মা ল্যুবেক থেকে মিউনিখ শহরে বাসা বাঁধলেন। এ ভাঙনের ছবি তাঁর প্রথম উপন্যাসে কিছু কিছু আছে। কিছু পড়া-শুনো ক'রে টমাস বীমা-ব্যবসার কাজে নামলেন। বেশিদিন তা ভালো লাগল না। রোমে গিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখা লিখলেন। উপন্যাসখানির নাম দিলেন 'বুডেন্‌ব্রুক্‌স্'— একটি সংসারের ইতিহাস। ১৯০১ সালে উপন্যাসখানি প্রকাশিত হল। প্রকাশকের মতে বইখানি অতিকায় হয়ে পড়েছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল লেখক বইখানিকে ছেঁটে অর্ধেক ক'রে দেন। মান্ সম্মত হন নি। ফলে মাত্র হাজার সংখ্যা ছাপা হল।

প্রথমে বইখানি সে রকম সাড়া জাগায় নি। কিন্তু শীগগিরই একটি সুলভ সংস্করণ ছাপা হল এবং দেখতে দেখতে বিক্রী হয়ে গেল— জর্মানিতে দশ লক্ষের উপর, য়ুরোপের অন্যত্রও লক্ষাধিক। সাতাশ বছর বয়সে টমাস মান্ সারা য়ুরোপে খ্যাতিমান হলেন।

তার পর কিছুকাল ছোটো গল্পের চর্চা চলল। অনেকগুলি সার্থক গল্প— ট্রিস্ট্রান (১৯০২), টোনিও ক্রোগর (১৯০৩) এবং সবচেয়ে স্মরণীয় ডের্‌টোড্ ইন্ ভেনেডিগ্ (১৯১২)। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোন্‌টি। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: 'শ্রেষ্ঠ? জানি না। তবে ভেনিসে মৃত্যু

গল্পটিই আমার সবচেয়ে পছন্দ।' এ সময়ে একখানি নাটক 'ফিওরেন্‌ৎসা' (১৯০৯) এবং একখানি উপন্যাসও 'ক্যোনিগ্‌লিশে হোহাইট্' (মহারানী, ১৯০৯) তিনি লেখেন।

জীবনের ধারাও এগিয়ে চলে। ইহুদি এক অধ্যাপকের কন্যা কাটিয়া প্রিংসাইম্‌কে বিয়ে করলেন, ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে মিউনিখ্-এ সংসার পাতলেন। বড়ো ছেলে ক্লাউস্ আর বড়ো মেয়ে এরিকা-ও আজ সাহিত্যিক।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে কাইসারের সাম্রাজ্যবাদ ফণা তুলল। জর্মানির পক্ষে সেদিন মান্-এর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। তখনও তিনি নীট্‌শে আর হ্বাগ্‌নার-এর সাক্ষাৎশিষ্য— শক্তির পূজারী। সম্রাট্ ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেট্-এর মহত্ত্ব ঘোষণা ক'রে এক প্রবন্ধ তিনি লিখলেন এই সময়ে। আর 'বেট্রাখ্‌টুংগেন্ আইনে উন্‌পলিটিশেন্' (একজন অ-রাজনীতিকের চিন্তাবলী) নামে আত্মজীবনীতে তাঁর রাজনৈতিক মত খুলে বলবার চেষ্টা করলেন—সবাই তা স্পষ্ট বুঝল না।

যুদ্ধের শেষদিকে তিনি লিখতে শুরু করলেন তাঁর প্রসিদ্ধতম উপন্যাস— 'ডেরৎসাউবেরবের্গ্'— 'জাদুপাহাড়। রণক্লান্ত য়ুরোপের পটভূমি। সুইৎজারল্যান্ডের ডাভস্-প্লাৎস্-এর একটি স্বাস্থ্যনিবাস 'বের্গ্‌হফ্' (শৈলাচল)। রুগ্‌ণ নায়ক হান্স্ কাস্টর্প্ সেখানে জীবনজিজ্ঞাসায় মগ্ন। তার মধ্যে মান্ নিজেকে খুঁজে পেলেন ; দূরে সরিয়ে দিলেন :

'অনেক কিছু, যা একদিন আমি ভালোবেসেছিলাম— অনেক বিষম অনুরাগ, মোহ এবং আকর্ষণ যার প্রতি য়ুরোপের আত্মা লুব্ধ ছিল এবং আজও রয়েছে।'

এইখান থেকেই তাঁর জীবনে মূল্য পরিবর্তন হল। নাটকের ভাষায় এইখানেই 'ক্লাইমাক্স্'। বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ, সমাজ আর ব্যক্তি, নূতন আলোয় বিধৃত হয়ে দেখা দিল। জীবনে এবং সৃষ্টিকার্যে প্রকট হল একটা দ্বন্দ্ব। তাঁর সহজাত আদর্শবাদ ও মানবিকতাবোধ রুখে দাঁড়াল আশৈশব তিনি যে শক্তির উপাসনায় দীক্ষা পেয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে। 'মারিও উন্ট্ ডেরৎসাউবেরের' (মারিও এবং জাদুকর) কাহিনীটিতে তার প্রতিফলন।

কর্মজীবনেও সেই একই সংঘাত সমান্তরাল হয়ে দেখা দিল। আডল্‌ফ্ হিট্‌লার তাঁর নাৎসিবাদের তরল আগুন ছড়াতে লাগলেন। শাক্ত মন্ত্রে ভয়েশ্‌লাণ্ড্ আবার উদ্বুদ্ধ হল, মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দিন গুনতে লাগল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। শুরু হল ইহুদি-নির্যাতন। আইন্‌স্টাইন্ প্রমুখ গুণীজ্ঞানীরা তার কবলে জর্জর হলেন।

এবার মান্-এর কণ্ঠে অন্য সুর ধ্বনিত হল। 'মাইন্ কাম্‌প্‌ফ্'-এর আদর্শের বিরুদ্ধে নিজের আদর্শকে তিনি অকুণ্ঠভাবে তুলে ধরলেন। এ বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দিলেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং অগ্রজ হাইন্‌রিখ্।

জর্মানি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মান দিয়েছিলেন। কিন্তু সোনার শিকল তাঁকে বাঁধতে পারে নি। ১৯২৯এর নোবেল্ পুরস্কারও অত্যন্ত সহজভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আর ১৯৩৬এ ইহুদি-নির্যাতনের সুতীব্র সমালোচনা করলেন তাঁর 'নয়ৎসুরিখেরৎসাইটুং' (নব জুরিখের সংবাদপত্র) প্রবন্ধে। মনে রাখতে হবে, ইহুদিদের নিয়েই তিনি এই সময়ে সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখছিলেন বাইব্‌লের কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে।

হিট্‌লার এর উত্তর দিলেন মান্-এর বই পুড়িয়ে। ১৯৩৭এ বন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পূর্বে যে সম্মান দিয়েছিল তা কেড়ে নিল।

অতি সংযত ভাষায় মান্ তার উত্তর দিলেন এক খোলা চিঠিতে— 'আইন্ ব্রীফ্ওয়েখ্সেল্' (একটি পত্রালাপ)। নিজেকে তিনি খাটো করেন নি। বড়োভাই হাইন্‌রিখ্ও ঘোর নাৎসিবিরোধী ছিলেন। তিনি যখন ছোটোভাইকে এক নাৎসিবিরোধী সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করতে বললেন, টমাস্ কিন্তু রাজি হলেন না। তিনি লিখলেন :

'রাজনীতির চেয়ে বিশুদ্ধ, সার্থক শিল্পসৃষ্টি দিয়ে মহত্তর জর্মানির সেবা করাই আমার কাছে বেশি কাম্য।'

অবশেষে তিনি স্ত্রীপুত্র নিয়ে জর্মানি ছাড়লেন স্বেচ্ছায়। আর দেরি করলে প্রাণসংশয় হত। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গায় বক্তৃতা দিলেন ফ্যাশিবাদের বিকৃতি দেখিয়ে— 'যে মারাত্মক চিন্তাধারা জীবন ও বুদ্ধিকে, শিল্প ও রাজনীতিকে সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দেখে।' ১৯৩৮এ আমেরিকায় 'গণতন্ত্রের আসন্ন জয়' নামে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন গণতন্ত্রই সেই 'সমাজব্যবস্থা যা আর সবার উপরে মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন।'

সেই বছরেই আমেরিকাকে তিনি নূতন স্বদেশরূপে বরণ করলেন। প্রথমে কিছুকাল নিউ জার্সির প্রিন্স্‌টন্ শহরে বসবাস করেন, ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, পরে সেখান থেকে কালিফর্নিয়ার সান্টা মনিকায় উঠে যান। সেখানে লেখাপড়া ও সংগীতচর্চায় দিন কাটাতে ভালোবাসতেন—বিশেষতঃ সংগীতচর্চায়। ব্রাম্‌স্ থেকে স্ট্রাভিন্স্কি পর্যন্ত বহু সুরকারই তাঁর প্রিয় ছিলেন, তবে হ্বাগ্‌নারের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি কোনদিনই।

১৯৩৩এ ওল্ড্ টেস্টামেন্টের জেকব আর জোসেফের কাহিনীকে তিনি উপন্যাসরূপ দিতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে চারটি সুদীর্ঘ খণ্ডে এ উপন্যাস— 'জোসেফ্ উন্ট্ সাইনে ব্রুডের' (জোসেফ ও তার ভাইয়েরা) শেষ হয়। খুব আকস্মিকভাবে এর সূচনা। ১৯২৬ সালে মিউনিখের এক চিত্রকর জোসেফের গল্প অবলম্বনে কতকগুলি ছবি আঁকেন। মান্‌কে তিনি অনুরোধ করেন এই ছবিগুলির একটি ভূমিকা লিখে দিতে। এর থেকেই গড়ে ওঠে সেই 'মহাকাব্য, যা আমার জীবনের পরম সাধনা হয়ে উঠেছে,' যাতে তিনি অনুভব করেছেন 'আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনকে বহু পিছনে ফেলে আমার কাহিনীকে মানবচিত্তের অতল গহনে নামিয়ে দিতে কী মাদকতা!'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। তাঁর 'লটি ইন্ হ্বাইমার' উপন্যাস তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের এ উপন্যাস যুদ্ধের মধ্যেও খুবই সমাদৃত হল, বিশেষতঃ ইংরেজ পাঠকমহলে। স্যর হিউ ওঅলপোল্ বইখানিকে সে বছরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে অভিহিত করলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের এক লোকপ্রচলিত কাহিনী নিয়ে একটি ছোট্ট কথিকা লিখলেন মান্। আর বি. বি. সি. থেকে পঁচিশটি বেতার-বক্তৃতায় জর্মানিকে তার সর্বনাশের পথ সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করলেন। 'ডয়েট্শে হোয়েরের' (জর্মানি শ্রোতা) নামে বক্তৃতাগুলি সংকলিত হয়েছে।

যুদ্ধ থামল। ১৯৪৮এ মান্ জর্মানির স্বৈরাচারকে কটাক্ষ ক'রে 'ডক্টর ফস্‌টাস্' লিখলেন। আর ১৯৫১ সালে তাঁর শেষ উপন্যাস বেরোল 'পুণ্যপাপী'। ছিয়াত্তর বছর বয়সেও তাঁর কলমের জোর যে কমে নি তার পরিচয় পাওয়া গেল পোপ গ্রেগরির জীবনী অবলম্বনে লেখা এই উপন্যাসখানিতে। ঈডিপুস্-এর আখ্যানের সঙ্গে গ্রেগরির জীবনের কিছু সাদৃশ্য ছিল। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে মান্ সার্থক শিল্পসৃষ্টি করেছেন। বিদগ্ধ সমালোচকেরা তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে বলেছেন : 'একালে এর চেয়ে মহৎ গদ্যভাষা আর লেখা হয় নি'। শেষ গ্রন্থেও মান্ এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

মান্-এর মা সত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। ছেলের নাকি বিশ্বাস ছিল, তিনিও তাই যাবেন— ১৯৪৫এ। মেয়াদ দশ বছর বাড়িয়ে ১৯৫৫ সালের ১২ আগস্ট জুরিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মনোবিদ্ কার্ল্ য়ুং যথার্থই বলেছেন যে 'প্রত্যেক শিল্পীই বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব অথবা সমন্বয়ে গঠিত।' একদিকে বিক্ষুব্ধ জীবনের লীলা, অন্যদিকে বহির্বিশ্ব থেকে আপনাকে সবলে দূরে সরিয়ে কেবলমাত্র সৃষ্টির ব্যাকুলতা। এই দ্বিধার দোলায় সমস্ত মহৎ শিল্পীকেই আন্দোলিত হতে হয়। যেমন টলস্টয়। শেষজীবনে যিনি শিল্পকে উপেক্ষা করে জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন।

মান্ও এর ব্যতিক্রম নন। প্রথম যুগে তিনি জীবনকে ছেড়ে শিল্পকেই বরণ করেছিলেন। আর শেষ-জীবনে সাধনা করেছেন দুয়ের সমন্বয়ে। তাঁর নিজের ভাষায় :

'আমার তরুণ বয়সে জগৎ সম্বন্ধে একটা দুঃখবাদী এবং রোমান্টিক দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাতে পরস্পরবিরোধী ছিল প্রাণ এবং আত্মা, ইন্দ্রিয়মুখিতা এবং মোক্ষ— তার থেকে শিল্পকলায় কতকগুলো বেশ মোহময় আবেদন দেওয়া যায়— মোহময়, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগত নয়, সত্য নয়। অর্থাৎ এক কথায় আমি ছিলাম হ্বাগ্নারের শিষ্য। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ পরিণত বয়সের ফলে আমার অনুরাগ এবং আকর্ষণ উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হয়েছে অনেক সুস্থ ও স্বাভাবিক এক আদর্শের উপরে— গ্যেটের আদর্শ, যার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে প্রতিভা এবং সংযমের।'

বোধ হয় এই কথাগুলির মধ্যে টমাস্ মান্-এর সমগ্র সাহিত্যজীবনের একটা দিক্‌নির্ণয় হবে। তাঁর প্রথম দিকের রচনার বিষয় হল 'হ্বেরফাল্'— একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের চিত্রণ।— ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেকাডেন্স্'। 'বুডেন্‌ব্রুক্‌স্' উপন্যাসখানি তারই রূপায়ন— কী ক'রে একটা পরিবারে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরল তারই ইতিহাস— যেমন গল্স্‌ওঅর্দির 'ফর্সাইট্' পরিবার, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'তিন পুরুষ'। তাই বুডেন্‌ব্রুক্‌স্ -এর আরম্ভে আমরা দেখি, সচ্ছলতার রোশনাই ভরা ঘরে সাদা এনামেল রঙের সোফা আর হলদে গদি— তার মাথায় সোনালি সিংহের মূর্তি। সেখানে আট বছরের ছোট্ট মেয়ে আন্‌টোনি রেশমি ফ্রক্ প'রে মায়ের কাছে ধর্মতত্ত্ব মুখস্থ বলছে : 'আমি বিশ্বাস করি যে মহান্ ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে আমাকেও সৃষ্টি করেছেন— দিয়েছেন জামা আর জুতো, অন্ন আর জল, ঘর আর বাড়ি, স্ত্রী আর সন্তান, জমি আর গোরু'— আর বুড়ো ঠাকুরদা জোহান্ বুডেন্‌ব্রুক্ হাসতে হাসতে নাতনিকে শুধোচ্ছেন তার কত জমি আর গোরু আছে, এক বস্তা গমের দাম সে কত নেবে? সবাই সে হাসিতে যোগ দিচ্ছে।

আর শেষে দেখতে পাই বেয়াল্লিশ বছর কেটে গেছে। ছোট্ট হানো টাইফয়েডে ভুগে মারা গেছে। সংসার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের ছায়া ঘিরেছে। কেউ বা বাস তুলে হলাণ্ডে চলে যাচ্ছে—আর ঘরের এক কোণে সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়ে আজ ফ্রাউ টোনি হ'য়ে বসে আছে। 'তার পিছনে ফেলে আসা জীবনের বহু ঝড় ঝাপটা আর তার দুর্বল পাকযন্ত্র সত্ত্বেও তাকে পঞ্চাশ বছরের বুড়ির মতো দেখাচ্ছিল না। রংটা একটু ময়লা হয়েছে, আর ঠোঁটের উপর দু-চারগাছি চুল— টোনি বুডেন্‌ব্রুকের টুকটুকে ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু শোকের পোশাকের তলায় তার পরিপাটি খোঁপার একটি চুলও পাকে নি।'

এ শুধু একটা পরিবারেরই কাহিনী নয়। শতাব্দীর শেষে সমগ্র প্রাচীন জর্মান 'কুলটুর'-এর সন্ধ্যা-সংগীত।

আর এই যুগসন্ধির পটভূমিকায় শিল্পীর ব্যক্তিচেতনা নিয়েই মান্-এর বিশ্লেষণ। টোনিও ক্রোগার গল্পটিই যদি ধরা যায়। হান্স্ আর টোনিও— দুই বন্ধু দুই জাতের মানুষ। হান্স্ সুস্থসবল, কিছুটা স্থূল— আর টোনি দুর্বল, ভীরু, শিল্পীসুলভ সূক্ষ্ম তার মনের প্রতিটি তন্ত্রী অনুরণনের জন্যে আকুল। বাইরের পৃথিবী তার কাছে তাই নির্মম, কঠিন, অসুন্দর। তার দৃঢ় প্রত্যয় যে 'শিল্পী হবে অমানুষ, অতিমানুষ। যে মুহূর্তে সে মানুষের মতো অনুভব করতে সুরু করবে, শিল্পী হিসেবে অমনি তার শেষ।' সে তাই বলে :

'আমি দুই জগতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কোনোটিতেই স্বস্তি পাই না, বেদনা পাই বারে বারে। তোমরা শিল্পীরা আমায় বলো বুর্জোয়া, আর বুর্জোয়ারা চায় আমাকে বেঁধে রাখতে— জানিনা কোন্‌টা আমার বেশি খারাপ লাগে। বুর্জোয়ারা নির্বোধ ; কিন্তু তোমরা সুন্দরের উপাসকেরা যারা আমাকে নির্জীব বল, নিরুদ্যম বল, তোমাদের বোঝা উচিত যে শিল্পী হওয়ার একটা পথ এত গভীর উৎসের দিকে গেছে, আর সে পথ এমন দুর্বার যে অতি-সাধারণ বিষয়ে আনন্দ পেতে চাওয়ার থেকে বড়ো আর কোনো বাসনা তার কাছে নেই!'

টোনি ক্রোগার মান্ স্বয়ং। আর তার যে দ্বন্দ্ব— শিল্প আর জীবন এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব— তা মান্‌কে বিহ্বল করেছে বারে বারে। প্রথম যুগে হ্বাগ্‌নার-শিষ্য মান্ জীবনকে ত্যাগ করে কল্পনাকেই বরণ করে নেবার পক্ষপাতী। তাই তাঁর এ যুগের রচনায় কিছু অসুস্থতা, কিছু বিষাদের আভাস। আর মৃত্যুর ছায়া সেখানে গহন— 'ভেনিসে মৃত্যু' আর 'জাদুপাহাড়' তার দৃষ্টান্ত। একদিকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আতঙ্ক, আর-একদিকে ডাভস্-প্লাৎস্-এর স্বাস্থ্যনিবাসে মুমূর্ষুর ভিড়— যেখানে 'আর্ত মানুষের শক্তিও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই তার রোগকে অতিক্রম ক'রে ওঠবার ; সে সারা পৃথিবীকে দেখে ঐ রোগের চিহ্ন আর প্রতিবিম্ব রূপে।'

কিন্তু এই মৃত্যু-উপত্যকা থেকে শেষ পর্যন্ত মান্ বেরিয়ে আসতে সমর্থ হলেন, যেমন ক'রে তাঁর মারিও জাদুকরের ভীষণ মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল। আবার আলোর মধ্যে এসে তিনি সাধনা করলেন পূর্ণতার, সামঞ্জস্যের। হ্বাগ্‌নার পথ ছেড়ে দিলেন গ্যেটেকে।

এরই পরিচয় জোসেফের কাহিনীতে। যে জোসেফ্ 'ঊর্ধ্বে স্বর্গের, নিম্নে অতলের কল্যাণস্পর্শে পুণ্য'। পিতা জেকব তাই পুত্রকে আশীর্বাদ করল সে নিষ্পাপ হোক এই কামনায় নয়, সে অপাপবিদ্ধ এই ধ্রুব বিশ্বাসে।

'মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ— আমি যেমন পুণ্য তেমনি পুণ্য হও ; এ আদেশ মানুষের মধ্যে দেবতার মঙ্গলসঞ্চার মেনে নিচ্ছে। এর প্রকৃত অর্থ— তোমার মধ্যে আমাকে পবিত্র হতে দাও, নিজেও শুচি হও। ক্রূর কঠিন দেবতার মূর্তি থেকে পরমকারুণিক ঈশ্বরের যে বিবর্তন, মানুষেরও ঠিক তাই। মানবআত্মার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তাঁর সত্য মর্যাদা লাভ করেন।'

এ কথা পিতা জেকবের চেয়ে পুত্র জোসেফ্ গভীরতরভাবে বুঝেছিল। তাই তার ভাইয়েরা যখন তাকে খদের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেল, নিজের দুঃখের কথা তার মনে এল না, নিজের মুক্তির উপায়ই তার কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিল না। সে তখন আরও সুদূর চিন্তায় মগ্ন ছিল, ভাবছিল তার আকস্মিক পতনের কথা, তার অতীত ভুলের কথা, হয়তো সেগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটেছিল, তবু তারা কম গুরুতর, কম দুঃখদায়ক হয় নি।' তাই এই খাদ থেকে ফিরে যাবার সংকল্প সে ত্যাগ করল— মৃত্যুকে বরণ করতে তার ভয় হল

না, কারণ সে বুঝেছিল মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়— 'পার্থিব আর অপার্থিবের ভেদ তার কাছে আর রইল না, মৃত্যুর স্বপ্নময় তৃপ্তিতে সে দুইয়ের মিলন দেখতে পেল। খাদ অতলগভীর; আর পুরোনো জীবনে ফিরে যাবার আশা সুদূরপরাহত। অস্তমিত সন্ধ্যাতারার আবার উদয়ের মতো, ছায়াগ্রস্ত চাঁদের আবার পূর্ণ হবার মতো অসম্ভব এ কল্পনা। কিন্তু এই উদয়াস্তের মধ্যেই তো আবার আবির্ভাবের, নব আলোক-পাতের, পুনর্জন্মের চিন্তা নিহিত আছে! এই কথা ভেবেই জোসেফের আশা ধন্য হল।'

টোনি ক্রোগার বা হান্স্ কাস্টর্পের মতো জোসেফকে দিয়েও মান্ আপন অন্তরের কথাই বলিয়েছেন। 'আমার বিশ্বাস' প্রবন্ধে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

'এই আমার আদর্শ মানুষ। যেখানেই চিন্তার ও ব্যক্তিত্বের জগতে আমি এই আদর্শের প্রকাশ দেখতে পাই— আলো আঁধারের, মনন ও অনুভূতির, আদিম ও সংস্কৃতের, জ্ঞানের এবং আনন্দের এই মিল দেখতে পাই— সেখানেই আমার অন্তরতম ভক্তি, সেখানেই আমার হৃদয় তার নীড় খুঁজে পায়। খুলে বলি— কোনো রোমান্টিক সূক্ষ্মতা, কোনো পালিশকরা বর্বরতার কথা আমি বলছি না। চাই প্রকৃতির যথার্থ পরিমার্জন, চাই সংস্কৃতি; চাই শিল্পী মানুষ; চাই আত্মোপলব্ধির কঠিন পথের দিশারী হিসেবে শিল্পকে।'

তাই শেষ পর্যন্ত এই অমর শিল্পস্রষ্টার প্রত্যয় ছিল যে ভবিষ্যতে সুদিন আসবে, যেদিন শিল্প কেবল অন্ধপ্রবৃত্তির উদ্‌গিরণ হবে না— বুদ্ধির শুভ্র আলোয় স্নিগ্ধ হবে। হবে প্রাণ এবং আত্মার মধ্যে সেতুবন্ধ।

স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় মুদ্রিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত দুর্গা-চিত্রের ব্লক অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট -এর সৌজন্যে প্রাপ্ত; মূল চিত্র কলিকাতা রাজভবনে রক্ষিত। দেবতাত্মা হিমালয় চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ও কলিকাতা সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়-অনুষ্ঠিত আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের চিত্রপ্রদর্শনীর স্মারকগ্রন্থ হইতে গৃহীত। 'কলকাতায় বর্ষা' শ্রীসুশীল গুপ্ত প্রকাশিত Woodcuts পুস্তকে প্রকাশিত।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রমেন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ সহানুভূতি ও প্রেরণায় কলাভবনে শিল্পশিক্ষা যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে সেই সময়ে রমেন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে ছাত্ররূপে এখানে ছিলেন। তখন আশ্রমে সংগীত নৃত্য নাটক কবিতাপাঠ আর নানা ঋতু-উৎসবের বিরাম ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ চলতেই থাকত তখন। এই সব উৎসবে ও অভিনয়াদিতে রমেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন উৎসাহী শিল্পী। তিনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন এই সব কাজে। সেই সময়ের এই আবহাওয়ার মধ্যে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রমেনের শিল্পশিক্ষা হয়। পক্ষান্তরে, আশ্রমের চতুর্দিকের শিল্পানুকূল মনোরম পরিবেশ সহজেই উৎকৃষ্ট শিল্পী গড়ে ওঠার সহায় হয়েছিল। আশ্রমের বহু বৃক্ষ ও ফলফুলের গাছ সব সময় ফুলে পল্লবে শোভায় গন্ধে ভরে থাকে। আর আশ্রমের বাইরে সুদূরবিস্তীর্ণ প্রান্তর ও লাল কাঁকরের খোওয়াই, আর কিছু দূরে ছোট্ট নদী কোপাই।

কলকাতা থেকে আসবার পর এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রমেন্দ্র ক্রমশ নিসর্গচিত্রাঙ্কনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। পরেও বহু প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিশেষতঃ শান্তিনিকেতনের দৃশ্যই তাঁর অঙ্কনের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। বদরীনাথ যাওয়ার পথে তিনি হিমালয়ের দৃশ্য অনেক এঁকেছিলেন। সেই সময় আমাদের আশ্রমে কাঠ-খোদাইয়ের কাজ একজন ফরাসী মহিলা এসে প্রবর্তিত করলেন। রমেন বিশেষ উৎসাহে কাঠ-খোদাইয়ের আঙ্গিক আয়ত্ত করেছিলেন। পরে দেখা গেল, নানা রকম কারুকর্মেও তাঁর বিশেষ প্রীতি। সুরেন বিলেত থেকে লিথো শিখে এলেন। তাঁরই কাছে লিথোগ্রাফিও তিনি শিখেছিলেন ; লিথোতে অনেক ছবিও তিনি করেছেন। এর পরে রমেন যখন বিলেতে যান সেখান থেকে তিনি এচিঙের বিদ্যাও ভালো করে শিখে আসেন। ছবি আঁকা ছাড়া তিনি অনেক ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ও আয়ত্ত করেছিলেন।

গুরুদেব তাঁর গান কবিতা ও নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সব ঋতুর মনের কথা প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর রচনায় মৌনী প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠেছে। এমন কোনো নিসর্গচিত্র নেই যা রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না। মানবচিত্তের পরিপূর্ণ 'ভাষা' সৃষ্টি ক'রে গেছেন তিনি। ফলে আমাদের আধুনিক ভাষার আদলও তাঁর রচনা থেকেই পাওয়া যায়। ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরাও এই সম্পদের অধিকার নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। কবিগুরুর এই সব অমূল্য সম্পদ্ এখানে সমাহৃত হওয়াতে শান্তিনিকেতনে যাঁরাই আসবেন তাঁরাই ভারতবর্ষের পুরাতন ভাবরাজ্যের সঞ্চিত সম্পদ, নানা প্রদেশের সংস্কৃতি ও ভারতের সঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির মিলন, সবেরই পরিচয় সহজেই পেতে পারেন। এই আশ্রমে যাঁরা আসেন তাঁরা সহজেই এখানে সারা ভারতবর্ষের চেহারা দেখতে পান। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্— এই মন্ত্র সার্থক এখানে। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক চিন্তারাজি মন্দিরের ভাষণের ভিতর দিয়ে আমরা এখানকার সকলেই সব সময় পেয়ে এসেছি। গুরুদেব তো শুধু নৃত্য গান অভিনয় শেখান নি, অধ্যাত্মচিন্তার ধারাও প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ভাষণে, গানে ও নাটকে।

এই পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছিলেন রমেন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন কলাভবনের একজন কৃতী ছাত্র হয়েছিলেন। তাঁর এখানকার শিক্ষা সফল হয়েছিল। তিনি যে-সকল স্থানে গিয়েছিলেন এখানকার শিক্ষার বিশেষত্ব ও গৌরব বহন করে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অকালে চলে যাওয়ায় আশ্রমের সংস্কৃতির প্রচারের এই মঙ্গলময় প্রচেষ্টা অসময়ে ব্যাহত হয়ে গেল।

সেই সময় ছাত্র যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ও অধ্যাপকেরা মিলে গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একমন একপ্রাণ হয়েছিলেন। গুরুদেব উপরে থেকে যে আমাদের চালনা করেছেন তা নয়। সকলেই আমরা এক আদর্শে গড়ে উঠছিলুম ; একই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও দরদ ছিল সকলের। তাতে তখন কাজও খুব ভালো ভাবে চলেছিল। তখন সুদৃঢ় হয়েছিল কাজের ভিত্তি। তখনকার কাজ কোনো কর্তৃপক্ষের তাগিদে হত না। নিজের ইচ্ছাতেই আমরা সবাই কাজ করতুম। নিজেরাই প্রস্তুত করতুম কাজ করতে করতে সময়োপযোগী নিয়মসূচী।

গুরুশিষ্যে সদ্‌ভাব ও সহানুভূতি, পরস্পরের সুখে দুঃখে সহযোগিতা, সেবা-শুশ্রূষা এ-সবই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল ; আর আপদে বিপদে ছাত্রেরা সব সময় প্রাণপণে কাজ করত। আন্তরিকতার গুণে সে একটা মহাশক্তি গড়ে উঠেছিল। তখন অবশ্য ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় এটা সহজ হয়েছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে কর্মের পরিধির প্রসার হওয়ায় সকলে এক সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করার অসুবিধা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও হৃদ্যতাও কমে আসছে বলে আশঙ্কা হয়। এই অবস্থায় পূর্বের মতো রবীন্দ্রনাথের আদর্শ নিয়ে কিরূপে কাজ করা যেতে পারে সেটা বিশেষ চিন্তার বিষয়।

শিক্ষকরূপে রমেন্দ্রনাথের কাজের পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ কেবলই মনে হয়, কলাভবনে ছাত্ররূপে রমেন যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তখন শিক্ষক ও ছাত্রেরা মিলে শিল্প বিষয়ে আলোচনা ক'রে, এক জোটে কাজ ক'রে, নানা স্থান থেকে আগত শিল্পী ও কারুশিল্পীদের সাহচর্যে, আমরা কী আনন্দই না উপভোগ করেছি। এমনভাবে মিলে-মিশে তখন এক জোটে কাজ করেছি যে, আজ বুঝে উঠতে পারছি নে কে কাকে কতটা শিখিয়েছি। গুরুশিষ্য অনেক সময় এক সঙ্গে শিল্পচর্চা করেছিলুম ব'লে ছাত্রদের শেখানোতে আর নিজেদের শেখায় কারো কোনো বিঘ্ন বা পরিশ্রম হয় নি ; শেখানো ও শেখাটা আগাগোড়াই ছিল একটা খেলার অঙ্গ। কে কাকে শিখিয়েছে, কখন কে শিখেছে, অনেক সময় আমরা টেরও পাই নি।

রমেন্দ্রনাথ কত বড় শিল্পী ছিলেন, আগামী কালের শিল্পরসিক ও শিল্পসমালোচকেরা তার বিচার করবেন। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থেকে গুরুশিষ্য এক সঙ্গে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিল্পশিক্ষায় যে রস পেয়েছি বাইরের কেউ তার খবর পাবেন না। সে আনন্দ লিখেও বোঝানো যাবে না।

শ্রীনন্দলাল বসু

গুরুপ্রণাম

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক আচার্য নন্দলাল বসুকে অর্ঘ্যদান-অনুষ্ঠান, পৌষ ১৩৬০। রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আচার্য নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনী রমেন্দ্রনাথের পরিচালনায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

ফোটো: শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ। আনন্দবাজার পত্রিকা

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ফোটো : শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ । আনন্দবাজার পত্রিকা

রমেন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা

শিল্পী রমেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। যাঁর সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত এতকাল কেটেছে তাঁর সম্বন্ধে নিরাসক্ত নির্বিকার মনে কোনো আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ।

ছাত্র-অবস্থা থেকেই রমেন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছিল। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় নি। রমেন্দ্রনাথের জন্ম নব্যভাবাপন্ন সংস্কারপ্রবণ অতি-আধুনিক সমাজের বাইরে, দেশের দূরপ্রান্তে; পণ্ডিত পিতার একাগ্রতা ও জ্ঞানস্পৃহার মধ্যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারের ব্রত-পার্বণ ও শুচিতার মধ্যে তিনি বাল্যে ও কৈশোরে লালিতপালিত, এইসকল তাঁর প্রথম-জীবনের মানসিক গঠনের প্রধান উপাদান বলা যেতে পারে। আধুনিক শহরবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে এখন যা দুর্লভ সেই পরিবেশই তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, তাঁর শিল্পদৃষ্টিও এই বিশেষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত। শিল্পের বিষয়বস্তু, ব্যক্তিগত নন্দন-আদর্শের গতি-প্রকৃতি, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, কোনো বিষয়েই রমেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে শহরবাসী শিল্পী হয়ে ওঠেন নি। পূর্বোক্ত সহজাত বুদ্ধি ও প্রেরণা তাঁকে যতদূর চালনা করেছে ততই তাঁর শিল্পসৃষ্টি সার্থক ও সত্য হয়েছে।
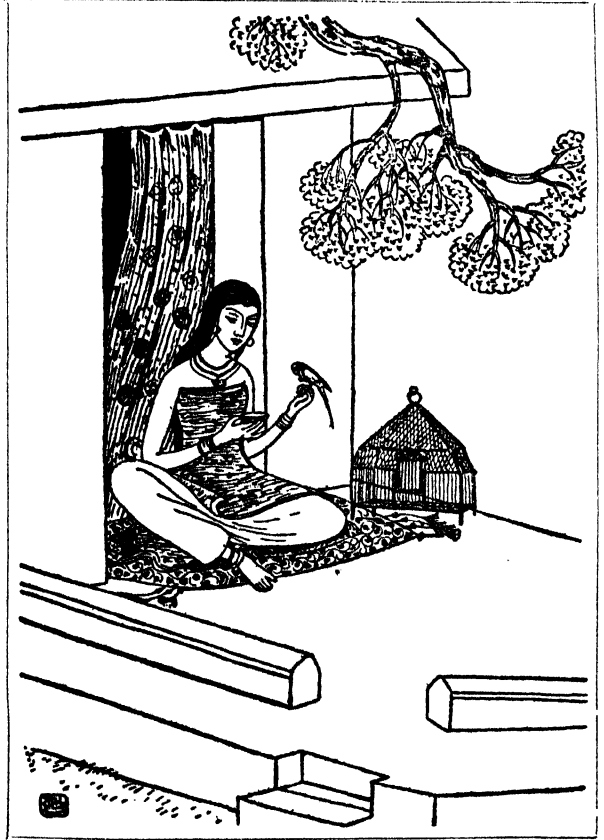
পোষাপাখি — রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"Habu and Cabu" (1928) গ্রন্থ হইতে

রমেন্দ্রনাথের শিল্পশিক্ষার গোড়াপত্তন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে, পরে তাঁর শিক্ষা শান্তিনিকেতন কলাভবনে। অধ্যবসায়ী ছাত্ররূপে আচার্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রমেন্দ্রনাথের বিলম্ব হয় নি। শিল্পী-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান অধ্যবসায়, কিন্তু শিল্পের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য আরও প্রয়োজন শিল্প-প্রেরণার। রমেন্দ্রনাথের জীবনে সে প্রেরণা যে তীব্রভাবেই বর্তমান তা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হল একটি তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন ক'রে।

১৯২১-২২ সালের কাছাকাছি কোনো-এক সময়ে কলাভবনের আচার্যেরা ছাত্রদের নিয়ে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় গিয়েছেন; উৎসব থেকে বঞ্চিত যে-দু-একটি ছাত্র আছেন তাঁরা কলাভবনের মাদুর-

চৌকি-ছড়ানো শূন্য ঘরে অবকাশ যাপন করছেন। সেই সময় রমেন্দ্রনাথ একটি ছোটো ছবি শুরু করলেন— ছবির বিষয়, একটি মেয়ে তোতাপাখিকে দানাপানি দিচ্ছে। সপ্তাহকাল পরে আচার্যেরা ফিরে এলেন উৎসব শেষ ক'রে, রমেন্দ্রনাথের ছবিও তখন শেষ হয়েছে। আচার্যেরা ছবি দেখে বিস্মিত হলেন— একজন অর্বাচীন ছাত্র এমন ছবি আঁকল কী করে! মোগল-সংস্কৃতির বর্ণবিন্যাস, রাজপুত ছবির রেখাপাত, এ-সকল শিক্ষা পার হয়ে রমেন্দ্রনাথ নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করবার 'ভাষা'ই বা পেলেন কী করে! রমেন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে এই-যে নূতন চেতনা, পরে বাইরের প্রশংসায় তা বিক্ষিপ্ত হতে পারে নি।

ভিখারীর রাজা রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"পাণুরে বাঁদর রামদাস" (১৩৩৫) গ্রন্থ হইতে

এর পর থেকে রমেন্দ্রনাথ ধারাবাহিক ভাবে যে-সব ছবি আঁকলেন তার বিষয়বস্তু ও ভাষা সবই ঘরোয়া, একান্তভাবেই তা রমেন্দ্রনাথের আপন সৃষ্টি— গ্রামের বাজার, মুদির দোকান, গ্রামের পুকুর ইত্যাদি ছবি, যেখানে মোগল-রাজপুতের কোনো প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত ভালো-লাগাকে আড়ষ্ট করতে পারে নি। বলা যেতে পারে, আধুনিক কালে ও এদেশে রমেন্দ্রনাথের ছবি genre-চিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শান্তিনিকেতনে ফরাসী মহিলা-শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস্-এর আগমন রমেন্দ্রনাথের শিল্পী-জীবনে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। মাদাম কার্পেলেস্ কাঠখোদাই ছবিতে পারদর্শিনী; রমেন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গেল। আঙ্গিকের দক্ষতা, বিষয়বস্তুকে কাঠখোদাইয়ের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আঁকতে পারা, এই-সব বিষয়ে রমেন্দ্রনাথের দক্ষতা শিক্ষার্থীর সীমা ছাড়িয়ে উঠল অতি সত্বর। এর পর রমেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনা 'গ্রাফিক আর্ট্‌স্' বা ছাপের ছবির ক্ষেত্রে।

প্রথম-জীবনে রমেন্দ্রনাথের অন্তরের আকর্ষণ ছিল জাপানী শিল্পী হোকুসাই-এর প্রতি। হোকুসাই-এর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ-দক্ষতায় এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও শিল্পীজীবন বাঁচিয়ে রাখার মতো অদম্য প্রাণশক্তিতে রমেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ইংরেজ শিল্পী ম্যুরহেড বোন্ -এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য, হোকুসাই বা ম্যুরহেড বোন্ -এর শিল্পাদর্শ অপেক্ষা, এই দুই জনের কর্মবহুল জীবনই মূলতঃ রমেন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল—এই অনুপ্রেরণা জীবনে মূর্ত করে তুলতে রমেন্দ্রনাথ আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন।

কয়েকবার বিদেশভ্রমণের সুযোগে রমেন্দ্রনাথ 'গ্রাফিক আর্ট্‌স্' বিশেষ করে এচিং-এর আঙ্গিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আয়ত্ত করেন। এশিয়ার মধ্যে তাঁর মতো ওস্তাদ এচিং-এর কারিগর দু-একজনের বেশি পাওয়া যাবে না।

রমেন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায়, সে-সম্বন্ধে বাংলা দেশ যতটা সচেতন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ততটা নয়। তেলরঙে আঁকা ছবির দ্বারা তিনি অন্যান্য প্রদেশে পরিচিত—ছাপের ছবির প্রবর্তন,

কাঠখোদাই রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রচার ও পরিণতির সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এ ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য দান যে অল্প লোকেরই আছে, অন্য প্রদেশে এ সম্পর্কে যথোচিত প্রত্যক্ষ পরিচয় বা স্বীকৃতি নেই।

এ সম্বন্ধে শেষ জীবনে তাঁর মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে করা কতকগুলি কাঠখোদাই দেখে। অনেকগুলি অসমাপ্ত তৈলচিত্র-ছড়ানো স্টুডিয়োতে বসে রমেন্দ্রনাথ বিক্ষিপ্ত মনকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনবার জন্য এগুলিতে মন দেন—সেই তাঁর অতীতের দেখা, অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনা পল্লীজীবনের দৃশ্য। এই শেষ দিকের এন্‌গ্রেভিংগুলিতে রমেন্দ্রনাথ যেন নূতন করে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কিছুকাল ধরে কেবলই উড-এনগ্রেভিং করবার। সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি, কিন্তু তাঁর এই শেষ ইচ্ছা জানতে পেরেছিলাম। তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন তাঁর চিরদিনের পরিচিত সাধনার ক্ষেত্রে।

রমেন্দ্রনাথের অসংখ্য স্কেচ, খসড়া, স্টাডি ও সেই সঙ্গে তাঁর অগণিত ছাপের ছবির যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে তাঁর কাজের ঐতিহাসিক মূল্য, শিল্পী হিসাবে তাঁর অতুলনীয় সার্থকতা।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চিত্রগ্রন্থাবলী

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র বাংলা ও ইংরেজী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। কাঠখোদাই, এচিং প্রভৃতি 'ছাপের ছবি' দিয়ে তিনি কয়েকখানি চিত্রসংগ্রহ এবং গ্রন্থও সংকলন করে গেছেন, নীচে তার তালিকা দেওয়া গেল।

বাসুকি রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
"পাথুরে বাঁদর রামদাস" (১৩৩৫) গ্রন্থ হইতে

WOODCUTS। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। ১৯৩১

শিল্পীর নিজের হাতে ছাপা ও স্বাক্ষরিত কুড়িখানি original print দিয়ে এই চিত্রসংগ্রহ গ্রথিত।

এর কিছুকাল পরে তিনি বারোখানি অনুরূপ ড্রাইপয়েণ্ট প্রিণ্ট, এবং দশখানি রঙিন কাঠখোদাই ছবি দিয়ে দুখানি চিত্রসংগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন।

CALL OF THE HIMALAYAS। প্রকাশক শ্রীশম্ভু সাহা, কলিকাতা। ১৯৪৩ ?

১৯২৩ সালে শিল্পী বদরীনাথ ভ্রমণ করতে যান, সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে ও পঁচিশখানি উড্-এনগ্রেভিং চিত্রে তা এই গ্রন্থে বর্ণিত।

SKETCHES OF EUROPE BEFORE THE WAR। শ্রীমতী কেসীর ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক লংম্যানস্, গ্রীন অ্যাণ্ড কোং। ১৯৪৪। লণ্ডন, অ্যামস্টার্ডাম্, প্যারিস প্রভৃতির সাতাশখানি স্থানচিত্র।

WOODCUTS। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকা-সংবলিত। প্রকাশক শ্রীসুশীল গুপ্ত। ১৯৪৪

আঠাশখানি ছবি আছে—পাঁচখানি রঙিন কাঠখোদাইর প্রতিলিপি।

রমেন্দ্রনাথ অনেকগুলি পুস্তক চিত্রিত করেছিলেন—তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'পাথুরে বাঁদর রামদাস'; প্যারীমোহন সেনগুপ্ত অনূদিত 'মেঘদূত', প্রথম সংস্করণ; ম্যাকমিলন-প্রকাশিত [শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত] Tales of India seriesএর কয়েকটি বই।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ সর্বদা তাঁর কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছেন—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ও রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্প গ্রন্থের মলাট-চিত্র রমেন্দ্রনাথের কৃত—এই পত্রিকার কাঠখোদাই মলাটটিও তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। রমেন্দ্রনাথের দুখানি ছবি উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যে দুটি কবিতা ('বরবধূ' ও 'যাত্রা') লিখেছিলেন, ছবি দুটি সহ তা 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তারই একখানি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

স্বরলিপি

বাল্যে শ্রুত যে-সকল বাংলা গান রবীন্দ্রনাথকে শেষজীবন পর্যন্ত আবিষ্ট করিয়াছে বর্তমান গানটি তাহার অন্যতম— তাঁহার রচনায় বহুবার এই গানটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা "রামচন্দ্র বসু। হাবড়ার নিকটবর্ত্তী শালিখা ইঁহার জন্মভূমি। ১১৯৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।· ·বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সঙ্গীতরচনায় অনুরাগ,— পাঠশালে বসিয়া কলাপাতে গান লিখিতেন,— আর ফেলিয়া দিতেন। একদিন কবিওয়ালা ভবানী এইরূপ কয়েকটি গান কুড়াইয়া পান,— গান পড়িয়া রামবসুর কবিত্বশক্তি বুঝিতে পারেন। সেই সময় হইতে রাম বসু, ভবানী বেণের দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন।· · শেষে নিজেই কবির দল করেন।· ·১২৩৬ সালে ৪২ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। · বিরহের সর্বাঙ্গীণ সুপরিপাটী ভাব-বর্ণনায় রাম বসুই অনেকের মতে অদ্বিতীয়।" —'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১)

নিম্নে সমগ্র গানের স্বরলিপি দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন সংকলনগ্রন্থে গানটির বহু পাঠভেদ দেখা যায়— স্বরলিপিকর্ত্রী ইহার যেরূপ পাঠের সহিত পরিচিত তাহাই স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হইল।

মনে রইল, সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হল না॥
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
তার হাসি দেখে ভাসি নয়নজলে—
তারে মন চায় রাখিতে, প্রাণ চায় সঙ্গে যেতে,
লজ্জা বলে ছিছি ছুঁয়ো না॥

কথা : রাম বসু

স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

মা পাঃ -দপঃ II { ^মপা -া ^মজ্ঞা । -ৱা সা -ণ্‌া I সা ^মজ্ঞা -া । জ্ঞমা -পা মা I
ম নে ০০ র ই ল ০ স ই ম নে র্‌ বে০ ০ দ

I পা -া -া । (-া -া -দপা I -মপমা -জ্ঞা -া । মা পা -দপা)} I
না ০ ০ ০ ০ ০০ ০০০ ০ ০ ম নে ০০

। -া জ্ঞা মা I পা -া -া । -া পণা দপা I
০ প্র বা সে ০ ০ ০ য০ খন্‌

I মা -গা পা । মা -া -পমা I -গা -া -া । -া গা মা I
যা য়্ গো সে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ তা রে

I পা না -া । র্সা র্সা -র্রর্সা I না -র্সঋর্সা -না । দা পা -দপা I
ব লি ০ ব লি ০০ আ ০০০ র্ ব লা ০০

I মা -পা জ্ঞা । জ্ঞমা -পা -দপা I -মপমা -জ্ঞা -া । মা পাঃ -দপঃ II
হ ০ ল না০ ০ ০০ ০০০ ০ ০ "ম নে" ০০

। া -া -া II { সা গা গা । মা মা পমা I গা গা পা । মা পাঃ পধঃ I
০ ০ ০ য খন্ হা সি হা সি০ সে আ সি ব লে তার্

I মা ধা পা । পা পা ধপা I মা গমা -পধপা । মা গা (-া)} I পধা I
হা সি দে খে ভা সি০ ন য়০ ০০ন্ জ লে ০ তারে

I { পধা -নর্সা র্সা । র্সাঃ র্সঃ র্সা I নর্সা -র্রগা র্রর্সা । র্সাঃ র্সঃ র্সর্রর্সা }I
ম০ ০ন্ চায়্ রা খি তে প্রা০ ০ণ্ চায়্ সঙ্ গে যেতে০

I ধর্সা র্সনা নর্সনা । ধনা পা মপমগা I গমপা -া -দপা । -মপমা -জ্ঞা মপা II II
লজ্ জাব লে০০ ছি০ ছি ছুঁ০০ য়ো না০০ ০ ০০ ০০০ ০ "মনে"

বিশ্বভারতী পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৬২

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমরা আস্‌তে পারবে না শুনেই আমি ঠিক করেছিলুম নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে তোমাকে একখানি পত্র লিখব। ইতিমধ্যে আজ তোমার চিঠি পেয়ে বড় খুসি হলুম।

তোমাকে আমি অতি অল্পকালই জেনেছি কিন্তু এমন স্বভাবতই তোমার প্রতি আমার গভীর স্নেহ জন্মেছে যে তোমার মঙ্গলসাধনের বিশেষ অধিকার আমি লাভ করেছি বলে আমার মনে হয়। তাই আমি আজ সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করছি।

তোমার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চল্‌চে তার একটা মূল্য আছে জান্‌বে। যে সত্যকে আমরা যথার্থ পাই তাকে সহজে পাইনে। তোমার অন্তঃকরণ সত্যের পিপাসু বলেই সত্যকে সম্পূর্ণ চিনে নেবার জন্যে তোমার মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা জন্মেছে। সত্যের প্রয়োজনবোধ যাদের মধ্যে প্রবল নয় তারা যা'-তা'কে সত্য বলে অনায়াসে গ্রহণ করে— কিন্তু সে তাদের যথার্থ কোনো কাজে লাগে না।

এই জন্যেই যে কোনো বড় জিনিষকে আমরা সত্যরূপে পাই তাকে বেদনার মধ্যে দিয়ে পাই— বেদনার মূল্য না দিয়ে তাকে আমাদের আপনার করতে পারিনে। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে সেই মূল্য নিচ্চেন, এর পরিবর্ত্তে তিনি তোমাকে শূন্যতা দিয়ে ভোলাবেন না।

দেখ, মা, এই যে জগৎ সংসারকে আমরা দেখ্‌চি জান্‌চি, একে ত আমরা Reason দিয়ে দেখ্‌চি-জান্‌চিনে। আমাদের চোখ যদি সহজে না দেখ্‌ত, কান যদি সহজে না শুন্‌ত, তাহলে কোনো যুক্তির দ্বারা আমাকে কেউ কিছু দেখাতে শোনাতে পারত না। ভাল করে যদি ভেবে দেখ তাহলে জানতে পারবে যা আমাদের দেখার অতীত তাকেই আমরা আমাদের চোখ দিয়ে অতি অনায়াসেই দেখ্‌তে পাচ্চি। তোমরা ত Science পড়চ— তোমরা ত জান আজকাল পরমাণুবাদ সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়েছে তাতে বস্তুর বস্তুত্ব আর থাকে না— শেষকালে রূপহীন শক্তিতে গিয়ে সমস্ত পৌঁছয়— সে যে কি তা ত আমরা কল্পনা করতে পারিনে। কিন্তু সেই কল্পনার অতীত শক্তির লীলাই ত আমাদের চোখে এমন করে ধরা দিয়েছে যে সে নিতান্ত আমাদের সামগ্রী হয়ে পড়েছে। বস্তুত Reason দিয়ে যদি আমাদের বিচার করতে হত

তাহলে আমার বাইরে যে কিছুই আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না— কিন্তু আমরা বলি আমার সামনে যে বস্তু আছে সে reasonএর দ্বারা জান্‌ব কি— সে ত আমার বোধের দ্বারাই জান্‌চি।

যেমন আমাদের দৃষ্টিবোধের দ্বারা দেখবার জিনিষকে জান্‌চি নইলে কোনোমতেই জানতে পারতুম না তেমনি ঈশ্বরকেও আমাদের আত্মার সহজ বোধের দ্বারাই জান্‌তে পারি তর্ক করে কোনোমতেই জানা সম্ভব নয়। মিষ্ট জিনিষ যে মিষ্ট তাও তুমি reasonএর দ্বারা জান্‌তে পার না রসনার দ্বারাই জান— পরমাত্মাই যে আমার আত্মার ধন সেও আমরা আত্মার ভিতর থেকেই জান্‌তে পারি তর্কদ্বারা পারিনে।

এই এককে, সত্যকে, আনন্দকে সমস্তের মধ্যে যাঁরা অনায়াসেই দেখ্‌তে পান তাঁদের সেই অধ্যাত্মবোধ উদ্‌বোধিত হয়েছে। তাঁরাই মানুষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানে দাঁড়িয়েছেন— আমাদের দৃষ্টির অভাব থাক্‌লেও আমরা তাঁদের দেখার ভিতর থেকে অনেকটা দেখ্‌তে পাই। সেই যাঁরা পরম সত্যকে সকল সত্যের মধ্যে পরম জ্ঞানকে সকল জ্ঞানের মধ্যে, পরম প্রেমকে সকল প্রেমের মধ্যে দেখ্‌তে পাচ্চেন— যাঁরা জগতের সমস্তকে বিচ্ছিন্ন করে অর্থহীন করে দেখ্‌চেন না, সমস্তকে আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মধ্যে দেখ্‌চেন তাঁরাই কি ঠকেছেন? আর আমরা যখন অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে হাৎড়ে বেড়াচ্চি, হাতে যখন যেটা ঠেক্‌চে সেইটেকেই খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌চি, আলোর অভাবে সমস্তকে একেবারে এক করে দেখ্‌তে পাচ্চিনে আমরাই কি ঠিক দেখা দেখ্‌চি?

না, না, Reasonকে দিয়ে হাৎড়ে বেড়ালে খণ্ডকেই পাবে— কিন্তু তোমার যে আত্মা অতি সহজেই বিনা তর্কে তোমার এক দিনের সঙ্গে আর এক দিনকে গাঁথচে, তোমার এক জানার সঙ্গে আর এক জানাকে যোজনা করচে, তোমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরকে, তোমার দূরের সঙ্গে নিকটকে অহর্নিশি সমগ্রভাবে এক করে তুল্‌চে বলেই জগৎ তোমার কাছে জগৎ হয়েছে, এবং তুমি আপনি তোমার নানার মধ্যে তোমাকে এক বলে জান্‌চ সেই আত্মাকে প্রসারিত করে ধর তাহলেই সর্ব্বত্রই আত্মার পরমাশ্রয় পরমাত্মাকে সকল সত্যের অন্তরতম সত্য বলে সহজে জান্‌বে।

চিঠিতে তোমাকে বেশী লেখবার সময় নেই। আশা করি মাঝে মাঝে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে আলোচনার অবসর হবে।

আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি নববর্ষ তোমার নবজীবনে ঈশ্বরের প্রসাদ বহন করে আবির্ভূত হোক্। তুমি দৃষ্টি লাভ কর, বল লাভ কর, আনন্দ লাভ কর— তোমার সংশয়কুহেলিকার অন্তরালে যাঁর চিরদীপ্তি অম্লানভাবে বিরাজ করচে তাঁকে তুমি তোমার হৃদয়ের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে প্রত্যক্ষ দর্শন করে ধন্য হও। তোমার সুন্দর পবিত্র জীবনটি এখনো কুঁড়ির মত আপনাতে আপনি আবৃত হয়ে আছে— নববর্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিতে তার আবরণ দূর হয়ে যাক্, তুমি তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতায় বিকশিত হয়ে পুণ্যগন্ধে সংসারকে মধুময় করে বিরাজ করতে থাক। তোমার চিত্তকুসুম যে তাঁরই পূজার সামগ্রী, তিনি নিজেই তাকে প্রস্ফুটিত করে নিজের হাতেই একদিন তাকে শুভক্ষণে গ্রহণ করবেন তাতে মনের মধ্যে লেশমাত্র সংশয় রেখো না। নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রেখো— জীবনের সার্থক পরিণামের উপর বিশ্বাস রেখো— এবং এই সার্থকতার পথে যিনি তোমাকে সকল সংশয়ের মধ্য দিয়ে চালনা করচেন তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখো।

[বৈশাখ ১৩১৮]

একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

মা, আজ ভোর তিনটের সময় উঠে আমি বাইরে বসে ছিলুম। তখন আকাশের এক প্রান্তে খণ্ড একটি চাঁদের রেখা; তারই অনতিদূরে একটি উজ্জ্বল তারা জ্বল্ জ্বল্ করছিল। পূর্ব্বদিকে কালো জটাপাকানো মেঘ জমে ছিল। অন্ধকারের তলে তলে আলোর একটি লাবণ্য ফুটে ফুটে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়তে লাগল। আমার স্থিরদৃষ্টির উপরে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। জগৎ জুড়ে আমাদের চারিদিকে এই যে সব প্রকাণ্ড ব্যাপার চলেছে— যার মধ্যে অনায়াসে আমরা ঘুমচ্চি এবং জাগ্‌চি— তার মধ্যেকার অনির্ব্বচনীয় একটি বিপুল সৌন্দর্য্যবিকাশকে আজ আলো এবং অন্ধকারের মাঝখানটিতে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেয়ে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ অত্যন্ত একটি স্নিগ্ধ নির্ম্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজকের প্রভাত আমার উপরে আশীর্ব্বাদরূপে অবতরণ করেছিল।

তারপরে সকাল বেলায় কাজের প্রয়োজনে বাহিরে চলে গিয়েছিলুম, নানা কথাবার্ত্তায় ভোরবেলাকার বাণীটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। এমন সময় বাড়ি ফিরে এসে দেখি কি অজস্র মাধুর্য্যরাশি আমার ঘরের আকাশ এবং বাতাসকে মিষ্ট করে তুলে আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। তোমার ফুলগুলি পেয়ে আমার সেই ভোররাত্রির অযাচিত আনন্দ উপহারটির কথা আমার মনে জেগে উঠ্‌ল। তোমার এই শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের দান আমার কাছে সেই উপর থেকে অভাবনীয় আশীর্ব্বাদের মতই এসে পৌঁছেচে। আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদকে আমি তোমার কাছে এমন সুন্দর করে পাঠাতে পারলুম না কিন্তু আমার সর্ব্বান্তঃকরণের শুভ কামনা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
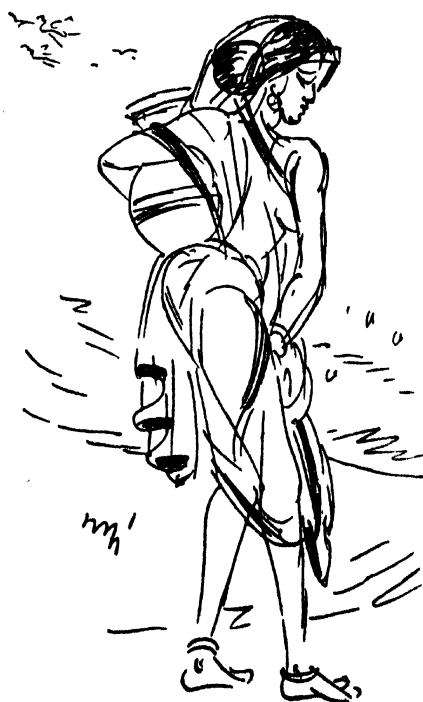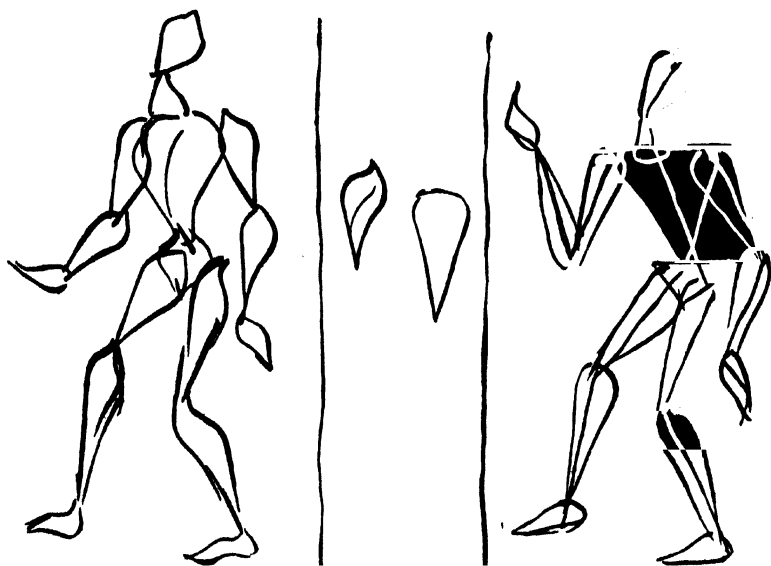
ছবির ছড়া

শ্রীনন্দলাল বসু

এগুলি ছড়া, কবিতা নয় বা রসাত্মক বাক্য নয়। নির্দোষ উপমা অলংকার ছন্দ কেউ আশা করবেন না। তবে, শিল্পীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, সেই সঙ্গে পূর্বগামী গুণীগণেরও, সোজা-সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে— যদি কখনো কারও কাজে লাগে। কিছু হয়তো পূর্বপ্রচলিত 'বচন'ও এর মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়ে থাকবে, বলা যায় না। বিষয়টি এমন যে, ছড়া-কার আনুকোরা নূতনত্বের কোনো-প্রকার দাবিদাওয়া রাখেন না।

গড়নের ছড়া

পিঠ উঁচা, পেট ধ্বসা—
গড়নের এই ভাষা॥
সিধা সাদা নধর যা
চট্ ক'রে ভাঙে তা॥
গিঁঠ গাঁট পাকৃতাড়ুয়া[1]
তারে ডরে যম-বুঢ়ুয়া॥
গদার মতো, শাঁখের মতো,
পাখ্‌নার মতো পেশী
আঁকো তো ভাই বসি॥
উঠ মুঠ ঘোড়া[2]
তিন আঁকায় সারা॥
ঠার-ঠোর ভয়-ভাবনা
রাগদ্বেষের ভঙ্গী
আঁকো তো ভাই সঙ্গী॥
ওঠা-পড়ার ভঙ্গী মেলা,
নাচা চলা কথা-বলা—
কোন্ খেয়ালের কেমন খেলা
নয়ন মেলে ছাখ্‌ রে ভোলা,
আঁক্ রে ভোলা॥

১ পাকানো। পেশীবিশিষ্ট।

২ পূর্বপ্রচলিত পাঠান্তর :—

মুখ মুঠি ঘোড়া
তিন শিক্ষার গোড়া॥

রঙের ছড়া

তিন হল মূল রঙ আর তিন মিশাল,
তারই মধ্যে মূল বরন হলদে নীল লাল ॥
মিত্[৩] রঙ সবুজ বেগুনি আর কম্‌লা
মূল রঙের মাঝে থেকে মিটায় ঝামেলা ॥
হল্‌দি আর লাল মিলে কম্‌লা মনোহর,
নীল হলুদের যোগে হল সবুজ স্বতন্তর ॥
লালে আর নীলে মিশে উপজে বেগুনি—
কোন্ রঙের কত মিশাল নিজে বুঝুন গুণী ॥

মিত্ রঙ নারী নর মিলেও না মেলে
কোলে কাঁখে বাদী রঙ একটু না পেলে—
হাসি-খুশি ছেলে ॥

একা একটি রঙ
তার নাই যে কোনো ঢঙ,
সে বেড়ায় যেন সঙ ॥

কেবল কালোয় আঁকন ভালো,
নানা ভাবে পর্দা[৪] তোলো—
গুণীর হাতের গুণেই বীণা বাজবে ভালো ॥

পাটকিলে—
কালো রঙ, নীল রঙ, লাল রঙ মিলে।
তুলনা তার তেঁতুল-বীচি আরশোলা আর গিলে ॥
ধূসর বরনে মেলে কালো আর সাদা—
ধুলো-মাটি তুলনা, ভুলো না গাধা ॥
সবুজ ঘাসে অরুণ আভা ঝলে,
ধূপ্‌ছায়া রঙ তারেই বলে।

৩ মিত্ রঙ : সম্‌বাদী রঙ বা মিত্র বর্ণ।
বিভিন্ন বর্ণগুলিকে, পরস্পর সম্পর্কের বিবেচনায়, সম্‌বাদী, বাদী, বিবাদী, উগ্রবিবাদী এরূপ নানা পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

৪ সুর বা স্বরের বৈচিত্র্য। অন্য পক্ষে, ছবির টোন্।

বিবাদী রঙ

সাম্‌না-সাম্‌নি মূল রঙ সদাই ঠোকে তাল
সবুজ[৫] দেখে রুখে হঠাৎ চোখ রাঙায় লাল[৫] ॥
লাল নীলের আড়া-আড়ি না বললেও চলে।
হলদে দেখেই বেগুনি যে তেলে-বেগুনে জ্বলে।
অপরাজিতা রাঙা-জবা সবুজ-বিল্বদলে
পুজ, ও ভাই, শ্যামা মায়ের রাতুল পদতলে ॥

উগ্রবিবাদী

কুঁচের কালো দেখে
আড়চোখে লাল
রেগেই আরও লাল।
আঁধার রাতের দাবানল দেখিতে ভয়াল ॥

সম্বাদী

মেঘের বুকে বকের মালায়,
নীল আকাশ আর মেঘে,
জুড়ায়ে দেয় চোখের জ্বালা—
হৃদয়ে রয় লেগে ॥
কালার বাঁধা স্বর্ণধটী
রাধার নীলাম্বরী—
যুগল রূপের কী শোভা, তার
বালাই লয়েই মরি ॥

২৯. ৭. ১৯১৫

৫ বাদী রঙ মাত্রাভেদে বিবাদী হয়ে থাকে। ঐরূপ, সম্বাদীও হতে পারে।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা থাকা আবশ্যক। ঐ গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা যথোচিত ফল ফলাইতে পারে না, কিম্বা যে ফল ফলিয়াছে তাহাও সাজাইয়া গুছাইয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারে না। ঐ গৃহিণীপনা থাকিলে কেবল একটিমাত্র রচনার জোরেও লেখক টিকিয়া থাকে, যেমন ফিট্‌জেরাল্ড ওমর-খৈয়ামের অনুবাদের জোরে টিকিয়া আছেন। আবার ঐ গৃহিণীপনার অভাবেই অনেক লেখক তলাইয়া যান। যেমন ওদেশে ল্যান্‌ডর, এদেশে রবীন্দ্রনাথের মতে সঞ্জীবচন্দ্র। আমরা সেই সঙ্গে তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচক-ভাগ্য অসামান্য। তৎকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ পড়িয়া মধুসূদন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।[১] আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন, অযথা প্রশংসা করিবার লোক তিনি ছিলেন না; তিনিও স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন।[২] রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে স্বপ্নপ্রয়াণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ সব ছাড়া আরো তিনটি রচনা আমার চোখে পড়িয়াছে।[৩] কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬০ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, সামান্য কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন প্রজন্মকাল দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। মাইকেল ছাড়া আর সকলেই তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণের গুণানুকীর্তন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন— সকলেই একবাক্যে এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস দিয়াছেন।[৪]

কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে দেখা যাইতেছে যে উচ্চ আদালতের রায় কাব্যের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও কবির বিশেষ লাভ হয় নাই। তিনি নামে মাত্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের নামটাও বোধ করি অনেকেরই স্মৃতির অতীত! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? গৃহিণীপনার অভাবই কি ইহার কারণ! আমার মনে হয় একটা কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আরো কিছু কারণ আছে,

---

১ "আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; মেঘদূত প'ড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।"

—পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্যায়

মধুসূদন যে "দেবেন্দ্র ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কবিত্বে" মুগ্ধ ছিলেন এমন মন্তব্য অন্যত্রও দেখিয়াছি।

২ "আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious! যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে Somehow or other it never came to the surface."

পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়

৩ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি; সতীশচন্দ্র রায়, রচনাবলী; শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২

৪ স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থাকারে ১৮৭৫ (?) সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮৭৩ সালে অংশতঃ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ মাইকেলের মৃত্যুর বৎসর। মাইকেলের চোখে পড়িলে এই অপূর্ব কাব্যের তিনি প্রশংসা করিতেন বলিয়াই আমার ধারণা।

আর সে-কারণ কালধর্মে ও পরবর্তী কাব্যধর্মে নিহিত। স্বপ্নপ্রয়াণের মতো অমর কাব্যের বিস্মৃতিতে বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যেরও পরিচয় নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। এক বিষয়ের অনুসন্ধানে নামিলে একাধিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতেছি।

২

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনকথা তাঁহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিদিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্রাগ্রজরূপে যে কৌতূহল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই এমনটি হইয়াছে। নতুবা নিজেকে বিদিত বা বিজ্ঞাপিত করিবার ঝোঁক তাঁহার ছিল না। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথা বলা যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্র্যবহুল তাঁহার জীবন নয়। এখানে কেবল সেই সকল তথ্যেরই উল্লেখ করিব বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহা প্রাসঙ্গিক।

১৮৪০ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। এই সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘদূত কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে ও আনুকূল্যে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহাতে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ, বেঙ্গল থিয়সফিক্যাল সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারতী, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহর্ষির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহর্ষির মৃত্যু হইলে ১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে এই মহানুভব মনীষী লোকান্তরে প্রয়াণ করেন। পঁচাশি বছরের বেশি এই দীর্ঘজীবনের তথ্যপুঞ্জ একমুষ্টির অধিক নয়। তাই বলিয়া তাঁহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার রচনাসমূহ গ্রন্থাবলী-আকারে ছাপিলে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্ত রচনাসমষ্টিকে অতিক্রম করিবে বলিয়াই মনে হয়, অন্ততঃ সরেজমিনে সে পরীক্ষা না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি।[৫]—

১	মেঘদূত	১৮৬০
২	তত্ত্ববিদ্যা ৪ খণ্ড	১৮৬৬-১৮৬৯
৩	স্বপ্নপ্রয়াণ	১৮৭৫
৪	পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম	১৮৯৮
৫	রেখাক্ষর বর্ণমালা	১৯১২
৬	গীতাপাঠ	১৯১৫
৭	নানা চিন্তা	১৯২০
৮	প্রবন্ধমালা	১৯২০
৯	কাব্যমালা	১৯২০
১০	চিন্তামণি	১৯২২

৫ পূর্ণতর তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর", সাহিত্যসাধকচরিতমালা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় নয়। কেননা, গদ্য ও পদ্য ছাড়াও নানা বিষয়ে তিনি নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। জ্যামিতি, স্বরলিপি উদ্ভাবন, কাগজের বাক্স রচনাপ্রণালী উদ্ভাবন ও বাংলা শর্টহ্যাণ্ড অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিণীপনা থাকিলে ইহাদের যে-কোনো একটি ধারাকে অনুসরণ করিয়া লোকে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন দৃষ্টিই ছিল না। তিনি অনেক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু কোনো পথেরই চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌছিবার চেষ্টা করেন নাই ; শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহিণীপনার অভাব। জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের প্রতিভার প্রাচুর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন।—

বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।

এই উদাসীনতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধর্ম। গদ্য পদ্য ও বিচিত্রমুখী রচনার কোনোটাতেই তাঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় নাই। তাঁহার রচনা পড়িতে শুরু করিলে মনে হয় ভাণ্ডারের চরম রত্নগুলি যেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অস্পষ্ট অতৃপ্তি পাঠকের মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কঠিন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবদন্তীতে ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি ?

এ উদাসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে ভুল হইবে, ইহা নিতান্তই তাঁহার ব্যক্তিগত স্বভাব। তিনি দার্শনিক না হইলেও ইহার ব্যতিক্রম হইত না। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার সাংসারিক অনাসক্তির একটি উদাহরণ দিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন—

পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যেত, নিজে কিছুই রাখতেন না। দীপেন্দ্রনাথই পরিবারে তা যথাযথ ভাবে বণ্টন করতেন। তাঁর নিয়মিত আহারবস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হ'ত না। কিন্তু একটি কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করতেন, সেটি লেখার জন্য ও বাক্স তৈরির জন্য কাগজ। একদিন শুনি জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলছেন, দীপুকে গিয়ে বলিস আজ যদি আমায় একটি দোয়ানি দেন তবে আমি একখানি খাতা আনাই। একটি দোয়ানির ভিখারী লক্ষপতি।

যে উদাসীনতা তাহাকে একটি দোয়ানি সঞ্চয় করিতে দেয় নাই, সেই উদাসীনতার উত্তরে বাতাসে "স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত।" আবার, সেই উদাসীনতাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এই উদাসীনতা ও রবীন্দ্রনাথ-কথিত গৃহিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার মতো। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীস্বভাব নিহিত থাকে, সেটি গৃহিণীপনার ভার লয়। এখন, পুরুষ ষোল আনা পুরুষ হইলে গৃহিণীপনার সুবিধাটুকু হইতে সে বঞ্চিত হয়। তাহার অসুবিধার অন্ত থাকে না। একটি অসুবিধা আত্মপ্রতিষ্ঠায় অক্ষমতা। সংসারে যেখানে যে-কেহ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম কয়খানি ইট তাহাকে স্বহস্তে প্রোথিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে অপরে ইমারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এতটুকুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এ যুগে এ রকম মনোবৃত্তি একান্ত বিরল।

৩

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম কি ? তিনি মূলতঃ কবি না দার্শনিক ? এ তর্কের মীমাংসা করিয়া লইয়া তবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রথম-যৌবনে তিনি কিছুকাল

কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাব্যরচনা করেন নাই, তত্ত্ববিদ্যার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কোল্‌রিজের সাহিত্যজীবনের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের যা-কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য তাহা প্রথমজীবনের রচনা, শেষজীবন দর্শন ও সমালোচনাতত্ত্ব লিখিয়া তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। আবার, দুজনেরই কবিকল্পনা কিঞ্চিৎ উন্মার্গগামী, অলোকিকের পাড়ায় তাহাদের গতিবিধি। কোল্‌রিজের 'এনশেণ্ট ম্যারিনার', কুব্‌লা খাঁ ও ক্রীস্টাবেল, দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ। বাহিরের এই মিল সত্ত্বেও দুজনের প্রতিভার ধর্ম ভিন্ন, কোল্‌রিজ মূলতঃ কবি, দ্বিজেন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শনিক।

স্বপ্নপ্রয়াণের গুরুত্ব এই যে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে গ্রথিত; ইহার কঙ্কালটা তত্ত্বের, রক্তমাংস কবিত্বের, আর প্রাণসঞ্জীবন মন্ত্র কল্পনার। স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বপ্নপ্রয়াণের পরে তিনি আর কাব্য রচনা করেন নাই। আগেও তত্ত্ব, পরেও তত্ত্ব, মাঝখানে একবারের জন্য কাব্যে ও তত্ত্বে গ্রন্থি বাঁধিয়া গিয়াছে— আবার তার পরেই দ্বিগুণিত বেগে তত্ত্ববিদ্যার প্রবাহ ছুটিয়াছে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্নপ্রয়াণেই সমাপ্ত। এই একটি কারণ যে-জন্য তাঁহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তাত্ত্বিক প্রতিভা বলিতে চাই।

আরো কারণ আছে। কাব্যে ও তত্ত্বে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার করিয়াছেন, সে ভাষারীতি সর্বত্র গদ্যাত্মক, অর্থাৎ যুক্তি, শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যে ভাষারীতি বা স্টাইল যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া, শৃঙ্খলার ছত্রভঙ্গ করিয়া উধাও হইয়া যায়, তাহার প্রাঞ্জলতা মেঘলোকের প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছ সরোবরের প্রাঞ্জলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণে খুঁজিলে মিলিবে না, মিলিবে শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির ধর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যরীতির জনক।

এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

কবিবর কথার বুঝিয়া মর্ম,
বলিল' যে অস্ত্রাঘাত সহিতেছি জানিছেন ধর্ম,
ভঙ্গ দিতে রণে
পারি বা কেমনে?
অতএব দেখ মোর সাহসের কর্ম।

কিংবা—

সেই দশা করেছ আমার; চাই রাখো চাই মারো।
অসাধ্য কি আছে যাহা সুখ-সাধ্য করিতে না পারো
নয়ন-ভঙ্গিতে! বলো বলো তাই কি করিবে দীন
শুধিতে অমূল্য অই চাহনির মর্মভেদী ঋণ।

আর—

এ শান্তিনিকেতন। আমার কুটীরে বিনা-তৈলে একটি দীপ জ্বলিতেছে, ভগবদ্গীতা। আমাদের দেশের মস্তকের উপর দিয়া এত যে বাত্যার উপর বাত্যা চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য ঈশ্বরের মহিমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পর্যন্ত সমান রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুব্ধ বা ম্লান হয় নাই।

আরও—

কপিল মুনি জিহ্বা সংযত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, 'যথাসম্ভব দুঃখনিবৃত্তিই জিজ্ঞাসার বিষয়' কিন্তু তাহা হইলে তিনি কপিল

মুনি হইতেন না, তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের দলভুক্ত হইতেন। একালের গ্রন্থসমালোচকেরা ঐকান্তিক সত্যের প্রতি বড়ই নারাজ।

এই চারটি অংশ, দুটি গদ্যের দুটি পদ্যের, একই ধর্মবিশিষ্ট, কেবল ছন্দের গুণে একটি পদ্য, ছন্দের অভাবে একটি গদ্য ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের সৃষ্টি যে-মনে, সে-মন গদ্যলেখকের ও তাত্ত্বিকের, যুক্তি শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতার ধাপ ফেলিয়া যে-মন অগ্রসর হইতে অভ্যস্ত।

এখানে একবার অনুজে অগ্রজে তুলনার লোভ সংবরণ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ কাব্য তত্ত্বপ্রবন্ধ গল্প যাহাই লিখুন-না কেন সর্বত্র তাঁহার কবিধর্ম ফুটিয়া বাহির হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্যেও তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বেও কবি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের পদ্যের বুনন যেমন গদ্যাত্মক, রবীন্দ্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত, তাঁহার গদ্য পদ্যাত্মক। সংস্কৃত অলংকার ও ইংরেজি বাক্যের প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের গদ্য গঠিত, দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটার্নটা একেবারেই দেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইডিয়ম, কিছু সংস্কৃত ভাষ্যের গদ্যরীতি। আবার দুজনের প্রতিভার ধর্মও ভিন্ন, একজন শৃঙ্খলা, যুক্তি ও প্রাঞ্জলতার পথিক, অপরজনে এসব গুণ তেমন লক্ষণীয় নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি রূপককে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন, আর রবীন্দ্রনাথ রূপকের আঙ্গিকের কাছে কখনো সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ একই বাড়ির এ-বারান্দা ও-বারান্দার অধিবাসী ; এমন ক্ষেত্রে আশা করা অন্যায় নয় যে, অগ্রজ প্রভূত পরিমাণে অনুজকে প্রভাবিত করিবেন। কিন্তু তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ঐকান্তিক পার্থক্য। অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্ক বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যের সুবাদে বিহারীলাল স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, আর অধিকতর শক্তিমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথ চিরকালই বিস্মৃতির ধার ঘেঁষিয়া রহিয়া গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, দ্বিজেন্দ্রনাথের পূর্বাপর নাই ; জীবনের ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে উত্তরপুরুষ পূর্বপুরুষকে স্মরণীয় করিয়া রাখে। উত্তরপুরুষহীন সাহিত্যিক সত্যই ভাগ্যহীন, দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই দলের একজন। অনেকে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যকে এক খণ্ড দ্বীপ বলিয়াছেন। আমি তো বলি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেই এক খণ্ড দ্বীপ। প্রাচীন ধারার সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিন্ন, আবার নূতন ধারার সঙ্গেও যোগ গড়িয়া ওঠে নাই আবার তৎকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার ধারেন না। তাঁহার উত্তরপুরুষ নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষই বা কে ? মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র কাহারও সঙ্গে তাঁহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি ? পূর্বাপরহীন তিনি নিঃসঙ্গ একক, দ্বীপ-খণ্ড বলিলেও যথেষ্ট বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তাহা যুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যেন গ্রহান্তরের উল্কাখণ্ড, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত।

আমার সিদ্ধান্ত এখন দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এই জন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে।…আমি গোড়া থেকেই সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি ; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি।…কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোন একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না।…দেখ, একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism বার আনা বিলাতি চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন patriot

আমিও সেই রকম patriot হব, এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল?

আত্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে দ্বিজেন্দ্রনাথ 'আমার মত patriot' না হইবার চেষ্টা করিয়া 'তোমার মত patriot' হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল জিনিস যেমন চলে আসল তেমন চলে না। কালের সহিত আপস করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-জাহ্নবী নূতন পথে চলিয়া গেল; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, শূন্য প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রহিলেন; তবে পুরাতন সেই শ্বেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কূলেই নদী বহিত, এখন সব পরিত্যক্ত।

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নবগোপাল একটা ন্যাশানাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি জিমন্যাস্টিক প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল, তাঁতি কামার কুমোর ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম— ওসব তো দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার? মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম, 'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।

ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসীকে করজোড়ে বসাইয়া ছবি আঁকিতে সেকালের পেট্রিয়টদের বাধিত না, পেট্রিয়ট না হইয়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের বাধিত। এই গেল সেকালের সঙ্গে প্রভেদ। একালের সঙ্গেও যে খুব বেশি মিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। একালের আমরা ব্রিটানিয়াকে সিংহাসনে বসাইয়া ছবি আঁকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা যে বসিতেন তাহাতে ভুল নাই। ইহাও তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মতে ইহাও 'আমার মত patriot' হওয়া নয়, 'তোমার মত patriot' হওয়ারই রকমফের। শকুন্তলা যদি ভেনাসের ভঙ্গীতে দাঁড়ায় তবে সে ভেনাসই হইল; ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিয়াই হইল— এই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিমত, ইহাকেই তিনি বলিতেন 'তোমার মত patriot' হওয়া। সেদিনের মতো ছবিখানা উল্টাইয়া রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাবৎকাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে। পরবর্তী কাল কালদ্রোহী দ্বিজেন্দ্রনাথের ছবিখানাই উল্টাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই যুগজীবনে তাঁহাকে নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক বিচিত্র কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের স্রষ্টা— দুই-ই নিজ নিজ পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত।

৪

পূর্ববর্তী সমালোচকগণ স্বপ্নপ্রয়াণ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, আর অল্পই বাকি আছে, সেইটুকু আমি গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

প্রিয়নাথ সেন স্বপ্নপ্রয়াণের সঙ্গে স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইন ও বানিয়ানের পিল্‌গ্রিমস্ প্রোগ্রেসের তুলনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাব্যের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে— সেখানি দান্তের

ডিভাইন কমেডি। অবশ্য কাব্যোৎকর্ষের বিচারে তিনখানির কোনোটির সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের একাসন নয়। আবার তিনখানির কোনোটির দ্বারা যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এমন প্রমাণও নাই। তৎসত্ত্বেও দুখানির সঙ্গে যদি তুলনা চলে, তৃতীয়খানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই। পূর্বোক্ত কাব্য দুখানির সঙ্গে স্বপ্নপ্রয়াণের মিল যদি আকস্মিক হয়, তৃতীয়খানির সঙ্গেও তাই। কিন্তু তৃতীয়খানির সঙ্গে আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্মাতের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। তাঁহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভার্জিল। তাঁহার পরিচালনায় দান্তে নরক ও Purgatory-র যাবতীয় রহস্য দর্শন করিয়া অবশেষে বিয়াত্রিচের নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অনুরূপ। এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্য কোনো কবি নয়, স্বয়ং কবিকল্পনা। তাঁহার পরিচালনায় কবি মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া নন্দনপুর, বিলাসপুর, বিষাদপুর, রসাতল, সমরপুর ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শান্তিপুরে পৌঁছিয়া সপ্তস্বর্গে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন। ডিভাইন কমেডি শান্তিময় প্যারাডাইসে এবং স্বপ্নপ্রয়াণ শান্তিময় শান্তিপুরে উপসংহৃত। এ দুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ডিভাইন কমেডির নায়ক স্বয়ং দান্তে। স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কবিটি কে? প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন— "একজন কবি বা কবিপ্রকৃতি লোক।" আমার ধারণা, স্বপ্নপ্রয়াণের নায়ক স্বপ্নপ্রয়াণের কবি স্বয়ং, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর ;
গুণ-জ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি,
সেই দেব নিকেতন আলো করে কবি।

ইহা স্পষ্টতঃই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।[৬] এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্নপ্রয়াণের নায়কের যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে আর সংশয় থাকা উচিত নয়। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে আর-একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়— স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনী, রূপকচ্ছলে এই কাব্যে তিনি তাঁহার জীবনের ও তথা কবিজীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিতার্থতা বিবৃত করিয়াছেন। স্বয়ং কবির নায়কত্ব পর্যন্ত ডিভাইন কমেডির সঙ্গে মেলে। এ মিল আকস্মিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিক্রমকারী, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া দুই কাব্যের অমিলের কথা তুলিব। স্বপ্নপ্রয়াণ লেখকের মানসজীবনের ইতিহাস। ডিভাইন কমেডিতে তৎকালীন ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি দান্তে মোক্ষকামী মানবমাত্রেরই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতায়, গভীরতায়, কাব্যোৎকর্ষে দুয়ে তুলনা করাই অসংগত। সে চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোর অতি প্রকট মিলটা দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এবারে আর-একটি কথা। নানা কারণে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য স্মরণীয়। মেঘনাদবধকাব্যখানিকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক দীর্ঘকাব্য। বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক রূপককাব্য।

---

৬ সত্য=সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম=হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণ=গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি=জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সোম=সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবি=রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবনিকেতন=মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন, কবি=দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মধুসূদনী কাব্যরীতি ও রবীন্দ্রকাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংলা কাব্য। আবার রসের বিচারেও ইহার স্থান কাব্যরীতি ও ফ্যাশন-পরিবর্তনের উর্ধ্বে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি যে, কি বাংলা সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য নানাভাবে স্মরণীয়। এসব কথা অল্পবিস্তর সবাই জানেন, অনেকেই বলিয়াছেন। আরো একটি কারণে ইহার অনন্যসাধারণত্ব আছে। বাংলা সাহিত্যে কবিজীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাব্যেই প্রথম স্বীকৃত হয়। প্রায় সমসাময়িক সারদামঙ্গল কাব্যেও কবিজীবনের ইতিহাস আছে, কিন্তু কবি সেখানে শিল্পী নয়, সাধক ; তাছাড়া "মৈত্রীবিরহ প্রীতি-বিরহ সরস্বতীবিরহের" সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া এমন এক মিশ্ররসের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার মধ্যে কবি-জীবনকে সঠিকভাবে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। কাব্যোৎকর্ষেও দুয়ে ভেদ আছে। সারদামঙ্গলের বর্ণ ও রেখা দুই-ই অস্পষ্ট, স্বপ্নপ্রয়াণ স্পষ্টতায় ও শৈত্যে শ্বেতপাথরের মূর্তি, সারদামঙ্গল কাব্যের নীহারিকা, স্বপ্নপ্রয়াণ শুক্রগ্রহের ন্যায় উজ্জ্বল ও অচপল। রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী'তে কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাব্য স্বপ্নপ্রয়াণের পরবর্তী রচনা। কবিজীবনের দ্বন্দ্ব সংগ্রাম ও ইতিহাসকে কাব্যের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কৃতিত্ব। আর, নিজের অজ্ঞাতসারে এই কাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাব্যরীতিতে তিনি নূতন প্রাণ ও বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন।

তার পরে যখন মনে পড়ে যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ কল্পনাকে পথপ্রদর্শিকা করিয়াছেন তখন ওয়ার্ডস্বার্থ-কোলরিজের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বের সমত্ব প্রকট হইয়া ওঠে। ওয়ার্ডস্বার্থ ও কোলরিজ সর্বপ্রথমে কবি ও কবিকল্পনাকে নূতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম বৃত্তিমাত্র ছিল। রোমান্টিক কাব্যের পুরোধাদ্বয় কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, আর কবিকল্পনাকে জীবনরহস্যের সারথ্য প্রদান করিলেন। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে কবি ও কল্পনার সেই নূতন অর্থই আমরা পাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে ইহার আগে মধুসূদন 'মধুকরী কল্পনা'কে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু এ 'মধুকরী কল্পনা' রোমান্টিক পুষ্পবনের ভ্রমরী নয়, অষ্টাদশ শতকের কাঁচি-ছাটাই সযত্নলালিত উদ্যানের সঙ্গেই তাহার পরিচয়। পরবর্তী কালের রবীন্দ্রনাথের 'কবিতাকল্পনালতা'র সঙ্গেই স্বপ্নপ্রয়াণের কল্পনার আত্মীয়তা। আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট-এ পরিণত হইয়াছে, আর কবিকল্পনা জগৎ ও জীবনের যাবতীয় রহস্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নূতন পদবীর প্রথম আভাস স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে। আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আর-একটি গুরুত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'রবি উদয়ের' আগে যে অরুণাভা নূতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে স্বপ্নপ্রয়াণে সেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য 'প্রভাতসংগীতে'র পূর্ববর্তী 'ব্রাহ্মমুহূর্তের সংগীত'; স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন অবস্থায় এখানে আমরা নবকাব্যের নির্ঝরকে যেন দেখিতে পাই।

৫

রূপক কাব্য যতই প্রাঞ্জল হোক, কাহিনীকাব্যের প্রাঞ্জলতা কখনো পাইতে পারে না। যুগপৎ কাহিনী ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলতা ও অর্থভেদ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কখনো সে জটিলতা ফেয়ারী কুইন-এর দুর্গমতায় পরিণত হয়, কখনো অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। স্বপ্নপ্রয়াণের গতি সরল, বিন্যাস প্রাঞ্জল আর অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই। তবু রূপক কাব্যে যেটুকু দুরূহত্ব অনিবার্য তাহা অবশ্যই আছে।

ইহারই সমাধানমানসে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারম্ভে দুই-চার ছত্র গদ্য সূচনা যোগ করিয়া দিয়াছেন আমরা সেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, তাহাতে সমগ্রের অর্থবোধে সাহায্য হইতে পারে।

প্রথম সর্গ। মনোরাজ্যপ্রয়াণ। সূচনা। স্বপ্নের কুহক। মনোরথ যাত্রা। অনেকদিন পরে কল্পনার দর্শন-প্রাপ্তি।

দ্বিতীয় সর্গ। নন্দনপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবির বাল্যকালের আনন্দনিকেতন। কবি বাল্যকালে চিত্রকর্ম সংগীত এবং প্রকৃতির শোভা লইয়া যেরূপ আনন্দে থাকিত, পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাত্ত্বিকা (সত্ত্বগুণ) কবিকে পথ দেখাইয়া মায়া-মমতার সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজসী (রজোগুণ) কবির মনকে কল্পনার পথে প্রধাবিত করিল। তামসী (তমোগুণ) কবির মনকে বিষাদের হ্রদে ডুবাইয়া দিল। কল্পনার তিন সখী সুরুচি, মাধবী, শরণ্ময়ী। সুরুচি কিনা কাব্যরসাস্বাদনশক্তি— রসজ্ঞতা। মাধবী কিনা বাসন্তী ভাব, মাধুর্যগুণ। শরণ্ময়ী কিনা শারদীয় ভাব— প্রসাদগুণ।

তৃতীয় সর্গ। বিলাসপুর প্রয়াণ। সূচনা। নৌকায় করিয়া বিলাসপুর যাত্রা। সখ্যরস প্রমোদ রাজার সভার মাঝখানে কবিকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জায় ফেলিল। প্রমোদ যখন বাল্যকালে নন্দনপুরে কবির সঙ্গে খেলাধুলা করিত তখন সে নন্দনপুরের প্রমোদ ছিল (অর্থাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপুরের প্রমোদ। তাই তার সংসর্গদোষে কবি লালসানাম্নী আদিরসের প্রাণবল্লভার কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে হারাইল এবং সেই খেদে পাগলের মত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিষাদপুরে গিয়া পড়িল। সভার মাঝখানে প্রমদা হরণ হইল— এ ঘটনাটিও কবির দুঃখানলে আহুতি দিল।

চতুর্থ সর্গ। বিষাদপুরপ্রয়াণ। সূচনা। কবি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিষাদপুরের অন্তঃপাতী বিষাদারণ্যে গিয়া পড়িল। নানাপ্রকার খেয়াল দেখিতে লাগিল। আধিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল। কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হুহু গন্ধর্বের নিকট নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল।

পঞ্চম সর্গ। রসাতলপ্রয়াণ। সূচনা। জাড্যের (অর্থাৎ আলস্যের) ভক্ত অনুচর আধিব্যাধি কবিকে রসাতলপতি ভয়ানক-রসের নিকটে সঁপিয়া দিল। ভয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চামুণ্ডা দেবীর সম্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। ইতিমধ্যে ভৈরব নামক একজন করালমূর্তি কাপালিক (যিনি ভয়ানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক) তিনি হঠাৎ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপনি কবিকে বলি দিবার মানসে শ্মশানে লইয়া গিয়া একটা অশ্বথ গাছের গায়ে বাঁধিয়া রাখিলেন। করুণা দেবী আসিয়া কাপালিকের হস্ত হইতে কবিকে এবং অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রমদাকে উদ্ধার করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ। সমর-প্রয়াণ। সূচনা। বীর আর ভয়ানক এই দুই রসের অধীনস্থ দুই দল সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম। ভয়ানক রসের পরাজয়। দুর্ভিক্ষের সহিত দাক্ষ্যের, মারীর সহিত স্বাস্থ্যের, হিংসার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ভয়ানকের সহিত বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

সপ্তম সর্গ। শান্তি-প্রয়াণ। সূচনা। রণাবসানে হত এবং আহতে সমাকীর্ণ রণক্ষেত্র দেখিয়া কবির বৈরাগ্য উদয়। করুণার প্রসাদে সুসঙ্গ লাভ। শমদমের আশ্রমে গমন। পাশব বৃত্তিসকলের উচ্ছেদ। সাধুসম্মিলন এবং দেবসম্মিলন। শুভপরিণয়। নিদ্রাভঙ্গ এবং স্বপ্নাবসান।

৬

কবি-প্রদত্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্বপ্নপ্রয়াণ-তত্ত্ব উদ্ধার করা যায় কি না দেখা যাক।

স্বপ্নাবিষ্ট কবি কল্পনার সারথ্যে মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নন্দনপুরে উপস্থিত হইলেন। নন্দনপুরকে aesthetic-লোক মনে করিলে ভুল হইবে না। কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে মানুষ প্রথমে aesthetic জগতে আসিয়া পৌঁছায়। এখানে তাহাকে পথ বাছিয়া লইতে হয়। নন্দনপুরকে যে মানুষ চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে সে কলাকৈবল্য বা art for art's sake তত্ত্বকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করে। মনে করিলেই ভ্রান্তি ও দুঃখ। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথভ্রান্তি ও পরীক্ষায়

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্পী : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিল্পী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়িয়াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে ভুল পথ ধরিয়া নন্দনপুরের গা ঘেঁষিয়া যে বিলাসপুর অবস্থিত কবি সেখানে গিয়া পৌছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্য পরিণাম তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছে। বিলাসপুরের অধীশ্বর প্রমোদ। প্রমোদরাজের প্রভাবে "লালসা নাম্নী আদিরসের কুহকে পড়িয়া এবং হাস্যরসের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে" কবি হারাইয়াছেন। এবারে তাঁহার দুঃখের পালা শুরু। কল্পনাকে হারাইয়া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালসা ও হাস্যরসের নষ্টামির ফলে কবি সোজা বিষাদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। "কবি বিষাদপুরের রাজা হাহা হুহু গন্ধর্বের নিকটে নীত হইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমর্পিত হইল।" অবশেষে কবি রসাতলে গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমুহূর্তে তিনি করুণা দেবীর কৃপায় উদ্ধার পাইলেন। পরে সমরপ্রয়াণ। এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম হইয়া ভয়ানক রসের পরাজয় ঘটিল। এবং বীর কর্তৃক কবি শান্তিপুরে নীত হইলেন। শান্তিপুরের নৃপতি আনন্দ। আনন্দ ও সাধুসঙ্গের কল্যাণে কবির সহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর সে মিলন বিবাহবন্ধনে পরিণত হইল। সেই সঙ্গে আরো দুটি বিবাহ হইল।

আনন্দভূপ বলিলেন—

হও এস সংসারধরমে ব্রতী।
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা ললনা
শোভা, কলপনা,
এস মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী।

প্রমদার সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত কল্পনার বিবাহ হইয়া গেল— আনন্দনৃপতি তিনে এক কন্যাকর্তা।

বীরত্ব ও কল্যাণকে কবির বিভূতিদ্বয়রূপে এবং প্রমদা (আনন্দদানশক্তি) ও শোভাকে (সৌন্দর্য) কল্পনার বিভূতিদ্বয়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাহিনীবিন্যাসের খাতিরে তাহাদের স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন। ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজনিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্জ্বলতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনর্মিলন ঘটিল। Aesthetic-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্যে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি সৌন্দর্যরূপিণী ও আনন্দদায়িনী কল্পনাকে পাইয়া চরিতার্থ হইলেন। ইহাই স্বপ্নপ্রয়াণের তত্ত্ব।

নন্দনপুর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনামাত্র; কিন্তু শান্তিপুরে যে কল্পনাকে দেখিলাম তাহার সংজ্ঞা ও সার্থকতা ব্যাপকতর, সে আর কবির আরাধ্য ধন মাত্র নয় যোগী জ্ঞানী সাধু সন্ত মনুষ্য মাত্রেরই ধ্যানের ধন, তাহার অভাবে মনুষ্যজীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দনপুরের কলাকৈবল্য হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আর art for art's sake নয়, এখন art for life's sake-এ দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়নাথ সেন যথার্থ ই বলিয়াছেন—

পরমার্থের সঙ্গে সৌন্দর্যকে গ্রথিত করিয়া হিন্দু কবি কাব্যকে অশেষ এবং অসীমের দিকে প্রসারিত করিয়াছেন।...এক কথায়

কবি সুনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের মত মানবহৃদয়কে বিশ্লেষণ করিয়া মানবজীবনের ক্ষেত্রের জটিলতা এবং উচ্চতার গভীরতা দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্যচর্চার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম করা বা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।[৭]

স্বপ্নপ্রয়াণের কাব্যসৌন্দর্যের চেয়ে তাহার তত্ত্বের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারের দিকে তেমন মন দেওয়া হয় নাই, কেবল প্রিয়নাথ সেনের রচনাটিতে কিছু পরিচয় আছে। দুঃখের কথা এই যে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে সম্ভবতঃ স্বপ্নপ্রয়াণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইত।

৭

নব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যই একমাত্র মহৎ ও দীর্ঘাঙ্গ কাব্য আপন গঠনসৌকর্যের বলে যাহা দণ্ডায়মান। সর্গের সহিত সর্গ গ্রথিত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা যুক্ত হইয়া অভ্রান্ত লক্ষে ও অমন্থর গতিতে তাহা চরম পরিণামের দিকে চলিয়াছে, সুচালিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যব্যূহের সঙ্গে ইহার সার্থক তুলনা চলিতে পারে। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যগুলির আলোচনা করিতে চাই না, যেহেতু দেশে এখনো তাঁহাদের কিছু কিছু গুণগ্রাহী ব্যক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্তর্নিহিত অনিবার্য কোনো নিয়মের দ্বারা তাঁহাদের কাব্যগুলি নিয়ন্ত্রিত নয়— ওসব যেন নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাঁধনটা নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্তুও পাঁচ দোকান ঘুরিয়া সংগৃহীত। স্বপ্নপ্রয়াণের architectonic বা গঠনসৌকর্য অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপ্নপ্রয়াণের কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য একটি সুপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াছে, পথভ্রান্ত হইবার বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্নপ্রয়াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তত্ত্ব— সে নিজেই ছায়াময়, অলক্ষ্যপ্রায় তাহার গতিবিধি তৎসত্ত্বেও কবি যে পথ হারান নাই, শেষ পর্যন্ত যথাকালে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসীম মনীষা ও শিল্পশক্তি প্রকাশ পায়। এই কার্যে তাঁহার সহায় তাঁহার অসামান্য সংযম। যেখানে একটি বিশেষণে চলে সেখানে দুটি তিনি ব্যবহার করেন না, একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দিকেই তাঁহার নজর। অযথা শব্দপ্রয়োগ ও ঘটনাবিস্তার তাঁহার দু চক্ষের বিষ। কাব্যের প্রতিটি সর্গ ছন্দ নৌকার মতো হালকা ও তীব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বর্জিত। অথচ যখন মনে পড়ে যে, লৌকিক ও কিম্ভূত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাঁহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্যকরূপে বুঝিতে পারি পদে পদে কি আত্মসংযম না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এদিকের বিচারে স্বপ্নপ্রয়াণ যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প। অন্য দিকে কল্পনার deification-এ বা দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা রোমান্টিক কাব্যেরও পূর্বসূত্র বটে। শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাংশে রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নপ্রয়াণ যে নূতন কাব্যধারা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল যোগ্য উত্তরপুরুষের অভাবে তাহা অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে এই ধারাকে হয়তো সার্থকতায় পৌছাইয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু সেই যে তিনি শান্তিপ্রয়াণ-অন্তে তত্ত্বপ্রয়াণ করিলেন, নূতন কাব্যপ্রয়াণ আর তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিল না। কল্পনা যতদিন তাঁহার কাছে পরকীয়া ছিল তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন, স্বকীয়া হইবার পরে তিনি আর তাহার প্রতি ফিরিয়া তাকান নাই। কি বিড়ম্বনা!

---

৭ প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৬৩-৬৪

৮

স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের শিল্পকুশলতা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সমালোচকগণ প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও উদাহরণযোগে নিজেদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ দৃষ্টান্ত উদ্ধারের প্রয়োজন ছিল না, 'এলডোরাডো'র পথে সোনা-মানিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে স্বপ্নপ্রয়াণের পথঘাট আকীর্ণ। সে-সব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার আবশ্যক হয় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যসৃষ্টিতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের মুখে কত দূরদূরান্তের স্বপ্নকুসুম ভাসিয়া আসে, যেমন ঐশ্বর্য তেমনি প্রাচুর্য। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের যে-কোনো পত্র ইহার সাক্ষ্য দিবে। সত্য বলিতে কি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস, নব্য বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ বিষয়ে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নয়। এত সৌন্দর্য একখানি কাব্যে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

সৌন্দর্যসৃষ্টির পরেই লক্ষণীয় তাঁহার সাজসজ্জা ও ভাষাব্যবহারকৌশল। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে বাংলা ভাষা ও ইডিয়ম ব্যবহারের নৈপুণ্য এ যুগের পাঠককে বিস্মিত করিয়া দেয়। এক-একবার আচমকা মনে হয়, এই বুঝি যথার্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু হায় 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি।' শ্রীকানাই সামন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেনা যায় না।" চেনা যে যায় না তাহার প্রধান কারণ স্বপ্নপ্রয়াণ-রচনাকালে ভদ্রেতর বাঙালী যে ভাষা বলিত এখন তাহা বলে না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মুখ হইতে মাতৃভাষা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার বদলে যাহা পাইয়াছি তাহা হয়তো অধিকতর ঐশ্বর্যময়, কিন্তু অকৃত্রিম বাংলা যে নয় সে কথা সুনিশ্চিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এ অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনো ওপথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা জানি না, কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে।

কিন্তু কৃষ্ণকমলের মতো বিশেষজ্ঞও যে বিরল, কাজেই সে ভাষা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই ভাষান্তর, ভাবা-ভাগীরথীর ভিন্ন পথ গ্রহণ, দুচার কথায় সারিবার মতো নয়। বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের জনপ্রিয়তার অভাবের অন্যতম কারণ, ইহার ভাষার এই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হওয়া উচিত নয়। একটু আয়াস স্বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমাণিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন। এ যুগে বাংলাদেশে যে-কয়জন ক্ষুরধারমেধাবিশিষ্ট মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, logical mind-এর চূড়ান্ত বিকাশ যাহাদের মধ্যে হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই মুষ্টিমেয়দের অন্যতম। এ হেন ব্যক্তির হাতে স্বপ্ন ও তত্ত্বের টানাপোড়েনে রচিত এই বিচিত্র কাব্য বাংলা সাহিত্যে সত্যই এক বিস্ময়ের বস্তু। মেঘনাদবধ কাব্যের মতোই ইহা প্রকৃত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্য বঞ্চিত। কিন্তু ইহাদের অমরত্বের জন্য উত্তরপুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষের অভাব নাই, সেই সব অপদার্থ সৃষ্টি না হইলে মেঘনাদবধ কাব্যের নিঃসঙ্গ মহিমা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্নপ্রয়াণের অকৃতার্থ উত্তরপুরুষেরও অভাব— সমস্ত কৃতার্থতা নিজের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিস্ময় আপনাতে আপনি অটল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

বাংলার শাক্তধর্ম

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশ শক্তিধর্মের দেশ এ কথা আমাদের মধ্যে বহুভাবে প্রচলিত। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর নানা দেশে মাতৃপূজা বহুভাবে প্রচলিত ছিল— ঠিক মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে না পারিলেও বিভিন্ন মাতৃদেবীর সন্ধান বহু দেশ হইতেই লাভ করিতে পারি। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মাতৃপূজা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যেরূপ একটা জীবন্ত ধর্মরূপে প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই মাতৃপূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি শক্তিবাদ ভারতবর্ষের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এমন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, এমন আর অন্যত্র দেখিতে পাই না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে আবার শক্তিধর্মের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি বাংলাদেশে। শক্তিধর্মের দর্শন, সাধন-প্রণালী এবং আনুষ্ঠানিক বিধিবিধানের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে যে গ্রন্থগুলিতে সেই তন্ত্রশাস্ত্র বহুলাংশে বাংলাদেশে রচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় দেশ-সমূহেই শাক্তধর্মান্তর্গত গুহ্যসাধন-ব্যবস্থা খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিত ছিল— এ কথা মনে করিবার মতন তথ্য ও যুক্তি প্রচুর রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাক্ত তীর্থ এবং শক্তিমন্দির এখানে সেখানে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; কিন্তু বাংলাদেশে তাহার সন্ধান মিলে সর্বত্র। এ কথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় যে সকল প্রসিদ্ধ শক্তিসাধকের আবির্ভাব বাংলাদেশে ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্যত্র শক্তিপূজা প্রচলিত থাকিলেও এবং তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত থাকিলেও এরূপ সাধকবর্গের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। বাংলার সমাজ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও এই শাক্তধর্মের দ্বারা যেভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে অন্যত্র তাহাও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই সকল কারণে বাংলাদেশকে শক্তিধর্মের দেশ বলিয়া অভিহিত করিবার একটা বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের কতগুলি তথ্য ও সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশকে আজ আমরা যেমন করিয়া শাক্তধর্মের দেশ বলিয়া জানি, হাজার বৎসর পূর্বেকার বাংলাদেশও ঠিক এমন ভাবে শাক্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমরা বলিতে পারি না। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে সেন-রাজত্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে আমাদের যে ধর্মের ইতিহাস তাহার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি আমরা বিশেষ ভাবে দুইটি দিক্ হইতে— প্রথমতঃ কতকগুলি দানলিপি এবং প্রশস্তিলিপি হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের মূর্তিশিল্প হইতে। এই উভয় মূল হইতে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি তাহাতে গুপ্ত পাল সেন সাম্রাজ্যে বাংলাদেশে শাক্তধর্মের কোনো প্রাধান্যের কথা মনে করিতে পারি না। বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবীমূর্তি প্রাপ্ত হইলেও শাক্তধর্মকে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে একটি গৌণ ধর্ম বলিয়াই মনে হয়। বাংলাদেশে দেবীপূজার কাহিনী ও বিধিবিধান-সংবলিত যে কয়েকখানি পুরাণ-নামধেয় উপপুরাণ পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; কিন্তু মোটামুটিভাবে

এগুলিকে দ্বাদশ শতক হইতে বেশি প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না, কতগুলি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লেখাও হইতে পারে।

এই সকল পুরাণ উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া আমরা যে বাংলাদেশে একটা বিশেষ মাতৃ-পূজাবিধি গড়িয়া উঠিতে দেখি, তাহা কোনো একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচয় বহন করে না। সংবৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই সকল পূজা বিধেয়। শক্তিপূজা নিত্যপূজারূপে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল এমন কথা বলিবার মতন আমাদের যথেষ্ট তথ্য নাই। আমাদের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা যে-সকল দেবীগণের আবির্ভাব এবং পূজাপ্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রসারের ইতিহাস লক্ষ্য করি সেই সকল দেবীগণ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিভূত্ব লইয়াই আসিয়া আবির্ভূতা হন নাই; তাঁহারা স্থানীয় দেবী— অনেকাংশে চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও। প্রতিকূল বিদেশী রাজশক্তির নিষ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন বিপর্যস্ত তখন সমাজদেহের নিম্নভাগ হইতে ইঁহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই ইতিহাস আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে। যে ভক্তগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় দেবীগণের এই 'আপ্রাণ' আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠী স্বভাবতঃই চেষ্টা করিয়াছেন সমাজের উপরতলায় নবাগতা এই দেবীগণকে প্রাচীন মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া ক্রমে তাঁহার সহিত অভিন্ন করিয়া তুলিতে।

প্রাচীন মহাদেবীকে আমরা বাংলার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তিতরূপে বেশি করিয়া পাইয়াছি আমাদের শাক্তপদাবলীর মধ্যে। সাধক রামপ্রসাদ হইতেই এই পদাবলীর উদ্ভব— অষ্টাদশ, উনবিংশ, এমন কি আমাদের বিংশ শতকে দেখিতে পাইতেছি সেই শাক্তপদাবলীর বিচিত্র প্রসার। পদাবলীসাহিত্য-রূপে বাংলার এই শাক্তপদাবলী একটি নিগূঢ় প্রবণতার দিক্ হইতে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর সমগোত্রীয়; তাহা হইল মৌলিক মাধুর্যপ্রবণতা। সর্বৈশ্বর্যশালী সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণকে আমরা যেমন ঘরের বালগোপাল করিয়া স্নেহের পুত্তলি করিয়া লইয়াছি আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীতে, তেমনই সর্বৈশ্বর্যময়ী মূলশক্তিরূপিণীকে বাঙালীর ভাঙা কুটিরের মধ্যে স্নেহের পুত্তলি কুমারী উমা রূপে লাভ করিয়া মধুররসে তাহার গৌরী তনুকে আরও উজ্জ্বল করিয়া লইয়াছে। আর যেখানে মা কুমারী উমা নন— গলিতচিকুরা, আসবমত্তা, রুধিরার্দ্র-রসনা রণোন্মাদিনী, সেখানেও দেখি—

> ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
> বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে,
> ধরি করতলে, গজগরাসে॥
> কে রে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
> কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
> কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্রভালে প্রকাশে॥

পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভয়ংকরী মায়ের বীভৎস রূপকেও মধুর কারিয়া দেখিবার ভক্তের কি আকুতি!

এই শাক্তপদাবলী বা গানগুলির প্রসঙ্গে আমরা প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে পারি, ইহারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিধর্মের একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তার সূচনা করিতেছে। ধর্মের বিষয়বস্তু যখন লোক-

সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া ওঠে তখন বোঝা যায়, ধর্ম সেখানে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় মানসে একটি প্রেরণারূপে দেখা দিয়াছে। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সপ্তদশ শতাব্দী হইতে শক্তিধর্ম এইরূপে আমাদের জাতীয় মানসে একটি গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাংলার কোনো কোনো মনীষী বলিয়াছেন, বাঙালী যেমন মাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে এমন আর অপর কেহ পারে নাই। এই কথা আমরা আমাদের কোন্ 'মা'-ডাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি? বাংলাদেশে রচিত তন্ত্রপুরাণাদিতে আমরা যে মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছি, তাহা বাংলাদেশে তান্ত্রিকতা-প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করিতে পারে, কিন্তু কোনো একক বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে না; কারণ পরিমাণে কম হইলেও, অনুরূপ শাক্ততন্ত্র এবং শক্তিকে অবলম্বনে রচিত পুরাণ-উপপুরাণ ভারতবর্ষের অন্য কোথাও রচিত হয় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাংলাদেশের আগমনী-বিজয়া সংগীত এবং অন্যান্য অজস্র শাক্তগানের ন্যায় গান অন্যত্র কোথাও রচিত হয় নাই এ কথা বলিতে পারি। সুতরাং এই গানগুলির পশ্চাতে যে একটা জাতীয় ধর্মচেতনা স্বীকার করিতে হয়, সেই ধর্মচেতনা একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই দাবি করিতে পারে। এই-জাতীয় একটা ধর্মচেতনা কোনো জাতির মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ যুগে একান্ত আকস্মিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না; সুতরাং মানিতে হইবে, সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ইহার একটা প্রস্তুতি ছিল। আমার বিশ্বাস, শাক্তধর্মের যে উপাদান বাংলাদেশে নানাভাবে ছড়াইয়া ছিল— গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতেই আমরা যাহার ইতস্ততঃ উল্লেখ ও পরিচয় পাই, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাহা একটা নব আবেগে নবরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন হইতে সেই আবেগকে আমরা ক্রমবর্ধমানরূপেই লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া নয়, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উপরেও ইহা গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানটিকে তাহারই প্রতীকরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুধু 'বন্দে মাতরম্' গানটি নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যত স্বদেশী সংগীত রচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বাংলার শক্তিরূপিণী মহাদেবীর জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিবিধ যোগও এই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়া তোলে। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় পাশ্চাত্যশিক্ষিত নাট্যকারও যখন গান রচনা করেন— 'চল, সমরে দিব জীবন ঢালি;— জয় মা ভারত, জয় মা কালী॥'— তখন সে তথ্যটিকে আমাদের আর উপেক্ষা করা চলে না। বিংশ শতাব্দীতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থচেতনা আমাদের ধর্মচেতনাকে যতই বহিষ্কৃত বা তিরস্কৃত করিবার চেষ্টা করুক, আমাদের সংস্কৃতির উপরে শক্তিধর্মের প্রভাব এখনও লক্ষণীয়।

সপ্তদশ শতক হইতে আমরা বাংলাদেশে যে শক্তিধর্মের নববেগ ও নবরূপতার কথা ইঙ্গিত করিলাম তাহার ভিতরে আরও একটি লক্ষণীয় সত্য নিহিত আছে। সাধনার ক্ষেত্রে বাংলার এই শক্তিধর্মের মুখ্য আশ্রয় দুর্গা নহেন, কালী। বাঙালীর সমাজ-জীবনের বর্ণনা করিতে গিয়াই আমরা যখনই সাড়ম্বরে 'দোল-দুর্গোৎসবে'র কথা উল্লেখ করি তখনই বোঝা যায়, দুর্গাপূজা বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ হইতে উৎসবের অঙ্গরূপেই অধিক ক্রিয়াশীল। অথচ ভারতবর্ষের শক্তি মহাদেবী বলিতে আমরা সাধারণতঃ দুর্গাকেই বুঝিয়া থাকি। এ কথা মোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শক্তিধর্মের ক্ষেত্রে কালীর আবির্ভাব আনুপাতিক পরবর্তী কালে। এই কালী দেবী বা কালিকা দেবী বাংলাদেশে কি করিয়া আস্তে আস্তে মহাদেবীর স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন এ কথা বেশ কৌতূহলজনক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করিলে

বেশ বোঝা যায়, যে-যুগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন করালবদনা কালী দেবী এবং চামুণ্ডা দেবী অভিন্নতা লাভ করিতেছিলেন ; তখন পর্যন্তও তাঁহারা সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে স্বগৃহীতা নন। চণ্ডমুণ্ড দৈত্যদ্বয়ের বধপ্রসঙ্গে এই চামুণ্ডারূপিণী কালী দেবীকে মহাদেবী চণ্ডী হইতে জাতা বলিয়া মহাদেবী চণ্ডীর সহিত যুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছে। দশম শতক হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলাদেশে বা পূর্বাঞ্চলে যে-সকল পুরাণ-উপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আমরা নানাভাবে দুর্গা ও কালীকে মিশ্রিতভাবে এক করিয়া লইবার 'প্রাণপণ' চেষ্টা লক্ষ্য করিতে পারি। দেবীপুরাণের বহু স্থলে মহাদেবীর বর্ণনায় কৈলাসবাসিনী পার্বতী এবং শ্মশানবাসিনী কালীর মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে পারি। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী দেবী যখন দক্ষালয়ে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বর্ণনা হইল—

> সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
> চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্॥
> বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সর্বগুণান্বিতাম্।
> আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্॥

তারপরে সতীদেহত্যাগের পরে হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে দেবী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে তিনি গৌরী হইয়া দেখা দিলেন না ; নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামা সেই কন্যাকে দেখিয়া মেনকা পরম হর্ষান্বিতা হইয়া উঠিলেন। কন্যার এই গাঢ় শ্যামবর্ণ দেখিয়া পিতা হিমবান্ যথাসময়ে কন্যার নাম রাখিলেন কালী— এবং কালী নামেই সেই কন্যা প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

> কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে॥
> বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না সা পার্বতীতি চ।
> কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী॥

মহাদেবের সহিত বিবাহ হইবার পরে এই কালী কি করিয়া গৌরী হইলেন এই বিষয়েও একটি অদ্ভুত উপাখ্যান দেখিতে পাই। একদিন পার্বত্যবনপ্রদেশে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখেই শিব ব্যঙ্গ করিয়া দেবীকে 'কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন। দেবী কালী তাহাতে নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়া মর্মাহতা হইলেন এবং সেই হইতে সংকল্প গ্রহণ করেন যে, যে-পর্যন্ত দেহে স্বর্ণগৌরতা লাভ না করেন সে-পর্যন্ত আর শিবের সহিত মিলিত হইবেন না। তাহার পরে কালী দীর্ঘদিন হিমালয়ের এক নির্জন প্রান্তে গিয়া কঠোর তপস্যা করেন— সেই তপস্যার দ্বারা তিনি গৌর অঙ্গ লাভ করিয়া গৌরী হইয়া উঠিলেন। এই গৌরীরূপে তিনি শিবের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে মিলিয়া অর্ধনারীশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিলেন। এই সকল কিংবদন্তী এবং উপাখ্যান বাংলাদেশে শক্তিসাধনার কেন্দ্রে কালীর ক্রমপ্রাধান্যলাভের ইতিহাসেরই তথ্য সরবরাহ করে। ইহার সহিতই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে বাংলাদেশে যাঁহারা শক্তিসাধক, কালী তারা প্রভৃতিই তাঁহাদের মুখ্য আশ্রয়।

তন্ত্র-পুরাণ-উপপুরাণ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া এই যে শক্তিসাধনা ও মাতৃপূজা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তাহার এমন প্রাধান্য এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীলগণের মন অধিকার করিয়াছে। এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের মধ্যে এখন প্রায় চালু হইয়া গিয়াছে— সে উত্তর

হইল, বাংলাদেশের জনসমাজে অনেক প্রাচীনকাল হইতে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে, মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক বা আর্যসংস্কৃতিজাত নহে, ভারতবর্ষের আর্যেতর আদিম জাতিগণের মধ্য হইতে এই মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং আর্যগণের তত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ সম্বন্ধে আবার একটা সমাজতাত্ত্বিক সাধারণ ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে এই আর্যেতর আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক। বৈদিক আর্যগণ সমাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার প্রাধান্য; আবার আর্যেতর সমাজের এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্যের জন্য তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং মাতৃ-উপাসনার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক এই তথ্যটিকে আমরা অতি সহজেই এতদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এই জন্য যে, এই তথ্যটির মধ্যে একটি গূঢ়ার্থ নিহিত আছে। মানুষের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিলে আমরা বহু স্থলে দেখিতে পাই, নানা ব্যাবহারিক কারণে আমাদের সামাজিক জীবনে যে জিনিসটি একটি বহুমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অর্জন করিয়া বসে। দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মানুষ্ঠানে রূপান্তর। প্রাচীন বৈদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা সত্য যে তাঁহাদের সমাজজীবনে অগ্নির প্রয়োজন অতিশয় ছিল, অগ্নি-প্রজ্বালন এবং প্রজ্বালিত অগ্নির সংরক্ষণও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অগ্নির এই বহুপ্রয়োজন এবং তৎ-হেতু বহুমূল্যই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৈদিক সমাজে অগ্নিকে একটি ধর্মমূল্য দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত অগ্নি এবং অগ্নিপ্রজ্বালনবিধি ও অগ্নিসংরক্ষণব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া বৈদিক যজ্ঞধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল— তাহার পরে ধর্মানুষ্ঠানরূপে তাহার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরে নানা সূক্ষ্মগভীর অর্থ সংযোজিত এবং উদ্‌ভাবিত হইতে লাগিল। আদিম আর্যেতর সমাজগুলির মধ্যে 'মা' কতগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিল। সামাজিক দিক্‌ হইতে আমরা দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল— ফলে সন্তানের পিতৃপরিচয় অত্যন্ত অনিশ্চিত মাতৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়— এবং এই কারণেই মা পরিবারের তথা সমাজের কেন্দ্রীয় বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন, আর্যেতর এই জাতিগুলির আর্থিক জীবন নির্ভরশীল ছিল মুখ্যভাবে কৃষির উপরে। এই কৃষিকর্মে বীজবপন হইতে ফসলকাটা এবং গৃহে শস্যসংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রণী— তাহার ফলে আর্থিক জীবনেও মায়ের প্রাধান্য অনুভূত হইত। এইভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজজীবনে যে বৃহৎ মূল্য লাভ করিলেন তাহাই এই সমাজের মধ্যে ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার একটা চিত্তপ্রবণতা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল।

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশ মুখ্যভাবে আর্য-অধ্যুষিত দেশ নহে; এ দেশের সমাজদেহে আর্যরক্তের মিশ্রণ অধিক নহে— এবং এই কারণেই হয়ত এদেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যপ্রভাব সর্বাতিশয়ী রূপে দেখা দেয় নাই। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটির জনগণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু আর্যপ্রভাব দেখা দিয়াছে; তাহাকেও আমরা বিশুদ্ধ বৈদিক আর্যপ্রভাব বলিতে পারি না— একটা সমন্বয়জাত মিশ্র হিন্দুপ্রভাব। এই হিন্দুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিয়াছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব।

পাল-রাজত্বে এই বৌদ্ধপ্রভাবই প্রাধান্য লাভ করিল— সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু পুনরুত্থানের আভাস। এ পর্যন্ত শক্তিধর্ম এবং মাতৃপূজার চিহ্ন গৌণরূপে এখানে-সেখানে প্রকট— মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল ,তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজদেহের অন্যান্য স্তর হইতে এই মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল— এবং তাহার ফলেই হয়ত বাংলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনার এত প্রসার।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, উপরিউক্ত মতটি সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। প্রথমতঃ, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনা সম্পূর্ণরূপে অবৈদিক বা অনার্য এ কথা বলিবার যৌক্তিকতা দেখিতে পাইতেছি না। প্রাচীনতম বৈদিক সূক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাইলেও যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদিতে বিভিন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাইতেছি। তাহা ছাড়া আরো একটি সংস্কার সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। যাহা কিছু অবৈদিক তাহাই যে অনার্য এমন কথা মনে করিবারও আমাদের কোনো কারণ নাই। ইহা ছাড়া পূর্বালোচিত মতটি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি হইল এই যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যদি ধর্মের ক্ষেত্রে মাতৃপূজার প্রচলন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আরো বহু স্থানে এই-জাতীয় মাতৃপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল ; কারণ এই-জাতীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।

সামাজিক মাতৃতান্ত্রিকতা এবং মাতৃপূজার প্রচলন বিষয়ে আধুনিক কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ্ যে-সকল নূতন তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীনকালে মাতৃদেবী ও তাঁহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসের বৃহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্টের ইস্থার, ইসিস্ প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্বতবাসিনী) দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় এই সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহু প্রাচীন নারীমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া কোন্ সময়ে এই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে আদিম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল— এ বিষয়েও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ একটা মোটামুটি অনুমান করিয়া লইয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভূমধ্যসাগরীয় এই সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই আনুমানিক সময়কার আরও কিছু কিছু মূল্যবান্ তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তথ্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতগুলি কবর। এই কবর খননের দ্বারা তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া পাশাপাশি শায়িত কতগুলি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। কঙ্কালগুলি পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দুইটি কঙ্কালের একটি কঙ্কাল পুরুষের, একটি কঙ্কাল নারীর ; আরো পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাশাপাশি শায়িত যে কঙ্কাল রহিয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষটির বয়স নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, কবরে পাশাপাশি শায়িত এই কঙ্কালদ্বয় স্বামি-স্ত্রীর কঙ্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তৎকালে ঐ অঞ্চলে হয়ত সহমরণজাতীয় কোনো প্রথা প্রচলিত ছিল। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠতা তৎকালীন সমাজ-জীবনে মাতৃতান্ত্রিকতা হইতে পিতৃতান্ত্রিকতার দিকেই অধিকতর ইঙ্গিত দান করে। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী

অঞ্চলে যখন মাতৃপূজার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক মাতৃতান্ত্রিকতার প্রচলন ছিল না। অবশ্য নৃতত্ত্ববিদ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিবার মতো বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা লাভ করে নাই, কিন্তু তথাপি এই সকল তথ্য এবং যুক্তিকে আমরা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারি না।[১]

আমি আমার পূর্বালোচনায় এ কথা বলিয়া আসিয়াছি যে, মাতৃপূজা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাংলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা বাংলাদেশে একটা নবরূপতা লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাংলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। আমার ধারণা, বাংলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটি ভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। বাংলাদেশের এই হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া যে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ মনে হয় না। সংস্কারবর্জিতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলি বড় কথা নয়— বড় হইল দেহকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতগুলি গুহ্য সাধন-পদ্ধতি। এই সাধনপদ্ধতিগুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞা-উপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।

অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে এই একটি তান্ত্রিক ধারা-প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষয়ে আমার একটি ধারণা আছে— তাহা স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও সুধীগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি। আজকাল আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে তন্ত্রশাস্ত্র এবং তন্ত্রসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সন্ধান পাইতেছি বটে, কিন্তু তথাপি আমার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাংলাদেশ— হিমালয়-পর্বতসংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধ হয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয়সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তন্ত্রবর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীও আমাদের অনুমানেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত; বঙ্গ-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনাস্থান— নেপাল-ভূটান-তিব্বত অঞ্চলে এগুলির

১ এ বিষয়ে Gordon Childe-এর *Social Evolution* গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীতও পার্শ্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি। তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষট্‌চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিম্নতম মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্‌চক্র। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন— নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে হইলেন ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, 'ডাক' কথাটি তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। আমাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র ডাকের বচন কথার মূল অর্থ বোধ হয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধ হয় ছিল 'গুহ্যজ্ঞানসম্পন্না'; আমাদের বাংলা 'ডাইনী' কথার মধ্যে তাহার রেশ আছে; মধ্যযুগের নাথসাহিত্যের রাজা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী 'মহাজ্ঞান'সম্পন্না এই-জাতীয় 'ডাইনী' ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই 'ডাকিনী' দেবী কোনো নিগূঢ়জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' নামে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভূটানে 'লাকিনী' ও 'হাকিনী' দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে তিব্বত-নেপাল-ভূটান অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীরাই কি তন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে আপন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন?

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের অতিশয় প্রাধান্য। এই মন্ত্রতত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না করিয়াও কতগুলি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্ত্রের মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমরা বীজমন্ত্রের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বীজমন্ত্রগুলি সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্ত্র সমূহের মধ্যে প্রণব বা 'ওঁ' সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। হ্রীং ক্লীং ঐঁ হৈঁ ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কি না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। এই বীজমন্ত্র ব্যতীত তন্ত্রের মধ্যে আমরা আর-এক রকমের মন্ত্রমালা পাই, এই মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক— ইহাদের কোনো অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এই অর্থহীনতাই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য। অবশ্য অর্থহীন মন্ত্র অথর্বাদি বেদের মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্ত্রে যে একাক্ষরী বীজমন্ত্রের এবং দ্ব্যক্ষরী মন্ত্রমালার বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত ভ্রমাত্মক হইবে যে, এগুলি আমাদের পূর্বোক্ত তান্ত্রিক অঞ্চলের কোনো প্রাচীনকালে প্রচলিত ভাষার লুপ্তাবশেষ? আমরা সাধারণ ভাবে যাহাকে চীনাঞ্চল বা মহাচীনাঞ্চল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষরিত্ব বা দ্ব্যক্ষরিত্বের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান

ইয়ং বেঙ্গলের যুগ

বিনয় ঘোষ

বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহীরা যখন মানিকতলার বাগানবাড়িতে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে নানারকম সমস্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন বাইরের জনসমাজে তাই নিয়ে মৃদুগুঞ্জন হলেও, ঠিক কলরবের সৃষ্টি হয় নি। বিদ্বৎ-সভার নিরিবিলি পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের তরুণদের বাক্‌যুদ্ধ অব্যাহত ধারায় চলছিল। এমন সময় বাইরের নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে হঠাৎ যেন আন্দোলনের জোয়ার এল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল ক্রমে। বেন্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা আইনবিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণা করলেন (১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর)। বিধর্মীর বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিপক্ষরা মাসখানেকের মধ্যে "ধর্মসভা" নামে এক সভা গঠন করলেন (১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০)। মাস ছয়েকের মধ্যে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় পৌছলেন (২৭ মে ১৮৩০)। উদ্দেশ্য, খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পথ পরিষ্কার করা। কলকাতায় পৌছেই তিনি মিশনারিসুলভ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ডাফ সাহেব কলকাতায় পৌছবার ছ মাস পরে রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করলেন (১৯ নভেম্বর, ১৮৩০)। তার প্রায় একমাসের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরু ডিরোজিওর অকালমৃত্যু হল (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। নবযুগের পথিকৃৎ রামমোহন ও বিদ্রোহী তরুণদের মন্ত্রদাতা ডিরোজিও, বাংলার সমাজ-জীবনের এমনই এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করার সমস্ত দায়িত্ব পড়ল নবীনদের উপর। নবীনরা সেই গুরুদায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। সংগ্রাম ও প্রস্তুতি একসঙ্গেই চলতে লাগল। এই প্রস্তুতির পর্বে বাংলাদেশে সভাসমিতির বিকাশ হল অনেক। তার মধ্যে বিদ্বৎ-সভাই বেশি।

ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ ডিসেম্বর) রামমোহনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার নবযুগের ইতিহাসের একটি পর্বান্ত হল বলা যায়। প্রবাসে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁর বিরাট পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের কোনো প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যায়, যার প্রভাব বাংলার সমাজ-জীবনে গভীর ও দূরপ্রসারী। বিলাতে থাকলেও, রামমোহন বাংলার এই সামাজিক আলোড়ন দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন নিশ্চয়। ফিরে এসে তিনি এই আন্দোলনকে কোনো সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারতেন কি না, তা নিয়ে আজ গবেষণা করে লাভ নেই। সম্পূর্ণ না পারলেও, তার অসংযম ও আতিশয্যের দিকটাকে হয়ত তিনি প্রকৃতিস্থ করতে সাহায্য করতে পারতেন। ঘটনা-চক্রান্তে তা যখন সম্ভব হল না, তখন ইতিহাস তার নিজের পথই খুঁজে নিল। সে-পথ আবর্তসংকুল পথ।

ক্রমায়াত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের সমাজপ্রাঙ্গণ কলরবমুখর হয়ে উঠল। ইতিহাসের এক নতুন কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজে যা শোনা যায় না কখনো। বদ্ধ ডোবার পাড়ে তরঙ্গ প্রতিহত হয় না। সমাজের মধ্যে যখন প্রবল স্রোত বইতে থাকে, তখন তার তরঙ্গের আঘাতে তীরে ভাঙন ধরে। সমস্যার

পর সমস্যা, সুপ্ত লোকচেতনাকে জাগিয়ে তোলে। জাগ্রত চেতনার বিস্ময়ের সাময়িক ঘোর যখন কেটে যায়, তখন সমস্যার মুখোমুখি সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। সকলে এক দিকে বা এক ভঙ্গীতে দাঁড়ায় না। কেউ দাঁড়ায় সামনে, কেউ পিছনে, কেউ পাশে। নানা মত ও নানা পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে যায় সমাজ। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ নির্মাণ করে এগিয়ে চলে মানুষ। সমাজ-জীবনের নির্জন নিস্তব্ধ অঙ্গন এই ধরনের ঐতিহাসিক সংঘাতকালে রণাঙ্গনে পরিণত হয়। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, আলোড়ন-আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন প্রাণচাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে (১৮২৫-৫০) বাংলার সমাজ-জীবনে এই সব বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল যথেষ্ট। রামমোহন ও ডিরোজিওর অভাবে নবীনরা প্রায় অভিভাবকহীন অবস্থায় আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রাচীনদের দলে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক শক্তিও খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে, নবীনরা সব দিক দিয়েই খুব দুর্বল ছিলেন। তার উপর তাঁদের কোনো প্রবীণ পরিচালক বা পরামর্শদাতা কেউ ছিলেন না। সুতরাং একত্রে দল বেঁধে মিলেমিশে, সভাসমিতি গঠন ক'রে, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো 'যুগ' হিসেবে আখ্যা দিতে হলে এই সময়টাকে "ইয়ং বেঙ্গলের যুগ" বলতে হয়। এই যুগের সভাসমিতির সংখ্যা নয় শুধু, বৈচিত্র্যও উল্লেখযোগ্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, সভা-গঠনের উদ্দেশ্যের ঐক্য। স্বাধীন চিন্তা, অবাধ আলোচনা ও মেলামেশার আদর্শ নিয়েই সব সভা-সমিতি গড়ে উঠেছিল।

ঘটনাক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে, কিভাবে তার ঘাতপ্রতিঘাতে বাইরের সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হল এবং সেই বিক্ষোভের ফলে বিভিন্ন সভাসমিতির বিকাশ হল, তা পরিষ্কার বোঝা যাবে না। ১৮২৯ সালের শেষে বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ বন্ধ করে দিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করলেন। তাঁদের প্রতিবাদের নিনাদে কলকাতা শহর কেঁপে উঠল। ইয়ং বেঙ্গল দল বিদ্রূপ ক'রে ধর্মসভার নাম দিলেন "গুড়ুম সভা"। আইন বাতিল করবার জন্য তাঁরা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি পাঠাবেন, স্থির করলেন। বিস্ময়কর হল, যে-ব্যক্তি তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তিনি গোপীমোহন দেব বা ভবানীচরণের দেশের লোক নন, বেন্টিঙ্কের দেশের লোক। তাঁর নাম মিঃ বেথী। এই বেথী সাহেব "আলেকজাণ্ডার" নামে এক জাহাজে করে বিলাতযাত্রা করেন, ধর্মসভার প্রতিনিধিরূপে সেখানে বেন্টিঙ্কের আইনের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য। কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি নদীপথেই জাহাজটি ডুবে যায় এবং বেথীও মারা যান। অন্যান্য নাবিকরা নাকি বলাবলি করে যে, জীবন্ত নারীকে দগ্ধ করে হত্যা করার কুনীতির সমর্থক বেথী সাহেবের মতন একজন পাপিষ্ঠ নরাধম জাহাজে থাকার জন্যই জাহাজটি ডুবে যায়।[১] যাই হোক, সতীদাহ-নিবারণ আইনের বাদপ্রতিবাদের সুযোগ নিয়ে সনাতনধর্মপন্থীরা হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষার ফলাফলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের সমস্ত পুঞ্জীভূত আক্রোশ হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উপর বর্ষিত হতে থাকল। বারো-তেরো বছর হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় শিক্ষিত নতুন একটি বিদ্বৎ-সমাজের (Intelligentsia) বিকাশ হয়েছে কলকাতা শহরে,

যার সঙ্গে সেকালের পণ্ডিতসমাজের পার্থক্য অনেক। তার সব ফলাফলটুকুই যে ভালো হয়েছে, তা নয়। তা হয়ও না কখনো। নতুন কোনো নীতি বা জীবনাদর্শ যখন বাইরে থেকে সমাজের মধ্যে আমদানি হয়, তখন প্রথম দিকে সেটা অনেকটা বিস্ফোরকের কাজ করে। কিছুদিন পরে তার প্রাথমিক উত্তাপ-উত্তেজনা যখন কমে যায়, তখন আবার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে। ১৮৩০ সালে উত্তাপ-উত্তেজনার মাত্রাই বেশি ছিল। সুতরাং অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি ছিল না, তা নয়। ধর্মসভাপন্থীরা সেই সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন। ডিরোজিওর মতন শিক্ষকের শিক্ষা ও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতন বিতর্কসভার অবাধ আলাপ-আলোচনার ফলেই যে সমাজের নৈতিক বনিয়াদ ভেঙে যাচ্ছে, এ অভিযোগ প্রাচীনপন্থীরা উচ্চৈঃস্বরে করতে লাগলেন।

প্রাচীন ও নবীনের এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের উদ্‌যোগপর্বে ডাফ সাহেব এসে পৌঁছলেন কলকাতা শহরে। লালবিহারী দে লিখেছেন: "When Duff arrived in Calcutta, the evil effects of a purely secular education was beginning to manifest themselves." তিনি দেখলেন, কলকাতা শহরের নবীন শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা মানসিক বিপ্লব ঘটে গেছে। তাদের মতামত অত্যন্ত উগ্র, তাদের পথও বিচিত্র। এই নবীনদের দিকে চেয়ে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, ডাফ সাহেবের যেমন আনন্দ হল, তেমনি ভয় হল:

"He witnessed the revolution which the minds of the intelligent youth of the city were undergoing: the wildness of their views; the reckless innovations they were introducing; the infidel character of their religious opinions; and the spirit of unbounded liberty, or rather, licentiousness, which characterised their speculations. He contemplated this scene with mingled feelings of joy and fear."[২]

ডাফ সাহেবের এই আনন্দের কারণ কি? ভয়েরই বা কারণ কি? আনন্দের কারণ হল, তিনি এসে এদেশে এমন একদল যুবককে (ইয়ং বেঙ্গল) দেখতে পেলেন, যারা যে-কোনো বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, অবাধে আলাপ-আলোচনা করতে শিখেছে। ভয়ের কারণ হল, তারা যে শিক্ষা পাচ্ছে, তার মধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই। এসব কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন।[৩] অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়ে এই নবীন যুবকের দল তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করলেও, ধর্মের প্রতি তাদের বিরাগ দেখে তিনি শঙ্কিত হলেন। কোনো ধর্মের প্রতি যাদের অনুরাগ নেই, এমন কি অনুসন্ধিৎসা পর্যন্ত নেই, তাদের কাছে তো খ্রীস্টধর্মের কথাও বলা যাবে না। এই হল ডাফ সাহেবের ভয়ের কারণ।

রামমোহন রায় তখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছেচেন। ডাফ সাহেব যখন কলকাতায় এলেন, তখন তিনি আশা-নিরাশার মেঘরৌদ্রের মধ্যে তাঁর জীবন-অপরাহ্নের দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি তখন কলকাতার বাঙালীসমাজের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাই ডাফ সাহেব যখন তাঁর পরিচয়পত্র জেনারেল বীটসনের কাছে পেশ করেন, তখন তিনি বলেন—"You must at once visit the Raja and I will drive you out on an early evening." ডাফের চরিতকার জর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গে দুঃখ ক'রে বলেছেন রামমোহন সম্বন্ধে—"justice has never been done to this Hindoo reformer, the

Erasmus of India." কথাটা মিথ্যা নয়। স্মিথের দুঃখ হল, শ্রীরামপুরের পাদ্রিরা তাঁর সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম নিয়ে অনর্থক তর্ক ক'রে তাঁকে বিরক্ত করেছিলেন। তাই তিনি আফ্‌শোষ করে বলেছেন: "If Rammohan Roy had found Christ, what a revolution there would have been in Bengal."[৪] ডাফ সাহেব অবশ্য সেরকম ভুল করেন নি। তিনি যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা তাঁকে বলেন, তখন রামমোহনই তাঁকে নিজের ঘোড়ার গাড়ি ক'রে চিৎপুর রোডে নিয়ে যান, ফিরিঙ্গী কমল বসুর সেই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে। বাইরের যে ঘর দুখানিতে ব্রাহ্মসভার অধিবেশন হত, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই ঘরই তিনি মাসিক ৫৪-৫৫ টাকা ভাড়ায় ডাফ সাহেবকে ব্যবস্থা করে দেন। ডাফ সাহেব সেখানে ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে (কলকাতায় আসার দু মাসের মধ্যে) "জেনারেল অ্যাসেম্‌বলিজ ইনস্টিটিউশন" প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরের টানাপাখার দিকে আঙুল দেখিয়ে রামমোহন রায় হেসে ডাফ সাহেবকে বলেন: "I leave you that as my legacy."[৫]

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে ডাফ সাহেব ক্ষান্ত হন নি। খ্রীস্টধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তার আদর্শ ক্ষেত্রও তখন প্রস্তুত। বুদ্ধিমান ডাফ নতুন পথ ধরে অগ্রসর হলেন। তাঁর বাড়ির একতলার হলঘরে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হল। বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বাধীনভাবে সমালোচনা করতে পারবেন এবং বক্তাকে প্রশ্ন করতে পারবেন, স্থির হল। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে (১৮৩০) হিল সাহেব প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বারুদের গোলায় যেন অগ্নিসংযোগ করা হল। বাদপ্রতিবাদের কোলাহলে কলকাতা শহর সরগরম হয়ে উঠল। ডাফ সাহেব নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে:

"The whole town was literally in an uproar···It is impossible to conceive or describe the wide and simultaneous sensation produced···The prevalent idea seemed to be, that by fair means or foul—by bribery or magical influence —by denunciation or corporeal restraint—we were determined to *force* the young men to become Christians."[৬]

অভিভাবকদের অভিযোগে ও ছাত্রদের ব্যবহারে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষও এই সময় বিচলিত হন। কলেজের ছাত্ররা কোনো ধর্মালোচনার সভায় যোগ দিতে পারবে না, এই মর্মে তাঁরা এক আদেশ জারি করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁরা উক্ত আদেশকে "tyrannical", "absurd and ridiculous" ব'লে মন্তব্য করেন। তাতে অবশ্য কোনো ফল হয় নি।

১৮৩০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহর, তথা সারা বাংলাদেশের উপর দিয়ে নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে যখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়, তার কয়েকদিন পরেই (১৯ নভেম্বর, ১৮৩০) রামমোহন রায় কলকাতা ছেড়ে বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি বাংলাদেশে। সামাজিক অগ্রগতির যে আন্দোলন তিনি শুরু করেছিলেন, পরবর্তী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে যখন তা রীতিমত আবর্তসংকুল হয়ে উঠল, তখন তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর আদর্শের উত্তরাধিকারী যাঁদের তিনি রেখে গেলেন, তাঁরা বয়সে সকলেই নবীন, যৌবনের উদ্দামতায় চঞ্চল ও অস্থির। এমন কি তাঁদের প্রত্যক্ষ মন্ত্রগুরু ডিরোজিও পর্যন্ত একজন যুবক মাত্র। দ্বন্দ্বটা সোজাসুজি নবীনের সঙ্গে

প্রাচীনের, যৌবনের সঙ্গে স্থবিরত্বের দ্বন্দ্বে পরিণত হল। যে-কোনো সমাজে এরকম সংঘাত অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও হয়েছিল।

সভাসমিতির প্রাচুর্যের সামাজিক কারণ

এই রকম সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভাসমিতির বিকাশ হয়। এটা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তাই দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগের সভাসমিতি বা ক্লাব-সোসাইটি বলতে যা বোঝায়, তার বিকাশ হয় নি। ইটালীয় রিনেস্যান্সের "হিউম্যানিস্টিক অ্যাকাডেমি"-গুলির আদর্শে ইয়োরোপে সোসাইটি ও অ্যাকাডেমির কিছু-কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে সম্মিলিতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার জন্য সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ তেমন তৈরি হয় নি। সামাজিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞরাও এ কথা স্বীকার করেন—

"...the world had not known until the eighteenth century any societies organised for collective thinking and discussion. There had been religious sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of lawyers ; but there had never been...anything like societies, let alone a whole network of societies, for the avowed purpose of collective thinking and talking."[৭]

সভা সমিতি সোসাইটি—"for the avowed purpose of collective thinking and talking"—একমাত্র সমস্যাসংকুল সংঘাতমুখর সমাজেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ও তাগিদে গড়ে উঠতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লব (আমেরিকান ও ফরাসী) মানুষের চিরন্তন একমুখী চিন্তাধারাকে বহুমুখী ক'রে তোলে। অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যা ও সংশয় মানুষের মনে জাগে, যার সদুত্তর ও সমাধান চায় সে। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের প্রয়োজন হয় সম্মিলিতভাবে। এই সামাজিক প্রয়োজন থেকেই সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়। এই সব সভা-সোসাইটির মূলনীতি হল স্বাধীন চিন্তা (Freedom of Thought), অবাধ আত্মপ্রকাশের (Freedom of Expression) ও পরস্পর-মিলনের (Freedom of Association) অধিকার। নবযুগের গণতান্ত্রিক আদর্শের তিনটি প্রধান স্তম্ভ, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যার অস্তিত্ব ছিল না। এই সময় ইয়োরোপে Freethinker-দের আন্দোলনও আরম্ভ হয়। ভল্টেয়ার এই অবাধ চিন্তাপন্থীদের বলতেন, *"franc-pensants"* এবং নবযুগের আলোকপন্থীদের লক্ষ্য ক'রে তিনি উপদেশ দিতেন— সুহৃদ্-গোষ্ঠী ও চক্র গঠন ক'রে একত্রে মেলামেশা করতে, একত্রে আহারবিহার করতে, একত্রে আলাপ-আলোচনা করতে, সভা করতে। এই আদর্শের প্রেরণায় ফ্রান্সে সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল খুব এবং তাদের বলা হত *"les societes de pensee"*. হব্‌স্ তাঁর *Leviathan* গ্রন্থে "Captivity of Understanding"-এর কথা বলেন এবং স্পিনোজা তাঁর *Tractatus theologico-politicus*-এ মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেন। লক্ ও হিউমের রচনাও মানুষের চিন্তাবিপ্লবের পথ পরিষ্কার ক'রে দেয়। সবার

উপরে, ***Rights of Man*** ও ***The Age of Reason***-এর লেখক টম্ পেইন (Tom Paine) নবযুগের নবীন সমাজের চিন্তাধারায় যে বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করেন, বোধ হয় কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) ছাড়া আর কোনো চিন্তানায়ক পরবর্তী কালে তা করতে পারেন নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভল্টেয়ার, হিউম, লক্, টম্ পেইন প্রমুখ নবযুগের চিন্তানায়কদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে কলকাতার বন্দরে আমদানি হতে থাকে। বিদেশী মদ ও শৌখিন জিনিসপত্তরের সঙ্গে এই সব গ্রন্থের কথা কলকাতার ব্যবসায়ীরা তখনকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতেন। ***Calcutta Chronicle, Calcutta Gazette, Morning Post*** প্রভৃতি কলকাতার ইংরেজি পত্রিকায় এরকম অনেক বইয়ের বার্তা প্রচারিত হত। এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, বিদেশ থেকে কেবল যে পোর্ট ওয়াইন, জিন, ক্ল্যারেট, ব্র্যাণ্ডি আসত তা নয়, তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি উত্তেজক পদার্থ আসত— যেমন ভল্টেয়ারের গ্রন্থাবলী, হিউমের গ্রন্থাবলী, টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি। ইয়ং বেঙ্গলের সমালোচকরা একচক্ষু দিয়ে কেবল এই ব্র্যাণ্ডিই দেখেছেন, বইগুলো দেখতে পান নি।

ব্র্যাণ্ডি ও বইয়ের বিপ্লব

এক হাতে ব্র্যাণ্ডি, আর-এক হাতে বই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল দল চিন্তাবিপ্লবের উদ্‌যোগ করেছিলেন। তাঁদের ব্র্যাণ্ডি-প্রীতির কথা অনেকে বলে গেছেন, কিন্তু নবযুগের চিন্তানায়কদের প্রচারিত আদর্শের প্রতি অনুরাগের কথা তেমনভাবে কেউ বলেন নি। এই আদর্শ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ প্রচার-মাধ্যম মুদ্রিত বইয়ের মারফত সমাজে প্রচারিত হয়। বাংলাদেশেও হয়েছে। কিভাবে হয়েছে তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নবযুগের অন্যতম চিন্তানায়ক টম্ পেইনের গ্রন্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় আমদানি হয়েছে। দৃষ্টান্তটি পাদ্রি ডাফ্ সাহেব উল্লেখ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শগুরুদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

"Their great authorities···were Hume's *Essays* and Paine's *Age of Reason.* With copies of the latter, in particular, they were *abundantly supplied···* It was some wretched bookseller in the United States of America who—basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars despatched to Calcutta a cargo of that most malignant and pestiferous of all antichristian publications. From one ship a thousand copies were landed, and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand that the price soon rose, and after a few months, it was actually quintupled. Besides the separate copies of the *Age of Reason,* there was also a cheap American edition, in one thick vol. 8vo, of all Paine's works including the ***Rights of Man,*** and other minor pieces, political and theological." [৮]

১৮৩০-৩১ সালের কথা বলেছেন ডাফ সাহেব। পাদ্রি সাহেবের পক্ষে টম্ পেইনের বইকে

"malignant" ও "pestiferous" বলা খুবই স্বাভাবিক। সেই জন্য তিনি আমেরিকান পুস্তক-বিক্রেতাকেও অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু পুস্তকবিক্রেতার মুনাফার মতলব যতই থাকুক, সুদূর বাংলাদেশের কলকাতা শহরে যে টম্ পেইনের *Rights of Man* ও *The Age of Reason*এর মতন বই জাহাজ বোঝাই ক'রে নিশ্চিন্তে পাঠানোর মতন সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সে-সময়, এ কথা তিনি বুঝেছিলেন। আমেরিকার বিপ্লবোত্তর যুগের পুস্তকবিক্রেতার পক্ষে না-বোঝাই অস্বাভাবিক। তা না হলে তিনি বইয়ের বদলে ব্র্যাণ্ডি, অথবা টম্ পেইনের বদলে অন্য কোনো লেখকের বইও পাঠাতে পারতেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, জাহাজ-বোঝাই টম্ পেইনের বই এল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তা হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকে নব্যবঙ্গের নবীন বিদ্বৎ-সমাজের প্রকৃত অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগের মধ্যে তার একাংশও পাওয়া যায় না। এক কথায় বলা যায়, ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, ঐতিহাসিক অবিচার। বাংলার নবজাগরণে তাঁদের প্রকৃত দানের তাৎপর্য, সেকালের বাঙালী বিদ্বজ্জনদের মধ্যে অনেকেই ভুল বুঝেছেন এবং বিকৃত ক'রে প্রচার করেছেন।

নতুন মানবাধিকার ও অবাধ চিন্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার হল তাঁদের দুটি। একটি পত্রিকা, আর একটি বিদ্বৎ-সভা, বিতর্ক-সভা প্রভৃতি বিভিন্ন সভা সোসাইটি। দুটিই নবযুগের নতুন হাতিয়ার, প্রেসও নতুন, সোসাইটিও নতুন। প্রাচীনপন্থীরাও এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, কিন্তু তাঁদের সুবিধা ছিল অনেক। প্রথমতঃ ধনিকদের আর্থিক পোষকতা ছিল, দ্বিতীয়তঃ কুসংস্কারের ভূতপ্রেত লেলিয়ে দেবার সুযোগ ছিল এবং সনাতন ধর্মের দোহাই ছিল। ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান সম্বল ছিল যুক্তির আলোকরশ্মি। তাঁরা ছিলেন Age of Reasonএর প্রতিনিধি। পত্রিকা ও সভা-সোসাইটির মধ্যে তাঁরা যুক্তির অভিযান আরম্ভ করলেন। বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য-প্রকাশ তাঁরা যে করেন নি, তা নয়। কিন্তু সেই আতিশয্য যতটা নিন্দনীয়, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসনীয় তাঁদের এই অভিযান। পার্থিনন, হেসপারাস, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রিফর্মার, এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি কয়েকটি ভালো-ভালো পত্রিকা এই সময় প্রকাশিত হল। ধর্মসভার পাণ্ডারা তাঁদের পত্রিকাদি মারফত হিন্দু কলেজের শিক্ষাদীক্ষা ও খ্রীস্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে (সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি) প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ডিরোজিও কলেজের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত হলেন। জুলাই মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় *Enquirer* পত্রিকা প্রকাশ করলেন এবং তার প্রথম সংখ্যায় লিখলেন:

"Having thus launched our bark under the denomination of *Enquirer*, we set sail in quest of truth and happiness."

পরবর্তী সংখ্যায় কৃষ্ণমোহন যা লেখেন সে-সম্বন্ধে ডাফ সাহেব বলেছেন:

"The next number of the *Enquirer* in particular, seemed as if penned with fire.···Hail, freedom, hail! rung through impassioned sentences".*

টম পেইনের আদর্শে যাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, বেকন হিউম লক্ ভল্টেয়ার পড়েছেন, তাঁদের ভয়

পাবার কথা নয়। তাই গুড়ুমসভার ঘন ঘন তোপধ্বনিতে তাঁরা আদৌ বিচলিত হলেন না। প্রচণ্ড আক্রোশে ধর্মসভা তাঁদের বিরুদ্ধে বাণ ছোঁড়া আরম্ভ করলেন। "এন্‌কোয়ারার" পত্রে কৃষ্ণমোহন লিখলেন :

"The bigots are up with their thunders of fulmination. The heat of the *Gurum Shabha* is violent, and they know not what they are doing. Excommunication is the cry of the fanatic : we hope perseverence will be the Liberal's answer. The *Gurum Shabha* is high ; let it ascend to the boiling point. The orthodox are in a rage ; let them burst forth into a flame. Let the Liberal's voice be like that of the Roman,—a Roman knows not only to act but to suffer."

এই লেখার এক মাসের মধ্যেই (আগস্ট ১৮৩১) কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতে তাঁর বাড়িতে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটল। তাঁর বন্ধুবান্ধব বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, গোমাংস ভক্ষণ ক'রে তার একটি হাড় পাশের বাড়িতে নিক্ষেপ করেন। তাই নিয়ে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, কৃষ্ণমোহন শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। গুড়ুম সভা যে এই সুযোগে কি পরিমাণ তোপধ্বনি করেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তেজস্বী কৃষ্ণমোহন তার উত্তরে "এনকোয়ারার" পত্রে লেখেন :

"If opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed ··A people can never be reformed without noise and confusion···"

টম্ পেইনের *The Crisis Papers* ও *The Age of Reason* যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গীর সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের এই সব ইংরেজি রচনার বিচিত্র সাদৃশ্য দেখে বিস্ময়বোধ করবেন। আমেরিকান পুস্তকবিক্রেতার জাহাজ-বোঝাই বই পাঠানো যে বৃথা হয় নি, কেবল "এন্‌কোয়ারার" পত্রিকার রচনাতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৩১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের এই ঘটনার পর কৃষ্ণমোহন নভেম্বর মাসে *The Persecuted* নামে একটি নাটকও রচনা করেন।[১০] ডিসেম্বর মাসে ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। ডিরোজিও কামনা করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে একদিন মুক্ত বিহঙ্গের মতন ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পক্ষবিস্তার করবেন, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। যখন তাঁরা সত্যিই শক্তিপরীক্ষার জন্য বুদ্ধি ও যুক্তির পক্ষবিস্তার করলেন, তখন ডিরোজিও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

কেবল পত্রিকার মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেন নি। পত্রিকা ছিল তাঁদের প্রথম হাতিয়ার। দ্বিতীয় হাতিয়ার ছিল সভাসমিতি। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, সঠিক জানা যায় না। তবে অ্যাকাডেমি ছাড়াও, এই সময়, আরও অনেক সভা-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল। কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর ডাফ সাহেবের জীবনচরিতে এবং ডাফ নিজে তা লিখে গেছেন। রেভারেণ্ড দে লিখেছেন :

"Debating Societies were multiplied, in which bigotry, high-handed

tyranny, superstition and Hindu orthodoxy was denounced in no measured terms."[১১]

ডাফ সাহেব আরো সুন্দরভাবে এই সব সভাসমিতি সম্বন্ধে লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, এর আগে সভা-সোসাইটি ছিল বটে, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। তার মধ্যে অধিকাংশ সভাই সাহেবরা উদ্‌যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ আদর্শ-সংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভাসমিতির দ্রুত বিকাশ হতে থাকল এবং তার সংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই সব সভার বৈঠক হত কলকাতায়। এক-একজন একাধিক সভায় যোগ দিতেন ও সদস্য হতেন। আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক যেন একটা বাতিক হয়ে দাঁড়াল। এমন কোনো বিষয় ছিল না যা নিয়ে আলোচনা বা তর্ক হত না। বিষয়বৈচিত্র্যের যেন শেষ ছিল না মনে হয়। ডাফ সাহেবের নিজের ভাষাই উদ্ধৃতিযোগ্য :

"New Societies started up with the utmost rapidity in every part of the native city. There was not an evening in the week, on which one, two or more of these were not held ; and each individual was generally enrolled a member of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania ; and its manifestation, both in frequency and variety, was carried to a prodigious excess."[১২]

সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে, নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কাতর্কি করার মনোভাব একসময় প্রায় 'ম্যানিয়া' হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে, ১৮২৯-৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে। ১৮৩০ সালে জনৈক "হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ" কলেজের ছেলেদের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের চিঠিতে এই ব'লে অভিযোগ করেছিলেন :

"প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহারা স্থানে ২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্ধ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব…"।[১৩]

পরিষ্কার বোঝা যায়, ছেলেরা যে স্থানে স্থানে সভা করেছে এবং সেই সব সভায় সামাজিক আচারব্যবহার, এমনকি 'রাজনিয়মের' বা রাজনীতিরও আলোচনা করছে, এতেই "ছাত্রস্য পিতুঃ" বেশ বিচলিত হয়েছেন। তিনি ছেলেকে কলেজ ছাড়াতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়ে নি। মাসিক টাকাও বন্ধ করেছেন, কিন্তু তাতেও 'উৎপাতগ্রস্ত' হয়েছেন। অথচ এরকম অবস্থার মাত্র বছর ছয় আগেও, ইংরেজি সংবাদপত্রে এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপনের আবশ্যকতার কথা লেখা হত। *Bengal Hurkaru* পত্রে ১৮২৪ সালে জনৈক লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তার উত্তরে "Medicus" নাম দিয়ে আর-একজন লেখেন :

"A correspondent in your paper…called the attention of the public, to the formation of debating society in Calcutta ; by which I conceive he means an Institution, where men may unbend their minds, discuss and express

their sentiments freely and fearlessly, on every subject connected with general knowledge, both political and scientific ··In countries, whose Government are different from this, such institutions flourish and to the credit of such, it may be said, that through their medium, Political Economy and Science have been greatly promoted."[১৪]

'মেডিকাস'-এর যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ সাল, মাত্র ছ বছরের মধ্যে, দেশের সামাজিক অবস্থার যে কত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল, সভা-সোসাইটির অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা বোঝা যায়। তার ফলে যে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার প্রসার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতারা এই সব সভাসমিতির জন্য রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।

সভা-সোসাইটি পরিচালনার বৈশিষ্ট্য

এই সব সভা ও সোসাইটি কিভাবে পরিচালিত হত, সকলেরই তা জানবার কৌতূহল হবে, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ পাওয়া যায় না। এ-সম্বন্ধে ডাফ সাহেব যা লিখে গেছেন, তা অনেকটা নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক সভায় যোগদান করতেন—"At one or other of these societies I felt it to be at once a duty and a privilege constantly to attend". তাঁর বিবরণ থেকে যেটুকু জানা যায়, তার মর্ম এই :

সভার সদস্যরা যখন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেজ লেখকদের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা নিজেদের মতামত জোরালো ক'রে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। আলোচ্য বিষয় যখন ঐতিহাসিক, তখন রবার্টসন ও গিবন উদ্ধৃত করা হত। রাজনৈতিক বিষয় হলে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরিমি বেস্থাম, বৈজ্ঞানিক বিষয় হলে নিউটন ও ডেভি, ধর্মবিষয় হলে হিউম ও টম্ পেইন, দার্শনিক বিষয় হলে লক, রীড, স্টিউয়ার্ট ও ব্রাউন প্রভৃতির রচনা থেকে প্রচুর পরিমাণে আবৃত্তি করা হত। বক্তৃতাটিকে সাহিত্যিক মাধুর্যে জীবন্ত ক'রে তোলার জন্য ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে ভালো ভালো অংশ তাঁরা উদ্ধৃত করতেন। তার মধ্যে ওয়াল্টার স্কট ও বায়রন থেকেই বেশি বলা হত, মধ্যে মধ্যে রবার্ট বার্নসের কাব্যাংশও আবৃত্তি করতে শোনা যেত। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা—"But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed."

আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সোসাইটির অধিবেশনের যে পরিচয় দিয়েছেন ডাফ সাহেব, তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য। উদ্ধৃতিটি অনেক বড় হবে ব'লে বাংলায় তাঁর বক্তব্যের সারটুকু উল্লেখ করছি।[১৫] সাধারণতঃ বিদ্বৎ-সভা ও বিতর্ক-সভার বৈঠকে যা দেখা যায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এক দল বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন। বিদ্বৎ-সভার ঠিক এ রকম কোনো বাঁধাধরা নিয়ম না থাকলেও, বিতর্ক-সভা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইয়ং বেঙ্গলের যুগে বিদ্বৎ-সভা ও বিতর্ক-সভার মধ্যে 'ফর্মাল' ভেদ বিশেষ ছিল না। কারণ সব সভাই প্রায় আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্কের জন্য গঠিত

হয়েছিল, নিরালায় গবেষণা করবার জন্য নয়। এই আলোচনাপ্রবণতাই ছিল তখনকার সভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিতর্ক-সভায় পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনির্দিষ্ট থাকাই রীতিসংগত। কিন্তু ডাফ সাহেব বলছেন, তখনকার সভায় তা থাকত না। সভার পরিচালকরা বলতেন যে, তাতে আলোচনা যান্ত্রিক 'ফর্মাল' আলোচনা হয়, কার কি বিশ্বাস ও ধারণা তা জানা যায় না, কেবল পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মতন মৌখিক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা হয়। সে রকম আলোচনায় এই-জাতীয় সভা-স্থাপনের আসল উদ্দেশ্যই অনেকটা ব্যর্থ হয়। সুতরাং এই সব সভায় কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকতেন না। সকলে মিলিত হবার পর যখন সভার কাজ আরম্ভ হত, তখন স্বাধীনভাবে যাঁর যে-পক্ষে ইচ্ছা আলোচনা করতে পারতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পরপর ছ-সাত জন বক্তা বলে গেলেন এমনও হত—"All were, therefore, left alike free in their choice; hence it not infrequently happened, that more than half-a-dozen followed in succession on the same side." সভ্যবৃন্দের বলা শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইতেন, তাঁকে তা বলবার সুযোগ দেওয়া হত। সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে পরস্পরের মতামতের প্রতি এমন একটা সংযত শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেত, যা সত্যই প্রশংসনীয়। যাঁদের ধৈর্য সংযম শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদির অভাব সম্বন্ধে প্রাচীনদের অভিযোগের অন্ত ছিল না, তাঁরা যে সভা-সোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ককালে এ রকম উদারতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন, ভাবলেও অবাক হতে হয়। বোঝা যায়, সমাজসংস্কারের নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে তাঁরা অধৈর্য ও অসংযমের পরিচয় দিলেও, ব্যক্তিগত চরিত্রের বনিয়াদ তাঁদের বেশ দৃঢ় ছিল। তা না হলে, তাঁদের সভা-সমিতির পরিচালনায় এই শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত না।

সভা-সোসাইটির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য

১৮৩০ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে, এই প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়নের ফলে, কলকাতা শহরে অনেক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজলে সভাসমিতির সুদীর্ঘ একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। সভা-স্থাপন করা যখন তরুণ বাংলার প্রায় 'ম্যানিয়া' হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্বল্পকালস্থায়ী সভাও অনেক গড়ে উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাদের অনেকগুলির দুএক লাইন 'নোটিস' ছাড়া, আর কোনো পরিচয় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে কয়েকটি সভা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং কিছুকাল স্থায়ীও হয়েছিল। যেমন:

বঙ্গহিত সভা	সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন	জ্ঞানচন্দ্রোদয় সভা
জ্ঞানসন্দীপন সভা	সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ
ডিবেটিং ক্লাব	তত্ত্ববোধিনী সভা
বঙ্গরঞ্জিনী সভা	মেকানিক্স ইনষ্টিটিউট
বিজ্ঞানদায়িনী সভা	টিচার্স সোসাইটি

ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তরুণ ছাত্রমহলে সভাস্থাপনের প্রেরণা সঞ্চার করে। ১৮৩০ সালেই "অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন" স্থাপিত হয়। ৯ সেপ্টেম্বরের (১৮৩০) "সম্বাদ কৌমুদী" পত্রে এই সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা যায় যে তার কিছুদিন আগে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সিমলায় রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এবং হেয়ার সাহেবের পটলডাঙা স্কুলের ছাত্ররা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সভা স্থাপন করেন। রামমোহন রায় তখনও বিলাত যাত্রা করেন নি, কলকাতাতেই ছিলেন। এই সভা-স্থাপনের ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না, বলা যায় না। সভার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী দেখে মনে হয়, হয়ত তিনি পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় কেবল নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলন ও চর্চা করার স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করা নিষেধ ছিল। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমির আলোচনায়, অথবা ডাফ হিল প্রভৃতি পাদ্রিদের ধর্মপ্রচারে তখন যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সমাজে, রামমোহন রায় তার প্রতি খুব যে প্রসন্ন ছিলেন তা মনে হয় না। তাই কেবল বিদ্যানুশীলনের উদ্দেশ্যে এই সভাস্থাপনে তাঁর খানিকটা সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বুধবারে এই সভার অধিবেশন হত।[১৬] "জ্ঞানসন্দীপন সভা" স্থাপিত হয় পাথুরিয়াঘাটার উমানন্দ ঠাকুরের বাড়িতে, ১৮৩০ সালে। এই সভারও নিয়ম ছিল, ধর্মবিষয়ে আলোচনা করা চলবে না, কেবল বিদ্যাবিষয়ে চলবে। এই সময় চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে "ডিবেটিং ক্লাব" নামে এক সভা স্থাপিত হয়। "ইংগ্রণ্ডীয় বিদ্যা" যাতে সভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি হয়, এই ছিল ক্লাবের উদ্দেশ্য। রামমোহন রায়ের সিমলার স্কুলে, ১৮৩২ সালের শেষ দিকে, "সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা" স্থাপিত হয়। সভাস্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাভাষার বিশেষ অনুশীলন করা। অধিকাংশ সভাসমিতিতে শিক্ষিত যুবকরা তখন ইংরেজিতে বক্তৃতা ও আলোচনা করতেন। বাংলাভাষা অনেকটা উপেক্ষিত হত। তরুণ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের এই বিজাতীয় মনোভাব দূর করবার জন্য এই সভাটি স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং সম্পাদক ছিলেন তাঁর সতীর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৭]

এ রকম আরো অনেক সভাসমিতি এই সময় স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ও নিয়মকানুন সকলের যে এক ছিল তা নয়। তবে যার যে উদ্দেশ্য বা নিয়মই থাক্-না কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই সমানভাবে বোধ করতেন। সেটি হল বিদ্যানুশীলনের প্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করলে, এই সময়কার দুটি সভা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে আছে মনে হয়। একটি Society for the Acquisition of General Knowledge বাংলায় "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" বলে পরিচিত; আর-একটি "তত্ত্ববোধিনী সভা"।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বৎ-সভার প্রভাব

এদেশের বিদ্বৎ-সভা স্থাপনের মূলে যে পাশ্চাত্ত্য সভা-সোসাইটির প্রেরণা ছিল অনেকটা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগে এই প্রেরণা আরো বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছে মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রচুর সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নতুন জ্ঞান বিতরণ করা। এই সব সোসাইটির

মধ্যে প্রথম "মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউটের" নাম করতে হয়। ইংলণ্ডের অনেক জায়গায় এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অন্যান্য যেসব সোসাইটি এই সময় স্থাপিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—"Society for the Propagation of Christian Knowledge" (S.P.C.K), "Society for the Diffusion of Useful Knowledge" (S.D.U.K), "Society for the Diffusion of Political Knowledge" (S.D.P.K) ইত্যাদি। ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে প্রত্যেকটি সভা রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের দেশে বিদ্বৎ-সভার ও অন্যান্য সভার নামকরণে পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সভার প্রভাব দেখা যায়। "মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউট" এদেশেও স্থাপিত হয়েছিল। S.D.U.K ও S.D.P.K-র সঙ্গে এদেশের "Society for the Acquisition of General Knowledge" (S.A.G.K)-এর সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। "Diffusion" ও "Acquisition"-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। সে-পার্থক্য ইংলণ্ড ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের সঙ্গে তুলনীয়। ইংলণ্ডের কাছে তখন বড় প্রশ্ন "Diffusion"-এর, আমাদের দেশের বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা হল "Acquisition"-এর। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রায় একই সময়ে দুই দেশেই এই জাতীয় সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়।(ক)

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

"সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকজন উদ্‌যোগী মিলে একটি ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে প্রচার করেন। প্রচারপত্রে পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল দেখা যায়— তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে। ১৮৪০-৪২ সালের প্রকাশিত সভার "ট্র্যানজ্যাকশন্‌স"-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। ঐতিহাসিক ডকুমেণ্ট হিসেবে নয় শুধু, অন্যান্য দিক থেকেও এই প্রচারপত্রটি খুব মূল্যবান ব'লে, এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল :*

COUNTRYMEN,—Though humiliating be the confession, yet we cannot, for a moment, deny the truth of the remark so often made by many able and intelligent Europeans, who are, by no means, inimical to the cause of native improvement, that in no one department of learning are our acquirements otherwise than extremely superficial. We need only examine ourselves in order to be convinced of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improve-

---

(ক) ইংলণ্ডের এই সব সভা-সোসাইটির বিবরণ Dr. R. K. Webb-এর *The British Working Class Reader, 1790-1848—Literacy and Social Tension.* নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত, এই সব সোসাইটির বহু অপ্রকাশিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বিবরণ থেকে ডক্টর ওয়েব এই ইতিহাস রচনা করেছেন। পূর্বে যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁদের বিবরণ বিশদ ও সম্পূর্ণ নয়। যেমন, S.D.U.K সম্বন্ধে ডক্টর ওয়েব লিখেছেন—"There is, for example, a pretty extravagant passage in G.D.H. Cole and Raymond Postgate, *The Common People* (London, 1947), pp. 810-11. The only large-scale attempt at an assessment of the Society's work is an unsatisfactory and unpublished dissertation in the University of London: M. C. Grobel, 'The Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 1826-1846.' (p. 176, Note 13)

* উদ্ধৃতির মধ্যে ইটালিক্‌স লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত।

ment has been laid in the School, (and a school tuition seldom does more) we enter into the world and never think of building a solid superstructure. *The fate of our Debating Associations, most of which are now extinct, while not one is in a flourishing condition,* as well as the puerile character of the native productions that appear in the periodical publications, are lamentable proofs of this sad neglect. If a tree is to be known by its fruits, where, with but one or two solitary exceptions, are the fruits to which we can point with pride and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent of learning ? We have ever sincerely regretted the want of an institution, which should be the means of promoting frequent mutual intercourse among the educated Hindus, and of exciting an emulation for mental excellence. There is at present no occasion whereby we are ever called upon to congregate on an extensive scale, for the purpose of mutual improvement, and whence we may receive an impetus for applying ourselves to useful studies. Is it then not desirable to unite in such a laudable pursuit, by which the bonds of fellowship may be strengthened, the acquisition of knowledge promoted, and the sphere of our usefulness extended ?

With a view therefore to create in ourselves *a determined and well regulated love of study,* which will lead us to dive deeper than the mere surface learning, and enable us to acquire a respectable knowledge on matters of general, and *more especially, of local interest,* we have thought it expedient to invite you to meet, in order to consider the proposal of establishing an institution which, in our humble opinion, is eminently calculated, not only to effect this great end, but likely to promote mutual good feeling and union—an object of no less importance. We cannot, of course, within the limits of a circular, give a detailed account of the plan we propose to lay before you, but allow us to state the following brief outline.

Such members of the proposed Society, as may be willing, should undertake to deliver at its meetings, written or verbal discourses, on subjects suited to their respective tastes, at such times as may be previously fixed by them with a view to their convenience, and to the degree of research and attention which the subjects may require ; and, *if they should fail without satisfactory reasons, to fulfil their pledges, they will be liable to pay a pecuniary fine.* The

purpose of this circular is to call a general meeting, to consider the propriety of establishing the proposed institution, and to arrange the details.

It is at this general meeting, Gentlemen, that we most earnestly solicit your attendance. You must be well aware that the success of a public object, like the one we propose, must depend on the degree of cordial cooperation we may receive from the members of our community. We cannot believe that in such a cause, coldness will be manifested by any person that entertains the least regard for his own improvement, or breathes any love for his own country ; and we flatter ourselves with the hope, that we shall meet with your hearty support in a proposal, which none can look upon with indifference, unless lost to all sense of duty, or sunk in apathy. Those who may, from circumstances, be unable to take an active share in our proceedings, can at least countenance the object by their presence, for which they may be assured of our thanks.

We have, through the kindness of Baboo Ramcomul Sen, Secretary to the Sancrit College, obtained permission to use the Sancrit College Hall for our meeting, where precisely at 7 o'clock P. M. on Monday, the 12 th March next, we earnestly entreat and hope, that every one of you, Gentlemen, will have the goodness to try your best to be present.

Calcutta, February 20, 1838

TARINEY CHURN BANERJEE
RAMGOPAUL GHOSE
RAMTONOO LAHIRY
TARA CHAND CHUKERBUTTEE
RAJKRISHNA DAY

প্রচারপত্রের মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ, ১৮৩৮ সালে স্বাক্ষরকারীরা যখন এই সভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্রটি প্রচার করেন তখন, তাঁরা বলেছেন, উল্লেখযোগ্য একটিও বিতর্ক-সভা বা বিদ্বৎ-সভা ছিল না। যা দুএকটি ছিল, তাও তখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ডাফ সাহেবের কলকাতায় আসার পর, বিশেষ করে ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। তার আগেই হয়ত তার কার্যকলাপ ঝিমিয়ে পড়েছিল। তার পরে আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিদ্বৎ-সভা গড়ে ওঠে নি। তার কারণ, সামাজিক অবস্থার অতিদ্রুত পট-পরিবর্তন। বাইরের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে যখন চারিদিকে তীব্র কোলাহলের সৃষ্টি হয়, তখন বিদ্বজ্জনেরাও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী দল তখন অনেক গজিয়ে উঠলেও, বেশ বড় কোনো স্থায়ী বিদ্বৎ-সভা স্থাপনের সুযোগ তখন হয় না। ১৮৩০-৩১ সালে বাংলাদেশে ঠিক এই অবস্থারই সৃষ্টি

হয়েছিল। ডাফ সাহেব এই সময়ে যে ধরনের সভার প্রাচুর্যের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই ছোট ছোট বৈঠকী সভা, বড় কোনো বিদ্বৎ-সভা নয়। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে অবস্থা অনেকটা শান্ত হবার পর, সকলে মিলিত হয়ে বেশ বড় স্থায়ী বিদ্বৎ-সভা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা ইত্যাদি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে হয় নি, কারণ হবার মতন অনুকূল পরিবেশ ছিল না।

প্রচারপত্রের দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, সুস্থির বিদ্যাচর্চা ও গভীর জ্ঞানার্জনের সংকল্প। উদ্যমীদের মধ্যে অনেকে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। প্রতিভার উন্মেষপর্বে তখন তাঁদের বিদ্যালোচনায় চপলতা ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি। আট-ন বছরের মধ্যে তাঁদেরও অনেক মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিণত হয়েছে, দৃষ্টিও গভীর হয়েছে। এখন আর তাঁরা বিদ্বৎ-সভায় চাপল্যের বা তারল্যের পরিচয় দিতে চান না। ভাসা-ভাসা জ্ঞানে আর তাঁরা সন্তুষ্ট নন। প্রত্যেক বিষয়ের গভীরে তাঁরা প্রবেশ করতে চান। জ্ঞানসমুদ্রের বুকে ডুব দিয়ে তলিয়ে দেখতে চান, উপরে সাঁতার কাটতে চান না। প্রকাশ্যে এ কথা প্রচারপত্রে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধেও তাঁরা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। যদি কোনো সভ্য তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট দিনে সভায় যোগদান না করেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুত বক্তৃতাটি না দেন বা রচনাটি না পাঠ করেন, তাহলে সভার সম্মতিক্রমে তাঁকে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে। বিদ্বৎ-সভার এ রকম কঠোর বিধান বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু প্রথম পর্বের অতিরিক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার কথা ভাবলে, পরবর্তী কালের এই কঠোর শৃঙ্খলার ইঙ্গিত অনেকটা স্বাভাবিকও বলা যেতে পারে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল—কেবল পাশ্চাত্ত্য বা সাধারণ বিদ্যাচর্চার মধ্যে তাঁরা আর সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। স্থানীয় বিষয় নিয়েও ("matters…of local interest") তাঁরা পড়াশুনা ও আলোচনা করতে চান, কেবল বিদেশের নয়, এ দেশেরও। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় এ দেশের পুরাণ ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ১৮২৮-২৯ থেকে ১৮৩৮-৩৯ সাল, মাত্র এই দশ বছরের মধ্যে এদেশী বিদ্বৎ-সভার যে বেশ উল্লেখযোগ্য আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্ঞানোপার্জিকা সভার ম্যানিফেস্টো তার ঐতিহাসিক প্রমাণ।

১৮৩৮ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহকারী সভাপতি ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক ছিলেন রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র, পরিচালক-মণ্ডলীতে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি। সাধারণ সভ্যরূপে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সভায় সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার ছিল সকলের, কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো নিষেধ ছিল না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সব বিষয় নিয়ে এই সভায় নিয়মিত আলোচনা হত। সাধারণতঃ সংস্কৃত কলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হত ব'লে মনে হয়। বাংলার নবীন বিদ্বৎ-সমাজের প্রায় সকলেই এই সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে এই সভার অধিবেশনে যোগদান করতেন। সেই সময় যতগুলি বিদ্বৎ-সভা স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই সভাটিকে বিদেশীরাও একবাক্যে প্রশংসা করে গেছেন। কিন্তু কোনোদিক থেকেই এই সভা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী

ছিল না। বরং সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হত, তাতে কলকাতার ইংরেজ-সমাজ সভার প্রতি খুব প্রীত ছিলেন না। তবু আদর্শ বিদ্বৎ-সভার সমস্ত গুণ এই সভার ছিল বলেই তাঁরা প্রশংসা না করে পারেন নি। কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট জর্জ জনসন লিখেছেন: "One of the most meritorious of the native associations is the Society for the Acquisition of General Knowledge".[১৮]

এই সভার Transactions ও Proceedings-ও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হত, কিন্তু তার একটিও এখন পাওয়া যায় না (খ)। জনসন সাহেব একটি খণ্ড নিজে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তার বিষয়সূচী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "The contents are essays, topographical descriptions, etc, all of a superior character." অন্ততঃ তিন খণ্ড Transactions প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ ১৮৪৩ সালের "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়—"3rd Volume of the transactions of the Society for the Acquisition of General Knowledge, shortly to be published and all volumes to be had of Messrs. P. S. D' Rozario & Co"[১৯] এই মুদ্রিত বিবরণীগুলি পাওয়া গেলে, সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা জানা যেত। এখন যেটুকু পাওয়া যায়, তা বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত টুকরো-টুকরো সংবাদ ও রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। তাও সভাস্থাপনের পর প্রথম দিকের বিশেষ কোনো সংবাদই পাওয়া যায় না। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় হয়ত কিছু-কিছু সংবাদ প্রকাশিত হত, কিন্তু তার একটি কপিও এখনো পাওয়া যায় নি। "জ্ঞানান্বেষণ" থেকে উদ্ধৃত "সমাচার দর্পণের" একটি বিবরণে দেখা যায়, প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে (১৬ মে, ১৮৩৮) কৃষ্ণমোহন পুরাণপাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন "অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘগর্জন হওয়াতে ঐ পাদরি বাবুর বক্তৃতা শ্রবণে শতাধিক মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন।"[২০] সভার কার্যকলাপ পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পরিচালকরা উৎসুকও ছিলেন না। ১৮৪৩ সালে "বেঙ্গল হরকরা" পত্রে সভার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন: "Although this Society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the Society does exist."[২১] হরকরা-পত্রের এই বিবরণ থেকে আরো জানা যায় যে, সভ্যরা নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোনো বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন এবং কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে নয়, বাংলাভাষাতেও তাঁরা প্রবন্ধ রচনা ক'রে পাঠ করতে পারতেন। ১৮৪৩ সালে সভার সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। এই সভ্যসংখ্যা থেকে "জ্ঞানোপার্জিকা সভার" ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

নব্যবঙ্গের মুখপাত্ররা সকলেই প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রত্যেক বিষয় নিয়ে তাঁরা যে কতটা স্বাধীনভাবে সভায় আলোচনা করতেন, তা আজকেও বোধ হয় অনেকে কল্পনা করতে পারবেন না। কেবল দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত।

(খ) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে আছে কিনা জানি না, এখানকার কোনো লাইব্রেরিতে পাইনি।

আলোচনাকালে ব্রিটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। উপস্থিত ইংরেজ শ্রোতাদের সামনেই করতেন। একবার একটি অধিবেশনে এইরকম আলোচনার সময় খুব গণ্ডগোল হয়। এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ "বেঙ্গল হরকরা" পত্রে প্রকাশিত হয়।[২২] সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করছি।

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে সভার একটি অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর-একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বক্তা এবং বক্তব্য বিষয় ছিল: "On the Present State of the East Indian Company's Criminal Judicature, and Police, under the Bengal Presidency." বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানীর কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিসের অসাধুতা ও অকর্মণ্যতা এবং ব্রিটিশের এদেশে আসার অভিসন্ধি সম্বন্ধে তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন:

"To stand up in a hall which the government had erected and in the heart of a city which was the focus of enlightenment, and there to denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the country, did in his opinion, amount to treason···The College would never have been in existence, but for the solicitude the Government felt in the mental improvement of the natives of India. He could not permit it, therefore, to be converted into a den of treason, and must close the doors against all such meetings."

রিচার্ডসনের এই অসৌজন্য-প্রকাশে বিচলিত হয়ে, সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী (হিন্দু কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র) চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন:

"Captain Richardson, with due respect I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin. I must say that your remarks are anything but becoming, I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindoo College, and if necessary to the Government itself. We have obtained the use of this public hall, by leave applied for and received from *the Committee*, and not through your personal favour. You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this society in the utterance of his opinions. I hope that Captain Richardson will see the propriety of offering an apology to my friend, the writer of the essay and to the meeting."[২৩]

এর পর দক্ষিণারঞ্জন তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করেন। রিচার্ডসন পরে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান। জ্ঞানোপার্জিকা সভা যে কেবল এদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করেছিল তা নয়, বাঙালী শিক্ষিতসমাজে স্বাদেশিকতাবোধও প্রথম জাগিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার যে কেবল কুফলই হয় নি, সুফলও হয়েছিল, এ কথা তখনকার বাঙালী-সমাজের অনেকে না বুঝলেও, রিচার্ডসনের মত জাত-ইংরেজরা মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জর্জ টম্‌সন এদেশে আসার পর, এই সভার সভ্যবৃন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও আলাপ-অলোচনা হয় (গ)। তাঁরই উদ্‌যোগে সভার সভ্যবৃন্দ ১৮৪৩ সালে *Bengal British India Society* স্থাপন করেন। এই জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যদের মধ্যেই অনেকে "তত্ত্ববোধিনী সভা"র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। গোড়া থেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা

"জ্ঞানোপার্জিকা সভা" প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে "তত্ত্ববোধিনী সভা" দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩৯, ৬ অক্টোবর)। প্রথমে নাম ছিল "তত্ত্বরঞ্জিনী সভা", পরে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরামর্শে "তত্ত্ববোধিনী সভা" নাম হয়।[২৪] সভার প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার"। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি ঐতিহাসিক অবিচার করা হবে। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও পূর্বেকার সনাতন-পন্থীদের "ধর্মসভা" ও "তত্ত্ববোধিনী সভা"র মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। ১৮৩০ সাল থেকে বাংলার সামাজিক জীবনে যে দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে যে ভাঙন ধরে, রামমোহন রায় জীবিত থাকলে (থাকা সম্ভবও ছিল) নিশ্চয় তার অসংযত উদ্দামতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকটাকে সংযত করার চেষ্টা করতেন। যে-সমস্যা সবচেয়ে ভয়াবহরূপে তাঁর সামনে প্রকট হয়ে উঠত, তা হল কৃষ্ণমোহনের মতন বাংলার প্রতিভাবান যুবকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের সমস্যা। তখন বৈদান্তিক ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য "তত্ত্ববোধিনী সভা"র মতন নতুন কোনো সভা স্থাপনের কথা রামমোহনও ভাবতে বাধ্য হতেন। তাঁর অভাবে, তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ গুরুর অসমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল, ডাফ হিল প্রমুখ পাদরিদের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী-সমাজে খ্রীষ্টানধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে অবাধ অগ্রগতির পথ প্রতিরোধ করা। ধর্মসভার মতন "গুড়ুম সভা" স্থাপন করে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার মতন সংস্কারমুক্ত ধর্মতত্ত্বান্বেষী সভার পক্ষেই তা করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে, ধর্মের ক্ষেত্রেও, তত্ত্ববোধিনী সভা সেই সময় যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

শুধু ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তত্ত্ববোধিনী সভার দান সমসাময়িক যে-কোনো প্রগতিশীল সভার তুলনায় বেশি ছাড়া, কম নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "The *Tattwa-*

(গ) জর্জ টম্‌সন এই সময় 'জ্ঞানোপার্জিক সভা' ও মেকানিক্‌স ইন্‌স্টিটিউটে' অনেক বক্তৃতা দেন। ১৮৪৩ সালের *Bengal Hurkaru* ও *The Bengal Spectator* পত্রে তাঁর অনেক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারেও কিছু বক্তৃতা সংকলিত হয়।

bodhini Sabha used to hold weekly and monthly meetings. Papers were read and discussed at the weekly meetings and divine service used to be held once a month. The *Sabha* commenced its career with only ten young men as its members. But so great were the energy and enthusiasm with which its proceedings were conducted that in the course of two years the number of members rose to 500…"[২৫] আরো কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য-সংখ্যা প্রায় ৮০০ পর্যন্ত হয়। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের অধিকাংশই এই সভার সভ্য হন। সভার মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার প্রবর্তন ক'রে বাংলা সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নতুন পথ প্রদর্শন করে। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতন প্রতিভাবানদের অভ্যুদয় হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়।

কয়েক বছরের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি হয়। এ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন :

"তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। প্রথম কালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বারা উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষণে পাঁচশত অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন; তৎকালে মাসে দশমুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল। এইক্ষণে প্রতি মাসে প্রায় চারিশত টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে; তৎকালে সভার অভিপ্রেত ব্রহ্মোপাসনার প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদায় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞানজনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে…প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম সেই স্থানেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরন্তু কার্য্যের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বারা স্থানের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সভার কার্য্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্টিমুদ্রা মাসিক বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালিত হয়। সেখানে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কর্ম্ম এবং সভার অন্যান্য তাবৎ কার্য্য একত্র নির্ব্বাহ হইত। তদনন্তর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে পাঠশালার ব্যয় এবং সেই বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষেরা সভার ক্ষুদ্র কার্য্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরন্তু অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা সুন্দররূপে পরিবর্ত্তন হইল, সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কল্পনা হইল, বহু কর্ম্মচারী আবশ্যক হইল;…সুতরাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক ক্ষুদ্রাংশ দীর্ঘ-প্রস্ত পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদয় ব্যাপার সম্পোন্ন হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে সেখান হইতে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার কার্য্যালয় আনীত হইল…"[২৬]।

সভার কাজকর্মের ক্রমিক প্রসারের ফলে স্থানসংকট দেখা দেয়। স্থান থেকে স্থানান্তরে, লোকের

অনুকম্পার উপর নির্ভর ক'রে ঘুরে বেড়ালে, সভার কাজ সুসম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সভ্যদের কাছে এককালীন দানের জন্য পত্রিকা মারফত আবেদন করা হচ্ছে, যাতে সভার একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করা যায়—"মাসিক দান নহে, বার্ষিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ দান করিলে যখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন? তত্ত্ববোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্যও যিনি তিনি আপনার ভরণপোষণের দৈনিক ব্যয়কে সংক্ষেপ করিয়াও ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার মতন আর কোনো সভা বাংলার বিদ্বৎ-সমাজে এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, এমন কি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যেটুকু অভাব ছিল, তত্ত্ববোধিনী সভা সেই অভাবটুকু পূরণ করে দিয়েছিল। সেই অভাব হল, দেশীয় সংস্কৃতির উদার ও মহান ঐতিহ্যের উপর পাদ-প্রতিষ্ঠার অভাব। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েও, তত্ত্ববোধিনী সভা দেশীয় ঐতিহ্যের যা-কিছু মহান তাকে অস্বীকার করে নি। কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সংকীর্ণতা তার ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ক'রে যে কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু করা যায় না, অথচ তার কালসঞ্চিত কুসংস্কারগুলোকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে যে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ-সত্য প্রথমে রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তী কালে নোঙরহীন আদর্শবাদীদের দিগ্ভ্রান্তির মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা এই দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। পূর্বেকার সমস্ত প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা-কিছু ভালো তার সবটুকু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ ক'রে এবং যা-কিছু মন্দ তার সবটুকু নির্ভয়ে বর্জন ক'রে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা নবযুগের বাংলার বিদ্বৎ-সমাজকে সুস্থির আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান দিয়েছিল। মনে হয় যেন, আত্মীয় সভা, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রভৃতি সমস্ত সভার পরমকাম্য পরিণতি হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভায়। তার পর থেকে সভা-সমিতির ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা হল।

১। George W. Thomson, *The Stranger in India* (London 1843), vol. 2. pp. 151-152, footnote.

২। Rev. L. B. Day, *Recollections of Alexander Duff* (London 1879), p. 24

৩। Rev. A. Duff, *India and India Missions* (Edin. 1840), Appendix.

৪। George Smith, *The Life of Alexander Duff* (London 1879), vol. I, pp. 112-113.

৫। জর্জ স্মিথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১২০ পৃষ্ঠা।

৬। Rev. A. Duff, *India and India Missions*, Appendix, pp. 634-635.

৭। *Encyclopaedia of Social Sciences* (1951 print), vol. 6, "Free-thinkers" by Robert Eisler. এ ছাড়া J. B. Bury লিখিত *A History of Freedom of Thought* (London 1913) দ্রষ্টব্য।

৮। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৬৪০ পৃষ্ঠা।

৯। *Enquirer* পত্রিকার কোনো ফাইল পাওয়া যায় না। ডাফ সাহেব তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রবন্ধে আমি সেইগুলি ব্যবহার করেছি।

১০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দি পর্সিকিউটেড' নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন : "১৮৩১ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত *The Persecuted* নাটিকাখানি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য। ১৯৪১ সালে Calcutta Municipal Gazette পত্রের ১৭শ বার্ষিক সংখ্যায় আমি এই নাটিকাখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, 'সম্পাদকীয়', ৭৪৭ পৃষ্ঠা)। নাটকটি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় (২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা) উদ্ধৃত করা হয়েছে।

"দি পর্সিকিউটেড" নাটকের একটি কপি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে।

১১। লালবিহারী দে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় অধ্যায়।

১২। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট।

১৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।

১৪। *Bengal Hurkaru*, November 22, 1824.

১৫। অ্যালেকজাণ্ডার ডাফের পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টের বিবরণ থেকে গৃহীত।

১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১২১-১২৯ পৃষ্ঠা। 'সমাচার দর্পন' পত্রিকা থেকে কয়েকটি সভা-সমিতির বিবরণ সংকলন করা হয়েছে।

১৭। J. K. Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, pp. 271-274.

১৮। George W. Thomson, *The Stranger in India*, p. 153.

১৯। *Bengal Hurkaru*, February 27, 1843.

২০। 'সমাচার দর্পণ' থেকে 'সংবাদপত্রের সেকালের কথায়' ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃ উদ্ধৃত।

২১। *Bengal Hurkaru*, January 16, 1843.

২২। *Bengal Hurkaru*, February 13, 1843.

২৩। "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের ১৮৪৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জনের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৪৩ সালের ২রা ও ৩রা মার্চ।

২৪। "তত্ত্ববোধিনী সভার" বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী", ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (৩য় ভাগ), রাজনারায়ণ বসুর "আত্মচরিত", শিবনাথ শাস্ত্রীর *History of the Brahmo Samaj* প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২৫। Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, vol I, (Calcutta 1919), pp. 86-88.

২৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ফাল্গুন ১৭৬৭ শক

বাউল-পরিচয়

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পূর্বানুবৃত্তি

সাধনা

জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা ব্রহ্মকে "তৎ"বস্তু বলিয়া তৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু বাউলরা পণ্ডিত নহেন। তাঁহারা বলেন, আমরা "তৎ" বা তত্ত্ব বুঝি না; আমরা চাই মানুষ। তাই তাঁহারা ভগবান্‌কে পুরুষ বা মনের মানুষ বলেন। এই জগতে নানা বস্তুর মধ্যে সেই মানুষকে হারাইয়া চলিয়াছি। সেই মানুষের বিরহ যখন মনে জাগে তখন আর কোনো বিষয়সুখে মনে তৃপ্তি হয় না। এই মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়াই হইল সাধনা। তাই বাউল গাহিয়া ফেরেন—

> আমার মনের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাব তারে।
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥

তত্ত্ব ও জ্ঞানে হৃদয়ের সেই ব্যথা সারে না—

> তত্ত্বে ফত্ত্বে মন মানে না পরম মানুষ চাই-ই চাই।
> তিয়াস যে মরে না খুয়ায় (=কুয়াশায়) স্বরূপধারা কই রে পাই॥
> পাঁচ পঁচিশ কি ত্রিগুণ সাধনে, মন মানে না উদাস করে অবুঝ কান্দনে।
> এখন মহাতত্ত্ব পরমার্থ লাগে যেন সব বালাই।
> মানুষ আমার চায় সে মানুষ (তাই) আউল বাউল হয়্যা ধাই।
> সেই মানুষ লাগি মন বিবাগী বিশার যে আর গতি নাই॥

বিশা হইল কৈবর্ত বলার শিষ্য, জাতিতে ভূঞিমালী।

কবীর, দাদূ, রজ্জব, রবিদাস প্রভৃতি ভক্তেরা এই মানুষের জন্য ব্যাকুলতা পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষসূক্ত তো বেদের একটি কোণায় পড়িয়া আছে। অথর্ব বেদে তাহা ১৯-৬ ও ঋগ্‌বেদে তাহা ১০ মণ্ডলের ৯০তম সূক্ত। কিন্তু বাউলদের আগাগোড়াই হইল পুরুষসূক্ত।

যাঁহারা জ্ঞানী পণ্ডিত, যাঁহাদের সমাজে বিশেষ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছেন তত্ত্বে জ্ঞানে, আচারে অনুষ্ঠানে, মন্দিরে ধর্মব্যবস্থায়। সরল শাস্ত্রজ্ঞানহীন বাউলরা অতশত বুঝেন না, তাঁহারা তাঁহাকে খুঁজিয়াছেন জীবনে ও আচরণে মানুষের মধ্যে সরল ও সহজ করিয়া।

সম্প্রদায়-বন্ধন

তাঁহাদের সেই সহজ পথে যখন কৃত্রিম মন্দির ও শাস্ত্র আসিয়া দাঁড়ায় তখন ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে তাঁহারা বলেন—

> তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
> (তোমার) ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।

ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বল্ তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়, (তোমার) অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
তোর দুয়ারেই নানান্ তালা, পুরাণ কোরাণ তস্‌বী মালা
ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা, কেঁদে মদন মরে খেদে॥

যে সরল সহজ জীবনে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারা যায় তাহাতে মন যখন তৃপ্ত হয় না তখন নানা কৃত্রিম চেষ্টা করিতে হয়। তাই কবীর বলেন—

সুধা জল পীয়ৈ নহী খোদি পিয়নকী হৌস্।—কবীর ৪, ৭ পৃ

"সুধা জল (যাহা সহজ ও সম্মুখে আছে) পান করিবে না, ইচ্ছা হইল যে খুঁড়িয়া জল বাহির করিয়া পান করিবে!" তখন নিজের রচিত শাস্ত্র প্রভৃতি বন্ধন একের পর একে আমাদের দৃঢ় করিয়া বাঁধে।

বেদ কী পুত্রী স্মৃতি আঈ।
বংধরত বংধ ছোড়ি ন জাঈ॥—কবীর ৪, ৬ পৃ

"বেদের পুত্রী আবার আসিলেন স্মৃতি, তিনি বাঁধিলেন এমন বাঁধন যে কিছুতেই আর যায় না ছাড়ানো।"

মতবাদ বা 'ক্রীড'

চারি দিকের আক্রমণ হইতে সাধনাকে রক্ষা করিতে ধর্মকে মতবাদের (creed) বেড়া দিয়া নির্বিঘ্ন করা গেল। একদিন উঠিয়া দেখি, সাধনার ক্ষেত্রে গোরুবাছুর চরিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু বেড়াগুলিই জীবন্ত হইয়া তার সব শস্য খাইয়া ফেলিতেছে।

বেহ্না দীন্হী খেত্‌কো বেহ্নাহী খেত খায়।—কবীর ৪, ১১ পৃ

যাঁহারা সরল প্রেমপন্থী তাঁহারা কৃত্রিম স্বর্গ-নরক বা শাস্ত্রের শাসনে ভীত নহেন। "যাহারা হরিকে না জানে তাহাদেরই স্বর্গ-নরকের ভয়, যাহারা হরিকে জানে তাহাদের সে ভয় নাই।"—

অনজানে কো স্বর্গ নরক হৈ হরি জানে কো নাহঁ।—কবীর ২, ১১ পৃ

পণ্ডিতেরা যখন তাঁহাদের স্বরচিত এই জটিল তত্ত্বজালে ভ্রাম্যমান, তখন এই মূর্খ ও সরল লোকরা সহজ সরল ধর্ম খুঁজিয়াছে জীবনে, প্রেমে। তাহারা জীবন-মরণ লইয়া মাথা ঘামায় নাই, সংসার ও পুনর্জন্ম লইয়া তর্ক করে নাই; জলহাওয়ার পরশ তাদের শুচিতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, তাঁহার (পরম পুরুষের) সঙ্গেই তাহারা নিত্য বসতি করিয়াছে—

জীবন মরণ ন বাংছৈ কবহূঁ আবা গবন ন ফেরা।
পানী পবন পরস নহিঁ লাগৈ তিহি সংগি করে বসেরা।—দাদূ, রামকলী পদ ২১০

তাহারা ঘরেও বদ্ধ হয় না, বনেও ঘুরিয়া বেড়ায় না। কৃচ্ছ্র সাধনাও কিছু করে না, সদ্‌গুরুর উপদেশে তাঁহার মনের সহিত নিজ মনকে মিলায়।

না ঘরি রহ্যা না বনি গয়া না কুছ কিয়া কলেস।
দাদূ মনহীঁ মন মিলয়ে সতগুরকে উপদেশ॥—দাদূ, গুরুদেব অঙ্গ, ৭৪

ভগবানকে তাহারা কেবলমাত্র পুরাণের অবতারের মধ্যে অবতীর্ণরূপে দেখিয়া তৃপ্ত নহে। তাহারা দেখে, সকল জীবনে সকল মানবে তাঁহার অবতারলীলা নিত্যই চলিয়াছে—

জীবে জীবে চায়্যা দেখি সবই যে তাঁর অবতার।
নূতন লীলা কি দেখাবি, তাঁর নিত্যলীলা চমৎকার॥

সেই অবিনাশী পুরুষকে সদাই সবাই দেখিতেছেন, কেবল সাধনার বলে সাধক তাহাকে চিনিতে পারেন—

সবকো দৃষ্টি পড়ে অবিনাশী বিরলা সন্ত পিছানে।—কবীর ২, ৫২

ভেখ, বাহ্যচিহ্ন

সহজ সরল পথের পথিক বলিয়া বাউলরা ভেখ-চিহ্নাদি পছন্দ করেন না। নানক কবীর দাদূ রজ্জব প্রভৃতি ভক্তগণও বার বার এই কথাই বলিয়াছেন। কেন্দুলীরই মহোৎসবে আমাদের এক বন্ধু এক বাউলের গান শুনিয়া চমৎকৃত হন। তাঁহার কাপড় গেরুয়া না হইয়া সাদা কেন এই প্রশ্ন করায় বাউল গাহিলেন—

ভিতরে রস না হৈলে কি বাইরে কি রে রং ধরে?
ফলে কি অমৃত নামে বাইরে তারে রং করে?

ফলে যখন রস হয়, তখন বাহিরে আপনি রং লাগে। নহিলে বাহির হইতে রং করিলে কি আর ফলে মাধুর্য আসে? গৈরিক পরিলেই তো অন্তরে রস আসিবে না।

অন্তরের সাধনা প্রেম

ভাবের রাজ্যে প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হইতে গেলে বাহ্য সাধনায় লাভ নাই। শিল্পাদির ন্যায় ভাব-সাধনাও যদি শুধু বাহ্য বস্তু লইয়াই থাকিত তবে তাহার শিক্ষাও বাহ্য হইত। কিন্তু ভাব ও প্রেম হইল জীবনের ভিতরের বস্তু, তাই তাহার সাধনাও হওয়া উচিত অন্তরের। বাউলদের মধ্যে প্রেমই হইল যথার্থ সাধনা। প্রেমই সরল ও সহজ সাধনা। প্রেমেই যথার্থ যোগ। জ্ঞানে শুধু পরস্পরে বিরোধ ও বন্ধন। তাই দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া চিরকাল যে বিবাদ জ্ঞানের জগতে চলিয়া আসিতেছে প্রেমের সহজ যোগে সহজেই তাহার সমাধান হইয়াছে। প্রেমের সংজ্ঞাই হইল বাউলদের মধ্যে—

নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।

দ্বৈতের মধ্যেও দ্বৈতকে অতিক্রম করে প্রেমে, কেহ কাহারও নিজ ধর্ম না হারাইয়া, অর্থাৎ পরস্পরের যোগে পরস্পরে পূর্ণ হয়।

বাউলদের প্রেমতত্ত্বের কিছু কথা চৈতন্যচরিতামৃতেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রেম বাহিরের কোনো প্রয়োজনের দ্বারা নিয়মিত হইবার নহে, কাজেই কোনো বাহ্য বিধি বা ধর্মের অনুসরণ করিলে প্রেমের স্বধর্ম নষ্ট হয়।

বিধি ধর্ম ছাড়ি করে কৃষ্ণের ভজন।—চৈ. চ. মধ্য, ২২ অ, ৮১৭ পৃ, ৭১৬ দে, সং

শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার আশ্রয় করিলে সে প্রেম বৃথা। প্রেমও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার নহে। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ বাহিরের নয়। প্রেম হইবে প্রেমের দ্বারাই নিয়মিত। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।
—চৈ. চ. ২২, ৮১৮ পৃ, ৭২০ দে. সং

কাম দেহসুখ প্রভৃতি প্রবৃত্তির দ্বারাও প্রেম যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে প্রেম তাহার শুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে হারায়। বৈধী ভক্তি হইতে এই স্ব নিয়ন্ত্রিতা স্বাধীনা ভক্তিই ভাল।

রাগানুগাভক্তি মুখ্যা।—চৈ. চ. মধ্য, ২২, ৮১৮ পৃ, ৭১৯ দে. সং

আর যে সাধক প্রেমের নিয়ন্ত্রিত পথে চলেন তিনিই ভগবৎপ্রেমের মাধুর্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্যের পক্ষে তাহা সুলভ নয়।

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ॥—চৈ. চ. মধ্য, ২১,৭৯৫ পৃ, ৬৬৯ দে. সং

লোকাচার শাস্ত্রাচার ও কামাদি দৈহিক প্রবৃত্তির অতীত বিশুদ্ধ প্রেমেই ভগবৎপ্রেম-মাধুর্য লাভ হয়। এই প্রেম হইতে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য স্বয়ং উদ্ভূত হয়, তাহাই ভাবসাধনায় এই ক্ষেত্রে চলে, নহিলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ইহার অবশ্য-অঙ্গ মানিলে এই প্রেমের পূর্ণতা হানি হয়!

জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।—চৈ. চ. মধ্য, ২২, ৮১৭ পৃ, ৭১৮ দে. সং

শাস্ত্রজ্ঞান লোকবিধি কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বাহ্য কোনো নিয়মাদির দ্বারা ইহা নিয়মিত নহে।

এই প্রেম হইল বিভু অসীম ও অপার, তথাপি ইহা নিত্যই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা বিরুদ্ধ কথা। কারণ প্রেম "বিভু" হইলে আর ইহার বাড়িবার অবসর থাকিত না। তথাপি ইহা নিত্যবৃদ্ধিশীল।

রাধা প্রেমা বিভু যায় বাড়িতে নাহি ঠাঞি
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ —চৈ. চ. আদি, ৪,, ৯৩ পৃ, দে. সং

পাছে কামপ্রবৃত্তিকে কেহ কেহ বাহ্য মনে না করিয়া আন্তর বলিয়াই গ্রহণ করেন তাই কবিরাজ গোস্বামী বিশেষ সাবধানতার সহিত স্পষ্টই বলিলেন যে, এই প্রেমের মধ্যে কাম ও ইন্দ্রিয়াসক্তির স্থান নাই।

কাম হইল আত্মসুখেচ্ছা, প্রেম হইল ভগবানের সুখেচ্ছা।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥—চৈ. চ. আদি, ৪, ১০১ পৃ

এই প্রেমেতে ঐশ্বর্যেরও কোনো হাত নাই। অর্থাৎ এই প্রেমের ক্ষেত্রে কেহ বড় কেহ ছোট নয়। শক্তি বা বিভূতির স্থান এখানে নাই। এই প্রেমেই আমরা আমাদের প্রিয়তমের সমান হইয়া যাই। উভয়ের মধ্যে যে ভেদবিভেদ তাহা ঘুচিয়া যায়। যদি তাহার ঈশ্বরত্ব দেখিয়া সেই লোভেই মজিয়া থাকি তবে তো প্রেম শুদ্ধ হইবে না। সেরূপ ঐশ্বর্য বা কামে দূষিত প্রেমে তাঁহার আনন্দ নাই।

ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।—চৈ. চ. আদি, ৪, ৫০ পৃ

তাই কায়ার ক্ষেত্রে আমরা সহস্র বন্ধনে বদ্ধ হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমময় আমাদের স্বাধীন করিয়া

দিয়াছেন, সেখানে যদি নিজেকে হীন মনে করিয়া তাঁহাকে ধরিতে চাই, তবে তাহা প্রেম নহে। তাহাকে প্রেম নাম দিলেও সে প্রেম সত্য হইবে না। প্রেমভাবে একটি স্বাধীন সাম্য চাই।

আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥—চৈ. চ. আদি, ৪, ৫০

নানা নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ এই সংসারের মধ্যে সহস্র নিয়মে বদ্ধ থাকিয়াও প্রেমে সদাই আমরা তাঁর সঙ্গে সমান ভাবে লীলা করিতে পারি। এবং নানা কর্মের নানা বন্ধনের মধ্যে আমাদের চিত্ত সদাই তাঁর আহ্বানের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে। তাই মহাপ্রভু চৈতন্য এই কথা বুঝাইতে গিয়া উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥—চৈ. চ. মধ্য, ১২৬ পৃ, দে. সং

পরকীয় তত্ত্ব

এই যে সংসারে সাংসারিক নিয়মের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াও যে সংসারাতীত প্রেমময়ের জন্য ব্যাকুলতা, ইহা যেন ঘরে থাকিয়া বাহিরের জন্য ব্যাকুলতা; ইহাই পরকীয় রস বলিয়া কথিত।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয় পরকীয়রূপে দ্বিবিধ সংস্থান॥—চৈ. চ. আদি, ৪, ৫, পৃ ১৬

ঋষিরাও আত্মাকে মানসলোকাগত হংস বলিয়াছেন (মৈত্রী, ৬,৮)। সেই হংস এখানে বাসা বাঁধে না, এখানকার মলিন জলে সিক্তপক্ষ হয় না। সেখানকার ডাক শুনিলেই উড়িয়া চলিয়া যায়। সে "অসঙ্গ"। "অমৃতের সন্ধানে সে সদা সচল"। বিস্তীর্ণ ইহার গতি (হংস, ১)। এই হংস বাহিরের জন্যই ব্যাকুল। হংসো লেলায়তে বহিঃ, (শ্বেতা, ৩,১৮)। এই অসীমের কি এক অপূর্ব ডাক আছে যে বায়ু সেই ডাকে স্থির থাকিতে পারে না, মন ঘরে রহে না, জলধারা যেন কাহার সন্ধানে সদাই সুদূরের দিকে ধাবমান।

কথং বাতো নেলয়তি কথংন রমতে মনঃ।
কি মাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী র্নেলয়ন্তি কদাচন॥ অথর্ব, ১০, ৭, ৩৭

এই কথাই দাদূ বলিয়াছেন—

দেহ রহে সংসার মেঁ জীব রামকে পাস।—দাদূ, বিচার অঙ্গ, ২

দেহ সংসারে থাকিলেও হৃদয় পড়িয়া আছে যেন তাঁহারই কাছে।

এই পরকীয়তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কত সাধনার্থী নিজ সাধনা ব্যর্থ করিয়াছেন তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই প্রেম বাহ্য সব সুবিধার দ্বারা নিয়মিত নহে। নিতাই নামে এক বাউলকে একবার প্রশ্ন করা গিয়াছিল, প্রেম-বস্তুর পরিচয় সে পাইল কেমন করিয়া। সে বলিল, "বাবা, আমারও স্ত্রী ছিলেন। দেহের কাছে দেহ দশ-বারো বৎসর রাখিয়াছিলাম। তার পরে তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন, তারও পরে দশ-বারো বৎসরের পর, হঠাৎ একদিন অর্ধদণ্ডের জন্য তাঁহাকে পাইলাম। সেই প্রেম-পরশটুকু পরশমণির মত

আমাকে সোনা করিয়া দিয়া গেছে।" এই প্রেম-পরশ হয় ভগবানের বিশেষ কৃপায়। তাই চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

ধর্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।—আদি, ৪, ৫২ পৃ

এই কারণেই নরনারীর পরস্পরকে চেনা সহজ নয়। সমস্ত ক্ষুদ্র কামনা না ছাড়াইতে পারিলে কেহই কারও পরিচয় পায় না। তবু বাউলদের মধ্যে নারীপরিহার করাই ধর্ম নহে। নারীর নারীত্বটি যে কি রহস্যময় বস্তু এবং প্রেমপথে যাঁহারা সাধনার্থী তাঁহাদের পক্ষে "নারীত্ব" যে কত বড় সহায়, তাহা সহজ-তত্ত্বজ্ঞরা জানেন। এ প্রসঙ্গে তাহা বুঝাইবার মত স্থান নাই। মহাপ্রভুর মত সাধকও প্রকৃতিভাবে সাধনা করিয়া প্রেমের যথার্থ পরিচয় পাইতে চাহিয়াছেন।

বাউলদের মধ্যে নারীকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে। অগ্নির যে দাহিকাশক্তি সংসারের ক্ষেত্রে কার্যসাধিকা, সেটুকু তাহার গৃহের ও গৃহকর্মের বিশেষ সম্পত্তি। কিন্তু তাহার দীপ্তিটুকু সর্বজনীন। সেই দীপ্তি সকলেরই তিমির হরণ করে। তাই নারীর "বিগ্রহ"রূপ তাহার স্বামীতে ও পরিবারে আবদ্ধ কিন্তু তাহার "আগ্রহ"রূপ বা অধ্যাত্মরূপ সকলের সাধনাকে জ্যোতি দিতে সমর্থ। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া যে "আগ্রহ"তত্ত্বের সঙ্গে ভুল করিয়া "বিগ্রহ"কে অমর্যাদা করে সে নারীত্বকে অসম্মান করে, সাধনাকে ক্ষুণ্ণ করে। এসব সহজের গভীর কথা। এই প্রসঙ্গে বলিবার মত স্থান নাই। এই প্রেমসাধনা হইল অন্তরের। ভগবানের বিশেষ কৃপা ছাড়া মানুষ সে রস জীবনে পায় না। তাহার মহাশত্রু হইল লোভ, মন ও অহমিকা। লোভে, মনের চঞ্চলতায় ও স্বার্থবুদ্ধিতে এই সহজ সরল সাধনা নষ্ট হইয়া যায়।

পরকীয়া প্রীতি বুঝিতে কেহ কেহ পরনারীতে আসক্তি বুঝিয়া সহজ ধর্মের মূলে আঘাত করিয়াছেন। সহজ রসের আর-এক কথা লইয়াও তাঁহারা গোল করিয়াছেন। বাউলরা বলেন, আপনাকে চেনাও হইল মুক্তির এক দ্বার। নিজেকে চেনাই যায় না, যদি-না আমরা পরের প্রেমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিজের স্বরূপটিকে না ধরিতে পারি। ভগবান্ সর্বজ্ঞ হইলেও তাঁর স্বমাধুর্য তাঁর নিজের কাছেই অজ্ঞাত অনাস্বাদিত। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুভবের মধ্য দিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিতে চান। তাহাই হইল চৈতন্যচরিতামৃতাদির লেখকগণের চৈতন্যলীলার মূল কথা। চৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথা শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর "শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা" শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ভালো করিয়া বুঝানো হইয়াছে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।—চৈ. চ. অ. আদি, ৪

ভাগবতে তো রাধা নাই। সেখানে লক্ষ্মী-রুক্মিণীই যথেষ্ট। রাধা হইলেন সহজপন্থীদের মহনীয়া।

নিজের মাধুর্যমর্ম নিজের কাছেও রহস্যাবৃত। ইহা আবিষ্কার করিতে পারি আমার প্রতি অন্যের যে প্রেম সেই প্রেমের মধ্য দিয়া। নিজের রূপও নিজেরই অজ্ঞাত। তাহা দেখিতে পায় পরে। নিজে দেখিতে হইলে

দেখিতে হয় দর্পণের মধ্য দিয়া। প্রেমিকপ্রেমিকা সেই দর্পণ। সে দর্পণে স্বমাধুর্য প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। তাই ভগবান্ আমাদের প্রেমের মধ্য দিয়া নিজেরই মাধুর্যসম্ভোগ করেন। আর প্রেমের মধ্য দিয়াই নিজেকে জানিতে পারিয়া আমরাও মুক্তির পথ সুগম করি। ইহা হইল সহজ সাধনার একটি গূঢ় কথা। ইহারও নানা বিকৃতি ঘটিয়াছে।

একরস ও সমরসতত্ত্ব

স্থানের ভেদ আমরা দৈহিক গতি দিয়া অতিক্রম করি। কালদূরত্ব আমরা জীবনগতি দিয়া অতিক্রম করি এবং সর্ববিধ ভেদ আমরা সমরস বা একরস বা অধ্যাত্মগতি দ্বারা অতিক্রম করি। ইতি অসীমে সীমায় আত্মসমর্পণ। তাহাতে উভয়ে উভয়কে পূর্ণ করে। এই সমরসতত্ত্বটি বাউলদের সহজপথের একটি খুব বড় কথা— ভেদবিভেদের সব অনৈক্য এই একরস ও সমরস সাধনের দ্বারা দূর হইয়া যায়। শিব আর শক্তি, জ্ঞান আর ভক্তি যদি ভিন্ন হইয়া থাকে তবে তাহা কোনো কাজেই লাগে না— একত্র হইলে তবে নব নব সৃষ্টির মূল খুলিয়া যায়। তাই আনন্দলহরী বলেন— "শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ প্রভবতি "— শক্তির সহিত যুক্ত হইলে শিব কিছু করিতে পারেন, নচেৎ তিনি "স্পন্দিতুমপি" অক্ষম। বাউলরা সমরসের কথায় বলেন—

> শিবশক্তি হলে যুক্তি হবে সমরস।
> সূর্যচন্দ্রে মেলে যুগল পাখ,
> সমান হয়ে সহজ শূন্যে নিরালম্ব থাক্।

দেহতত্ত্বসাধকেরা জ্ঞান ও প্রেমধারা, গঙ্গা ও যমুনা, ইড়া ও পিঙ্গলাকে একত্র করিয়া সেই সংগমে মুক্তিস্নান করেন। কবীর বলেন—

> সুরত ঔর নিরত ধার মনমেঁ পকড় কর ;
> গঙ্গ ঔর জমনকে ঘাট আনৈ।
> নীর নির্মল ওহাঁ রৈন দিন ঝরত হৈ।
> জনম ঔর মরণ তব অংত পাই॥

প্রেমে ও বৈরাগ্যের গঙ্গাযমুনা ধারা একত্র যোগ করিলে যে "প্রয়োগ" বা "প্রয়াগ" হয় তাহাতে স্নানই মুক্তি। যোগ হইতে উপরে এই প্রয়োগ। সাধারণ নদীসংগমে বা 'প্রয়াগে' স্নানে মুক্তি হইবে কি করিয়া ?

তাই বাউলরা গান করেন—

> বল্ কি সাধন আছে আর
> ভেদ বিভেদে একাও (=এক কর) রসে সমরসেরে করবি সার॥
> যদি শিব শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রয়,
> ডাইন আর বাঁয়ের আলগ্ ধারা ভিন্ন ভিন্ন বয়।
> তবে মিথ্যা যুক্তি নাই রে মুক্তি সবই শূন্যে শূন্যাকার।
> জগা বলে শোন্ রে ও মাধা
> জপ তপ উপাস্ তীর্থ শাস্ত্র ব্যর্থ সব সাধা।
> যদি পরমার্থ সাধবি নিত্য, যোগে মিলা নানান ধার।

এই সমরস বা একরসও বাউলদের মতে প্রেমেরই এক নাম। কারণ রস ছাড়া জ্ঞান ও প্রেম, মৃৎ এবং চিৎ, জীব ও শিব, শিব ও শক্তি সর্বপ্রকারের ভেদ বিভেদ দূর করিয়া এক হয় না। রসের আনন্দেই এই এক হওয়া। তারই নাম সমরস। এই সমরস বা একরসের কথা নাথপন্থ যোগীদের মধ্যে, শৈব যোগীদের মধ্যে তন্ত্রে ও উত্তর-পশ্চিমে, পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের মধ্যে বহু বহু স্থানে আছে। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উল্লেখ করা গেল না।

ভেদনাশন এই প্রেম দিয়াই সহজ সাধনার সব কথা। এই সহজের কথা কবীর নানক দাদূ রবিদাস রজ্জব প্রভৃতি সবাই বলিয়াছেন। দাদূর শিষ্য সুন্দরদাস তো সহজানন্দ বলিয়া একটি গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন। দাদূর গুরুদেব অঙ্গ, ৭৪ পদ, রামকলী রাগের ২১০ সবদ, সারংগ রাগের ২৬৮ সবদ প্রভৃতি দেখিলে তাঁর সহজ মতটি বুঝা যায়। সুন্দরদাস তাঁর সহজানন্দ গ্রন্থে সহজ মতের সব কথাই বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থে বলিয়াছেন—

১. সাম্প্রদায়িক আচারক্রিয়াকর্মে ও বিধিবিধানের আড়ম্বরের কোনোই সার্থকতা নাই।

২. বিশেষ বিশেষ কর্ম ও অনুষ্ঠান বিনা, বিধিবিধান ও সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর বিনা, সহজ প্রেমপথেই সহজ জ্ঞান ও আনন্দ মেলে।

৩. বেদান্তবিহিত তত্ত্বজ্ঞানেও যে কর্মের সমূল নাশ হয় বা না হয়, সহজানন্দ হইতে তাহা আরো সহজে হয়।

তাই তিনি বলেন—

সহজৈ সহজ রামধুনী হোঈ।
সহজ হিঁ মাঁহি সবারৈ সোঈ। (৮)

সহজেই জীবন ভগবৎসংগীতে সংগীতময় হইয়া যায়। সহজের মধ্যেই তাহা হয় বিলীন।

সুন্দরের মতে, সেই নিরঞ্জন সকলের মধ্যেই সহজ হইয়া আছেন—

সহজ নিরংজন সব মৈ সোঈ॥ (১৯)

তাই সকল সাধক সহজ হইয়াই তাঁহাকে ও নিজেদের যোগকে পাইয়াছেন—

সহজৈ সংতমিলৈ সব কোঈ (১৯)

ভক্ত সোজাজী, পীপাজী, সেনাজী, ধনাজী, ভক্ত রবিদাস, ভক্ত দাদূ, শিব সনক শুকদেবাদি সবাই এই সহজ পথেরই পথিক—

সোজা পীপা সহজ সমানা।
সেন ধনা সহজৈ রস জানা॥
জন রইদাস সহজ কৌ চংদা।
গুরু দাদূ সহজৈঁ আনংদা॥ (২৩)

ধ্রুব, প্রহ্লাদ, গোরখ গোপীচংদ, জয়দেব সবই সহজ পথেই চলিয়াছেন (২১-২২)।

সর্ববিধ ভেদবিভেদের সুসংগতি হয় সহজে সমরসে। কাজেই সমরস হইল সাধনার মধ্যে একটা মহা যোগসাধনা।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

জর্মন-কবি রিল্‌কে'র দুটি কবিতা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

রিল্‌কে কে ও কি ছিলেন বাহ্য-জীবনে, পরে কিছু বলছি। তাঁর কবিতা দিয়েই আগে তাঁর পরিচয় আরম্ভ করি।

প্রথম, 'অরফেউস ও ইউরিদিস' কবিতাটি[১]। গ্রীকদের এ কাহিনী সুপরিচিত। অরফেউস ছিলেন সংগীতকার, অতুলনীয় সংগীতকার— পশুপাখি তরুলতা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যায় তাঁর সংগীত শুনে। তাঁর প্রণয়িনী ইউরিদিসের মৃত্যু হয় হঠাৎ, সর্পাঘাতে। মৃত্যুলোকে (Hades) চলে গেলে, অরফেউসও তাঁর অনুসরণ করলেন সেখানে সশরীরে। এবং তাঁর সংগীতে মুগ্ধ করলেন মৃত্যুদেবতাকে; ইউরিদিসকেও ফিরে পেলেন, তবে এই শর্তে যে ইউরিদিস যখন ফিরে চলবে তাঁর পিছনে, পৃথিবীর উপর পৌঁছনো পর্যন্ত তিনি তার দিকে ফিরে তাকাবেন না, তাকালেই ইউরিদিসকে হারাতে হবে, সে ফিরে চলে যাবে অধোলোকে। কার্যতঃ অরফেউস ভুলে গেলেন তাঁর শর্তের কথা, পৃথিবীর নিকটে এসে ফিরে তাকালেন ইউরিদিস এল কি না দেখবার জন্য, আর হারালেন তাকে।

লাতিন কবি ভর্জিল বলেছেন এ কাহিনী, মাধুর্যে কারুণ্যে অতুল সে কাব্য বিশ্বসাহিত্যে। অরফেউস আনন্দে ঔৎসুক্যে আপ্লুত হয়ে ফিরে তাকালেন, ইউরিদিস বেদনায় বলে উঠলেন—

কি করলে তুমি, হতভাগ্য দুজনাই আমরা— এই যে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোথায়, কোথায় তোমার হাত? অন্ধকার রাত্রি যে ঘিরে এল! বিদায়, বিদায়![২]

রিল্‌কে কিন্তু এ করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যুলোকে গিয়ে, মৃত্যুর আবহাওয়ায় ইউরিদিসের ঘটেছে রূপান্তর— শেক্সপীয়রের ভাষায় sea-change। শুধু দেহগত নয়, তার মধ্যে এসে গিয়েছে চিত্তগত বিপর্যয়, কেবল ভৌতিক নয়, তার হয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নবগঠন। রিল্‌কে দিয়েছেন চিত্রটি এই ভাবে—

ইউরিদিস তবে ফিরে চলেছে মৃত্যুলোক হতে মর্ত্যলোকে, অরফেউসের পিছনে; দুজনের মাঝখানে, ইউরিদিসের ঠিক সামনে পথ দেখিয়ে চলেছেন দেবতাদের দূত মার্কারি (বুধদেব)। এ দেবদূত কি রকম? মনোহারী— এবং গভীরব্যঞ্জনাপূর্ণ। রিল্‌কের এই আলেখ্য— রিল্‌কের ভাষার জাদু ইংরেজি অনুবাদেও আমরা কথঞ্চিৎ অনুভব করতে পারি— বাংলা অনুবাদ দিতে পারে তার দূর প্রতিধ্বনি—

> পথচলার দেবতা, দূর বার্তার দেবতা।
>
> দীপ্ত আঁখি দুটির উপর ঝুঁকে পড়েছে তার পথযাত্রীর মস্তক-আবরণ,

---

১ দ্রষ্টব্য

Rainer Maria Rilke : *Requiem and other Poems,* translated and edited by J. B. Leishman. The Hogarth Press.

২ Jam que vale : feror ingenti circumdata nocte,
Invalidas que tibi tendens, heu! non tua, palmas.

হাতে জাদুদণ্ড দেহের সম্মুখে প্রসারিত,
পায়ে ডানা ধীরে দুলে চলেছে,
বাঁ হাতে ধরে রেখেছে তার কাছে সমর্পিত— **তাকে**।[৩]

আর ইউরিদিস?—

নিজের মধ্যে নিজেকে ঢেকে সে রেখেছে— তার সময় যে হয়ে এল। চিন্তা করে না— পতি তার সামনে এগিয়ে চলেছে, কি, রাস্তা তার উঠে চলে মিশেছে আবার জীবনধারায়।

ঘিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধ্যে, চলেছে আনমনে— মৃত্যু তার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ করে তুলছে।

পরিণত ফলের মত মধুরতায় আর গাঢ় আঁধারে পূর্ণ হয়ে সে রয়েছে তার মহামরণের সঙ্গে মিলে— এমন নতুন জিনিস তা, আর-কিছু সে-সময়ে আর তার অন্তরে প্রবেশ করে না।

ফিরে আবার যে কুমারী হয়ে উঠেছে নূতনভাবে, স্পর্শের অতীত এখন; নারীত্ব তার মধ্যে আসন্ন সন্ধ্যায় ফুলের মতো আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে, পাংশুল অঙ্গ তার হারিয়ে ফেলেছে পত্নীত্বের অভ্যাস সব…[৪]

আর সে সেই সুন্দরী রমণী নয়, কবির কাব্যকে যে একদিন প্রতিরণিত করে তুলেছিল; আর সে সুরভিত প্রসারিত শয্যার ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর সে পতির সম্পত্তি নয়।

দীর্ঘ কুন্তলের মতো খুলে পড়েছে সে, বৃষ্টির মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, বহু বিচিত্র অবদানে আপনাকে বিতরণ করে দিয়েছে— ফিরে গেল সে তার আদি সত্তায়, লাভ করলে কেবল মূলরূপ…

দিশারী দেবতা করুণ কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠল, "এই যে, হায়, ফিরে তাকাল!" স্পর্শ করলে না কিছু তাকে, উত্তরে বললে মৃদুকণ্ঠে— "কে?"[৫]

৩ The god of faring and of distant message,
the travelling-hood over his shining eyes,
the slender wand held out before the body
the wings around his ankles lightly beating
and in his left hand, as entrusted, *her*.

৪ Wrapt in herself, like one whose time is near,
she thought not of the husband going before them,
nor of the road ascending into life.
Wrapt in herself she wandered. And hear deadness
was she with her great death, which was so new
that for the time she could take nothing in.
She had attained a new virginity
and was intangible; her sex had closed
like a young flower at the approach of evening
and her pale hands had grown so disaccustomed
to being a wife. . . .

৫ Even now she was no longer that fair woman
who'd sometimes echoed in the poet's poems,
no longer the broad couch's scent and island,
and yonder husband's property no longer.

মৃত্যুর অপরূপত্ব রিল্‌কের কাব্যে মূল সুর। মৃত্যু একটা অপশক্তি নয়, যা ঘটায় দেহের অবসান শুধু। দেহের অবসান একটা নিবিড় উদার মহামুক্তির লক্ষণ। মৃত্যুকে বার বার বলা হয়েছে মহামৃত্যু (the great death)। মৃত্যুর স্পর্শ ঘুচায় পার্থিব ব্যক্তিত্বের বন্ধন, দূর করে আধারের ইন্দ্রিয়জ সুখবোধ— আধার হয়ে ওঠে রসবর্জিত ("রস বর্জং"), উদাসী, তপস্বী; আর নামরূপের সীমানা ভেঙে দিয়ে নিয়ে আসে বিশ্বের সকলের আধারের সঙ্গে সাম্য ও সমপ্রাণতা। মৃত্যুর এই স্বরূপ দ্বিতীয় কাহিনীটির মধ্যেও রিল্‌কে ফুটিয়ে ধরেছেন। এটিও গ্রীক-কাহিনী— আল্‌সেস্‌টিস ও আদ্‌মেতস (Alcestis and Admetus)। আদমেতস মৃত্যুর দুয়ারে— জীবন সে ফিরে পেতে পারে যদি আর কেউ তার বদলে মৃত্যু বরণ করে। বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা রাজি হলেন না, যুবক বন্ধুও ফিরে চলে গেল— রাজি হয়ে এল তার পত্নী আলসেসটিস। আমাদের মহাভারতে আছে যযাতি-পুরু উপাখ্যান— পুত্র পুরু গ্রহণ করেছিলেন পিতা যযাতির বার্ধক্য। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিজ্‌ তাঁর বিখ্যাত নাটকে দেখিয়েছেন পত্নীর আত্মত্যাগের সৌন্দর্য ও মহিমা, পরম কারুণ্যে অভিষিক্ত ক'রে। কিন্তু রিল্‌কে সেদিক দিয়ে যান নি। আলসেস্‌টিস এল ধীরে প্রশান্ত পদক্ষেপে, মৃত্যুর কাছে নিজেকে ধরা দিতে, মৃত্যুর সঙ্গে চলে যেতে। মৃত্যুর কাছে সে যেন বহু আগেই ধরা দিয়েছে, বহু পূর্বেই সে নিবেদিত উৎসর্গীকৃত। সকল জিনিসের পারে সে চলে গিয়েছে, শেষ হয়ে গিয়েছে সব বস্তু তার মধ্যে।[৬] মৃত্যু একটা পরম উপরতি, সকল তৃষ্ণা-বিবর্জিত প্রশান্তি। ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বিমুক্ত আনন্ত্য, এক থেকে বহুর মধ্যে একাত্মতা। তাই তো মৃত্যু যখন গ্রহণ করলে এই নারীকে, তখন তাঁর মুঠির মধ্যে এল যেন এক জাদুকণা যার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শত মানুষের জীবন। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে আমরা মিশে যাই বিশ্বের পঞ্চভূতে একটা গভীর অর্থে— বিশ্বের উদাসীন প্রশান্ত জীবনধারার সঙ্গে একীভূত হয়ে লাভ করি একটা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক গতি। মৃত্যুর পরে লুসী'র পরিণতি সম্বন্ধে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই ধরনের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রিল্‌কে স্পষ্টই আর একটি কবিতায় বলছেন: বীজ তার বয়ে চলল নদীর স্রোতে, গেয়ে চলল তরুলতার মধ্যে, চেয়ে রইল প্রশান্তভাবে ফুলের ভিতর থেকে— রইল সে একান্তে, চলল সে গেয়ে।[৭]

বিশ্ববস্তুর সঙ্গে আত্মায় এই বহুবিচিত্র ঐক্যের আলেখ্য আরো দিয়েছেন রিল্‌কে এইভাবে: নামহীনের

She was already loosened like long hair,
and given far and wide like fallen rain,
and dealt out like a manifold supply.

She was mere root.
And when, abruptly swift,
the god laid hold of her, and, with an anguished
cry, uttered the words: He has turned round!—
she took in nothing, and said softly: Who?

৬ for no one's reached the end
of everything as I have. What remains
of all I used to be.

৭ And when he died, light as without a name, he was distributed: his seed ran in brooks, his seed sang in the trees and looked peacefully at him from flowers. He lay and sang.

সঙ্গেই আমার গাঢ়তর অন্তরঙ্গতা। ইন্দ্রিয়ের সহায়ে, পাখির মত যেন আমি আকাশের হাওয়ায় উড়ে যাই।

রিল্‌কের মূল ভাষা বড় সুন্দর এখানে—

mit meinen sinnen, wie mit Vögeln, reiche
ich in die windigen Himmel aus der Eiche. [৮]

আর আমার অনুভূতি মাছের উপর ভর করে ডুবে যায় যেন আলোক-চঞ্চল পুকুরের তলায়।

মৃত্যুকে রিল্‌কে অনেক সময়ে বলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছায়াগাঢ়— অর্থাৎ এ পরিণাম একটা নিবিড় প্রচ্ছন্ন পরিপূর্ণতা, সে হল যেন শিকড়ের অসম্বৃত আত্মসমাহিতি।

তাই তুমি এত শ্যামল, হে মৃত্যু, তোমার সীমানায় এসে আমার ক্ষুদ্র আলো তার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।··· তোমার শক্তির অভিরাম লীলা, তোমার অপরূপ সেবাব্রত শিকড়ের মধ্যে বেড়ে চলেছে, বৃক্ষকাণ্ডে মিলে মিশে গিয়েছে, শাখার শিখরে নবজন্ম লাভ করেছে।[৯]

এই হল আসল রহস্য— মৃত্যু মৃত্যু নয়, তা হল পুনর্জন্ম, রূপান্তর। তাই তো মৃত্যু যখন আলসেসটিসকে নিয়ে চলেছে, তখন সে দেখলে—

সেই কুমারীর মুখখানি তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে হাস্যময়, আশার ও ভরসার আলো যেন, ফিরে আসবে আবার পরিণত হয়ে, মৃত্যুর পাতাল থেকে তারই কাছে জীবনের পূজারী যে।···[১০]

২

রিল্‌কে জর্মন বলেছি। তাঁর জন্ম প্রাগ শহরে, চেকোশ্লোভাকিয়া দেশে। চেকোশ্লোভাকিয়া অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তখন। রিল্‌কে স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন বটে, ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য তৈরিও করছিলেন নিজেকে। কিন্তু বরাবর তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির, অমিশুক, নির্জনতা-প্রিয়। শিক্ষায় ও জীবন-ধারায় জর্মন-ব্যবস্থার যে কড়া আইন-কানুন সে-সব তাঁর কাছে উৎপীড়ন বলে মনে হত। জীবনে দুটি তীব্র অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষ অভিভাবিত ও অভিভূত করে। এক, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ— প্রথম বারের। তাঁকে সৈনিক হয়ে যোগদান করতে হয়েছিল, যদিও তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্যে শেষে কেরানীর কাজ দেওয়া হয়েছিল। দ্বেষ-হিংসা রেষারেষি রক্তারক্তি তাঁর উদার উদাসী কোমল প্রকৃতির ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষের

---

৮ mit (with) meinen (my) sinnen (senses), wie (as) mit (with) Vögeln (birds), reiche (reach) ich (I) in (into) die (the) windigen (windy) Himmel (sky) aus (from) der (the) Eiche (oak).

৯ You are so dark, my little brightness on your border has no meaning—
Du bist so dunkel; meine kleine Helle
an deinem Saum hat Kienen Sinn.
Such is the wondrous play of forces, passing so serviceably through things: growing in roots, vanishing into the trunks, and in the tree-tops like resurrection.

১০ he saw the Maiden's face, that turned to him,
smiling a smile as radiant as a hope,
that was almost a promise: to return,
grown up, out of the depths of death again
to him, thy liver. . .

এ রকম নির্মম উগ্র পাশব বৃত্তি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হল ফরাসী দেশে আগমন। ফরাসীর মানস-প্রকৃতি ও সংস্কৃতি তাঁকে মোহিত করেছিল— তাঁর মধ্যে স্থান পেয়েছিল ফরাসীর সুমার্জিত সুরুচি, ভাষায়, ভাবে, আচারে— জর্মনীর অতীন্দ্রিয় দার্শনিকতার সঙ্গে। কিন্তু ফরাসী দেশে এসে যে-দৃশ্য তাঁকে বিভ্রান্ত ব্যথিত করলে তা হল শ্রেণীবদ্ধ হাসপাতাল রাস্তায় রাস্তায় অর্থাৎ যত দুঃস্থ রোগী অসহায়ের এক রকম অস্পৃশ্য আবহাওয়া— তাঁর কারুণ্যপূর্ণ পারলৌকিকতা এই অভিজ্ঞতায় হয়ত আরো শাণিত হয়ে উঠেছিল। তবে ফরাসী দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতা তাঁর হল ভাস্কর রোডিন'এর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বস্থাপন। এ দুজনের আন্তর ভাবের মিল এক রকম অসাধারণ ছিল। রোডিনের প্রভাবে রিল্‌কের ভাবে ও রচনার ধারায় ঘটেছিল বিশেষ পরিবর্তন। রিল্‌কে গোড়ায় ছিলেন অনেকখানি ভাববিলাসী, তাঁর চেতনায় ও তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিমায় দৃঢ়তার নিশ্চয়তার চেয়ে বেশি ছিল মাধুর্য, রোমান্টিক-সুলভ উচ্ছ্বাস ও অস্পষ্টতা। কিন্তু রোডিনের সংস্পর্শে রিল্‌কের এল ভাস্কর্য-সুলভ আত্মস্থতা, দৃঢ়তা, পরিচ্ছিন্নতা, সংহত স্বচ্ছতা।

রিল্‌কে রুশ দেশও ঘুরে এসেছিলেন। রুশিয়ার যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্পর্শ করে তা হল তার প্রগাঢ় আস্তিকতা (আজও সে আস্তিকতা প্রকাশ পায় না কি তার নাস্তিকতার মধ্যে ?), আর একটা অসীমতা ও নিরবচ্ছিন্নতার আবহাওয়া। এ সবই রিল্‌কের কবি-চেতনার উপাদান হয়েছিল।

রিল্‌কের আন্তরজীবন একটা তীব্রতা, প্রগাঢ় আস্পৃহায় পরিপূর্ণ থাকলেও, তার মধ্যে এসেছিল প্রসন্নতা শান্তরসাম্পদতা। জীবনে বাহ্যতঃ তাঁকে খুব বেশি বিরোধ-সংঘর্ষ-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নি। অভাব-অভিযোগ তাঁর কমই ছিল। বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি সহযোগ সর্বদাই পেয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁর দেহ কোনোদিন খুব সবল ছিল না— অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নিবে এল— শেষ হল একটা শান্তিরই মধ্যে।

রিল্‌কে আগুনের কবি, আলোর কবি— সে-আগুন এ-পারের সব পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যায় ও-পারের আলোকে।—

> Yes I know from where I came!
> Ever hungry like a flame
> I consume myself and glow.
> Light grows all that I conceive,
> Ashes everything I leave:
> Flame I am assuredly. [১১]

পরিণতি হল একটা পরিপূর্ণতা, এখান থেকে চলে গিয়ে আবার নবভাবে ফিরে এসে নবীন সার্থকতা—

> Over the nowhere arches the everywhere
> Oh, the ball that is thrown, that we dare,
> Does not fill our hands differently than before?
> By the weight of return it is more. [১১]

পূর্বে যে পুনর্জন্মের কথা আমরা বলেছি সেই resurrectionএরই বাণী প্রতিধ্বনিত এখানেও।

---

১১ এ দুটি অনুবাদ আর-এক জনের কৃত (Kauf Mann).

ভারতীয় সাহিত্য

হিন্দী ভক্তিসাহিত্য

যে সময়ে হিন্দীতে ভক্তিসাহিত্যের সৃষ্টি শুরু হল সে এক যুগসন্ধির কাল। সেই প্রথমবার ভারতীয় সমাজকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল যা এতকাল তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তখন পর্যন্ত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সমাজচ্যুত করা হত আর তারা এক নূতন জাতের সৃষ্টি করত। এভাবে যদিও শত শত জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হচ্ছিল তবু বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা কোনো-না-কোনো আকারে সমাজে চলিতই ছিল। কিন্তু এ সময়ে তাদের সামনে এমন একটি সুগঠিত সমাজ এল যা প্রত্যেক ব্যক্তি আর প্রত্যেক জাতিকে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে সমান আসন দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। সে হল ইসলাম। একবার কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, রাজা থেকে ভিখারী, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সকলকে ধর্মোপাসনায় সমান অধিকার দিতে ইসলাম স্বীকৃত। সমাজে দণ্ডিত ব্যক্তি তখন অসহায় বোধ করত না, ইচ্ছা করলেই সে এক সুগঠিত সমাজের সাহায্য পেতে পারত। এই সময়েই দক্ষিণদেশ থেকে ভক্তিধর্মের আগমনে বিদ্যুতের মত এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছেয়ে ফেলেছিল। এই ভক্তিধর্ম দুই বিভিন্ন ধারায় নিজেকে প্রকাশিত ক'রে, নির্গুণ ধারা ও সগুণ ধারা এই দুই সাধনা দুটি পূর্ববর্তী ধর্মমতকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছিল। সগুণ উপাসনা পৌরাণিক অবতারদের কেন্দ্র করেছিল আর নির্গুণ উপাসনার কেন্দ্র ছিল যোগীদের (অর্থাৎ নাথপন্থী সাধকদের) নির্গুণ পরব্রহ্ম। প্রথম সগুণ সাধনা হিন্দুজাতির বাহ্যাচারের শুষ্কতাকে আন্তরিক প্রেমের সিঞ্চনে রসময় করেছিল আর দ্বিতীয়টি নির্গুণ সাধনা বাহ্যাচারের শুষ্কতাকেই দূর করার চেষ্টা করেছিল। এর মধ্যে এক দল ধরল আপসের পথ, অন্য দল গেল বিদ্রোহের পথে। এক দল শাস্ত্রের সাহায্য নিল, অন্য দল অনুভবের। এক দল শ্রদ্ধাকে পথপ্রদর্শক বলে মানল, অন্য দল জ্ঞানকে। এক দল সগুণ ভগবানকে স্বীকার করল, অন্য দল নির্গুণ ভগবানকে। কিন্তু দু দলেরই প্রেমের পথ, শুষ্ক জ্ঞান দুয়েরই অপ্রিয়। কেবল বাহ্যাচার পালনে দু দলের কারোই সম্মতি ছিল না, আন্তরিক প্রেমনিবেদন উভয়েরই ঈপ্সিত। অহেতুক ভক্তি উভয়েরই কাম্য, আত্মসমর্পণ উভয়েরই ধর্মসাধনের উপায়। ভগবানের লীলায় উভয়েরই বিশ্বাস। উভয়েই অনুভব করত যে, ভগবান লীলার জন্যই এই জাগতিক প্রপঞ্চ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাদের মধ্যে প্রধান ভেদ এই ছিল যে, সগুণ ভাবে যারা ভজনা করত তারা ভগবানকে দূরে রেখে দেখায় রস পেত আর নির্গুণ সাধক তার নিজের মধ্যে রমণ করছেন যে ভগবান তাঁকে পরম কাম্য মনে করত।

সে সময় ভারতবর্ষের শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানরা নিবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে কাজে তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরা শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন— সেই পরম্পরাটি হল যে সকলের প্রতি সম্মানের ভাব রেখে নিজের পথ আবিষ্কার করা। সগুণ সাধক ভক্তগণ সম্পূর্ণরূপে এই পুরাতন পরম্পরাগত মনোভাবের পোষক ছিলেন। তাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আর ঋষিদের অকুণ্ঠচিত্তে নেতা বলে স্বীকার করে তাঁদের বাক্যের সংগতি প্রেম-পক্ষে নিযুক্ত করলেন। এর জন্য তাঁদের কম পরিশ্রম করতে হয়নি। সমস্ত শাস্ত্রের প্রেমভক্তিমূলক

অর্থ করার সময় তাঁদের নানা অধিকারীভেদ ও নানা ভজনরীতির আবশ্যকতা মেনে নিতে হয়েছিল, নানারকম অবস্থার কল্পনাও করে নিতে হয়েছিল। সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক প্রকৃতির বিস্তার থেকে অনন্ত প্রকৃতির ভক্ত আর অনন্ত প্রণালীর ভজনের কল্পনা করতে হল। সব শাস্ত্রকেই উচিত মর্যাদা দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাগবত মহাপুরাণকেই সর্বপ্রধান প্রমাণগ্রন্থ বলে মানতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। অথচ তাঁরা কখনো কোনো শাস্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা অথবা অবহেলার ভাব দেখাননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল সর্বদাই ভগবানের পরম প্রেমময় রূপ আর মনোহর লীলার উপরেই নিবদ্ধ, অথচ তাঁরা খুব ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সংগতি এনে দিয়েছেন। সগুণ ভাবের ভক্তদের মহিমা তাঁদের অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায়ে, নির্গুণ শ্রেণীর ভক্তদের মহিমা তাঁদের সাহসের মধ্যে প্রকাশিত।

কিন্তু কেবল ভগবৎপ্রেম বা পাণ্ডিত্যই এই যুগের সাহিত্যকে রূপ দেয় নি। হিন্দী ভক্তিসাহিত্যকে কাব্যের নিয়ম আর প্রভাব থেকে একেবারে সরিয়ে আনা যায় না, আর অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যগত সংস্কার থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাও চলে না। অথচ তা এমন বস্তুও নয় যাকে সংস্কৃত, প্রাকৃত আর অপভ্রংশের পূর্ববর্তী সাহিত্য বলা যায়। সেই সাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে সাবধান হয়ে সেগুলিকে আমাদের যাচাই করতে হবে।

স্মরণ থাকতে পারে, অলংকারশাস্ত্রে দেবাদিবিষয়ক রতিকে ভাব বলা হয়। যে আলংকারিকেরা এ কথা বলেছিলেন তাঁদের কথার তাৎপর্য এই ছিল যে, নরনারীর প্রেমে এক প্রকার স্থায়িত্ব আছে; যখন কোনো রাজা বা দেবতা সম্বন্ধীয় প্রেমে ভাবাবেশের প্রাধান্য হয়, তা অন্যান্য সঞ্চারী ভাবের মত বদলায়। অথচ এ কথা ঠিক সমর্থন করা যায় না। এই বিধানের দ্বারা ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমকে বোঝানো যায় না। ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমে নির্বেদ ভাবের প্রাধান্য রয়েছে অর্থাৎ জগতের প্রতি উদাসীন হবার প্রবৃত্তি তাতে প্রবল থাকে এ কথা বললে কেবল জড়জগতের চেয়ে মানসিক সম্বন্ধকে প্রধান বলে মেনে নেওয়া হয়। এই কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, মনুষ্যের সঙ্গে জড়জগতের সম্বন্ধের স্থায়িত্ব থেকে রসের নিরূপণ হয়। কারণ এভাবে যদি তার বিচার না হত তবে শান্তরসে জগতের সঙ্গে যে নির্বেদাত্মক সম্বন্ধ আছে তাকে প্রাধান্য না দিয়ে ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হত। যাঁরা শান্ত রসের স্থায়ী ভাব হিসেবে নির্বেদকে না ধরে শমকে ধরেন, তাঁরা এভাবে চিন্তা করেন। এই প্রসঙ্গে বারবার 'জড়জগৎ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দ ভক্তিশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। এই প্রসঙ্গবিচারে মনে রাখা চাই যে, ভারতীয় দর্শনের মতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি সবই জড়প্রকৃতির বিকার মাত্র। সেজন্য চিদ্‌বিষয়ক প্রেমে ভগবানের সঙ্গেই কেবল সম্বন্ধ আছে। ভক্তিশাস্ত্রীরা দাবী করেন যে, এই পরম প্রেম প্রাপ্ত হবার পর অন্যান্য প্রেম শিথিল হয়ে যায়। সেজন্য ভগবৎপ্রেম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নয়, মনোগম্য বা বুদ্ধিসাধ্যও নয়। অনুমান দ্বারাই একে আস্বাদ করতে হয়। এই রসের সাক্ষাৎকার হলে আপনার বলে কিছু আর থাকে না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বা স্বভাব দ্বারা যেসব কর্ম সম্পন্ন হয়, সে সবই সচ্চিদানন্দ নারায়ণে গিয়ে বিশ্রামলাভ করে। ভাগবতে (১১।২।৩৬) এই জন্যই বলা হয়েছে—

> কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
> করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ ॥

কিন্তু নির্গুণভাবে ভজনাকারী ভক্তদের বাণীর অধ্যয়নের পক্ষে শাস্ত্রের সহায় খুব কম। এখন পর্যন্ত

তার অধ্যয়নে যে উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। সেইগুলি বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় লোকগীত, লোককথা আর লোকোক্তির জ্ঞান। আর ততখানিই প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, পূজাপদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে এ সবের একান্ত অভাব। ভক্তিসাহিত্যের পাঠককে, বিশেষতঃ নির্গুণ ভক্তির অধ্যেতাকে, যে কথা সর্বাধিক আকৃষ্ট করে তা হল— এই সময় উত্তরদেশের হঠযোগী আর দক্ষিণদেশের ভক্তদের মধ্যে মৌলিক ব্যবধান। তাদের মধ্যে একের ছিল জ্ঞানের গর্ব, অপরের ভরসা নিজের অজ্ঞতায়। একের পক্ষে পিণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড আর অপরের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডই পিণ্ড। একের ভরসা নিজের উপর, অন্যের ভরসা রামের উপর। এক দল মনে করত প্রেম দুর্বল আর অন্য দল মনে করত জ্ঞান কঠোর। একজন যোগী, অন্যজন ভক্ত। এই দুই ধারার বিচিত্র মিলনেই নির্গুণ-ধারার সেই সাহিত্যসৃষ্টি যার এক দিকে অনমনীয়তা, অন্য দিকে সর্বস্বত্যাগীর মনোবৃত্তি।

এই সাহিত্য আত্মসম্পূর্ণ নয়। নাথমার্গের মধ্যস্থতায় এর মধ্যে সহজ মত আর বজ্রযানের শৈব ও তন্ত্রমতের অনেক সাধনা আর চিন্তাধারা মিলিত হল আর দক্ষিণের ভক্তিপ্রচারক আচার্যদের শিক্ষাদ্বারা বৈদান্তিক ও অন্য শাস্ত্রীয় চিন্তাও এল।

মধ্যযুগের নির্গুণ কবিদের সাহিত্যের সহজ, শূন্য, নিরঞ্জন, নাদ, বিন্দু ইত্যাদি বহু শব্দ যেগুলিকে বাদ দিলে সে সাহিত্যের চলবার উপায় নেই— সেগুলি পূর্ববর্তী সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে বোঝাই যায় না। 'কবীর' পুস্তকে আমি এই শব্দগুলির মনোরঞ্জক ইতিহাসের প্রতি বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছি। একটি দৃষ্টান্ত দিই। সবাই জানেন যে কবীর ও অন্যান্য নির্গুণ সন্তদের সাহিত্যে 'খসম' শব্দের ব্যবহার খুব বেশি। সাধারণতঃ এর অর্থ করার হয় পতি বা নিকৃষ্ট পতি। আরবী ভাষায় এ ধরনের একটি শব্দ আছে। এই শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে খসমের অর্থ করা হয়েছে পতি। কবীরদাস খসম শব্দটির এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে তার ব্যঞ্জনা হয় নিকৃষ্ট পতি। কিন্তু পূর্ববর্তী সাধকদের পুস্তকে এই শব্দ এক বিশেষ অবস্থার অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'খ-সম' ভাব অর্থাৎ আকাশের সমান ভাব। সমাধির এক বিশেষ অবস্থাকে যোগীরাও 'গগনোপম' অবস্থা বলেন। 'খ-সম' আর 'গগনোপম' একই কথা। অবধূতগীতায় এই গগনোপম অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মনের সেই অবস্থাকেই এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যখন দ্বৈত আর অদ্বৈত, নিত্য আর অনিত্য, সত্য আর অসত্য, দেবতা আর দেবলোক—ইত্যাদি কোনো বোধ থাকে না। সে অবস্থা মায়াপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে, দম্ভাদি ব্যাপারের অতীত, সত্যাসত্যের উপরে, আর জ্ঞানরূপী অমৃতপানের পরিণাম। টীকাকারগণ 'খ-সম' শব্দটির অর্থ করেছেন—'প্রভাস্বর তুল্যভূতা।' ভক্তিসাহিত্যে এতে ভাবাভাববিনির্মুক্ত অবস্থা বোঝায়। নির্গুণ সাধকদের সাহিত্যে এর অর্থ আরো বদলে গেছে। গগনোপমাবস্থা যোগীদের দুর্লভ সহজাবস্থার আসন থেকে এখানে নীচে নেমে এসেছে। কবীরদাস যে প্রাণায়াম প্রভৃতি শরীরপ্রযত্নে সাধিত সমাধিকে বিশেষ মূল্য দিতেন তা মনে হয় না। যে সহজাবস্থা শরীরচেষ্টা দ্বারা সাধিত হয়, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিলয়। এই কারণেই কবীরদাস এই প্রকার খ-সমাবস্থাকে সাময়িক আনন্দ বলেই মনে করতেন। মূল বস্তু তো ভক্তি, যা পাবার পর ভক্তের ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যে ভক্ত তা পেয়েছে—সেই সহজ-সমাধির অধিকারী। সহজ সমাধিতে 'কহুঁ সো নাম, সুনুঁ সো সুমিরণ, জো কছু করুঁ সো পূজা।' পূর্ববর্তী সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখার জন্য পণ্ডিতেরা 'খসম' শব্দটির এই প্রকৃষ্ট অর্থ লক্ষ্য করেন না। উল্লিখিত 'কবীর' পুস্তকে আমি

বিস্তৃতভাবে এই শব্দের পূর্বাপর অর্থের বিচার করেছি আর এইজন্যই আমি এ কথা বলতে সাহসী হয়েছি যে, কবীরদাস 'খসম' শব্দ ব্যবহারকালে তার আরবী অর্থ ছাড়া ভারতীয় অর্থও বরাবর মনে রেখেছিলেন। আমার বিশ্বাস নেপাল এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেখানে যেখানে যোগমার্গের প্রবল প্রচার ছিল, সেখানকার লোকগীত এবং লোককথায় এ রকম অনেক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করা যায়।

কিন্তু দৈবাৎ সৌভাগ্যবশতঃ যে পুস্তকগুলি আমাদের হাতে এসে পড়েছে শুধু সেইগুলি অধ্যয়নের প্রধান অবলম্বন বলে স্বীকার্য নয়। সাধারণতঃ পুস্তকে লেখা কথায় আমরা সমাজের এক বিশেষ প্রকার চিন্তাধারারই পরিচয় পাই। যাঁরা এ কাজ হাতে নেবেন তাঁদের প্রচুর কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় সমাজ আজ যে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় ছিল না। এই বিশাল দেশে নিত্য নব জনসংঘের আগমন হয়েছে, আচারবিচারের অল্লাধিক প্রভাব তাঁরা রেখে গেছেন। পুরাতন সমাজব্যবস্থাও সর্বদা একরকম ছিল না। আজ যে সকল জাত সমাজের সবচেয়ে নীচের স্তরে তারা সর্বদা তাই ছিল না, আজ যারা উঁচু স্তরে তাদের সম্বন্ধেও অনুরূপ কথাই প্রযোজ্য। এমন যুগও গেছে যখন এই দেশের এক খুব বৃহৎ জনসমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মকে মানত না। সেই সমাজের পৌরাণিক পরম্পরা ছিল, সমাজব্যবস্থা ছিল, লোক-পরলোকে বিশ্বাসও ছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এসব জাতকে হিন্দু বলা হত না। কোনো জাতেরই তখন হিন্দু নাম ছিল না। মুসলমানরাই এই দেশবাসীদের প্রথমে হিন্দু নাম দেন। অজ্ঞাত কোনো সামাজিক পেষণের ফলে এর মধ্যে অনেকগুলি অপৌরাণিক মতের জাত হয় হিন্দু নয় মুসলমান হতে বাধ্য হল। তারা সংখ্যায় অবশ্য সামান্যই। এ যুগের এটিই একটি বিশেষ ঘটনা যে এই সময় প্রত্যেকটি মানব-গোষ্ঠী কোনো-না-কোনো বড় দলে শরণ নিতে বাধ্য হল। উত্তর-পাঞ্জাব থেকে বাংলা দেশের ঢাকা কমিশনারী পর্যন্ত এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূভাগে জোলাদের দেখে রিজ্‌লী সাহেব তাঁর *Peoples of India* পুস্তকে লিখেছেন (পৃ ১২৬) যে, এরা কোনো একসময়ে সংঘবদ্ধভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কবীর, রজ্জব প্রভৃতি মহাপুরুষেরা এই বংশের রত্ন ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা না হিন্দু না মুসলমান। সহজপন্থী সাহিত্যপ্রকাশনে একটি কথা খুবই স্পষ্ট হয়েছে। মুসলমান-আগমনের অব্যবহিত পূর্বে ডোম, হাড়ী প্রভৃতি জাতগুলি যথেষ্ট সম্পন্ন ও শক্তিশালী ছিল। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে তাদের উঁচু জাত বলে ধরা হত এমন বলি না, তবে এ কথা বলতে পারা যায় যে, তারা শক্তিশালী জাত ছিল।

নির্গুণ সাহিত্যের অধ্যেতাদের এই জাতগুলির লোকোক্তি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে জানা খুবই দরকার। এ কথা ভুললে চলবে না যে, এই অধ্যয়নের উপকরণ কোনো একটি প্রান্তে, কি একই ভাষায়, কি একই কালে, কি একই জাতিতে, কি একই সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নেই। এই সাহিত্যের প্রত্যেক কবিকে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করলে সমস্ত সাহিত্য অস্পষ্ট আর অসম্পূর্ণ মনে হবে। অবশ্য নানা কারণে কবীরের ব্যক্তিত্ব খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে। তিনি নানারকম পরস্পর বিরোধী অবস্থার মিলন বিন্দুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি এমন এক প্রশস্ত চৌরাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিলেন যার এক দিকে হিন্দুত্ব অন্য দিকে মুসলমানত্ব, যার এক দিকে জ্ঞান অন্য দিকে অশিক্ষা, এক দিকে যোগমার্গ অন্য দিকে ভক্তিমার্গ, এক দিকে নির্গুণ ভাবনা আর অন্য দিকে সগুণ সাধনা। তিনি দুই দিকই দেখতে পেতেন পরস্পরবিরুদ্ধ পথের দোষগুণ স্পষ্ট বুঝতে পারতেন। এই ছিল কবীরদাসের ভগবদ্দত্ত সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্য সাহিত্যকে অক্ষয় প্রাণরসে প্লাবিত করতে পেরেছিল। কিন্তু একেই একমাত্র মনে করে বসে থাকলে আমরা একেও ঠিকভাবে

বুঝতে পারব না। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'ওঝা অভিনন্দন গ্রন্থমালা'র একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের ভক্তিসাহিত্য কিভাবে বিভিন্ন প্রান্তগুলির সঙ্গে সম্বদ্ধ।

সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থ আর গ্রন্থকারদের উদ্‌ভব আর বিলয়ের কাহিনী নয়, কালস্রোতে বয়ে আসা জীবন্ত সমাজেরই বিকাশের কথা— গ্রন্থকার আর গ্রন্থ সেই প্রাণধারার প্রতি ইঙ্গিত মাত্র করে, তারাই মুখ্য নয়। মুখ্য হল সেই প্রাণধারা যা নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে আজ আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রাণধারা নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। ভক্তিসাহিত্যকেও আমাদের এইভাবেই দেখতে হবে।

শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী

অনুবাদ : শ্রীমতী মলিনা রায়

গ্রন্থপরিচয়

বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। মূল্য বারো টাকা আট আনা।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করেছেন, তা একটি সুবৃহৎ কর্ম। এ কাজ শুধু নিষ্ঠার পরিচয় নয়, রীতিমত পরিশ্রমসাপেক্ষ। একে তো বলেন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু বহুমুখী, রচনা অজস্র। তার উপর, ১৯০৭ সালে ঋতেন্দ্রনাথের চেষ্টায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা-সম্বলিত বলেন্দ্রনাথের যে রচনাবলী একত্র সংকলিত হয়, তাতে সংকলনের কোনো বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি, বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সমাবেশ করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সংকলন-গ্রন্থ তখনই সার্থক হয় যখন গ্রন্থকারের মন ও তার ধর্ম তারই ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই প্রথম প্রকাশের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে যখন বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সংস্করণ হল, এবং বলেন্দ্রনাথের মানস-ইতিহাসের দিক থেকে কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ হল, তখন তৃপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বলেন্দ্রনাথের অতি-প্রয়োজনীয় এই রচনা-সংকলন প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের আন্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। উদারদৃষ্টি, সাহিত্যের রসজ্ঞ গুণগ্রাহী রামেন্দ্রসুন্দরের মূল্যবান ভূমিকাটির অধিকাংশই সন্নিবেশিত হয়ে গ্রন্থাবলীর গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

অতি-আধুনিক মতবাদ-শাসিত সাহিত্যগোষ্ঠীগুলিতে বলেন্দ্রনাথের কি মূল্যনিরূপণ হবে ঠিক জানি না। হয়তো, যে সহজিয়া দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহিত্য ও সৌন্দর্যের বিচার করেছিলেন, যে প্রাকৃত শ্রী তাঁর দৃষ্ট জগৎকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার অন্যরকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু বলেন্দ্র-প্রতিভা যতই স্বতন্ত্র হোক, তার একটি ঐতিহ্য ছিল। কাজেই তাঁর মনস্তত্ত্ব এবং সাহিত্যপ্রচেষ্টার স্বরূপ বুঝতে হলে, দুটি কথা মনে রাখা দরকার। তিনি শিল্প-কাব্য-সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন এমন এক বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে থেকে, যে তাঁর সাধনাকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। ঠাকুরবাড়ির শিক্ষাদীক্ষা ও রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর মানস-মণ্ডলকে ঘিরে আছে একটি কোমল আবেষ্টনীর মতন। সুতরাং একটি সুনির্দিষ্ট, সুপরিচ্ছন্ন সামাজিক ও সাংসারিক পরিবেশে ঐ রকম সংস্কৃত মনের সুমিত বিকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। আর দ্বিতীয় কথা: যে সহজ রূপ-দর্শন ও শিল্পচর্চা বলেন্দ্রনাথের স্বভাবগুণ ও স্বধর্ম, সেই মনোধর্ম এবং ভাবের প্রবণতা জন্মাতে পারে অবসরভুঞ্জনেই। কাদম্বরী-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার যে দীর্ঘ অবকাশ-প্রসূত ধীর-মন্থর গতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই রসায়িত নিরঙ্কুশ গতি আর অবসররঞ্জিনী দৃষ্টি আছে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' ও '**গল্পগুচ্ছ**' রচনায় যেমন আছে বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থে এবং 'ক্ষণিক শূন্যতা'-র মতন মাসিক পত্রে বিক্ষিপ্ত বহু নিবন্ধে। এই অবকাশ-উপভোগকে অভিজাত মানস অথবা ভাববিলাস যাই বলা হোক, সেটা শিল্প ও সাধনার বস্তু। রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ উভয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অবসরের অনুকূল আবহাওয়ায়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সাহিত্য যে বিলাসের মনোরঞ্জন-উপকরণ মাত্র নয়, এ কথাও তাঁরা জানতেন। ভাষা-শৈলীর এমন সহজ বিন্যাস যে কতখানি সংযম ও সামঞ্জস্যের অপেক্ষা রাখে, একটি সুন্যস্ত দৃঢ়বদ্ধ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অবতারণা করতে হলে যে কতটা কলাকুশল হতে হয়, সেটা দুজনেই অতি

যত্নে ও পরিশ্রমে প্রমাণ করে গিয়েছেন। তফাত এই যে, রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি আরো গভীর, শব্দবাহী ভাষার মাধ্যমে তিনি এমন একটি দৃষ্টি-স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন যেখানে শব্দের চেয়ে ঐশ্বর্যের দ্যুতি আরো মহৎ, বাক্যের চেয়ে সত্য বড়। আর বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সচেতন শিল্পী। প্রকৃত কারুশিল্পীর মতই প্রতিটি শব্দের ওজন বুঝে ব্যবহার করতেন, শব্দের সুষমা ও অন্তর্নিহিত ধ্বনি নিষ্কাশিত করে ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব ফুটিয়ে তুলতেন। তাই তিনি শুধু 'শ্রাবণী' আর 'মাধবিকা'র কবি নন, গদ্যরচনাতেও একটি বিশেষ ধরনের ছন্দ ও ঝংকার আমদানি করেছিলেন—সে ঝংকার ও বাঙ্ময় জাদু শুধু পড়ার শেষে কানে বাজে না, এক দুর্লভ স্মৃতি হয়ে রসাস্বাদের ঘরে জমা হয়ে থাকে। বহুকাল পরেও মনে হয়, এমন মিষ্টি হাত শুধু তাঁরই হয় যিনি কবি হয়ে জন্মেছিলেন, যিনি কাব্যের প্রসাদগুণ যেন অবলীলায় ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত রচনায়। আয়াসের অস্তিত্ব তাই আর চোখে পড়ে না। কবি-কর্ম আর লিপিকৌশল বিষয়বস্তুকেও রসে নিষিক্ত করে তোলে। ভাষানির্মাণের পদ্ধতি এমন বেমালুম যে প্রসঙ্গ মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভাসে।

এই সূত্রে বলেন্দ্রনাথের স্বল্পায়ু সাহিত্য-জীবনের কথা স্বতই মনে হয়। মাত্র উনত্রিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কেমন করে পরীক্ষার স্তরগুলি পেরিয়ে পুরোপুরি আর্টিস্ট হয়ে উঠলেন, এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। বঙ্কিম মধ্যায়ু; রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু। স্টাইল নিয়ে পরীক্ষার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন তাঁরা। মৃত্যুর আগে বলেন্দ্রনাথের মাত্র তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম প্রবন্ধের বইখানিতেই তিনি জাত-লিখিয়ে প্রমাণ-সমেত সাহিত্যের আসরে নামলেন। 'চিত্র ও কাব্য'গ্রন্থের গদ্য পূর্ণপ্রাণ। এক দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিশ্লেষণ, অপর দিকে সংস্কৃত কাব্যের মতই চিত্রধর্মিতা। এই দুইয়ের এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন বড় দেখা যায় না। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনক্ষমতা-প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ নিজের ভাষা দিয়েই দেখিয়েছেন খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের কেমন আনন্দ ছিল। আবার উত্তরচরিতের আলোচনায় তাঁর ভাষাও দৃশ্যকাব্যের অনুরূপ, করুণ-গম্ভীর সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত। ভবভূতির পরম অনুরাগী বলেন্দ্রনাথ। তাই হয়তো কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তিনি তেমন সমগ্র দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। তিনি প্রধানতঃ হলেন রসসাহিত্যের ব্যাখ্যাতা। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বর্ণনায় তিনি নূতন ও সূক্ষ্ম দিক্-নির্দেশ করেন নি। তাঁর মূল কাজ হল মন্তব্য নয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণও নয়—আবেগস্পন্দিত অপরূপ শব্দবিন্যাসে রসের কল্পলোক সৃষ্টি করা। প্রাচীন সাহিত্যের মাধুর্যকে মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় ধরে রাখা, পাঠকের চোখে তারই মায়াঞ্জন লাগিয়ে দেওয়া। আধুনিক মনীষার কাছে এই ধরনের সহজ রূপোদ্‌ঘাটন ঠিক মনঃপূত হবে না। তাঁরা চাইবেন তথ্য, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বলেন্দ্রনাথ হলেন মর্মস্পর্শী। সমালোচনার কাজে তিনি কিছু মোহাবিষ্ট। তবে রসস্রষ্টা, এ কথা নিঃসংশয়। তাই সমালোচনার কাজে খুঁটিয়ে দেখা কিংবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বিচারবুদ্ধি দিয়ে কোনো প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, এ ধরনের মনীষা বলেন্দ্রনাথের নয়, তা স্বীকার করাই ভালো। যা দেখেছেন ও বুঝেছেন, যা ভালো লেগেছে এবং যেমন করে তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে তেমনি করে আপনার উপলব্ধিকে রসভোগে তারিয়ে তারিয়ে লেখনী দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা পাঠকের চিত্তে বহন করে দেওয়াই তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য। বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সমগ্র, সাংশ্লেষিক। তিনি যা দেখেন তা পুরোপুরি দেখেন। খণ্ড খণ্ড চিত্রের মারফত তিনি অখণ্ড একটি সৌন্দর্যের পরিচয় দেন। নিজের আনন্দ আর পাঠকের উপভোগ, এ দুটির সংস্পর্শ সাধন করছে তাঁর অপূর্ব ভাষা। এ ভাষা কারুশিল্পের ভাষা।

নন্দন-আমোদী ঘটকতাই তার প্রাণ। সংস্কৃত সাহিত্যের চিত্ররচনা হোক অথবা উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র কিংবা দিল্লীর চিত্রশালিকাই হোক, শ্রাবণের বারিধারা-প্রসঙ্গে নিভৃত চিন্তা হোক অথবা কণারকের বিষাদ-গম্ভীর মহৎ সৌন্দর্যের অভিভূতি হোক, সমগ্র দৃষ্টির কোমল উজ্জ্বল আলোয় বিষয়গুলির মৌলিক ও সম্পূর্ণ প্রকৃতি যেন উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি ভাবমেদুর রসমন্থর আবহ-সৃষ্টিতে বলেন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেউ নেই, একমাত্র তাঁর গদ্যরচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। বলেন্দ্রনাথের মানসভঙ্গী, প্রাচীন কালের সাহিত্য ও শিল্পকলার সশ্রদ্ধ উপসরণ আর ভাষার বলয়িত গতিমাধুর্য, এই তিনটির সমন্বয় তাঁকে গীতিকবির পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুশীলনে এবং ব্যাখ্যায় বলেন্দ্রনাথ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত ধারা গ্রহণ করেছেন।

'চিত্র ও কাব্য' গ্রন্থখানির কথাই বার বার উল্লেখ করছি এই কারণে যে, এইখান থেকেই বলেন্দ্র-প্রতিভার যথার্থ বিকাশ। এর পূর্বে বালক-বয়সের যেসব রচনা, সেগুলি কেমন অস্পষ্ট, আবেগস্পন্দনে ও ভাবালুতায় শিথিল। কিন্তু চিত্র ও কাব্যের প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়, তখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুবাপুরুষ। ললিতশিল্পের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যে আন্তরিক আসক্তি এবং নিজেকে উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করার আকুলতা তখন দানা বেঁধে সার্থক রূপ-সন্ধান করেছে। এই সময়ে বলেন্দ্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব পড়েছিল পরোক্ষে অথবা প্রত্যক্ষে, তার জন্য সাল-তারিখ বা দলিলের প্রয়োজন নেই। 'সাধনা'-'ভারতী'-পর্বের রবীন্দ্রনাথ পরিণত শিল্পী। 'মেঘদূত', 'নিশীথে' কিংবা 'ক্ষুধিত পাষাণ' -এর লেখকের বাগ্‌বিন্যাসে যে জাদু, তা বলেন্দ্রনাথের লেখায় যদি আদর্শ মোহ বিস্তার করে থাকে, তাতে অস্বাভাবিকত্ব নেই। 'কণারক', 'কলবেদনা' অথবা 'গৃহকোণ' প্রবন্ধে যে মর্মরিত সৌন্দর্য এবং শুভ্রতা, তার তুলনার জন্য একমাত্র পিতৃব্য-রচনার শরণাপন্ন হতে হয়। শেষ পাঁচ-ছয় বছরে বলেন্দ্রনাথের লেখায় ব্যক্তিগত সুর কমে গিয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক রূপ ফুটে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন একটি উচ্চাঙ্গ ভাষাশিল্পের বাহকতায় নিখিল মনের সঙ্গে সখ্য এবং আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছিল। প্রসঙ্গ আর পদ্ধতি, দুই দিক দিয়েই তিনি আরো ব্যাপক আরো গভীর হতে পেরেছিলেন। 'শুভ উৎসব' 'নিমন্ত্রণ-সভা' 'প্রাচীন উড়িষ্যা' আর 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা' পড়লে মনে হয়, বলেন্দ্রনাথ বর্ণনের অতিরিক্ত সত্যের স্থির ও দৃঢ় আবেদনে উপনীত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রচনার এই দুর্লভ স্তরে স্থায়ী হতে-না-হতেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। আরো এক যুগ বেঁচে থাকলে তাঁর সত্তা ও স্টাইল কেমন ভাবে ও কোন্ পথে এসে সার্থক পরিণতি লাভ করত সর্বপ্রভাবমুক্ত হয়ে, সেটা অনেকটাই অনুমানের বিষয় হয়ে রইল।

বলেন্দ্রনাথের স্বাধিকার ছিল এমন একটি ভাষা যা বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি। তিনি কবি, আবার জীবনরসিক। তাই বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর ভাষায় বিচিত্র কারুকার্যের শোভা। নিসর্গের বর্ণনায় তাঁর ভাষা শ্যামল-কোমল, লতাপাতা-ফুলফলের সৌন্দর্যভারে আনত। মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের পরিচয়ে তাঁর প্রকাশভঙ্গী স্মিত সরস কৌতুকে উজ্জ্বল। সামাজিক স্মৃতির আলোড়নে তার ভাষা অতীত দিনের চিত্রবর্ণে আপনাকে ডুবিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ অথচ মধুর হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায় কার্পণ্য নেই, আবার অকারণ কারুণ্যও নেই। যখন তিনি চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন ভাব ও বুদ্ধির সমন্বয়ে তাঁর ভাষাও ঋজু অথচ মধুর। 'নগ্নতার সৌন্দর্য' প্রবন্ধটিতে এ উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হবে। পূর্বেই অবশ্য বলেছি যে বলেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য শুধু যুক্তি-

শৃঙ্খলায় কিংবা বিশ্লেষণে নয়। যুক্তি-ন্যস্ত কল্পনাতেই তাঁর শিল্পী-সত্তার প্রকাশ। এ-জাতীয় প্রবন্ধগুলি তাঁর কলমে নিছক তথ্যপূর্ণ বা মননশীল হয় নি। বিষয়গত ধারণাশক্তির সঙ্গে হৃদয়গত সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরণের ভঙ্গী সৃষ্টি করে নেন, যার মধ্যে সত্যমুখীন সৌন্দর্যপ্রবণতারই প্রাধান্য। তাই এখানে ভাষাও সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে, যেমন :

নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্তি হয়, এইজন্য তাহার সৌন্দর্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দর্য স্ব-প্রকাশ। উষার সৌন্দর্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে তাহার সৌন্দর্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়া চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন ; দরবার, রাজত্ব—সকলই ভাগ্যে জুটিয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পাশে শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য ফুটে অধিক। তাহার মর্মে কি যেন লজ্জাহীনা পবিত্রতা জাগিয়া আছে।

বিশ্লেষণ করতে গিয়েও বলেন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধেরু সাহায্যই নিয়েছেন, 'পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে'—এইটাই মূল কথা এবং ঐ কথাটিকে ঘিরেই তাঁর স্বভাবকল্পনা অগ্রসর হচ্ছে বিস্তৃত পরিধির সন্ধানে। যে সব তুলনা তিনি করলেন, যে যুক্তি দেখালেন, সেখানে তথ্যবন্ধনের চেয়ে সত্যকল্পনাই বড়। 'ক্ষণিক শূন্যতা' বা 'অতীত' প্রবন্ধেও এই ধরণের ভাব ও ভাষার সুন্দর মিশ্রণ হয়েছে। একটাই মূল সত্য, তাকে কেন্দ্র করে তাঁর কল্পনার জাল রচিত হচ্ছে গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়ে। যে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছেন, ভাষাও তারই সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলেছে, যেমন :

বর্তমানের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। আমরা বর্তমানে অনেক জিনিস এত বেশী করিয়া দেখি যে তাহার রহস্যটুকু, সৌন্দর্যটুকু মুছিয়া যায়। ছবি নিকটে আসিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে রঙের আতিশয্য বই আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে···বলা বাহুল্য প্রথমাবস্থায় আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে পাই। চিত্রে তাহার অস্ফুট ছায়া মাত্র দেখি, বস্তু গিয়াছে, ভাবমাত্র অবশিষ্ট।

এইখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের স্মিত তুলনা-প্রয়োগ এবং অর্থসমন্বিত ভাবের সরস বিকাশ শেষ হত না। তাই আরও একটু ভাষ্যের প্রয়োজন, আর একটু কবিত্বময় সাদৃশ্যের বিস্তার। অতএব তিনি বলেন :

অতীতেও বস্তু গিয়াছে—ভাব আছে মাত্র। সেই ভাবই স্মৃতি। স্মৃতিতেই অতীত মধুর। বর্তমানে বস্তুরই অধিকার—ভাব যেন ফুটিতে পায় না। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থায়ী। এইজন্য অতীত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে, অতীতের জন্য আমরা বিলাপ করি। বর্তমান প্রতিদিন শুকাইয়া যায়। অতীত আসিয়া সেই শুষ্ক ভূমির উপরে শ্যামল উদ্যান রচনা করে।

এখানে ভাব ও ভাষার কি মিলন হয় নি? হয়তো আধুনিক দৃষ্টিতে এটা অতিকথনের মতো মনে হবে। যতটা পরিসরে তিনি অতীতের স্মৃতিধর্ম বুঝিয়েছেন, তার চেয়ে আরো সংক্ষেপে ঘনবদ্ধ যুক্তিতে একটিমাত্র প্রতিপাদ্যকে খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু প্রাচুর্য আর সরসতাই তাঁর মনের ও কলমের যথার্থ পরিচয়। একে বাগ্‌বাহুল্য বলব না ; বলব মর্ম-বিস্তার। একটি বক্তব্যকে ঘিরে কথার জাল-বুনন চলছে। এটা কল্পনাবিলাস, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর কাছে এটা অপরিহার্য। ভাষাকে সংকুচিত করে আনলে 'অতীত' প্রবন্ধটির বিষয়গত ত্রুটি হত না। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রাণহানি ঘটত। তাই মনে হয়, বলেন্দ্রনাথে ব্যক্তিত্বে আর স্টাইলে দুটি বিরোধী জিনিসের সমন্বয় ঘটেছিল। সৌন্দর্যপিপাসায় তিনি মুক্ত। আলোচনায়,

ব্যাখ্যায় ও টিপ্পনীতে তিনি অভিব্যক্ত। এই স্বভাব আর সংস্কার এই 'ফ্রীডম' আর 'সোফিস্টিকেশন' উভয়ের মিশ্রণ তাঁর দৃষ্টিকে সহজ অথচ তীক্ষ্ণ এবং ভাষাকে মুখর অথচ উজ্জ্বল করেছিল।

ঘরোয়া আটপৌরে জিনিসের বর্ণনাতেও বলেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি স্ফূর্তিলাভ করে। সরসতা ও প্রাঞ্জলতা, যা তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য, তা নষ্ট হয় না। এ দিক থেকে 'গৃহকোণ' প্রবন্ধটি তাঁর প্রতিভার প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে। মাটির প্রদীপের ক্ষীণ শিখায় গৃহকোণ এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যে ছোটোখাটো জিনিসগুলি নজর এড়ায় না। তারপর 'গৃহকোণে'র গৃহলক্ষ্মী, পুকুরপাড়, আমবাগান, বাঁশঝাড়, সরষেক্ষেতের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, ঘরের থালাবাসন, পূজার দ্রব্য—সব কিছু মিলে একটা ভাবঘন সুন্যস্ত গার্হস্থ্য চিত্র মনের পটে চিরকালের জন্য এঁকে যায়। তেমনি 'শুভ উৎসব' এবং 'নিমন্ত্রণ-সভা'। মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এগুলি ভরপুর। সূক্ষ্ম কৌতুকের অভাব নেই, আবার অতীত দিনের সামাজিক প্রথা ও আচারগুলি খাঁটি স্বদেশী ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরল দৈনন্দিন জীবনের আলো ছায়ায় স্নিগ্ধ হয়ে, পাঠকের মনে অনতিরঞ্জিত সমাজস্মৃতি জাগ্রত করে। 'নিমন্ত্রণ-সভা'র আরম্ভেই বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

> ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রণশালার সজ্জায়োজন বড় অধিক নহে। কদলীপাত্র ও মৃৎপাত্র হইলেই আমাদের বৃহৎ যজ্ঞ অনায়াসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপরে যদি একখানি কুশাসন জুটে তাহা হইলে যজ্ঞশালা সজ্জার কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না।…ইংরাজের মত দশ কুড়িটি অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে।

আবার প্রবন্ধশেষে—

> সব শুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব…আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ। এবং এই শুভ সংকল্পটুকু ক্রমশঃ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে ইহাই সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়…

এই মন্তব্যটি পড়লে লেখকের বিজাতীয় ভাব বর্জন এবং বিগত বাংলার সামাজিক সদাচারের প্রতি অনুরাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মানসলোকের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি, স্পর্শকাতরতা, আকরুণ আকুলতা, কাব্যের প্রসন্ন প্রাণবন্ত মূর্তি নিয়ে চোখের সামনে ভাসে তাঁর স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে। নানা ধরনের স্মৃতি, অতীতের ও বর্তমানের অজস্র উপভোগের তীব্র কোমলতা ছড়িয়ে আছে 'যাত্রা', 'জানালার ধারে', 'কাহিনী', 'একরাত্রি', 'বনপ্রান্ত' এবং 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি রচনায়। এগুলি বার বার পড়লে পাঠকের মন ভাষার ও কল্পনার মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ সব লেখায় স্মৃতি পটভূমির কাজ করে, আবেগ আর কল্পনা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। 'যাত্রা' প্রবন্ধটিতে ভাষা যেন পুরাতন অভিজ্ঞতার এক আবছা স্মৃতিতে ধূসর ও মধুর হয়ে ওঠে, একটা অস্পষ্টতার রহস্য ঘনিয়ে তোলে—যেমন 'বনপ্রান্ত' লেখাটির শেষ অংশে গরুর গাড়ির ঢিমে চাল নিঃশব্দ কল্পনার মন্থর আবর্তনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে যায়—

> আমার সেই গরুর গাড়ীটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীও চলিয়াছে, বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই।

দুটি প্রবন্ধেই একই চিত্ররূপী কল্পলোক—যেখানে অফুরন্ত যাত্রার ম্লান নিঃসঙ্গতা বিদায়ের ও অপরিচয়ের বেদনাকে আকাশে বাতাসে কম্পিত করে রেখে যায়। 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' এমনি আর-একটি অনবদ্য রচনা,

যার স্বকুমার সৌন্দর্য দুপুরের গরম হাওয়াতেও মুখের উপর এক ঝলক শীতল শান্তি বুলিয়ে দিয়ে যায়। এ প্রবন্ধে বোলতাকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে বলেন্দ্রনাথ প্রেমের ও কাব্যের যে তীব্র দহন-সুখ, তার যথার্থ রূপটি এঁকে দিয়েছেন। এই বিগলিত স্বর্ণময় দ্বিপ্রহরের অসীম আলস্য ও নৈরাশ্য যেন বিধূনিত বায়ুতরঙ্গে ভেসে বেড়ায়। এক বছর আগেকার রচনা 'বোলতা' দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে পরিণতি লাভ করেছে, বঙ্কিমী ঢং থেকে মুক্ত হয়ে কাব্যের মর্মকোষ উন্মুক্ত করেছে। এই সব স্মৃতিমূলক রচনা পড়লে মনে হয় সৌন্দর্যের কত সহজ, কত অতৃপ্ত সাধক ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধস্পর্শে ভরা নিত্যপ্রবহমান সৌন্দর্য-স্রোতকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করতে পারবেন না বলেই কি তাঁর এত বিষণ্ণ বিহ্বলতা? 'উত্তরচরিত' আলোচনায় কি তাই কীট্সের 'নাইটিঙ্গেল' কবিতা থেকে তিনি একটি সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতার আক্ষেপোক্তি সযত্নে উদ্ধৃত করেছিলেন?

> My heart aches and a drowsy numbness pains
> My sense, as though of hemlock I had drunk…

বলেন্দ্রনাথ কবি— 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থে তিনি যে কবি, তার চেয়ে অনেক সার্থক ও পরিণত কবি তিনি তাঁর গদ্যরচনায়।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যপ্রকাশিকা। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা ৭। মূল্য দশ টাকা।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণার সব তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের সুপরিজ্ঞাত নহে। এখনো নিত্য নূতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই সব পুঁথি কোথাও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিতেছে, কোথাও সে আমাদের পুরাতন ধারণা একেবারে বদলাইয়া দিতেছে। এইসকল নূতন নূতন পুঁথির আবিষ্কার ব্যতীত আমাদের সাহিত্যে অল্পপরিজ্ঞাত কতগুলি বিষয়ও রহিয়াছে— সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের অল্পজ্ঞতা বহুদিন যাবৎ কতগুলি অস্পষ্ট— এবং অনেকস্থলে ভ্রান্ত— ধারণার সৃষ্টি করিতেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভালোভাবে গবেষণা করিতে হইলে আমাদের এই নবাবিষ্কৃত তথ্য এবং অল্পজ্ঞাত তথ্য, উভয়কে লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন এই গবেষণার কাজ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যাভবনের গবেষণালব্ধ তথ্য সংগৃহীত হইয়া এই প্রথম খণ্ড সাহিত্যপ্রকাশিকা মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় মুখবন্ধে ডক্টর বাগচী জানাইয়াছেন যে, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় অনেকগুলি মূল্যবান্ বাংলা পুঁথি সংগৃহীত আছে, সেই সব পুঁথির বিবরণ এই গ্রন্থমালায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে— কোনো কোনো পুঁথিও সুসম্পাদিত হইয়া এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন হইতে এই গবেষণা ও গ্রন্থমালা প্রকাশ অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। ইহা যেমন এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়া গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে, তেমনই, আমাদের বিশ্বাস, ইহা বিশ্বভারতীর মর্যাদাও বৃদ্ধি করিবে। বাংলায় এই-জাতীয় গবেষণা-প্রকাশক গ্রন্থের একান্ত অভাব। সাময়িক পত্রসমূহ গবেষণাত্মক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশে স্বভাবতঃই

অক্ষম ও অনিচ্ছুক; অথচ গবেষণাকে সর্বত্র 'সরস ও সংক্ষিপ্ত' করিয়া তোলা নিরাপদ নহে— হয়ত সম্ভবও নহে; সুতরাং ইহার জন্য পৃথক্ গ্রন্থমালার একান্ত প্রয়োজন; বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন এ-বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সাধুবাদের ভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের এই আদর্শ অন্যত্রও অনুসৃত হইবার যোগ্য।

সাহিত্যপ্রকাশিকার আলোচ্য প্রথম খণ্ডে আমরা বাংলা সাহিত্যের দুইটি বিশেষ দিক্ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল আলোচনা করিয়াছেন কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী' বিষয়ে; আর শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় আলোচনা করিয়াছেন 'বাংলার নাথসাহিত্য' বিষয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দৌলত কাজির আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি বিশেষ স্থান আছে। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশের একেবারে পূর্বপ্রান্তে আরাকান-রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি আশ্চর্য প্রসার ঘটিয়াছিল। এই রাজসভায় যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই দৌলত কাজি এবং তৎপরে কবি আলাওলের নাম করিতে হয়। বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিগণের যৌথ সাধনায় সমৃদ্ধ। মুসলমান কবিগণের মধ্যে কবি দৌলত কাজিকেই সর্বপ্রথম কবি বলা না গেলেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক মুসলমান কবি। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই— তাঁহার অসম্পূর্ণ কাব্য তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কবি আলাওল সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। কবি দৌলত কাজির এই গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য; অধ্যাপক ঘোষাল এখানে কাব্যখানির একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ দিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজন করিয়া এই কবি ও তাঁহার কাব্য, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া আরাকান-রাজসভা ও তথায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক ঘোষাল যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান-রাজসভায় যে মুসলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতেছিলেন তাঁহারা কোনো রাজনৈতিক কারণে হিন্দু কবিগণ হইতে একান্তভাবে অসমগোত্রীয় ছিলেন না। তাঁহারা ঐতিহ্যসূত্রে একই বাঙালী বিশ্বাসপ্রবণতা ধ্যানধারণা, একই ভাব ও ভাষার অধিকারী ছিলেন। তাই কবি দৌলত কাজি বা কবি আলাওল গ্রন্থারম্ভে মুসলমান ধর্মের বিধি অনুযায়ী বন্দনাদি করিলেও কাব্যমধ্যে ভাবে ও ভাষায় নিজেদের কোথাও বৃহত্তর বাঙালী-মানস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই। এমন কি, আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, ধর্মের ক্ষেত্রেও অবোধপূর্বভাবেই তাঁহাদের লেখার মধ্যে একটা জনপ্রিয় সমন্বয়ের আভাস রহিয়াছে। আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের প্রতি অধ্যাপক ঘোষাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন— তাহা হইল তৎকালীন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উপরে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বাতিশায়ী প্রভাব। সুদূর আরাকানে বসিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি যখন একান্ত পার্থিব প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া ব্রজবুলির অনুকরণে কবিতা লিখিতেছেন—

মোহর সুনায়ক — গুণের পালক
মধুর মূরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষপান
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং॥

তুহু বড় পাপিনী পাপ শুনাওসি
ধরম করাওসি বামং।
পাতকী ঘাতকী ধাই কি মোক চিন্তসি
জাতি কুল করহ নির্ণামং॥

অথবা কবি শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যখানি সম্মুখে রাখিয়া যখন বর্ণনা করিতেছেন—

নবচুত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলী কল কল কুজিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে॥
কেতকী চম্পক কদম্ব কুরুবক
বকুল-মুকুল-কুল রঙ্গে।
হেরইতে মধুর মধুপানে মধুকর
মানিনী মান বিভঙ্গে॥

তখন সত্যই আশ্চর্যন্বিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় নিবন্ধে শ্রীযুত সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলার নাথসাহিত্য বিশেষ করিয়া গোরক্ষ-বিজয় বা গোর্খ-বিজয় এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকে অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যদিও আলোচনাপ্রসঙ্গে কতগুলি ঐতিহাসিক বিতর্কের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইয়াছে এবং বিচার-বিবেচনার পরে তথ্যগত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথাপি ঐতিহাসিক বিচার তাঁহার মুখ্য কাজ নহে— এই সকল গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যবিচারই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সুখময়বাবুর সমস্ত আলোচনা পড়িয়া আমাদের প্রধানতঃ দুইটি কথা মনে হইয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার আলোচনা একটু অকারণ দীর্ঘ মনে হইয়াছে; বিষয়ের প্রতি কোনোরূপ অবিচার না করিয়াও আলোচনাটি আরো অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সংহত করা যাইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, সব জাতীয় সাহিত্যরচনা সম্বন্ধেই একই বিচারবিধি সুপ্রযুক্ত নয়। লোকসাহিত্যের নিজস্ব কতগুলি বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ থাকে— তাহাদের বিচারে সেই বিশেষ আকর্ষণগুলিকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই বেশি দরকার। অভিজাত সাহিত্যলক্ষণ এই সব সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে সে চেষ্টা সর্বত্র সুষ্ঠু নাও হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে সেই চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়াই কথাগুলির উল্লেখ করিলাম।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

নদীপথে। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। বিশ্বভারতী। পৃ ৬৮। মূল্য দুই টাকা। শ্রীপরিতোষ সেন চিত্রিত।

আমাদের মনের মধ্যে যে যাযাবর পাখিটা দিনরাত ডানা ঝাপ্‌টিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "নদীপথে" পড়বার পর সে কিছুক্ষণের জন্য কতকটা শান্ত হয়ে এল।

রবীন্দ্রনাথ একবার চিঠিতে লিখেছিলেন যে অত কষ্ট ক'রে জিনিসপত্র বাক্সবন্দী ক'রে, অজস্র টাকাপয়সার শ্রাদ্ধ ক'রে, রেলগাড়ি ইত্যাদিতে চেপে হাওয়া বদল করার চেয়ে, দিব্যি টেবিলের কাছটি থেকে সরে এসে

জানলার ধারে বসলেই তো দৃশ্য ও হাওয়া উভয়ই বদল করা হয়। উপরন্তু পাগলের মত পৃথিবীটার পিছনে ছুটে বেড়াতে হয় না, বরং পৃথিবীটাই কাছে এসে ধরা দেয়। এ বইখানি পড়ে সে কথাও মনে হল।

রচনার কোনো চটকদার গুণ নেই, নিরলংকার ঝরঝরে পরিষ্কার বাংলায় লেখা কতকগুলি চিঠি মাত্র। তাদের মধ্যে লোকদেখানো কোনো গুণপনা নেই, কোনো দার্শনিক তত্ত্বকথা নেই, কোনো কাব্য গাওয়া নেই, কোনো চালাকি-চাতুরীর বালাই নেই।

পুরোনো দিনের সব কথা; বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সতেরো বছর আগে; ঘটনাগুলি ১৯৩৪, ১৯৩৫, ১৯৩৬ সালের। অথচ লেখক যেন আমাদের সুদ্ধ নিয়ে গিয়ে এক অপরিচিত নদীজগতে উপস্থিত করলেন।

সেখানে অদৃশ্য ও অবিবেচক ইংরেজ প্রভুদের অনিচ্ছুক ভৃত্য, মুসলমান সারেং-বাট্‌লারদের হাতে আত্ম-সমর্পণ ক'রে, নিশ্চিন্ত সুখে, দেবদুর্লভ অনাবিল আলস্যে দিন কাটাতে হয়। বাঙালী যাত্রী পেয়ে জাহাজে ইজি-চেয়ার বা পর্দা-ঝালরের বাহুল্য থাকে না। দুই পাশে দুটি মালবোঝাই ফ্ল্যাট বাঁধা থাকে। ঘাটে লাগবার সময় আবার স্থানাভাবে তাদের দু-একটাকে মাঝ-নদীতে খুলে আসতে হয়। মাল নামে, মাল বোঝাই হয়। খাবার জল আর কাঁচা রসদ ফুরিয়ে যায়। নদীর উপরে বাস করেও ভালো মাছ পাওয়া যায় না। ছোট একটা কাতলা কি অসময়ের ইলিশ জুটল তো বহু ভাগ্য। তবে উকিল মহাশয়ের কাছে জমিজমা সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে এখানেও লোক আসে। হরবোলা নানান পাখির ডাক শুনিয়ে যায়। পাটের নৌকোর সঙ্গে ছোটখাটো একটা ঠোকাঠুকিও লাগে, তাতে কারো বিশেষ ক্ষতি না হ'লেও, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে দুটো দুটো রিপোর্ট লিখে দিতে হয়। আর পরদিন পর্যন্ত সারেঙের মন খারাপ হয়ে থাকে।

আকাশে টিপি টিপি মেঘ জমে, উত্তরে হাওয়া বয়, কিন্তু সামনের ডেকটা রোদে ভরে থাকে। এখানে ওখানে রোমাঞ্চকর নামধারী সব জায়গায় কুয়াশার জন্য বা ভাঁটা পড়ার জন্য একনাগাড়ে পাঁচ-সাত ঘণ্টা জাহাজ আটক থাকে। তার পর সপ্তমুখী নদী বেয়ে, নামকানা খাল ধরে সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে চলে। সুপুরি-নারকেল বনের ওপারে সূর্য অস্ত যায়, নদীর জল গোলাপি রং দিয়ে ঘোলা হয়ে ওঠে। ক্রমে সন্ধ্যা নামে, মাঝিমাল্লারা পিছনের ডেকে নামাজের আজান দেয়। বিচিত্র তাদের জীবন। পরীক্ষা পাশ দিয়ে সারেঙের কাজ পেতে হয়, তাও সাদা চামড়াদের চেয়ে অনেক কম মাইনেতে। পাট দিয়ে সাবানজল দিয়ে জাহাজখানিকে আগাগোড়া চকচকে করে রাখে। সন্ধ্যাবেলা রোজা ভাঙবার সময় এক-একটা বড় থালায় ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়ে, তিন-চারজন একসঙ্গে বসে যায়।

এত অভিজ্ঞতা লেখক একবারেই লাভ করেন নি। সময়ের সঙ্গে এ রকম যাত্রায় কারো কোনো সম্পর্ক থাকে না। প্রথম বছর জগন্নাথ ঘাট থেকে ধীরে সুস্থে ঝালকাটি পৌছতেই ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এক বছর পরে, মাঝে কোথাও না থেমে, কলকাতা থেকে বরাবর ঝালকাটি অবধি চলে এসে, আবার শুরু হয় সেই ঢিমে-তেতালা ছন্দে ছুটি ভোগ।

এবার পদ্মা নদী ধরে গোয়ালন্দ অবধি অগ্রসর হওয়া যায়। তারপর আরো এক বছর বাদে ঢাকা মেলে গোয়ালন্দ পৌছে, সেখান থেকে আবার নৌবিহার শুরু হয়। এবার সিরাজগঞ্জ পেরিয়ে, ফুলছড়ি ঘাট পিছনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র ধরে, চিলমারি হয়ে ধুবড়ি। সেখান থেকে বিলাসীপাড়া, গোয়ালপাড়া, পলাশবাড়ি, পাণ্ডুঘাট, গৌহাটি, তেজপুর। সেইখানে এসেই স্বপ্নরাজ্যের শেষ সীমানায় পৌছনো গেল।

সেখানকার নদীর সঙ্গে, বাংলাদেশের সুপুরি-নারকেলের বন আর আমবাগান-কলাবাগানের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিতা নদীটির কোনোই সাদৃশ্য নেই। এখানে তীরে লম্বা লম্বা ঘাস আর পাহাড়ের লাইন, তাদের মাথায় কুয়াশা জমে আছে, জলের ধার ঘেঁষে নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়, তাদের মধ্যে কোনোটা অনাবৃত কালো পাথরে ঢাকা।

গ্রন্থখানি ছাপা হবে বলে লেখা হয় নি, সেইজন্য এমন একটি মন-কেমন-করা বই খুঁজে পাওয়া দায়। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিরল, সেটি হল মনের শান্তি। মনে হয় লেখক তার সন্ধান পেয়ে থাকবেন। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি সর্বদা নায়কের পদ পরিহার করে, পা দুটি মেলে দিয়ে, দর্শকের আরামকেদারায় বসে থাকেন।

শ্রীলীলা মজুমদার

পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা। অশোক মিত্র প্রণীত। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরঙ্গী টেরেস, কলিকাতা। দাম চার টাকা।

সংস্কৃতির একটি লক্ষণ সার্বজনীনতা। শুধু দুচারটি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ নয়। উনিশ শতকের বাঙালী, এমন কি বিশ শতকের গোড়ার পাদেও বাঙালীর শিক্ষায় এই সার্বজনীনতা এবং বিভিন্নমুখিতা ছিল। সকলেই যে সব বিষয় জানতেন তা নয়, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী অনেক বিষয়ে অনেক কথা জানতেন। বঙ্গদর্শনের পাতা ওলটালে এ কথা বোঝা যায়। কত বিষয়েরই আলোচনা তাতে হত! সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সামাজিক শাস্ত্র, ইতিহাস— আরো কত কি। সমাজপতির পত্রিকা 'সাহিত্য' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁদের সাহিত্যিক রুচির মানদণ্ড আজকের বিচারে চলবে এমন কথা নিশ্চয়ই বলছি না—কিন্তু তাতে লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল রুচির বহুমুখীনতা। ইতিহাস, শিলালিপির পাঠোদ্ধার, সমাজতত্ত্ব, ইত্যাদি বহু বিষয়ের আলোচনা থাকত তাতে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের কাগজ চলা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না, যদি-না তখন পাঠকের চিত্তও মোটামুটি এইসব বিষয়ে উৎসুক থাকত। সে তুলনায় আজকের দিনের পাঠকের রুচির বিচার করলে দেখা যায়, রুচি যেন অনেকখানি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বস্তুতঃ এই লক্ষণ শুধু বাঙালী পাঠকেরই নিজস্ব নয়— এ বোধ হয় সারা জগতেরই একটি আধুনিকতম লক্ষণ। জীবন যত জটিল হয়ে পড়ছে, জীবনের বিভিন্ন দিকে যত বিশেষীকরণ হয়ে উঠছে, ততই আমরা বিশেষজ্ঞদের অধীন হয়ে পড়ছি, কিন্তু এই নব বৈশেষিক দর্শনে জীবনের সমগ্রতা খণ্ডিত হয়ে চলেছে। সত্তার খণ্ডীভবন এবং সংস্কৃতির চূর্ণীভবন (atomisation) এ যুগের সাংস্কৃতিক সংকটের অন্যতম লক্ষণ। এ কথা সত্য যে আজকের দিনে সে-মানুষ দিয়ে চলে না যে-মানুষ পাঁজিপুঁথি দেখে একটা যাত্রার দিন ঠিক করে দিতে পারতেন, নাড়ী দেখে মোটামুটি রোগটাও বাতলে দিতে পারতেন এবং দরকারমত চাষবাসেরও দুচারটে হদিস দিতে পারতেন। আজ জীবনযাত্রা আর এত সহজ নয়, যাতে নানা বিষয়ে ঐ রকম অশিক্ষিতপটুত্ব দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, একালে ঐ রকম অশিক্ষিতপটুত্ব অচল হলেও সত্তার খণ্ডীভবন সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের পরিপূরক নয়। সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশ হতে গেলে জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। হয়তো তা আগেকার মত অত সহজে আর হবে না, হয়তো তার জন্য কিছুটা বিশেষ জ্ঞান দরকার—

কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে যে, সেই বিশেষ জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। তা না হলে আমরা জীবনের বিভিন্ন দিকের আস্বাদ পাব না, আমাদের সংস্কৃতিও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে না।

সেই দিক্ থেকে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র প্রণীত 'পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা' বইখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা সম্বন্ধে খুব বিশেষ তর্কবিতর্কপূর্ণ বই রচনা করেন নি— পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার সঙ্গে সাধারণ এবং সহজ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের কথাতেই "পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার সাধারণ পরিচয় ও শিক্ষার জন্য বইটি লেখা।" সে কাজে তিনি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। শুধু "স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা" নয়, প্রত্যেক সাধারণ বাঙালী পাঠকই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ অনুভব করবে। তিনি আদিযুগ থেকে তাঁর কাহিনী শুরু করেছেন। আল্‌টামিরা প্রভৃতি গুহার গাত্রে অঙ্কিত আদিম ছবি দিয়ে তাঁর বর্ণনা শুরু করেছেন। তার পর ইজিপ্টের ছবি। তার পর তিনি গ্রীক চিত্রকলার এবং প্রথম যুগের খ্রীস্টিয়ান চিত্রকলার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তার পর তিনি প্রাক্-রেনেশাঁ যুগের কথা আলোচনা করে বিখ্যাত রেনেশাঁ যুগে পৌঁছেছেন। তার মধ্যে আবার ছোট রেনেশাঁ এবং আসল রেনেশাঁ। প্রত্যেক দিকেই তখন ধর্মের বন্ধন থেকে মানবচিত্ত মুক্তিলাভ করছিল, ছবিতেও ধর্মবহির্ভূত ছবি আঁকা শুরু করলেন বিখ্যাত চিত্রকর বত্তিচেল্লি। তার পর পেরুজীনো রাফায়েল্লো মিকালেঞ্জেলো দা ভিঞ্চি প্রভৃতি অমর শিল্পীর আবির্ভাব হল— ইতালীয় ভাবতরঙ্গ পূর্ণ জোয়ারে বইতে লাগল। শুধু কি চিত্রকলা? স্থাপত্য, ভাস্কর্য— সব দিকেই এই ভাবতরঙ্গের পূর্ণ জোয়ার। শ্রীযুক্ত মিত্র শুধু এই ভাবতরঙ্গেরই বর্ণনা দেন নি, তার সঙ্গে বিখ্যাত ছবিগুলিরও বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছবিরও প্রচুর নমুনাও ছেপেছেন। তার পর পরে পরে অন্যান্য যেসব বড় শিল্পী এসেছেন— যেমন রেমব্রাণ্ট্, রুবেন্স ইত্যাদি ডাচ্ শিল্পী, ডিউরর প্রভৃতি জার্মান শিল্পী, ভেরমীয়র, গ্রেকো, ভেলাস্‌কেথ ইত্যাদি বহু শিল্পীর পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ফরাসী ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পী এবং পিকাসো-তে পৌঁছেছেন। এইভাবে পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন।

বস্তুতঃ এ বইটির খুব প্রয়োজন ছিল এবং এ বইটি একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছে বলে মনে হয়। পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা এক নতুন বস্তু, আমাদের পক্ষে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব জগৎ। ভারতীয় চিত্রকলার— এমন কি চীনা বা জাপানী চিত্রকলার— ঐশ্বর্য অনন্ত, তার নানা দিকে বিকাশ ঘটছে, তার বহু দিকে গতিবিধি। কিন্তু তাদের সঙ্গে পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার মূলগত তফাত আছে। সাধারণ দর্শক হিসেবে আমার বারবার মনে হয়েছে, প্রাচ্য চিত্রকলায় ছবিটি হচ্ছে ভাবদ্যোতনার উপলক্ষ্য মাত্র, রং ছবি পটভূমি সব মিলিয়ে একটি ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হওয়াই তার সবচেয়ে বড় কথা। সেইজন্য সেখানে দীর্ঘায়িত চক্ষু বা আঙুল মোটেই অমানান নয়। অথবা চীনের ছবি— ধূসর পটভূমিকায় একটি শুকনো ডালে একটি ঝোড়ো পাখি। কিন্তু ইওরোপের চিত্রকলা, মনে হয়, ঠিক এ পথে যায় নি। সেখানেও ভাবসৃষ্টির অপূর্ব মহিমা আছে— মোনা লিসার কথা কে না জানে, অথবা রাফায়েলের ম্যাডোনার ছবিগুলির? কিন্তু একেবার একালের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলায় ভাবসৃষ্টির অপূর্ব মহিমা থাকা সত্ত্বেও সেখানে ছবিতে শারীরিক গঠন এবং অবয়বের যাথার্থ্য রক্ষা করা হত। তার সঙ্গে পশ্চিমী ছবির আর-একটি বড় কথা হল কম্পোজিশন। কত মানুষের ভিড় ছবিতে! এক-একটা বড় ছবি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যেমন ভ্যাটিকানে রাফায়েল্লো রুমসের রাফায়েলের ছবিগুলি। অথবা সিস্টিন চ্যাপেলের গায়ে আঁকা মিকালেঞ্জেলোর

অপূর্ব কীর্তি। কত মানুষের ভিড় ছবিতে, আর কি বৃহদাকারের মানুষ! ওয়ারউইক ক্যাসলে ভ্যান ডাইকের আঁকা একখানি সিংহের ছবি আছে। জনশ্রুতি এই যে, সেই ছবি যখন আঁকা হয়েছিল তখন সেই সিংহ দেখে কুকুরেরা ভয়ে চীৎকার করতে করতে পালিয়ে যেত— এমনই জীবন্ত সে ছবি। যাঁরা রুবেন্সের ছবি দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই অনুভব করছেন, কী জীবন্ত জলন্ত প্রতিমূর্তি! কাজেই ভাবদ্যোতনার প্রক্রিয়া এই চিত্রধারায় অন্য। আমরা যারা সাধারণতঃ অন্যরকম ভাবপ্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে পশ্চিম ইওরোপের চিত্রধারা একটি সম্পূর্ণ নূতন ও অন্য ধরনের জগৎ। সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত মিত্র এমন একটি সুখপাঠ্য সুন্দর এবং ধারাবাহিক আলোচনা বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদই শুধু অর্জন করেছেন তাই নয়, সংস্কৃতির খণ্ডীভবনের যুগে সাংস্কৃতিক প্রসারের সহায়তাও করেছেন—তার জন্যও তিনি ধন্যবাদার্হ।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত 'মুরলী করাও উপদেশ' চিত্রখানি কলিকাতায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর বিগত বার্ষিক প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; ব্লকও উক্ত অ্যাকাডেমির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গত (কার্তিক-পৌষ ১৩৬২) সংখ্যায় ১৬৩ পৃষ্ঠার সম্মুখে মুদ্রিত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ফোটোগ্রাফ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত।

স্বরলিপি

যে যাতনা যতনে মনে মনই জানে

পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে ॥

প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী নিরবধি সাধি প্রাণপণে।

তবু তো সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে ॥

কথা[১] ॥ শ্রীধর কথক

স্বরলিপি ॥ শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

[ধপা -মপা -মজ্ঞা]

II -া -া { র্সা -া । -^র্ণা -া ধা পা । ^পমা -জ্ঞা -রজ্ঞা -রসা । -রা রা ^রজ্ঞরা -ণধা I
০ ০ যে ০ ০ ০ যা ত না ০ ০০ ০০ ০ য ত০ ০০

I পা -া } -া -া । -া -া -া -ধপা । মা -গা মপমা -া । -া -া -া -জ্ঞরা I
নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ম ০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I রজ্ঞমা -পা -া -া । -া -া মা জ্ঞা । রা -া -া -া । -া -া -া -জ্ঞরা I
ম০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নই জা নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০

I সা রা মা পা । ধা ধণধা -পধা -ণর্সণা । ধা পা -া -া । -া -া -া -া I
পা ছে লো কে হা সে০০ ০০ ০০০ শু নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পধা ণা র্সা -ণর্রা । -র্সর্রর্সা -া -া ণধা । পমা -ণধা -র্সণা -ধপা । মা -জ্ঞা -রসা -রা II
লাজে প্র কা ০০ ০০০ ০ ০ শ০ ক০ ০০০০ রি নে ০ ০০ ০

II {মা মা ^মণা -ধপা । -ধা না না ^নর্সা । -নর্সনা -ধনা -র্সর্রর্সা না I
প্র থ ম ০০ ০ মি ল না ০০০ ০০ ০০০ ব

I র্সা -া -া না । না র্সা র্সা -া । না র্সা -া -া । -নর্সা -র্রর্সা -ণর্সা ণা I
ধি ০ ০ যে ন ক ত ০ অ প ০ ০ ০০ ০০ ০০ রা

I ধা -া (-ণধা -পমা)} । -া -ণধা । {পা -র্সা -া ণধা । পা পা -া -া । -ধণধা -পধপা -মগা -মা I
ধী ০ ০০০০ ০০০ নি ০ ০ র০ ব ধি ০ ০

I -া -া -া পা । ^পণা -ধপা -ধা -া । না -া র্সা -র্রর্সা । না -া র্সা -া I
০ ০ ০ সা ধি ০০ ০ ০ প্রা ০ ণ ০০ প ০ ণে ০

I {-া -া মা ণা । ধা -া -া -া । ধা ধা ধণর্সা -ণা । -ধা -ণা ধা পা} I
০ ০ ত বু তো ০ ০ ০ সে না হি০০ ০ ০ ০ তো ষে

I -া পা ধা ণা । র্সা -া ণা -ধা । পমা -ণধা -র্সণা -ধপা । মা -জ্ঞা -রসা -রা II II
০ আ রো দো ষে ০ অ ০ কা০ ০০ ০০ ০র ণে ০ ০০ ০

১ সুর কাফি-সিন্ধু। আড়াঠেকা। রাগ-তাল নির্দেশে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবোধ নন্দীর সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে।

পার্থসারথি : শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩

চিঠিপত্র

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার বাবা যদি আমার চিঠি না পেয়ে থাকেন সে তোমার বাবার দোষ। তিনি আমাকে কি একটা পাহাড়ে গোছের ঠিকানা দিয়েছিলেন আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস করে সেই ঠিকানাতেই জবাব দিয়েছি। এখন বুঝতে পারচি তিনি আমাকে ঠকিয়েছেন। তা হোক্— একরকম ভালোই হয়েছে কারণ সেই জন্যেই তোমার চিঠিখানি পেলুম। চিঠির মধ্যে ছাতিম গাছের যে কবিতাটি লিখেছ সেটি সুন্দর হয়েছে— ঐ ছাতিমে ভাবী কালে যে ফুলের মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্চি। কাব্য-সরস্বতী তাঁর নৈবেদ্যের জন্যে এখন থেকেই তোমাকে বায়না দিয়ে রেখেচেন সেটাতে আর সন্দেহ থাকচে না,— আমি পূজার দিনে উপস্থিত থাকব কি না বলতে পারিনে— কিন্তু একটা আনন্দ এই যে আমরা যে ডালি সাজিয়ে গেলুম তারি মধ্যে তোমার নব বিকশিত ফুলগুলি এসে মিশবে।

তোমাদের রবীন্দ্রপরিষদে[১] যে রবীন্দ্রকে তোমরা আহ্বান করেচো সে তো অশরীরী রবীন্দ্র— বাণী তার বাহন,— আর এই যে দেহধারী রবীন্দ্রনাথ এ আসন খোঁজে তোমাদেরই সংসদে— এর মেয়াদ অল্প— যে ক'টা দিন আছে তোমাদের একটুখানি যত্ন আদর আর ছাতিমগাছের দুটো একটা ফুল উপহারে নগদ বিদায় চায়— এমন কি ঐ সম্ভবত সুচিরস্থায়ী পরিষদের রবীন্দ্রনাথের পরে তার ঈর্ষা জন্মে। অতএব বাবাকে মাকে নিয়ে শীঘ্র শান্তিনিকেতনে চলে এস, তার পরে অন্য কথা হবে। ইতি ২৭ কার্ত্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্রপরিষদ

২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমরা ডাক দিলে আসন টলে না এত বড় স্থাবর পদার্থ আমি নই— কিন্তু অদৃষ্ট যে খাঁচা বানিয়েচেন তার লোহার শলাগুলোকে বিধাতা বধির করে গড়েচেন। মিষ্টি গলায় ওরা যে এতটুকু গলবে এমন নম্রতাও ওদের নেই। তাই বেরোবার ফাঁক পাচ্চিনে। বহুকাল অনুপস্থিত ছিলুম— সেই দীর্ঘ সময়ের লোকসানটা অল্প সময়ের মধ্যে ঠেসে পুরিয়ে নেবার জন্যে মনিব তাড়া লাগিয়েছেন। মনিব যদি বাইরেকার কেউ হতেন, তাহলে ফাঁকি দিয়ে আপিস পালাতুম কিন্তু ইনি অন্তরে বসে তাগিদ করেন এঁর শাসন এড়াবার জো নেই। খবর নিশ্চয় পেয়েছ একটা গল্প[২] লিখতে সুরু করেছি— মাঝে দীর্ঘকাল ছেদ পড়ল— আবার জোড় মেলাতে হচ্চে। লেখা জিনিস তো ছুতোরের কাজ নয়, অর্থাৎ শুকনো কাঠের কারবার একে বলে না,— এ মালীগিরি, সজীব গাছের ডালপালা নিয়ে কাজ— কাটা ডাল দীর্ঘ অনাদরে শুকিয়ে গেলে তখন মাটিতে পুঁৎলেও শিকড় ছড়ায় না, কলমের জোড় লাগাতে গেলেও আর জোড়ে না, খসে পড়ে। এই জন্যে ভাঙা গল্পটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে তার তদ্বির করতে লেগেচি। এই যে কাজে নিযুক্ত আছি এর ফল তোমরাই ভোগ করবে— আমি তো তোমাদেরই মালঞ্চের মালাকর। তবু কিছুদিন বাদে কোনো না কোনো বিশেষ উপলক্ষে কলকাতায় যেতে বাধ্য হতে হবে— তখন মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে, আর তোমার ছাতিম গাছে মঞ্জরী ধরবার আগেই তার পরিচয় নেব। তোমার বাবাকে টানবার চেষ্টায় ছিলুম— তিনিও দেখি গতিশক্তিরহিত— মহম্মদ বলেছিলেন পর্ব্বত যদি তাঁর ডাকে না আসে তিনিই পর্ব্বতের কাছে যাবেন — কিন্তু যেখানে দুই পক্ষেই পর্ব্বত সেখানে উপায় কি? কলিযুগে গন্ধমাদন নড়াবার মত মহাবীর দুর্লভ— এই কারণেই মেঘদূতে দেখতে পাবে একদিকে রামগিরি পর্ব্বত আর একদিকে কৈলাস পর্ব্বত এর মাঝখানে মেঘের ডাক বসানো ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না— এখনো সেই যুগই চলচে। ইতি ২ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাবাকে আর স্বতন্ত্র চিঠি লিখলুম না। যদি লিখতুম আমার অবকাশের অভাব স্বতই অপ্রমাণ হয়ে যেত। তোমার বাবা ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত এই জন্যে কবিকেও সাবধানে চলতে হয়।

৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রোজ মনে করি চিঠি লিখি। লোকে বলে কবিরা স্বভাবত অহঙ্কারী। কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু অহঙ্কারী মানুষের সঙ্গে কারবার করা সহজ। একটু স্তব করলেই তার মন পাওয়া যায়। গেল চিঠিতে তুমি

২ 'যোগাযোগ'

আমার পত্ররচনার গুণব্যাখ্যা করেছিলে। সেটাতে কাজ হয়েচে—মন সম্পূর্ণ রাজি হয়েচে তোমাকে লিখ্‌তে। কিন্তু আমার দুষ্ট গ্রহকে রাজি করানো শক্ত। কাজের অন্ত নেই। তুমি লিখেচ তোমার বাবার অনেক কাজ—বোধ হয় তিনি তোমাদের কাছে তাঁর কাজের বড়াই করে থাকেন। দেরি করে খেতে এসে, অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে, অনেক হাঁপিয়ে, বিশ্বের লোককে তাড়া লাগিয়ে, ব্যস্ততায় পোষাকে বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে বোধ হয় তিনি প্রত্যয়জনকরূপে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কাজের লোক। একটা কথা মনে রেখো, কাজের লোককে কাজ কম করতে হয়, অকাজের লোকের কাজ অফুরান। অকাজের লোককে নিজের কাজ করতে হয় বলে তার ছুটি নেই। জলের কল হ'ল কাজের, ঝরনার ধারা হ'ল অকাজের। হাজার লোক ভিড় ক'রে মীটিঙ করে উৎপাত করলেও জলের কলের ছুটি আছে, কিন্তু নির্জন গুহাতলে একটি মানুষ না থাকলেও ঝরনার হাঁফ ছাড়বার সময় নেই এক কথায় বলতে গেলে কাজের সীমা আছে। অকাজ অসীম। আমি অকেজো হয়ে জন্মেছি বলে মরবারও অবকাশ পাইনে।

সম্প্রতি একটি নাট্যালোচনা[৩] নিয়ে নাচ গান কবিতার সাইক্লোন ঝড় চলচে। সেই তুফান ঠেলে একটি ছোট্ট চিঠির নৌকোকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেওয়া বড় শক্ত। মাঝে মাঝে হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসে, দাঁড় বাগিয়ে বসি এমন সময়ে আবার ঝড়ের দমকা এসে তরী ডাঙায় আছড়ে ফেলে। অনেক সাবধানে এই ডিঙিখানি তোমার ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি নোঙর ফেললুম—তোমাকে খুসি করবার জন্য এটাকে নিয়ে যে খানিকটা বাচ খেলব সে সাধ্য আমার নেই। ইতি ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী

কাল কলকাতা রওনা হব। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দুই একদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেম, একটা সভায় বক্তৃতা করে ফিরে এসেছি, কথাটা সত্য। তোমাকে খবর দিইনি কেন জিজ্ঞাসা করেচ। আমার কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে খবর দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু দেব এই ছিল অভিসন্ধি। অর্থাৎ সশরীরে দর্শন দেবার ইচ্ছা ছিল। মনের উৎসাহে ভুলে গিয়েছিলেম যে, বেশির জন্যে আকাঙ্ক্ষাটা সম্ভবপরের শত্রু। মহাদেবকে আশুতোষ বলা হয়েছে তার কারণ উপস্থিত তাঁকে যা দেওয়া যায় অল্প হলেও তাতে তিনি রাজি,—বেশি দেব বলে আশা দিতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে ফাঁকি দিয়ে থাকে। আমি সেই দলের। বেশি নেবার ইচ্ছেটাও যেমন লোভ বেশি দেবার ইচ্ছেটাও তেমন লোভ। এই লোভের তাড়নায় প্রচণ্ড পরিশ্রম করে মরেচি—সেই ব্যস্ততায় হারিয়েচি অনেক স্বল্পকে, অর্থাৎ সুন্দর অল্পকে। এই সুন্দর অল্পকে দেবার শক্তি নিয়ে কত লোক পৃথিবীকে রমণীয় করেচে—যেমন তৃণ সে বটগাছের মত বেশি দেবার চেষ্টা করে না তবু সে কৃতার্থ—ধরণীকে মরুর আক্রমণ থেকে সেই বাঁচিয়েছে। ৮ই মাঘে কলকাতায় যাব বিশু ডাকাতের মত আগে থাকতে খবর দিলুম। ইতি ৫ মাঘ ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৩ ঋতুরঙ্গ

৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি যে উত্তর প্রত্যাশা করে চিঠি লেখ এ কথা আগে ভাবি নি। তার কারণ এই যে তোমাদের বয়সে যখন চিঠি লিখতুম তখন চিঠি লেখা মনকে পেয়ে বসত বলেই লিখে যেতুম—তার কাছে কৃতজ্ঞ হতুম যাকে উপলক্ষ্য করে চিঠি লেখা সহজ হত। কাজের চিঠি যাকে-তাকেই লেখা যায়, কিন্তু সহজ চিঠি লেখাতে পারে এমন লোক অল্পই মেলে— যখন তাদেরকে পেয়েছি তখন নিজের গরজেই চিঠি লিখে গেছি। কিন্তু সে এ বয়সে নয়। অকারণ কর্ম্মের বয়স আমার ফুরিয়েচে। এখন সকারণ কর্ম্মের বোঝায় আমার পিঠ গেল বেঁকে। এখন আমার মনবনস্পতি ফলভারের ভিড়ে নিষ্পত্র— এখন শেষের সেই দিন ঘনিয়ে আসচে যখন

অন্যে পত্র লেখে কিন্তু আমি রহি নিরুত্তর।

জীবিত কালের প্রধান ঐশ্বর্য্য হচ্ছে অবকাশ। সেই অবকাশের ফাঁক দিয়েই আসে আলো হাওয়ায় গন্ধে বর্ণে বিশ্বের মৈত্রী। আর সেইটেই হেলো চিঠি চালাচালির প্রশস্ত পথ। পাছে এই পথ দিয়ে পাঠশালা পালাই— কাজ কামাই করি তাই কর্ত্তা এ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে বয়সে কর্ত্তব্যের বালাই নেই সে বয়সে এ পথে পাহারাওয়ালা থাকে না— আমারো ছিল না— ভুলে এখন যদি এই রাস্তায় এসে পড়ি পদে পদে পার্মিট দেখাতে হয়— পথে দণ্ডধারীর অন্ত নেই— অতএব আমার সঙ্গে পত্রব্যবহার চালাতে যে চায় তাকে গীতার উপদেশ খুব ভালো করে হজম করতে হবে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং তোমার বাবার কতদূর উন্নতি হয়েচে জানিনে, কিন্তু উপদেশ দিতে পারবেন। তাঁর কাছ থেকে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যটা আদায় করে নিয়ো। যে সুখটুকুর জন্য ডাক-পিওনের ঝুলিটার পরে নির্ভর করতে হয় তার আশা-বন্ধন থেকে মনকে মুক্তিদান কোরো।

তোমার বাবার অসুখের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। সেরে উঠতে যেন দেরি না করেন তাঁর পরে আমার এই অনুরোধ। ইতি ২৮ মাঘ ১৩৩৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় এসেচি। কিন্তু শরীরটা ক্লান্ত—একে নিয়ে টানাটানি করা বড় কঠিন হয়েচে। ডাক্তার বলচে কিছু কোরো না— চুপ করে থাকো— আর সকলেই বলছে, কথা কও, বক্তৃতা করো, প্রবন্ধ লেখো, সভাপতি হও—কাজ করো, করতে করতে রাস্তার মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে হঠাৎ মরো। রাজি ছিলুম যদি কাজের মতো কাজ হত। যত রাজ্যের বাজে কাজের আবর্জ্জনা চাপা পড়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার

মতো দুর্গতি আর কিছুই নেই। ক্রসের উপর পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেরেছিল যিশু খৃষ্টকে, আমাদের মারে আলপিন ঠুকে ঠুকে। কোনো একদিন সুস্থ যদি থাকি এবং সময় যদি পাই তবে তোমাকে গিয়ে দেখে আসব। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ফিরে এসেছি। রেলগাড়ির নাড়া খেয়ে আমার প্রাণপুরুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেচে। তাই শয়ান অবস্থাতেই দিন কাটাচ্চি—আমার উত্থান একাদশীর তিথি কবে পড়বে নিশ্চিত জানিনে। চলংশক্তি যখন অবাধ হবে তখন তোমাদের ওখানে যাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হব। আপাতত কল্পনাবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোনো মনোবৃত্তি বা দেহশক্তি ভ্রমণপটু অবস্থায় নেই। ৭ বৈশাখ ১৩৩৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

কল্যাণীয়াসু

একটু ভালো আছি— সেই পরিমাণে ছোট্ট চিঠি লিখব।

কথা আছে কলকাতায় ফিরে গিয়ে নীলরতন বাবুর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করব। ফিরতে লেশ-মাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু চিকিৎসককে ফাঁকি দিতে গেলে যমরাজ পাছে অট্টহাস্য করেন এই ভয়ে যাওয়াটাই স্থির করেছি। আগামী হপ্তায় কোনো এক সময়ে পৌঁছব। যদি গলিতে জল দাঁড়ায় তাহলে কী করব সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করি? ১ শ্রাবণ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তুমি জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করতে লেগে গেছ শুনে ভীত হয়ে পড়েছি। নাড়িনক্ষত্রের কথা যা আমার নিজের কাছেও অগোচর তাই যদি তোমার কাছে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে হয়ত লজ্জা পেতে হবে— নক্ষত্রের সাক্ষ্যের উপরে আমার সাক্ষ্য হয়ত প্রামাণ্য হবে না।

একজন জ্যোতিষী একবার কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল দেবদ্বিজে আমার ভক্তিমাত্র নেই, এমন কি গোরুতেও নেই। শেষ নালিশটা শুনে মনে বড়ো গ্লানি হল, চেষ্টা করলুম তখনি সেই

জ্যোতিষীকে ভক্তি করতে। তার মুখ দেখে পেরে উঠলুম না। শরীরটা সম্বন্ধে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি। তাতেই রুষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে ও আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করে— আমি কিন্তু হার মানবার পাত্র নই, ওর আপত্তির উপর দিয়েই আমার কাজের বোঝাইকরা রথ চালিয়ে দিই। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal*

কল্যাণীয়াসু

আমার খবর জানতে চাও কিন্তু যে কোণে বাস করি এখানে খবর ঘটে না,— খবরহীন দিনের মাঝখানে রবি বিরাজমান।

তুমি একদা এখানে আমাকে একটা প্রকাণ্ড বেতের চৌকির উপর লম্বমান পড়ে থাকতে দেখেছিলে। সম্প্রতি সেই ছবির কোনো পরিবর্ত্তন ঘটেছে কি না জিজ্ঞাসা করেছ। ঘটেচে। কারণ সংসারে যেমন চলাচ্চলং চলদ্বিত্তং তেমনি চলদাসনমালয়ং। সে ঘরে আমি নেই— তারি অনতিদূরে দুটি ছোট ঘর আশ্রয় করে থাকি— তাতে আমি ছাড়া বড় পরিমাণের কোনো পদার্থ নেই— দুই একটা আসন আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে তারা আমার প্রতিস্পর্দ্ধী নয়। এখানে জানলা আছে এবং বাহির ব'লে বিরাট পদার্থটি অবারিতভাবেই আমার দৃষ্টির সামনে বিস্তীর্ণ। ওইটিই আমার প্রকাণ্ড কেদারা, আমার মন ওরই উপর নিজেকে প্রসারিত করে অনেক সময়ই স্তব্ধ হয়ে থাকে। কাজকর্ম্ম যে কিছু নেই তা নয় কিন্তু সে সব কাজের বিবরণ প্যাম্ফ্লেটে লেখা চলে চিঠিতে নয়। অতএব ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal*

কল্যাণীয়াসু

তুমি আমাকে একশো মাইলব্যাপিনী কান্নার ভয় দেখিয়েছ— সেটা শান্ত করবার জন্যে চিঠি লিখতে বসেচি। উত্তর হাওয়া দিলে পত্র ঝরে, আমার হয়েচে কি, উত্তর দিতে গেলেই আমার পত্র অদর্শন করে— এতে বোঝা যাচ্চে আমার আয়ুতে শীত ঋতুর আবির্ভাব। দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিণ্য আমার কাছে আশা করা বৃথা।

* মুদ্রিত ঠিকানা

এগারই মাঘ উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাবার সম্ভাবনামাত্র নেই। আমি এখানে চুপচাপ বসে আমার সেই ছোট ঘরের বাতায়ন থেকে সূর্য্যাস্ত দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটাতে চাই। একেবারে রাজকীয় চালে কুঁড়েমি করতে পারলে খুসি হতুম কিন্তু গ্রহ নারাজ, ছুটি মেলে না। বাল্যকালে কাজ ফাঁকি দিয়েছি, এখন তার সুদ গুণতে হচ্চে। আমার এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমার যেন শিক্ষা হয়— নইলে সাতষট্টি বছর বয়সে পাকা মাথায় খাটুনির অন্ত থাকবে না। ইতি মাঘ ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

[পোস্টমার্ক শান্তিনিকেতন ১৩ জুন ১৯২৯]

কল্যাণীয়াসু

তোমার উচিত ছিল আইন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হওয়া। তুমি পুরোনো দলিল ঘেঁটে যে সব তর্ক তুলেচ তার জবাব দেওয়া কঠিন। সাহস এই যে আদালতে বিচার হবে না। গোড়ায় যে আভাসমাত্র দেওয়া গেছে[৪] শেষ পর্য্যন্ত তার চেয়ে বেশি যদি কিছু নাও দিই তাহলেও সাহিত্যের বিচারে চুক্তিভঙ্গের মকদ্দমায় ড্যামেজ দিতে হয় না। আমার পক্ষে এই হচ্চে মস্ত ভরসা।

ঘন ঘোর বর্ষা নেমেচে— আকাশ শ্যামল, ধরণী শ্যামল, রবির আলো তারি মাঝখানটাতে ক্ষণে ক্ষণে সোনার লেখন লিখছে। ইতি আষাঢ় ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

দুটো দিন অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে কাটিয়ে এখানে এসেচি। কিন্তু এখানে অনেক কালের জমা কাজ আমার পথ চেয়ে ছিল, এসে পৌঁছবামাত্র চারদিকে ঝেঁকে এসেচে। এই ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠ্‌তে কিছুদিন লাগবে। রাশী-কৃত চিঠি টেবিলের উপর ভিড় করে আছে, তাদের ধ্বনিহীন বাক্য যদি ধ্বনিত হয়ে উঠত তাহলে সেই বহুভাষার সাইক্লোনে আকাশ যেত পাগল হয়ে।

বুলা[৫] তার স্বামীকে বলে নিঃসম্বল বিশ্বভারতীর জন্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়েচে। পূর্ব্বে কিছু দিয়েছে, পরেও কিছু দেবে এই তার সঙ্কল্প। সেইদিন তার মুখ থেকে এই কথারই আভাস পেয়েচ।

---

৪ যোগাযোগ উপন্যাসের সূচনায় যে অবিনাশ ঘোষালের উল্লেখ আছে রচনাশেষে আর তাহার বিবরণ নাই, এই প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে লিখিত।

৫ 'বাতায়ন'-এর কবি উমা গুপ্ত, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে এককালে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ও রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থে'র (১৩১০) সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা।

হাতের কাজগুলো শেষ ক'রে তার পরে হিবার্ট লেকচার লেখবার চেষ্টা করব— কিন্তু আপাতত ব্যস্ততার অন্ত নেই। এখন তোমার লেখা শোধন করবার দরকার হয় না। তোমার রচনার ধারা তার নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিয়েচে— আমরা তাতে হাত লাগাতে গেলে হয়ত তাকে মুক্ত না করে বাধাগ্রস্ত করা হবে। ইতি ৯ জুলাই ১৯২৯

স্নেহানুষক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

তোমার খাতা আজ এসে পৌঁছল। এর মধ্যে পরিণত অপরিণত দু রকমেরই কবিতা আছে। বোধ করি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লেখা। তোমার হালের লেখাগুলি নিঃসংশয় চিত্তে প্রকাশ করবার যোগ্য— অন্যগুলো তাদেরই সঙ্গ ধরে তীর্থযাত্রা করতে পারে "দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে।" অধিক কিছু সংশোধন করবার আছে বলে মনে করিনে। যদি কিছু করি সেগুলি স্বীকার না করলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। সবগুলি এখনো পড়বার সময় পাইনি। ইতি ১ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার আশীর্বাদ ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩৩৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহার সঙ্গে একটি কার্ডে

Kali phos 6x
Kali Mur 6x Calc phos 6x
Nat. Mur 6x

পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ওষুধ দিনে দুইবার।

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমাদের ছোট-আমি জন্মমৃত্যুর স্রোতে প্রবহমান, সুখদুঃখের তরঙ্গে দোলায়িত। আমাদের অন্তরতম নিত্য-আমির সঙ্গে তাকে অভিন্ন করে কল্পনা করি বলেই আমরা বদ্ধ হই পীড়িত হই মলিন হই। এই কথা আমাদের শাস্ত্রে বলে এবং আমি এই কথা মানি। সংসারে আমাদের আত্মা কেবলি অপমানিত হতে থাকে এই ছোটোটার সঙ্গে যুক্ত থেকে। আমি যাত্রা করে বেরিয়েছি সেই ক্ষুদ্রটার থেকে বহু দূরে যেতে—এই কথা আমি সেদিন সকালে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। সেই দূরত্ব থেকেই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার লাভ করি। আত্মার মধ্যে যে-সত্যকে পাবার জন্যে আমরা এই প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করি, অসতো মা সদ্গময়, সেই সত্য তোমার জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, এই আমার কামনা। ইতি ১১ নভেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

যে জিনিষটা বিশেষ অবস্থায় অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি যেটা তর্কের বিষয় নয় সেটাকে যে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারব এমন আশা করি নে। বুঝিয়ে দিলেও সেটা ব্যবহারে আসতে পারবে কি না তাও জানি নে। তবু তুমি প্রশ্ন করেচ বলে কথাটা বলে নিই।

পৃথিবীর একটা গতি আছে সূর্য্যের চারদিকে, সেই গতিতে সে সমস্ত সৌরগ্রহের সঙ্গে এক মহা-প্রদক্ষিণে মিলিত, আর একটা গতি আছে যেটি তার নিজের চারদিকে, সেইটিতে তার নিজেরই দিন-রাত্রির আলো ও অন্ধকারের আবর্ত্তন চলচে। তার ছোট গতিটাও তার বড় গতির সঙ্গেই সঙ্গত, তার কক্ষ কেন্দ্রস্থিত মহাজ্যোতিষ্কেরই আকর্ষণে। বস্তুত সে যেন তার আত্মপ্রদক্ষিণকেই উৎসর্গ করচে তার বড় প্রদক্ষিণের কাছে,—তার বড় প্রদক্ষিণেরই অক্ষমালার ৩৬৫ গুটি হচ্চে তার ছোট আবর্ত্তন।

পৃথিবীর এই দুই গতির সামঞ্জস্য প্রকৃতির সনাতন নিয়মে বাঁধা হয়ে গেচে। কিন্তু মানুষকে নিজের ইচ্ছাকৃত সাধনায় বেঁধে নিতে হয়। যখন সে আপন দুঃখসুখের, আলো অন্ধকারের দোলাকেই একান্ত করে জানে তখন তার সেই সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রায় লাভ ক্ষতি উৎকট হয়ে উঠে সত্যের ছন্দকে হারায়। এই জন্যেই নিজের যাত্রাপথের কেন্দ্রস্থলে নিরন্তর নিজেকেই না দেখে মানুষ যদি পরমজ্যোতিকে দেখতে পায় তাহলে তার আত্মআবর্ত্তন প্রতিদিনই নিজেকে অতিক্রম করে চলতে পারে। তারি মধ্যে বদ্ধ হয়ে সে নিরর্থক হয় না।

আমাদের ছোটটিই যে আমাদের একমাত্র সত্য এই বিশ্বাস প্রতিদিন জীবনে সঞ্চীয়মান হয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এ কঠিন জড় বিশ্বাসকে ক্ষয় করতে হয় প্রতিদিন নিজের ক্ষুদ্র আবেষ্টন থেকে নিজেকে দূরে এনে বড়কে উপলব্ধির সাধনায়।

দূরে আনার মানে বর্জ্জন করা নয়। আমার মনে বিশুদ্ধ সুরের একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শটি না থাকলে আমার পক্ষে সঙ্গীতের কোনো অর্থই থাকে না। কিন্তু সেই আদর্শ যদি কেবল মনেই থাকে তাহলেও তাকে সঙ্গীত বলা চলে না। এই জন্যেই বীণার তারে যখন সুর নেমে যায় তখন বীণাকে বর্জ্জন করার দ্বারাই আমরা সঙ্গীতের বিশুদ্ধি লাভ করবার আশা করিনে—ধ্যানস্থিত সুরের বিশুদ্ধ আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে বীণার সুর বাঁধলে তবেই সঙ্গীত সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই আদর্শ সুর সঙ্গীতের ধ্রুব সত্যে আশ্রিত, তাকে শিক্ষায় সাধনায় আমরা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখি, কিন্তু তার পরে সেই উপলব্ধিকে গান গাওয়ার দ্বারা প্রকাশ করতে থাকলে তবেই দুইয়ের যোগে সঙ্গীতের সৃষ্টি হ'তে থাকে। অন্তরে যদি উপলব্ধি বিশুদ্ধ না হয় তবে বেসুরের বন্ধনজাল বিভীষিকা হয়ে ওঠে। বীণার তারে বন্ধনকে স্বীকার করি, কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আবির্ভাব হয় বিশুদ্ধ সুরের আনন্দে। জীবনে যখন দেখি কর্কশতা, তখন পালিয়ে সেটাকে পরিহার করবার ইচ্ছা বারে বারে নিষ্ফল হয় তখন অন্তরের মধ্যে সেই সত্যকে বিশুদ্ধ ভাবে উপলব্ধি করতে হয় যার মধ্যে শান্তি যার মধ্যে কল্যাণ। বাইরের বেসুর থেকে অন্তরের মধ্যে দূরে আসতে হয়—কিন্তু বাইরের সুরকেই মেলাবার জন্যে—সেই সুর যখন মেলে তখন একই কালে দূর ও নিকটের সামঞ্জস্য ঘটে। তখন "তদ্দূরে তদিহান্তিকে চ।"…
ইতি ১৬ নভেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

"বাঙ্গালা ইতিহাসে তিনি [অক্ষয়কুমার] যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।"

—রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের মনীষীসমাজে সাহিত্য শিল্প ইতিহাস ও বিজ্ঞান -চর্চায় এই একটি ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, "ভারতবর্ষের যথার্থভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে", "বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমরবাণী উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত"— "বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে··· এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে।"

এই "নবজাতির জন্মসংগীত"-এর প্রধান উদ্‌গাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ— "আমার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এমন সকল বড়লোক জন্মিবেন যাঁহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও এরূপে পৃথিবীর সীমানা বাড়াইয়া দিবেন"— প্রথমযৌবনের এই কল্পনাকে তিনি সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে যেমন সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বন্ধুসমাজে যেখানেই প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্য করিয়াছেন সকলকেই "পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে" আহ্বান করিয়াছেন— "স্বদেশের আহ্বান প্রত্যহই পরিস্ফুটতর ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে— আপনি যে এই আহ্বানের লক্ষ্য আছেন তাহা আমি কবির চক্ষে দেখিতেছি এবং একদিন যে আপনি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশের ললাটে নূতন যশোমাল্য স্থাপন করিতেছেন তাহাও আমি দেখিতে পাইতেছি", এবং প্রবল উৎসাহে তাঁহাদের কার্যে প্রেরণা সঞ্চার করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।*

* তুলনীয় ভাস্কর মৃন্ময়পাত্রে গঠিত মূর্তি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা, "মন্দিরাভিমুখে", 'প্রদীপ', পৌষ ১৩০৫—

"আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি বা আমাদের সূর্য্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

"ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদান-প্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

"রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গরুর মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এসিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ যোগাইবার জন্য আছে, কিড্‌, প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

"অদ্য আমাদের হীনতার অভাব নাই একথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই।···"

এই বন্ধুগোষ্ঠীর পুরোভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্র, অক্ষয়কুমারও (১৮৬১-১৯৩০) এই গোষ্ঠীর অন্যতম। অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে জয়ধ্বনি কি অকৃপণ অবিরল ভাবে ঘোষিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন একত্র সংকলিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি-প্রকাশিত 'ইতিহাস' গ্রন্থে, এবং তাহার বিশদ বিবরণ গ্রথিত হইয়াছে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস-সাধনা' পুস্তকে, এখানে তাহার বিস্তৃত পুনরুক্তি বাহুল্য।

ইতিহাস-প্রসঙ্গ ছাড়া, দেশের আর-একটি মঙ্গলকার্যেও অক্ষয়কুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ হইয়াছিল। ইতিহাস-আলোচনা ব্যতীত নানা স্বদেশহিতকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের যোগ ছিল, রেশম-শিল্পের উন্নতিচেষ্টা তাহার অন্যতম। "রেশম-শিল্পের সকল বিষয়েই ইনি অভিজ্ঞ" †— 'পট্টবস্ত্র', 'এণ্ডি' সম্বন্ধে তিনি রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'ভারতী'তে (১৩০৫) প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাজসাহীতে রেশম-শিল্পবিদ্যালয় অক্ষয়কুমারের উদ্‌যোগেই পরিচালিত হয়, "ইনি পাঁচ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।"† রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে তাঁহার আগ্রহ ও উদ্‌যোগের বিশেষ পরিচয় এই চিঠিগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে।

এ সবই স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেকার কথা। স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যপ্রসারে, দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে উৎসাহ-উদ্যম, ও সেজন্য ক্ষতিস্বীকারের প্রবৃত্তি ঠাকুর-পরিবারে দীর্ঘকাল ধরিয়াই বর্তমান ছিল; এই পত্রালাপকালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারিতে বাস করিতেন, পল্লীর উন্নতিকল্পে এই সময়ে তিনি নানারূপ পরীক্ষা শুরু করেন, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তিকায় (৭ পৌষ ১৩৫৮) তাহার কিছু বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অক্ষয়কুমারের উৎসাহের আকর্ষণে রেশমের গুটির চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার আভাসও এই রচনায় আছে; ইঁহাদের উৎসাহে রেশমের কীটপালনে জগদীশচন্দ্রও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।†† অক্ষয়কুমারের পরিচালিত শিল্প-বিদ্যালয়কেও তিনি যথাসাধ্য উৎসাহিত করিতেন— অক্ষয়কুমারের চিঠিতে যে কাপড় পাঠানোর কথা আছে তাহা তিনি নিজেও ব্যবহার করিতেন, বন্ধুজনকেও উপহার দিয়া ব্যবহারে উৎসাহিত করিতেন— ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে একখানি চিঠিতে (৩০ চৈত্র, ১৩০৫) তিনি লিখিতেছেন—

> মহারাজার জন্য সর্বানন্দের হস্তে একটি সাদা রেশমের থান পাঠাইলাম।
>
> আপনার জন্যও রাজসাহী শিল্পবিদ্যালয় হইতে মট্‌কার থান প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে উপহার পাঠাইব—ইহার প্রস্তুত এক স্যুট সাজ পরিয়া আমার সহিত শিলাইদহে যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন বিশেষ আনন্দ লাভ করিব।
>
> শিল্পবিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি—দোষের মধ্যে লোক ও সামর্থ্য অল্প হওয়াতে তাহারা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে কাপড় যোগাইতে পারে না,—বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার। অতএব আশা করি আপনারা তুচ্ছ বলিয়া ইহাকে অনাদর করিবেন না।**

অক্ষয়কুমারের লিখিত ১-সংখ্যাঙ্কিত চিঠিখানিতে, তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যসমাজের একটি বিতর্কের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বর্তমান কালে সাহিত্যপরিবারের…গৃহবিচ্ছেদে'র বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কাব্যে

† দ্র হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্বন্ধে প্রস্তাব

†† দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

** দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্বাশা

উপন্যাসে ইতিহাসের বিকার ঘটিলে, বিশেষতঃ কোনো চরিত্রের অসংগত লাঘব হইলে, অক্ষয়কুমার তীব্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন— বঙ্কিম-নবীনের রচনাও অব্যাহতি লাভ করে নাই। 'পলাশির যুদ্ধ (কাব্য)' গ্রন্থে (১২৮২) নবীনচন্দ্র কর্তৃক 'কাল্পনিক সিরাজ-কলঙ্ক' প্রচারিত হইয়াছে, এই অভিযোগ অক্ষয়কুমার করেন ভারতী পত্রের মাঘ ১৩০৩ সংখ্যায়, তাঁহার সুবিখ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের 'পলাশির যুদ্ধ' অধ্যায়ে। পরবৎসর (১৩০৪) ভারতী পত্রে মীরকাশিম সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের আলোচনা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে; বৈশাখ সংখ্যায় উপক্রমণিকাতেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেন, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মীরকাশিম ও তকি খাঁর চরিত্র অন্যায় ও অনৈতিহাসিক ভাবে অশ্রদ্ধেয় করিয়া অঙ্কিত করিবার অভিযোগে; অক্ষয়কুমারের পত্রে এই রচনার প্রসঙ্গই উল্লিখিত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় পূর্ণিমা পত্রের ১৩০৫ শ্রাবণ সংখ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধে। ভারতী-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সাময়িক সাহিত্য'-সমালোচনা বিভাগে পূর্ণিমার এই প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া যে মন্তব্য করেন নীচে তাহা মুদ্রিত হইল—

মীরকাসিম লেখকের প্রতি, মতবিরোধ লইয়া, অবজ্ঞা প্রকাশের অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আমরা সমালোচ্য প্রবন্ধলেখকের অপেক্ষা ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাসিম লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আমরা উচিত বোধ করি না। কারণ ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মান-ভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অন্য হিসাবে অক্ষয়বাবুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালানুক্রমে ভূপঞ্জরের যেরূপ স্তর পড়িয়াছিল হিমালয় পর্ব্বতে তাহার অনেক বিপর্য্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোন ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়কে খর্ব্ব করিলেও কালিদাসের নিকট তাহার দেবাত্মা গুপ্ত থাকে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোন খর্ব্বতা হয় নাই। উপন্যাসের বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও যা, আর ধান্যজাত মদিরা অন্ন হইয়া উঠে নাই বলিয়া রাগ করাও তাই। উপকরণের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে কিন্তু তবুও অন্ন মদ্য নহে এবং মদ্য অন্ন নহে, একপাটা গোড়ায় ধরিয়া লইয়া তবে বস্তু-বিচার করা উচিত। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রস টুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ্ শর্ষের সন্ধান করেন। মস্‌লা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন্, এবং যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এস্থলে লক্ষ্য, মস্‌লা উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন না— কিন্তু মহারাণীর খাস হুকুম আছে। উদ্যান প্রহরীরই জিম্মায় থাক্, কিন্তু এক সখীর কুঞ্জ হইতে আর এক সখী পূজার জন্য হোক্ বা প্রসাধনের জন্য হোক্ যদি একটা ডালি ফুল পল্লব তুলিয়া লইয়া যায় তবে তিনি তাহার কৈফিয়তের দাবী করিয়া এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্য্য হানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

এই মন্তব্য সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে, "কবিকল্পনার সীমা কোথায় তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রসর দিয়াছেন তাহাতে আমার নালিশের সুবিচার হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন আশ্বিন ১৩০৫ সংখ্যা ভারতী পত্রে,

"ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রবন্ধে; রচনাটি তাঁহার 'সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন—

আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্ব্বচনীয় মিশ্ররস আছে অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।···সেই সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।···

সেক্‌স্‌পিয়ারের অ্যাণ্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা নাটকের যে মূল ব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনী নারীমায়াজালে আপন ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন করিয়াছে; এইরূপ ছোটখাট মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভগ্নাবশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনে বদ্ধ গ্রীসের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে একসুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করাতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারজনক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রীস ইতিহাসবেত্তা মম্‌সেন পণ্ডিত যদি সেক্‌স্‌পিয়রের এই নাটকের উপর প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবতঃ ইহাতে অনেক কালবিরোধদোষ (anachronism) অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে একটি অনির্ব্বচনীয় ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।···

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই করুন আর খণ্ড করিয়াই করুন সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্ব্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাৎ হইয়া ডুবিয়া যায়।···

অক্ষয়কুমার বিষয়টি পুনরুত্থাপন করেন ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রে, রবীন্দ্রনাথের 'কথা'-কাব্যের (১৩০৬) আলোচনায়। এই গ্রন্থের দীর্ঘপ্রশস্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

···কিছুদিন বঙ্গসাহিত্য বহু পথে ধাবিত হইয়া অবশেষে কোকিল-কূজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও মানভঞ্জনের তরল তরঙ্গের রঙ্গরসেই সমধিক মত্ত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অনুরোধে কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল নখরাঘাতে বহু ঐতিহাসিক চরিত্র শতধা বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা নিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ-সাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে কবিকল্পনা যে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে একবার কর্ত্তব্যানুরোধে তীব্রভাষা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন :—"মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে, আশা করি সেই পরিবর্ত্তনের জন্য সাহিত্যনীতিবিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।" আমি কবিকুলকে ঐতিহাসিক হইবার জন্য তাড়না করি নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলকেই আগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্পাংশ সরল সরস ও সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই— সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ। কবি বর্ত্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই; সুতরাং অবান্তর বিষয়ে যাহা কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না।···

১

"ঐতিহাসিক চিত্র"-কার্য্যালয়।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
[১৩০৫]

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতৎ—

শ্রাবণের ভারতী পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত আবতুল করিমের ইতিহাসের সমালোচনায়[১] এবং প্রসঙ্গ কথায়[২] এবার ভারতীসম্পাদক ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বাংলা সাময়িকপত্রের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে; এমন সুচিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ বাংলা সাময়িকপত্রে সর্ব্বদা প্রকটিত হইলে আমাদের সাময়িক সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা স্বতই আকৃষ্ট হইবে। আপনি ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা[৩] লিখিবার যোগ্যপাত্র বলিয়াই সে ভার আপনাকে দিয়াছি, এখন আর বলিতে পারিবেন না যে আমি সে গান গাহিতে শিখি নাই। আপনার প্রবন্ধ না পাইলে কার্য্যারম্ভ হইবে না, সুতরাং একটু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব সত্বর হইবেন। ছবি ক্ষোদাই ও কাগজ ক্রয়ের জন্য প্রকাশক কলিকাতায় গিয়াছেন; তিনি প্রত্যাগত হইলেই কার্য্যারম্ভ করিব।

এবারকার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা[৪] উপলক্ষে আমার কথা কিছু বেশী বলিয়া ফেলিয়াছেন, উহা আপনার স্নেহোদ্ভূত ভিন্ন আমার ন্যায্যপ্রাপ্য প্রশংসা বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। কবিকল্পনার সীমা কোথায় তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রসর দিয়াছেন তাহাতে আমার নালিশের সুবিচার হয় নাই। ইতিহাসে যাহার যে স্বাদ উপন্যাসেও তাহার সেই স্বাদ রাখিতে হইবে, যে ইতিহাসে মহাবীর উপন্যাস তাহাকে কাপুরুষ সাজাইতে পারিবে না,— ইহাই আমার মূল বক্তব্য। উপন্যাসে কল্পনা নানারূপ ঘটনা সৃষ্টি করুক, তাহাতে কেহ বাধা দিতে চাহে না কিন্তু কাল্পনিক ঘটনাসৃষ্টির ক্ষমতা থাকিলেও মূল চরিত্র বিকৃত করিয়া দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এদেশের আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ব্যক্তি; তাঁহার সম্বন্ধে সহস্র কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া কবিকল্পনা তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রকে উজ্জ্বল করিতে চাহে ত করুক, কিন্তু কবিকল্পনা যদি তাঁহাকে কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া মূর্খ নিষ্ঠুর নীচমনা ও দুর্জ্জন বলিয়া লোকসমাজে তাঁহাকে চিত্রিত করিয়া ফেলে তবে কি তাহাকে সংযত করা আবশ্যক হইবে না? দুর্ভাগ্যক্রমে মীরকাশিমের উপক্রমণিকায় আমার পূর্ব্বলিখিতাংশের সহিত শ্রীমতী সরলাদেবীর সংকলিত

---

১ 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত।

২ এই প্রসঙ্গ কথার প্রথমাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে (পৃ ৫৫৫-৬২) সংকলিত হইয়াছে। পরাংশ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ সম্বন্ধে "কোন আংলোইণ্ডিয়ান পত্র" যে "ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন" তাহার আলোচনা। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে উক্ত গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছিলেন। উভয় প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড 'আধুনিক সাহিত্য' অংশে, ও 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত।

৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র পত্রের প্রথম সংখ্যায় (জানুয়ারি ১৮৯৯) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের এই "সূচনা" 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যা ভারতী পত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন— দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১১।

৪ এই পত্রাবলীর ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত ও আলোচিত।

বহু কথা সংযুক্ত হইয়া উহাকে নিতান্ত অসংযত লেখনীর দৃষ্টান্তস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং আমাকে পূর্ণিমা-লেখকের লগুড়াঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু মূল বিষয়টির প্রতি আপনারা দৃষ্টিপাত না করিয়াই মপস্বলের হাকিমের মত নথী না দেখিয়াই বিচার করিতেছেন। আপনি কি ইংরাজী ও পারস্য ইতিহাসে মীরকাশিম ও তকি খাঁর চিত্র পড়িয়া তাহার সহিত চন্দ্রশেখরের ছবি মিলাইয়া কোন কথা বলিয়াছেন? অবশ্যই তাহা করেন নাই— কলমের মুখে যাহা আসিয়াছে লিখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ঐটুকুই আমার নালিশের প্রধান অজুহাত। দেখুন, একে আমাদের দেশে লোকশিক্ষার উপাদান অল্প, ইতিহাস হইতে আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রেম শিখাইবার সম্ভাবনা কম তাহার উপর যে দুই একটি চরিত্রে সে সকল গুণ বিকশিত হইয়াছিল কল্পনাবলে তাহা বিনষ্ট করিলে দাঁড়াইবার স্থান থাকে না।

যাহা সুন্দর তাহার আদর কে না করিবে? কিন্তু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য বাস্তবকে নষ্ট করা অন্যায়। ইতিহাসের পায়সান্ন হইতে রসাহরণ করিয়া উপন্যাস লিখিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে, কিন্তু তাহার রস পায়সান্নের ন্যায় মধুর না করিয়া তিক্ত করা অন্যায়, তাহাতে রসভঙ্গ হয়, সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া কুরুচি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আপনি ত অনেক প্রখ্যাত বীর সন্তানকে লইয়া কল্পনাবলে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ধরুন, আপনার চিত্রাঙ্গদা। বাঙ্গালী তাহার যথোচিত আদর করে নাই বলিয়া এমন ভাবিবেন না যে তাহা অসুন্দর— উহা আপনার একখানি অত্যুত্তম চিত্র। উহাতে অর্জ্জুনকে আপনি কল্পনাবলে যত সাজ সজ্জায় সাজাইয়া তুলিয়াছেন তৎসত্ত্বেও অর্জ্জুনকে অর্জ্জুন বলিয়াই চিনিয়া লওয়া যায়, বরং কল্পনা তাহাতে আমাদের সহায় হইয়াছে, অর্জ্জুনকে বেশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আপনি যদি তাহা না করিয়া গাণ্ডীবধন্বাকে কাপুরুষ সাজাইতেন সে কল্পনার কেহ প্রশংসা করিত না, বলিত— এরূপ কল্পনাবিস্তারে আপনার অধিকার নাই। মুসলমানের প্রাণ আছে, তাই তাহারা মহম্মদকে রঙ্গভূমিতে আনিতে দেয় না; আমাদের প্রাণ নাই তাই আমরা বুদ্ধ চৈতন্য রাম লক্ষ্মণ সকলকেই রঙ্গভূমিতে যথেচ্ছ প্রদর্শিত হইতে দিয়া তাহাদিগকে কত না নাস্তানাবুদ করিয়াছি। যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্র লোকশিক্ষাবিধানের সময়ে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিত, তাহাদিগকে খাট করিয়া বিকৃত করিয়া, নিরন্তর মুখরোচক উপন্যাস বা নয়নবিমোহন অভিনয়াদি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ মাটি করিয়া ফেলিতেছি। লোকে উপন্যাস ও রঙ্গভূমির সাহায্যে তাহাদের যে চিত্র স্মৃতিপটে দৃঢ়মুদ্রিত করিতেছে তাহা সহজে দূর হইবার নহে। কবিকল্পনা যদি সে সকল চরিত্র অবিকৃত রাখিয়া প্রবাহিত হয় তবেই ভাল, নচেৎ কবিকল্পনা অনিষ্টসাধন করে, সুন্দরকে কুৎসিত সাজাইয়া সৌন্দর্য্যবিকাশের পরিবর্ত্তে কুরুচির প্রশ্রয় দেয়।

আমি আর নালিশ করিয়া কি করিব? বেচারা বহু বৎসর মরিয়া গিয়াছে, ইংরাজেরা তাহার বীরকীর্ত্তির সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, আবার স্বদেশের কবিকুল যদি তাহাকে কল্পনাবলে পঙ্কলিপ্ত করিয়াই সুখী হন তবে আমি আর কি বলিব? আর বলিলেই বা আমার কথা কে শুনিবে? যখন এদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে তখন লোকে আপনা হইতেই তকি খাঁর মত বীরের মস্তকে বারাঙ্গনার পদাঘাত দেখিয়া করতালি প্রদান করিবে না, রঙ্গালয় পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবে— ইত্যলম্

ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

তাগদা'র পাইন-বন : শ্রীনন্দলাল বসু

২

"ঐতিহাসিক চিত্র"-কার্য্যালয়।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী
[১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারনিবেদনং—

আপনার উপদেশমত ত্রিপুরায় পত্র লিখিলাম। নাটোর[৫] শীঘ্রই টাকা পাঠাইবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা বাহির না হইলে অপরিচিতের দ্বারস্থ হইতে ভয় হয়; এত লোকে এত ধূয়া ধরিয়া চাঁদা সাধিয়া বেড়াইতেছে যে, লোকে সহসা আমাদিগকেও ধড়িবাজ মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। ইহার সঙ্গে আপনার নামের সংযোগ আছে, আপনাকে আর নাস্তানাবুদ করিতে পারি না। এখন ভিক্ষার ঝুলিটা কাজেই তুলিয়া রাখা ভাল মনে করিতেছি।

আমি ঠাকুরবংশকে টানিব না, সে বিষয়ে— মা ভৈঃ। স্যর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন একখানি "ঠাকুর বংশাবলী" উপহার দিয়াছেন সেই কথাই লিখিয়াছিলাম। আমার বর্ত্তমান লক্ষ্যস্থানীয় রাজবংশ ও পুরাতন জমিদারবংশ।

আপনি এবারকার ভারতীতে ঐতিহাসিক নামাদির বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে প্রসঙ্গ কথায় কিছু লিখেন ত আমার মতটি সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া রাখি।

গ্রীক, চীন, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশীয় পরিব্রাজকেরা আমাদের বৌদ্ধযুগের কোন কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থেও ম্লেচ্ছ রাজগণের উল্লেখ আছে। বিদেশের লোকে তাঁহাদের স্ব স্ব ভাষায় আমাদের নামাদি বিকৃত করিয়াছেন, আমরাও তাঁহাদের নামাদি বিকৃত করিয়া লইয়াছি। ফল এই হইয়াছে যে এখন আর মাথা কুটিয়াও মিল করা ঘটিতেছে না। দুই একটা উদাহরণ লউন:—

মুদ্রারাক্ষস নামক কবি বিশাখদত্ত রচিত সংস্কৃত নাটকে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক পাঁচটি প্রধান ম্লেচ্ছ-রাজের নাম চিত্রবর্ম্মা, সিংহনাদ, সিন্ধুষেন, পুষ্কর ও মেঘাক্ষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে,— এখন আর কিছুতেই তাহাদিগকে চিনিবার উপায় হইতেছে না। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন গঙ্গা ও এরণবস্ নদীর সংযোগস্থলে পালিবোত্রা নগরে সন্দ্রকোত্তস্ নামে রাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। স্যর উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক রিসার্চের দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তর্কে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহুর সংযোগস্থলে পাটলিপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্ত নামক রাজার রাজধানী সংস্থিত ছিল তাহাই মেগাস্থিনিসের বক্তব্য। আমাদের গৌতমবুদ্ধকে ব্রহ্মদেশীয় লোকে গন্দামা Gandama বলিয়া নামকরণ করিয়াছে চীনেরা আরও কত অদ্ভুত শব্দ সংযোগ করিয়া আমাদিগকে গোলে ফেলিয়াছে। গ্রীকভাষার বর্ণমালায় চন্দ্রগুপ্ত, পাটলিপুত্র ও হিরণ্যবাহু লিখা অসম্ভব ছিলনা, তাহা লিখিলে কোনই গোল হইত না। ইহা হইতে ঠেকিয়া শিখিয়া আমি এই বলিতে চাই যে বিদেশের নাম তাহাদের উচ্চারণ কৌশলে যেরূপ উচ্চারিত হয় ঠিক সেই শব্দসাদৃশ্য অবিকৃত রাখিয়া আমাদের অক্ষরে বর্ণবিন্যাস করা উচিত।

গির্ণারে ও উৎকলে যে অশোকস্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে "আন্টিয়কো যোনরাজ" শব্দ উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা "Antiochus যবনরাজ"। নানা ফড়-নবীশ Nana Fernvis হইয়াছেন,

৫ নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়

উহাকে এখন নানা ফরনভিন্স্ করিলে গোল বাধিবে। W কে ব করিয়া William ব্যুলিয়ম হইলে কানে বিস্তর গোলযোগ হইবার আশঙ্কা। আমি সেই জন্যই বলিতে চাই যাহার নাম যে দেশে যেরূপ উচ্চারিত হয় সেই উচ্চারণ যতটা বাংলায় উতরাইতে পারা যায় সেইভাবে তাহার নামের বর্ণবিন্যাস করা উচিত। আমার মত সংক্ষেপে লিখিলাম, আপনি যেরূপ ভাল মনে করেন লিখিবেন।

সূচনা সুবিধামত পাঠাইবেন, ভারতীর জন্য বিব্রত, তাহার উপর আমি হয়ত তাগিদ পাঠাইয়া আরও বিব্রত করিয়াছি। প্রকাশক এখনও কলিকাতায় আছেন, সুতরাং ভারতীর কাজ সারিয়া আমার সূচনা দিলেও চলিবে। ইতি

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

৩

ওঁ

"ঐতিহাসিক চিত্র" কার্য্যালয়
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ ইং
[২৫ ভাদ্র ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতৎ

ঐতিহাসিক চিত্র-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি শেষ করিয়া পত্র লিখিব বলিয়া কয়েকদিন কোন উত্তর দেই নাই—ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ছবি খোদাই হইয়া আসে নাই ১০ ফর্মা পরিমিত 'কাপি' ঠিক হইয়াছে—অবশিষ্ট কাপিও পাই নাই ; সম্মুখে পূজাবকাশ—সুতরাং ঠিক পূজার পর ভিন্ন আগে কাগজ বাহির হইল না। ত্রৈমাসিক কাগজ সুতরাং ভবিষ্যতেও যাহাতে পূজার বন্ধের সময় কোন সংখ্যা বাহির করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই করা কর্ত্তব্য ; তজ্জন্য অগ্রহায়ণে বৎসরারম্ভ করিলে মন্দ হইবে না ; আগামী বর্ষে তাহাই করা যাইবে এবার প্রথম সংখ্যা কার্ত্তিকে বাহির হইবে এই বন্দোবস্তে ছাপা চলিতেছে নমুনা পাঠাইলাম দেখিবেন।

আমি ইতিমধ্যেই পত্রসম্পাদনের গুরুত্ব কিছু কিছু অনুভব করিতেছি—পুলিশের ইনেসপেকটার সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতেছেন— কলিকাতায় দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকও ইহার উদ্দেশ্য উল্টা করিয়া বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আপনাকে আর গোপন করিয়া কি করিব, প্রবীণ ঐতিহাসিক …র বৈঠকে নাকি কথা উঠিয়াছে যে, ঠাকুরবংশের কীর্ত্তিঘোষণার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের চেষ্টায় আমার নামমাত্র সম্পাদকতায় এই নূতন কাগজ বাহির হইতেছে—আমার "সম্পাদকের নিবেদন" ছাপা শেষ হইয়া যায় নাই, সুতরাং লোকে যাহাতে ভুল না বোঝেন তাহার কৈফিয়ৎ দিয়া দিব।[৬] আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ ইহা বলিয়া আর দুঃখ করিয়া কি করিব ?

[৬] "যাঁহারা আধুনিক রাজা বা জমিদার, তাহাদের কথা নানা কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থান পাইবে। সে ভার ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকের হস্তে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই,—পুরাতত্ত্ব সংকলন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

মটকার কাপড়ের নমুনা পাঠাইয়াছি। কোট প্রস্তুতের জন্য অষ্ট্রেলিয়া মটকা ক্রয় করিবার জন্য আমাদের শিল্পবিদ্যালয়ে নমুনা পাঠাইয়াছে, ঐ নমুনার কাপড় এ দেশের অর্থাৎ রাজসাহী, বহরমপুর ও মালদহের তাঁতিরা সহজেই প্রস্তুত করিতে পারিবে। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে ত বড় কারখানা নাই, তাঁহারা মাসে ৫০০০ হাজার থানও লইতে পারেন তিন জেলাতেও অত কাপড় গরীব তাঁতিরা বুনিয়া উঠিতে পারিবে না। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সময়ে দাদনসূত্রে কাপড় প্রস্তুতের কারখানা খুলিলে বাঙ্গালীর একটা মস্ত বাণিজ্যের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন, ইহাতে কাহারও প্রতিযোগিতা নাই। আমি যতদূর পারি এ দেশের তাঁতিদের সুবিধা করিয়া দিতেছি। বহরমপুরের Messrs Furgussen & co অষ্ট্রেলিয়ায় মাল চালান দিবার কারবার করিবেন বলিয়া তাঁহাদের লোক নানা স্থানে পাঠাইতেছেন মটকার কাপড়ের বৈদেশিক বাণিজ্যে যাহা কিছু লাভ হইবার কথা তাহা ফরগুসন কোম্পানীরই হইবে, তাঁতিরা খাটিয়া খুটিয়া চারিটী উদরান্ন মাত্র পাইবে, অথচ দেশ ঘুমাইয়া আছে— শুধু বক্তৃতায় ইহার আর কি হইবে? স্বদেশীভাণ্ডার[৭] যদি অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এই কারবার চালাইতে প্রস্তুত হইতেন ত আমি যথাসাধ্য মালপত্তর সংগ্রহ করিয়া দিতাম— এক্ষণে Fergussen কোং officially লিখায় যদি কিছু করিয়া দিতে পারি সে ফল তাঁহারাই ভোগ করিবেন।[৮]

আমি দিন কতকের জন্য একবার মপস্বলে যাইব। 'ভারতী' এখনও পাই নাই। ভরসা করি আপনি স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখিয়া খাটিবেন।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

৪

"ঐতিহাসিক চিত্র" কার্য্যালয়।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮
[২৭ ভাদ্র ১৩০৫]

প্রীতিনমস্কারনিবেদনমেতৎ

আপনাকে পত্র লিখিবার পর ভাদ্রের 'ভারতী' পাইয়াছি। উহার কবিতাটি[৯] অতি সুন্দর হইয়াছে, মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে[১০] বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গ কথা[১১] আমার পক্ষে কিছু অতিরিক্ত আশার

৭ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—"স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে তিনি [বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর] প্রথমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ [ঠাকুর] উভয়ে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে যোগদান করেন।…বলেন্দ্রনাথের যত্নেই প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার আদির একরূপ সূত্রপাত হয়।"—ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বলেন্দ্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়", 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' (১৯০৭)।

৮ পত্রের এই অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষয়-প্রসঙ্গে পত্রাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯ "ভাষা ও ছন্দ", 'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

১০ রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে সংকলিত

১১ রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র পত্রের 'সূচনা' লিখিয়াছিলেন—ঐ পত্রের 'মুদ্রিত প্রস্তাবনা' পাইয়া ভারতী পত্রে (ভাদ্র ১৩০৫) সম্পাদকীয় 'প্রসঙ্গ কথা'য় দীর্ঘ আলোচনা করেন—"নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এক্ষণে

উদ্রেক করিয়া কুণ্ঠিত থাকিবার কারণ জন্মাইয়াছে। ভাদ্রের ভারতীর প্রবন্ধগুলি সমস্তই চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, এখন সহযোগী সমালোচকগণ যাহাই বলুন।

আপনি যে পুরাতন পুস্তকের তালিকা পাঠাইয়াছিলেন ঐ তালিকার অনেক পুস্তকই আমি পড়িয়াছি কোন কোন পুস্তক কিনিয়াছি ও কোন কোন পুস্তক ধার লইয়াছি। ঐ সমস্ত পুস্তকই উক্ত তালিকার লিখিত মূল্যাপেক্ষা অল্পমূল্যে কলিকাতায় অন্য লোকের নিকট পাওয়া যায়।

আমি ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধাদির সমস্ত দেখাশুনা শেষ করিতে পারিলেই দিনকতকের মত একটু অবসর প্রাপ্ত হইব, সম্প্রতি পূজাবকাশ নিকটবর্ত্তী বলিয়া কাজেরও কিছু চাপাচাপি ও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যেরও কিছু গুরুভার পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য রীতিমত পত্রাদি লিখিতে পারি না।

শিল্পবিদ্যালয়ের কাপড়ের যে নমুনা পাঠাইয়াছি তাহা কেমন হইয়াছে ইত্যাদি লিখিবেন। চাদর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারও একখানা নমুনা যথাসময়ে পাঠাইব। কোট প্রস্তুতের কাপড়েরও নমুনা দিব। এতন্মধ্যে যাহা কলিকাতায় চলিতে পারে জানাইবেন।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

৫

ওঁ

ঘোড়ামারা রাজসাহী
১৫।৯।৯৯ ইং
[৩০ ভাদ্র ১৩০৬]

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতৎ

বলেন্দ্রবাবুর[১২] অকালমৃত্যুতে আমরা সকলেই নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়, তৎসূত্রে যে আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়াই স্নেহমমতা করিতাম। তাঁহার উদার স্বভাব, নির্ম্মল চিত্ত ও স্বদেশহিতাকাঙ্ক্ষার চেষ্টা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। কেবল আপনারা কেন সমগ্র দেশের লোকেই তাঁহার অকালমৃত্যুতে একটি আত্মীয় হারাইয়াছে। আমাদের দেশের কথা আর কি বলিব— অতি অল্প লোকেই দেশের জন্য প্রকৃত পন্থায় পরিশ্রম করিয়া থাকেন; যে দুই চারিজন করেন, তাঁহাদের এইরূপ অকালমৃত্যু অন্যের উৎসাহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেই শীতের সময় যে কলিকাতায় গিয়াছিলাম— সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে, এমন মনেও করি নাই!

আমরা দেশে এবং কালে এক রূপে এবং বিরাট রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক।…সেই মহৎ আবিষ্কারব্যাপারের নৌযাত্রায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' একটি তরণী।…আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে।…'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন জন্য ধর্ম্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত।"

সম্পূর্ণ রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে 'আধুনিক সাহিত্য' অংশে ও 'ইতিহাস' গ্রন্থে সংকলিত।

১২ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জন্ম ৬ নভেম্বর ১৮৭০, মৃত্যু ২০ আগস্ট ১৮৯৯। দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,' সাহিত্যসাধক-চরিতমালা ৬০।

আপনি কোথায় আছেন জানিতাম না এবং এই শোকের সময়ে পত্র লিখিতেও সাহস করি নাই। আমরা এখানে বড় বিব্রত— জ্বরে সপরিবারে সহরস্থ ভদ্রমণ্ডলী প্রায় সকলেই শয্যাগত, তাহার উপর ওলাওঠা মারীভয়ের আকার ধারণ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিবার পর অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময় হয় নাই। তথাপি আপনার কর্ম্মচারীর পত্র পাওয়া মাত্র আমি সুতা পাঠাইবার হুকুম লিখিয়া দিয়াছিলাম। শিক্ষক তখন মপস্বলে ছিলেন, নগদ টাকা ভিন্ন হাটে সুতা কেনা যায় না— একথা আমাকে তখন জানায় নাই। তাই বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। কুষ্টীয়া কেদারচন্দ্র লাহিড়ীর নিকট রেল পার্শেলে কিছু সুতা গিয়াছে, এবং সুতা কিনিবার জন্য হুকুম দিয়াছি, যত চাহেন পাঠাইতে পারিব। আমার ইচ্ছার ত্রুটি নাই, ইচ্ছা করে দশহাতে আপনাদের দশজনের সেবা করি, কিন্তু দুখানি হাতে পারিয়া উঠি না তজ্জন্য লোকের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া কত না মর্ম্মপীড়া অনুভব করি। এই এক মাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চিত্রের তৃতীয় সংখ্যায় সমস্ত কাপি ঠিক করিয়া ছাপিবার জন্য কলিকাতায় সান্যাল কোম্পানীর কাছে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রকাশকের বাড়ীতে ওলাওঠা লাগিয়া গিয়াছে; এবং পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট শেষমুহূর্ত্তে মাধাইনগরের তাম্রফলকখানির ফটো পাঠাইয়াছেন। এবার ফটো যাইতেই পারে না, কিন্তু প্রবন্ধটি দিতেই হইতেছে। সুতরাং কাগজ একটু দেরীতে ভিন্ন আর হইয়া উঠে না। আমার কাজ আমি সারিয়া রাখি— চতুর্থ সংখ্যার পর্য্যন্ত কাপি ঠিক আছে; কিন্তু অন্যান্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের লেখকগণ যে কি অলস— কত পত্র ও টেলিগ্রাম দিয়াও চেতনা করিতে পারি না— দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এ বোঝা অর্দ্ধপথে নামাইয়া দিয়া বাঙ্গালীজন্মের পরিচয় দেই। কেবল রণে ভঙ্গ দেওয়া অভ্যাস নাই বলিয়াই পারি না। কিন্তু আমি সব কাজ করিলেও কোন কাজই যথাসময়ে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিয়াছেন। তাহার কারণ আর কিছুই নয়— মানুষ একা, কাজ অনেক। এ মানুষকে দিয়া কাজ করাইতে হইলে সহিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এ বেচারা পারিয়া উঠিবে কেন? আমি যে উদরান্নের জন্য নিত্যই অপরিমিত শ্রম করিতে বাধ্য তাহা ভুলিবেন না। কিন্তু এমনও বিশ্বাস করিবেন না যে আমি তজ্জন্য কেবল কালে ভদ্রে অন্য কাজে হস্তক্ষেপ করি। প্রতিদিনই সাহিত্য শিল্প ও অপরাপর ওকালতীর বাহিরের কাজ করিয়া থাকি, যাহা কেবল আমার উপর নির্ভর করে তাহা একরূপ নামাইয়া দিতে পারি, যাহা দশজনের উপর নির্ভর করে তাহা পারি না। কি করিব?

পূজার ছুটি সম্মুখে। দেশে যাইবার ইচ্ছা নাই। সেখানেও ম্যালেরিয়া ঢুকিয়াছে। কোথায় যাইব এখনও স্থির করি নাই। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার পূজার ছুটি ভিন্ন সময় ঘটিয়া উঠিবে কিনা জানি না সুতরাং আপনার ওখানে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু শিলাইদহে যাইতে হইলে পাবনায় এবং কুমারখালীতে না গিয়া উপায় নাই— মোটেই তাহা ভাল দেখায় না। তাহাতে কিন্তু বেশী সময় লাগিবে। যদি ততটা সময় ও সুযোগ ঘটে তবে অবশ্যই যাইব।

তাঁতি শিক্ষককে বলিবেন তাহার বাড়ীর মঙ্গল। সে যেন নিপুণ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করে— পলায়ন না করে। আজ তবে এইখানে বিদায় হই, আশা করি আপনার পত্র এখন রীতিমত পাইব। নিবেদনমিতি

ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

৬

ওঁ

ঘোড়ামারা রাজসাহী
১২।১২।৯৯ ইং
[২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৬]

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতৎ

আপনার 'কণিকা' পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম। কেহ কেহ হাত ঝাড়িলেই পর্ব্বত হয়—আপনার 'কণিকা'ই তাহার প্রমাণ। কথায় ছোট হইলেও কাজে কম নহে, ইহাতে আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব দূর করিবে। আমরা দশজনে সন্ধ্যার ছায়ায় একত্র মিলিত হইয়া বাঙ্গালা কবিতা হাতে করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়কে ডাকিতে হয়। জলের মত সরল, জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল, প্রিয়জনের মত সুন্দর বলিয়া 'কণিকা'র কবিতা সহজেই সকলকে পুলকিত করিতে পারিবে।[১৩]

যদি লক্ষ্ণৌ যাই তবে, হয়ত বড়দিনে কলিকাতায় দেখা করিতে পারিব না। ঐতিহাসিক চিত্র বাহির হইল—দু একদিনের মধ্যেই পাইবেন নিবেদনমিতি

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

মূল পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

সংযোজন

১-সংখ্যক পত্রে, ও পত্রাবলীর ভূমিকায় কাব্য উপন্যাস ও ইতিহাসের ক্ষেত্র ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ও রবীন্দ্রনাথের যে আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে, অবনীন্দ্র-শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত সুবিখ্যাত "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন"-চিত্র উপলক্ষ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলীও স্মরণীয়। এই চিত্র প্রকাশিত হইলে, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক 'অলীক', 'সুনিপুণ চিত্রকর'-অঙ্কিত এই চিত্র 'সর্বথা কাল্পনিক', এই মর্মে অক্ষয়কুমার রাজসাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষদে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ১৩১৫ মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে উহা ("লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক") মুদ্রিত হয়। ১৩১৬ বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে "কলঙ্কভঞ্জন" প্রবন্ধে (সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে) অবনীন্দ্রনাথ ইহার উত্তর দেন—"ইতিহাসের রাজ্য আর শিল্পের রাজ্য এক নয়। পলায়নকলঙ্কস্বরূপ অসহ্য পঙ্ককে আশ্রয় করিয়া তোমার মনোমৃণাল অবাধে সিধা গিয়া ঠিক জায়গায় বিকাশলাভ করিয়াছে, বঙ্গরাজশ্রীর একটি নিষ্কলঙ্ক করুণ বিদায়চ্ছবিতে। তোমার এ লক্ষ্মণ সেন ইতিহাসের ছায়া নয় কিন্তু কালচক্রের মর্মভেদী ঝন্‌ঝনার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মাত্র।"

---

১৩ রাজসাহী হইতে প্রকাশিত, অক্ষয়কুমারের রচনায় পরিপুষ্ট, 'উৎসাহ' পত্রের ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৬ সংখ্যায়, 'কণিকা'র সমাদর-পূর্বক লিখিত দীর্ঘ আলোচনা বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রদীপ' পত্রে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের যে আলোচনা করেন তাহা এই পত্রাবলীর ভূমিকায় অংশতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ

শ্রীসুকুমার সেন

বিদ্যাপতির কথা অনেকে অনেকভাবে বলেছেন, আমিও কিছু বলেছি। তবে আবার বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার উত্তরে বলব কথায় কথা বেড়ে গেছে বটে কিন্তু তথ্য ও যুক্তি আমাদের "অচলা" বিশ্বাসকে বিশেষ নাড়া দিতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে যে ধারণা আমরা পোষণ করি তাকে "ফেথ্" বললে রূঢ় হয় বটে কিন্তু মিথ্যা হয় না। নূতন কথার প্রতি আমাদের ঘোরতর অবিশ্বাস, যদি সে কথা প্রতিষ্ঠিত ধারণার অনুকূল না হয়। দ্বিতীয় আপত্তি বিদ্যাপতি এখন রীতিমত আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার বিষয়। বাঙালীর দাবি স্বামিত্বের নয়, ইজারাদারের। সে ইজারার মেয়াদ চুকে গেছে। এখন পূরাপূরি স্বত্ব মিথিলার। কিন্তু সে স্বত্ব হিন্দী এসে জবরদখল করছে। বিদ্যাপতি এখন প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের কবি, কেননা শোনা যাচ্ছে মৈথিলী ভাষা নাকি হিন্দীরই এক উপভাষা যেহেতু দুইই নাগরী অক্ষরে ছাপা হয়।

ঝগড়ার কথা থাক্। বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য আমার গোচরে এসেছে এবং সে সম্বন্ধে কিছু নূতন চিন্তাও আমার মনে উদয় হয়েছে। সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাচীনসাহিত্যরসিকদের কাছে গ্রাহ্য হবে মনে করে সে বিষয়ে আলোচনা করছি এই প্রবন্ধে।

২

বিদ্যাপতি একটি ছোট সংগীত-নাটক লিখেছিলেন গোরক্ষনাথের কাহিনী নিয়ে। এ কথা কারো কারো জানা ছিল। এই নাটকের একটি পুথির কয়েকটি পাতার ফটো-প্রতিলিপি আমি বছর সাত-আট আগে দেখেছিলুম। কিছুকাল আগে এই নাটকের একটি পুথির বিবরণ আমার গোচরে এসেছে।[১] সেই বিবরণ আমি বাঙালী পাঠকের নজরে এনে দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

পুথি আছে নেপালে। তালপাতার পুথি, বারো পাতা, মৈথিলী অক্ষরে লেখা। নাম 'গোরক্ষবিজয় নাটকম্'। বিষয় শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক কামিনীমোহপাশবদ্ধ গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের উদ্ধার। রচনার রীতি উমাপতির পারিজাতহরণের মতো। অর্থাৎ গানগুলি ভাষায়, বাকি সব সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে। ভাষা মানে মৈথিলী ও বাংলা অর্থাৎ ব্রজবুলি। মিথিলায় ভৈরবেশ্বর শিবের উৎসব উপলক্ষ্যে রাজা শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি এই সংগীত-নাটক রচনা করেছিলেন। অতএব রচনাকাল ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।

এই দুটি শিব-বন্দনা শ্লোক দিয়ে নাটকের আরম্ভ—

> হর্ষাদম্ভোজজন্মাপ্রভৃতিদিবিষদাং সংসদি প্রীতিমত্যা
> গৌর্যা মৌলৌ পুরারে র্দুহিতৃপরিণয়ে সাক্ষতং চুম্ব্যমানে।
> তদ্বক্ত্রং শৌলিবক্ত্রে মিলিতমিতি ভৃশং বীক্ষ্য চন্দ্রঃ সহাসো
> দৃষ্ট্বা তদ্বৃত্তমাশু স্মিতসুভগমুখঃ পাতু বঃ পঞ্চবক্ত্রঃ॥

---

১ বীর-পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফতেজঙ্গ পরাক্রম শাহ প্রদত্ত বিবরণ (সংস্কৃতসন্দেশ ১. ১)।

—'ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের সভায় দুহিতার পরিণয়ে মুরারির মস্তকে হর্ষভরে সস্নেহে চুম্বন করবার সময় প্রীতিমতী গৌরীর মুখ শৈলীর (শিবের) মুখের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে ভেবে চন্দ্র হেসে উঠল। তাই দেখে তখনি সহাস হল শিবের সুন্দর পঞ্চমুখ, সেই পঞ্চমুখ তোমাদের রক্ষা করুন।'

অপি চ।

> বক্ত্রাম্ভোরুহি বিস্মিতাঃ স্তবকিতা বক্ষোরুহি স্ফারিতাঃ
> শ্রোণীসীমনি গুম্ফিতাশ্চরণয়ো রক্ষোঃ পুনর্বিস্তৃতাঃ।
> পার্বত্যাঃ প্রতিগাত্রচিত্রগতয় স্তন্বন্তু ভদ্রাণি বো
> বিদ্ধস্যান্তিকপুষ্পশায়কশরৈ রীশস্য দৃগ্‌ভঙ্গয়ঃ॥

—'অধিকন্তু। মুখপদ্মে বিস্মিত, স্তনে স্তবকিত, নিতম্বরেখায় স্ফারিত, চরণে গুম্ফিত, বক্ষে বিস্তৃত— পার্বতীর প্রতি অঙ্গে বিচিত্রগতিপ্রাপ্ত সন্নিহিত মদনশরবিদ্ধ ঈশের এইরূপ দৃগ্‌ভঙ্গি তোমাদের মঙ্গল বিস্তার করুক।'

নান্দীর পর গান। তার শেষ কয় ছত্র এই—

> মন পরিতোষ রোষ তহ দুণ
> মারল মদন জিআউল পুণ।
> মুগুতি কারণে রে ভেলাহ জটাধারী
> ভুগুতি কারণে অর্দ্ধতনুধর নারী।
> ভনই বিদ্যাপতি পুরবথু আশা
> মঙ্গলকার এ দেব দিগ্‌বাসা॥

তার পর নট-সূত্রধারের উক্তি,

> অলমতিবিস্তরেণ। ততো নটী মাহূয় সঙ্গীতকমবতারয়ামি॥

নটীর প্রবেশ ও উক্তি,

> অজ্জউত্ত ইয়ং খু অহং চিট্‌ঠামি। কিং আণবেদি অজ্জো॥—'আর্যপুত্র, এই আমি হাজির। আর্য কি আজ্ঞা করেন।'

নটের প্রত্যুত্তর,

> শ্রীবিদ্যাপতি-সৎকবীশ্বরস্য গোরক্ষবিজয় নাম নাটক-নটনার্থং মহারাজাধিরাজ-
> শ্রীমৎশিবসিংহদেবপাদৈঃ সুহেতুকার্থং শ্রীমদ্ ভৈরবভক্তয়ে আজ্ঞাপিতোঽস্মি।

নটীর উক্তি,

> অজ্জ কং সময়ং লক্‌খীকদুঅ নটিদব্বং॥—'আর্য কি সময় উপলক্ষ্য করে নাট করতে হবে।'

নটের প্রত্যুত্তর,

> শারদমেব। অত্র
> পিবতি তমঃ শশিলেখা বিকশতি পদ্মং হসন্তি কুমুদানি।
> লঘুরপি রাজতি তারা গুরুরপি সীদতি পয়োবাহঃ।
> প্রফুল্লসপ্তচ্ছদগন্ধলুব্ধা
> মুগ্ধাঃ প্রভাতোৎপলসৌরভেষু।
> ভৃঙ্গাশ্চ কিঞ্জল্কভরেণ ভৃঙ্গা
> ভূয়োঽত্র কুর্বন্তি গতাগতানি॥

—'শরৎকালেই। এ সময়ে

শশিকলার দীপ্তি বাড়ে, পদ্ম বিকশিত হয়, কুমুদ হাসে, ছোট তারাও উজ্জ্বলতর হয়, ভারি মেঘও অবসন্ন হয়।

ফোটা ছাতিমফুলের গন্ধলুব্ধ ভৃঙ্গগণ ফুলরেণু-ভরে নত হয়েও প্রভাতে উৎপল-সৌরভে মুগ্ধ হয়ে এখন অনবরত গতায়াত করছে।'

গোরক্ষ তাঁর চেলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রাসাদদ্বারে। দৌবারিক বললে, 'অরে যোগিনৌ যুবয়োা রত্র প্রবেশো নাস্তি'।

গোরক্ষ বললেন, ওরে দৌবারিক, আমরা যোগী আমরা সর্বত্র যথাভিরুচি যেতে পারি ও থাকতে পারি। কেউই আমাদের নিষেধ করতে পারে না।

তবুও প্রহরী ঢুকতে দেয় না। তখন গোরক্ষ বললেন, আমি যা খুশি তাই করতে পারি বটে কিন্তু গুরু যদি চটেন সেই ভয় করি।

সংক্ষোভয়ামি নগরং গগনে নয়ামি
প্রাসাদমেব নৃপতে র্নিভৃতং বিশামি।
কি [-ন্তত্র যোগমহিত-] স্য গুরোরিদানীং[১]
রাগানুবন্ধহৃদয়স্য গুরো র্বিভেমি॥

—'নগর আলোড়ন করতে পারি, তা আকাশে তুলে বসাতে পারি, নিভৃতে নৃপতির প্রাসাদে তো অবশ্যই প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু ভয় করি· ·অনুরাগমুগ্ধচিত্ত গুরুর রোষ।'

প্রাসাদে ঢুকে গুরুর সামনে গিয়ে গোরক্ষ গুরু-বন্দনা গাইলেন,

গোরথ নামে তোহর হমে শীষ
সেবা আএলাহু দেহ আশীষ।· ·

তারপর গুরুকে শিষ্যের জ্ঞান উপদেশ,

কোদণ্ডদণ্ডয়োর্মধ্যে সূর্যকোটিসমপ্রভম্।
রাজ্যং বিহায় রাজেন্দ্র তজ্জ্যোতিঃ পরিচিন্ত্যতাম্॥

—'হে রাজেন্দ্র, রাজ্য ত্যাগ করে ভ্রূযুগল মধ্যবর্তী কোটি সূর্যের প্রভাময় সেই জ্যোতি ধ্যান করুন।'

মৎস্যেন্দ্রনাথ এ কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। তখন গোরক্ষ খেদ করতে লাগলেন,

অন্তেবাসী ত্রিভুবনগুরো র্বদ্ধ সীতাংশুমৌলের্
মান্যো রাজাপি চ মম গুরু র্যোগিনামগ্রগণ্যঃ।
ভব্যো বোধোদয়বৃততনু র্যৎ স মৎস্যেন্দ্রনাথঃ
সীদত্যস্মিন্নহহ সুদৃশাং ভ্রূলতাপাশবদ্ধঃ॥

—'ত্রিভুবনের গুরু চন্দ্রশেখরের শিষ্য (এই) মান্য রাজা যোগীদের অগগ্রণ্য, আমারও গুরু। এমন যে ভব্য ও জ্ঞানদীপ্তদেহ মৎস্যেন্দ্রনাথ, আহাহা তিনি এখানে সুনয়নী নারীর ভ্রূলতা পাশে বদ্ধ হয়ে মুহ্যমান।'

---

১ বন্ধনীস্থিত অংশ আমার যোজনা।

রাজা মৎস্যেন্দ্র হেসে বললেন,

অস্মাকং যোগিনাং কুতঃ স্ত্রিয়ো মোহঃ।

কাষ্ঠং শিলা কুলিশমস্তি কঠোরবর্গম্
তেভ্যোঽপি গাঢ় মধিকং কিল যোগিচেতঃ।
অস্তু স্থিতং কমলপত্রমিবাম্ভসৈব
লোলিয়্যতে করুণয়া শরমন্তরেণ ॥

—'আমরা যোগী, আমাদের নারীমোহ কোথায়।

কাঠ পাথর বজ্র এই সব কঠিন দ্রব্য, এসবের চেয়েও অধিক অভেদ্য যোগীর চিত্ত। হতে পারে (চিত্ত) বারিবিন্দুযুক্ত কমলপত্রের মত, কিন্তু শর ব্যতিরেকে তা করুণার দ্বারা বিনষ্ট হবে (?)।'

গোরক্ষ নাছোড়বান্দা। অবশেষে মৎস্যেন্দ্রের চক্ষুরুন্মীলন। তিনি পদ গাইলেন যার ধুয়া

তোহে মোর গোরখ প্রাণসমান।

গোরক্ষ সমুচিত উত্তর দিলেন পদ গেয়ে। পদটির ভনিতা

ভনই বিদ্যাপতি জোড়িঅ হাথ
সঙ্গ ন লাগহ মচ্ছেন্দ্রনাথ।

শেষে ভরতবাক্য। শিষ্যকে গুরুর আশীর্বচন,

গঙ্গেবাম্বুনিধে হিমাদ্রিশিখরং বিদ্যা গুরুং সঙ্গতা
ত্বত্তঃ স্নেহনিশান্ধকারগহনে লব্ধঃ প্রকাশো ময়া।
ত্বন্মে শিষ্যত্বমত্রপঃ..........ত্বন্মে ত্বদীয়ং বপুঃ
শ্রীগোরক্ষ চিরেণ জীব জগতি ত্বৎকীর্ত্তিরুজ্জৃম্ভতাম্ ॥

—'সাগর থেকে হিমাদ্রি শিখরে গঙ্গার মত বিদ্যা গুরুকে মিলেছে। তোমার জন্যে আসক্তিরূপ নিশান্ধকারে আমি আলোক পেয়েছি। তুমি আমার শিষ্যত্ব··আমার দেহ তোমারই। শ্রীমান গোরক্ষ তুমি চিরকাল বেঁচে থাক আর তোমার কীর্তি জগতে বিস্তীর্ণ হোক।'

অতঃপর "ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে"। তার পর পুষ্পিকা

ইতি সুপ্রক্রিয়-মহারাজ পণ্ডিতবর-শ্রীমদ্‌বিদ্যাপতি-সৎকবি বিরচিতং গোরক্ষবিজয়-নাম নাটকং সমাপ্তম্। লসং ৪৩৫ অগ্রহ[ায়]ণ বদি ১১ তিথৌ···দিনে···যোগে করণ শ্রীমুরারি কণ্ঠস্যাত্মজ শ্রীভগীরথেন লিখিতং পুস্তকমিতি।

বিদ্যাপতির "মহারাজপণ্ডিত" বিরুদ অন্যত্র দেখা যায়নি।

৩

'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী' বইয়ে লিখেছিলুম "বিদ্যাপতির কোনো পদে পদ্মসিংহ বিশ্বাসদেবীর উল্লেখ নেই।" এ কথা এখন প্রত্যাহার করতে হচ্ছে। বিদ্যাপতির একটি পদে বিশ্বাসদেবী ও পদ্মসিংহের নাম মিলেছে। একটি পুরানো তালপাতার পুথি মৈথিলী অক্ষরে লেখা, তাতে পদটি মিলেছে।[১] ভনিতা এই,

---

১ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর বিদ্যাপতির পদাবলীতে পদটি উদ্ধৃত করেছেন (২০৬)। তবে পাঠে কিছু ভুল আছে।

ভনই বিদ্যাপতি· ·[১] নহি আনে
বিসবাসদেবি-পতি রসকো বিন্দক নৃপতি পদুমসিংহ মানে ॥

এই পুথিতে এমন একটি পদ আছে যার জুড়ি বিদ্যাপতির পদাবলীতে অথবা অন্য পদাবলীতে মেলে না। পদটিতে শীতের প্রকোপ সরসভাবে বর্ণিত, সেই সঙ্গে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে কবির পোষ্টা কুমার অমর সিংহের প্রত্যাশিত বদান্যতার (জোড়া শালের ?) দিকে।[২] পদটি এই—

সারঙ্গী ॥

জাড়ন বামুন তেজ সনান
জাড়নি মা [-নিনী ছাড়ল][৩] মান।
জাড়ন বাড় ঘোকরী নাব
জাড়ন রসিক তেনা গাব। ধ্রু।
জাড় আএল কহব কাহি
বড় পরাভব পবন চাহী।
·· ·· ·· ·· [ক] রথি
পিঠিক জাড় সেহও নহি হরথি।
অনল ফুকিঅ হেরিঅ সুর
সিসির পাবি সেহও ভেল দুর।
জুঝি· · · ·কাহর
জাড়ন বীর কৈসে হোএ বাহর।
মনহি মন করি অনে আর
তৈসন সিংহ তইসন সিআর।
[সরস][৪] কবি বিদ্যাপতি গাব
কেও নহি ঐসন জাড় ছুড়াব
সকল জগত জাড় হরণ
কুমর অমরসিংহ সরণ ॥

—'জাড়ে (অর্থাৎ শীতের চোটে) বামুন স্নান ছাড়লে, জাড়ে মানিনী মান ছাড়লে। জাড়ে বুড়ো হাঁটু তুলে পা মুড়ে মাথা গুঁজলে, জাড়ে রসিক (যুবক) টেনা (কাপড়) গায়ে দিলে। জাড় এল, কি আর বলব। দেখে পবনের খুব প্রভাব হল (?)। [অগ্নি সেবনে কিছু প্রতিকার] করে, কিন্তু সেও পিঠের জাড় হরণ করতে পারে না। আগুন ফোঁকা দেখে সূর্য সেও শীতকাল (বা শিশির) পেয়ে দূরে সরে গেল।[৫] যুদ্ধ · ·কাহার, জাড়ে বীর কি করে বার হবে। মনে মনে নিরূপণ করলে (??), যেমন সিংহ তেমনি

১ পুথিতে এই অংশ এখন লুপ্ত। বিমানবাবু পড়েছিলেন "সুনহ মধুরপতি তোঁহে ছড়ি গতি।"

২ বিমানবাবু পদটির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি (২১৩), তাই মানে বা ব্যাখ্যা দেন নি।

৩ বন্ধনীস্থিত অংশ কল্পিত।

৪ বন্ধনীস্থিত অংশ পুথিতে এখন লুপ্ত, পাঠ বিমানবাবুর।

৫ পাঠ "অনল ফুকিঅ হেরিঅসুর"।

শিয়াল। বিত্যাপতি কবি গাইছে, এমন কেউ নেই যে জাড় তাড়ায়, (তবে) সকল জগতের জাড্য (মূর্খতা) হরণকারী কুমার অমরসিংহ শরণস্থল।'

৪

মিথিলায় পাওয়া বিত্যাপতি-পদাবলীর আকর গ্রন্থ ও পুথির মধ্যে লোচন শর্মার রাগতরঙ্গিণী প্রাচীনতম ও প্রামাণিকতম। রাগতরঙ্গিণীর একটি পুথির লিপিকাল ১৬০৬ শকাব্দ, আর একটির ১৬১৩ শকাব্দ। ১৬০২ শকাব্দে লোচনের নিজ হাতে লেখা নলচরিত (নৈষধীয়চরিত) কাব্যের পুথি মিলেছে। সুতরাং রাগতরঙ্গিণীর রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ। রাগতরঙ্গিণীতে শুধু যে বিত্যাপতির পদাবলী কিছু উদ্ধৃত আছে তাই নয়, তাঁর পদাবলী গানের গোড়ার কথাও কিছু বলেছেন। তার মধ্যে এমন নতুন খবর আছে যা অত্যাবধি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নি।

দেশী গীতের আলোচনার আরম্ভে লোচন বিত্যাপতির গানের উল্লেখ করেছেন,

দেশ্যামপি স্বদেশীয়ত্বাৎ[১] প্রথমং মিথিলাপভ্রংশভাষয়া শ্রীবিত্যাপতি-কবি-
নিবদ্ধা স্তাস্তা মৈথিল-গীতগতয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে।

তারপর বিত্যাপতি-গীতের "উৎপত্তিপ্রদর্শনম্",

বিখ্যাত-ভূদেব-সুবংশসূতির্
বিত্যাবিভূতির্ভবভূতিরাসীৎ।
স দেবতায়াঃ কিল সিদ্ধিযোগাৎ
কাব্যং পুরাণপ্রতিমং চকার॥

—'বিখ্যাত উত্তম ব্রাহ্মণবংশের সন্তান ছিলেন বিত্যাবিভূতিমান্ ভবভূতি। তিনি দেবতার বরে সিদ্ধিলাভ করে পুরাণতুল্য কাব্য রচনা করেছিলেন।'

অধীত্য তৎসংসদি পার্থিবেভ্যঃ
কথাস্তদীয়াঃ কথয়াম্বভূব।
অতস্তদানীং সুমতিঃ কলাবান্
কায়স্থসূনুঃ কথকো বভূব॥

—'এঁর কাছে শিক্ষা করে কায়স্থ সন্তান কালোন্নাত সুমতি তখন কথক হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন রাজ-সভায় (গুরুর রচনা) কথকতা করতেন।'

সুমতি-সুতোদয়-জন্মা জয়তঃ শিবসিংহদেবেন।
পণ্ডিতবর-কবিশেখর-বিত্যাপতয়ে তু সন্ন্যস্তঃ॥

—'সুমতির পুত্র উদয়। উদয়ের পুত্র জয়ত। তাকে রাজা শিবসিংহ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কবিচূড়ামণি বিদ্যাপতির কাছে দিলেন।'

এতৈঃ সঙ্গীতবিদ্‌ভিঃ স্বরনিকরসরিৎকান্তমন্তর্বিগাহ্য
প্রোন্মীলৎসুস্বরৌঘৎপ্রবিততগতিকাঃ কল্পিতাঃ কেঽপি রাগাঃ।
তদ্গানার্থন্তু বিত্যাপতি-কবিকৃতিনা কল্পিতাস্তু ধ্রুবা যাস্
তাসামেকোঽগ্রগাতাভবদিহ জয়তঃ সংসদি শ্রীনৃপস্ত॥

১ ব্যাসদেব মিশ্র সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ "স্বদেশীয়ত্বাৎ" ভ্রান্ত।

—'এই সংগীতবেত্তারা স্বরসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে নবনবোন্মেষিত স্বরমণ্ডলের বিচিত্র ভঙ্গিমায় কতকগুলি রাগ তৈরি করেছিলেন। সেই সব রাগ গানে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে কৃতী কবি বিদ্যাপতি যেসব ধুয়া রচনা করেছিলেন রাজার সভায় সেগুলির একমাত্র উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন জয়ত।'

পিতুরন্যূনগুণঃ কিল কলাভিরানন্দদঃ প্রথিতঃ।
জয়তাদজনি বিতৃষ্ণঃ কৃষ্ণো নিজদেশিগায়কঃ সদসি॥

—'জয়তের পুত্র হল কৃষ্ণ। ইনি পিতার মতো গুণবান্, লোকপ্রিয় যশস্বী কালোয়াত, উদাসীন-প্রকৃতি এবং সভায় দেশীগীতের গায়ক।'

ততশ্চ

বিমলমতিরতীশপ্রায়কায়ঃ কথায়াস্
সদসি কথনকারী গীতগানৈর্গরিষ্ঠঃ।
সফলজনি রনন্যজ্ঞানসামান্যবিদ্যা-
বিদিত-হরিহরাখ্যো মল্লিকঃ প্রাদুরাস॥

—'তাঁর থেকে জন্মালেন হরিহর মল্লিক। ইনি নির্মলবুদ্ধি, সমুন্নতদেহ, সভায় কথার কথক, গীতের গানে শ্রেষ্ঠ। এঁর জন্ম সফল। ইনি অসাধারণ জ্ঞান ও তত্তুল্য বিদ্যার জন্য বিখ্যাত।'

খড়্গরাম-ঘনশ্যাম-কল্লীরামা স্ত্রয়ঃ সুতাঃ।
এতস্য বত তেষ্বেকো ঘনশ্যামস্তু গায়কঃ॥

—'এঁর তিন পুত্র—খড়্গরাম, ঘনশ্যাম, কল্লীরাম। তার মধ্যে একমাত্র ঘনশ্যাম হলেন গায়ক।'

রামান্তা লচ্ছিরাঘবটীকাখ্যাঃ শীলসম্পন্নাঃ।
স্বদেশিগায়কাস্তে তু ঘনশ্যাম-সুতাস্ত্রয়ঃ।

—'ঘনশ্যামের তিন পুত্র—লচ্ছিরাম, রাঘবরাম, টীকারাম। তাঁরা দেশিগানের গায়ক ছিলেন।'

তার পরে বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ শেষ করছেন লোচন এই বলে,

শ্রীমদ্বিদ্যাপতি-কবয়িতুঃ কাব্যবর্ণানুবদ্ধাং
স্তৎতৎপ্রায়ানথতৈ তদনুগ-খ্যাতগীনিবদ্ধান্।
রাগানেভ্যঃ কথমপি তথা বর্তুলীকৃত্য ধীমান্
প্রেম্ণা শ্রীমন্নরপতিরতো লোচন স্তাঁল্লিলেখ॥

—'শ্রীমান্ বিদ্যাপতি কবির কাব্যবর্ণনানুবদ্ধ অথবা সেগুলির তুল্য অথবা সেগুলির অনুকৃত, প্রচলিত গীতে নিবদ্ধ, রাগগুলি থেকে কোনো রকমে কিছু যোগাড় করে শ্রীমান্ নরপতির অনুরক্ত ধীমান্ লোচন সাদরে সেগুলি লিখলেন।'

তার পরে সেইসব রাগের নাম-গোষ্ঠী নির্দেশ ও গীত-উদাহরণ।

৫

বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে লোচন যা বলেছেন তার মধ্যে দুটি কথা অনুধাবনযোগ্য। লোচন প্রথমে বলেছেন, দেশি রাগের গানে রূপ দেবার জন্য বিদ্যাপতি ধুয়া পদ লিখেছিলেন। শেষে বলেছেন, তিনি বিদ্যাপতির "কাব্যবর্ণানুবদ্ধ" রাগ সংগ্রহ করেছেন। কাব্যবর্ণানুবদ্ধ মানে স্পষ্ট— সম্পূর্ণ পদাবলীর রূপযুক্ত।

লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির ভনিতাযুক্ত পদাবলী কয়েকটিই প্রধানত সংকলিত হয়েছে। ভনিতাহীন যে দু-চারটি পদ আছে, সেগুলিতে পদসংখ্যা চার অথবা আট। মনে হয় এই ধরনের ভনিতাহীন ছোট পদগুলিকেই লোচন "ধ্রুবা" বলে নির্দেশ করেছেন। মিথিলায় অথবা নেপালে বিদ্যাপতির পদাবলীর যেসব প্রাচীন পুথি পাওয়া গেছে তাতে ভনিতাহীন পদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ডক্টর শ্রীসুভদ্র ঝা সম্পাদিত নেপালের পুথির কতকগুলি পদ আসলে ভনিতাহীন, পুথির লেখক বিদ্যাপতির নাম যোগ করে দিয়েছেন শুধু "ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি" অথবা "ভণে বিদ্যাপতীত্যাদি" বলে। কোনো কোনো স্থানে এমনি যে "ভনই বিদ্যাপতি" "ভনে, বিদ্যাপতি" অথবা শুধু "বিদ্যাপতি" ছন্দের সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং এখানে স্বীকার করতেই হয় যে এমন ভনিতাছত্র মূলে ছিল না। উদাহরণ দিই—

কত ন জীবন সঙ্কট পরএ কত ন মীলএ নিধি
উত্তিম তৈঅও সত্য ন ছাড়এ ভল মন্দ কর বিধি।
সাজনি গএ বুঝাবহ কাহ্নু
উচিত বোলইতে[1] জে হোঅ সে হো[অ] দৈন ন ভাবহ জনু॥ ধ্রু।[2]
জৈসন সম্পত্তি তৈসনি আসতি পুরুব অইসন ছলা
মোন[3] বেচি যদি প্রাণ জে রাখীঅ তাতে মরণ ভলা।
ভনই বিদ্যাপতীত্যাদি॥

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পরে যখন অদ্বৈত আচার্যের ঘরে শান্তিপুরে আসেন তখন একদিন সন্ধ্যাবেলায় আচার্য ও হরিদাস "এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন—"

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ধ্রু॥

পদটিকে অনেক কাল পরে পাওয়া যাচ্ছে বিদ্যাপতির নামে একটি পূর্ণাঙ্গ পদের অংশ রূপে। পদটি এই,

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর। ধ্রু।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাঙ
তব হাম দূরদেশে পিয়া না পাঠাঙ।
শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।
নিধন পিয়ার [হাম] না কৈলুঁ যতন
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন।
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

---

১ পদটির ছন্দ ও বাক্‌রীতি বাংলা। 'বোলইতে' এই মৈথিলী পদটি ছন্দোদুষ্ট, বাংলা 'বলিতে' পড়লে ঠিক হয়।

২ এইটিই ধ্রুবপদ, ডক্টর ঝা প্রথম পদটিকে ধ্রুবপদ নির্দেশ করেছেন।

৩ মন, মৌন অথবা মান।

এই পদের শেষ আট ছত্র, বিশেষত শেষ ছ ছত্র, প্রথম চার ছত্র থেকে স্পষ্টত স্বতন্ত্র। শেষের ছত্রগুলির ভাষা ও ছন্দ পুরাপুরি বাংলা। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, বিদ্যাপতির এই গানটি ছিল "ধ্রুবা"-জাতীয়, দু ছত্রে বা চার ছত্রে সম্পূর্ণ। ভনিতা ছত্র বিদ্যাপতির অন্য পদ থেকে যোগ হয়ে থাকবে। আর মাঝের ছত্রগুলি যাকে বাংলায় বলে সম্পূরণ, ইংরেজিতে প্যাডিং।

বিদ্যাপতির "ধ্রুবা" গীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের যুক্ত ভনিতার পদগুলির কিনারা হয়। এই পদগুলির সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর বলে গেছেন,

বিদ্যাপতি-ঠক্কুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাস কবিরাজ-কৃত মিতি গম্যতে।

এ উক্তির সমর্থন হয়। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কয়েকটি "ধ্রুবা" গীতিকে পূর্ণতর রূপ দিয়েছিলেন এবং উত্তরসূরীর কপিরাইট্ অগ্রাহ্য করেন নি॥
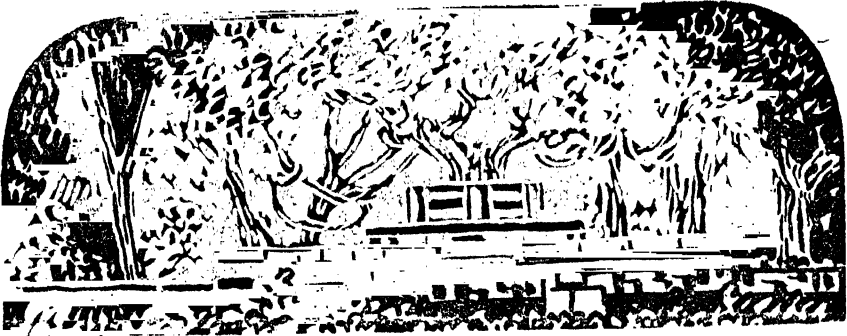
নিধুবাবু ও বাংলার টপ্পা

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাঙালীর স্বভাবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে ভারতীয় সমাজে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। এই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য তার সংগীত-সংস্কৃতিতেও বর্তমান। বাংলার সংগীত এবং উত্তরভারতীয় সংগীত—এই দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে অথচ দুইয়ের মধ্যে এক সুনিবিড় যোগসূত্রও বর্তমান। এই পার্থক্য কোথায়? একটি সামাজিক এবং মানবিক, অপরটি কৌশলী শিল্পবৈজ্ঞানিক। এই যে সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, এইটিই হল বাংলা গানের মূলকথা। দরবারি গানের চর্চা বাংলায় হয়েছিল কিন্তু বাঙালীর কৃতিত্ব সেখানে নয়; বাংলার সংগীতকলা সেখানেই সার্থকতা অর্জন করেছে যেখানে সংগীত উচ্চ ভাবলোক বা আয়াসসাধ্য রূপবন্ধ ছেড়ে নিজের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই বাংলার লোকসংগীত এত মধুর, এবং কীর্তনের আখরগুলি এইজন্য আমাদের অন্তরকে এত স্পর্শ করে। বাংলার কাব্যসংগীত যখন গড়ে উঠতে লাগল তখনও তাতে রাগসংগীতের প্রয়োগ হলেও তার কাব্যসুষমা অক্ষুণ্ণ রইল। আমাদের মনোভাব এবং অনুভূতিকে রাগ-সংগীতের স্পর্শে রূপায়িত করা হল কিন্তু নানা 'কর্তব্' খাটিয়ে তাকে একটা উচ্চশ্রেণীর সংগীতে পরিণত করবার প্রয়াস বিশেষ প্রাধান্যলাভ করে নি। এরকম চেষ্টা যে একেবারে হয় নি তা নয়, কিন্তু তেমন সমর্থন পায় নি। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)-র টপ্পার মূল বৈশিষ্ট্য বোলতান সাপট্তান বা জমজমায় নয়, ছোট ছোট বিস্তারে এবং আন্দোলিত তানে। পুরোনো বাংলাগানের সংগঠন লক্ষ্য করলেই দেখা যায় খুব একটা ওস্তাদির অবকাশ তাতে নেই কিন্তু ছোটখাটো বিস্তার এবং তানপ্রয়োগের অবসর আছে। এতে খুশি না হয়ে অনেকে নানাকরম কৌশল বিস্তার খাটিয়ে টপখেয়ালের অবতারণা করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সংগীত এই দুই বস্তুরই অঙ্গহানি ঘটেছে। নিধুবাবুর রচনার সবচেয়ে বড় কথা হল একটি মানবিক আবেদন—শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয় সংগীতের ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে এবং এই আবেদন যাতে মর্মে পৌছায় সেজন্য তিনি টপ্পার তানকে দ্রুত করেন নি, তাকে ধীর আন্দোলিত রূপে প্রকাশ করেছেন। উত্তরভারতে যে টপ্পার তান প্রচলিত তার রূপ আর নিধুবাবুর টপ্পার তানের আকৃতি এক নয়। একটি দ্রুত তানকর্তবের সমষ্টি, অপরটি সমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত ঢেউয়ের মত দুলে দুলে চলেছে, আর আমাদের হৃদয়তটে এসে আছড়ে পড়ছে। শোরির টপ্পার দ্রুত তানে একটি কারুণ্য আছে, তানহিল্লোলে সেই কারুণ্য প্রকাশ পায়। বিখ্যাত টপ্পা "ও মিঞা বে জানেওয়ালে" গানটিতে হিন্দিচালে দ্রুত তানে চমৎকার রসসৃষ্টি করবার সুযোগ আছে। এগানটি গাইবার সময় বাংলা টপ্পার চাল আমাদের মনে আসে না। কিন্তু এরই ছকে ফেলা গান "যে যাতনা যতনে" যখন গাইতে বসি তখন আপনা থেকেই আসে নিধুবাবুর প্রবর্তিত সেই করুণ মিঠে ধীর দুলকিচালের তান। এ গানটি শ্রীধর কথকের রচনা। নিধুবাবুর রচনা বলে চিরপ্রসিদ্ধ "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গানটির সুর শুনলে এই ধীর আন্দোলিত তানের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বোঝা যাবে।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।

এ ক্ষেত্রে "কলঙ্কছলে"র পরে টপ্পার যে তান দেওয়া হয় তা যদি দ্রুত করা যায় তাহলে ওস্তাদি হয়তো প্রকাশ পায় কিন্তু পূর্ণশশীর পরিতাপ প্রকাশ পায় না। কাব্যসংগীতে নিধুবাবুর অসামান্য প্রতিভার বিকাশ এইরকম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। নিধুবাবু রাগসংগীতকে অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি নিজে ছিলেন ওস্তাদ মানুষ কিন্তু সংগীতের প্রকৃত মর্ম যে কাব্যের আবেদনে, নিছক ওস্তাদিতে নয়, এটা তিনি সেই যুগে বুঝেছিলেন যে যুগে এক দিকে ছিলেন হিন্দিগানের দুর্ধর্ষ ওস্তাদবর্গ আর অপর দিকে কবিগান আর খেউড়-গায়করা। নিধুবাবু সে যুগের সংগীতে মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি গুরুগম্ভীর ধ্রুপদী রীতির প্রয়োগ করেন নি, আবার হালকা চালকেও গ্রহণ করেন নি, অথচ লোকের রুচি অনুসারে গান লিখেছেন। কি সাহিত্য কি সংগীত, এই দুই ক্ষেত্রেই সাধারণের রুচিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যেটা সবাই পারেন না। সাধারণের রুচি বলতে অনেকে নিম্নরুচি বোঝেন; কিন্তু এই ধারণা ভ্রমাত্মক। সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ রয়েছে— যে শিল্পী এটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন তিনিই সাধারণকে অসাধারণ প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। নিধুবাবু পেরেছিলেন— তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁর পরে আর-একজন এই-রকম অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি শ্রীধর কথক। বাংলা টপ্পার সবচেয়ে পরিমার্জিত রূপ শ্রীধরের রচনায় পাওয়া যায়।

সংগীতে মানবিক আবেদন সবচেয়ে বড় বলে নিধুবাবু রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার আবরণে নিজের বক্তব্যকে ঢাকেন নি অথচ প্রবহমান প্রণয়সংগীতের মূলরসটি তাঁর সংগীতে ছিল। গায়কী রীতিও তিনি সেইভাবে সংস্কৃত করে নিয়েছিলেন যাতে গানের চাল হালকা না হয় অথচ বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়। প্রয়োগশিল্পের এই সংযোগে যে রূপ সৃষ্ট হল তা একান্ত পরিচিত অথচ নতুন। নিধুবাবুর স্বকীয়তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই সৃষ্টিকর্মে। এই প্রভাবে পরবর্তীকালের বহু রচনা গৌরবান্বিত হয়েছে, এমন কি পাঁচালি-কথকতাও। পাঁচালিতে ব্যবহৃত অনেক গানের সুর টপ্পার মাধ্যমে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এইসব রচনায় লোক-সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য আছে অথচ টপ্পার স্পর্শে এগুলি কাব্যসংগীতের লালিত্যে মনোরম রূপ ধারণ করেছে। এমন একাধিক গান দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে মেলে।

টপ্পার প্রভাবে ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত "খেমটা" চালের গানও মার্জিত এবং সুললিত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত "আড়-খেমটা" গানের অশ্লীলত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে একটা ভীতি আছে তা অনেক পরিমাণে অমূলক। খেমটা চালের গান মাত্রই যে অশ্লীল এমন নয়। আড়-খেমটার ঢঙে কয়েকটি বিশেষ মনোভাবকে প্রকাশ করা যায় যা হয়তো আর কোনো ঢঙে সম্ভব নয়। এই ঢঙে এক দিকে মনের প্রফুল্লতা, চাপল্য, অপর দিকে কারুণ্যও প্রকাশ পায়। সবচেয়ে বড় কথা এর নাটকীয় আবেদন। আর নাটকীয় আবেদন মানেই মানবিক অনুভূতির প্রকাশ। খেমটা ধরনের গানগুলির সার্থকতাও এইখানেই। এইসব গানের সুরে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটে নি সত্য কিন্তু মানবিক হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। যা সাধারণের চেতনার উর্ধ্বে তাকে অনুভব করাবার চেষ্টা হয়তো মহৎ কিন্তু যা আমাদের প্রাত্যহিক ভাবধারার মধ্যে লুকিয়ে আছে অথচ যা আমাদের জানান দেয় না আমাদের অন্তরে ছোট্ট একটুকরো সুরের আঘাতে যদি তার পরিচয় প্রকাশ হয় তবে তার মূল্য বড় কম নয়।

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
চারদিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুন গুন করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুমবনে
আমার ঐ ফুলবাগানে
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

গানটি গোপাল উড়ের যাত্রায় ছিল। খাঁটি আড়-খেমটা চালের গান। এক সময় এ গানের খুব আদর ছিল, এখন অবশ্য কালধর্মে একেবারেই বিস্মৃত। এমনি পড়ে গেলে এ গানে আর কি বৈশিষ্ট্য আছে? কিন্তু কালেংড়া সুরে আড়-খেমটায় এ গান শুনলে মালঞ্চের আনন্দচঞ্চল রূপ ভেসে উঠবে— ভ্রমরের গুঞ্জরণ শ্রোতার কানে এবং প্রাণে পুলকের সাড়া জাগিয়ে তুলবে। এইসব গান ছোট ছোট টপ্পার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। বস্তুত গত শতাব্দীতে বাংলার সংগীতে সাধারণভবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে টপ্পা। শ্যামাসংগীত, আগমনী, বিবিধ ভক্তিরসাত্মক সংগীতও টপ্পার রসে অভিষিক্ত। বাংলা গানের ধারা পর্যালোচনা করলে এইটাই মনে হয় যে বাঙালীরা একটা ধরাবাঁধা পথে কোনো নির্দিষ্ট গম্ভীর রীতি অনুসরণ করার চেয়ে আবেগপ্রধান প্রাণশক্তিতে উচ্ছল সংগীতকেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনধারার যোগ নেই এমন উচ্চ ভাবলোকে অবস্থিত সংগীতকে প্রাধান্য দিলেও আপনার করে নেন নি। এই কারণেই প্রাচীন অতিবিলম্বিত রীতির কীর্তন ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল এবং সে জায়গায় সহজ সরল ছন্দবেগে হিল্লোলিত যে কীর্তন তাকে বরণ করা হল। এই একই কারণে জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলী বাঙালীর এত প্রিয় যে, এই রীতিতে গান রচনা জয়দেবের পরে শত শত বৎসর ধরে চলে এসেছে। এই মনোভাবই টপ্পাকে একেবারে আপনার করে নিয়েছে।

নিধুবাবু বাঙালীর চরিত্রকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন। তিনি যে সহসা খুব উঁচুদরের গান বেঁধে বাংলা গানকে সুসংস্কৃত করতে চান নি এটি তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। জাতীয় মনোভাব কি রকম সেটা তিনি জানতেন এবং জাতীয় রুচির বিকৃতি কোথায় সেটাও তিনি ঠিক ধরেছিলেন। অতএব তাঁর চেষ্টা ছিল যাতে রুচির শোধন হয় অথচ তা জাতীয় মনোভাবের পরিপন্থী না হয়। এই দুদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বাংলা গানের একটি সুসংস্কৃত রূপ প্রদান করলেন। এই সংগঠন-পরিকল্পনায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বড় কম ছিল না। তিনি যে যুগের মানুষ সে যুগে বাঙালীকে কঠিন দুর্যোগের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। নিধুবাবু তাঁর দীর্ঘজীবনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহাবিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব তাঁকে নিতান্ত ভাবপ্রবণ করে তোলে নি, তাই তিনি অগ্রপশ্চাৎ ভেবেই আমাদের সংগীতের সংস্কার-সাধনায় অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে যাঁরা সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হলেন তাঁরা এতটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না এবং এইখানেই তাঁরা মস্ত ভুল করলেন যার ফলে বহু সংগীত আজ লুপ্ত হয়েছে।

গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সমাজের অনেকে সুনীতি এবং সুরুচি প্রতিষ্ঠার প্রবল আগ্রহে অনেক সুকুমার কলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন। আমাদের চরিত্রের দুর্বল দিকটা বিশেষভাবে প্রকট হবার ফলে

একটা সংস্কারের আশু প্রয়োজন ছিল সত্য কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি অনাস্থার কোনো কারণ ছিল না। নবশিক্ষার প্রভাবে রুচির পরিবর্তন এমন বৈপ্লবিকভাবেই ঘটল যে পুরাতন প্রচলিত গানের কতটুকু রক্ষণীয় এবং কতখানি বর্জনীয় সেটি ভেবে দেখবার অবকাশ ঘটে নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে উদার মনোভাব সে যুগের শিক্ষিত সমাজে জীবনকে বৃহৎ এবং ব্যাপকভাবে দেখবার সহায়তা করেছিল সে ঔদার্য সংগীতের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় নি। মনে হয়, প্রচলিত সংগীতকে সাধারণভাবেই নিতান্ত অশিক্ষিত স্তরে আরোপ করা হয়েছে যেন সংগীতনির্বিশেষে সবই খেউড়ের স্বগোত্র। এই মনোভাবের ফলেই তৎকালপ্রচলিত প্রণয়-সংগীতের একটি বৃহৎ অংশকে কলুষের পরিচায়কজ্ঞানে ভদ্রসমাজ থেকে বর্জন করা হয়। এর সঙ্গে জড়িত হয়ে বহু নিষ্কলুষ গানও দুর্নামের ভাগী হয়েছে। কালধর্মে নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠত্বের অসামান্য স্বীকৃতিও অনাদর এবং অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়ে রইল। নিধুবাবুর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর যুগের সংগীতকে অস্বীকার না ক'রে সুসংস্কৃত ক'রে নিয়েছিলেন এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যকেও অবহেলা করেন নি। আর পরবর্তী যুগের অসাফল্য এইখানে যে, তাঁরা প্রবহমান সংগীত-সংস্কৃতির উপর প্রবল আঘাত হেনে তাকে ভেঙে দিলেন কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য অথচ সুললিত সংগীতশিল্প গঠনে সক্ষম হন নি। নিধুবাবুর মতো প্রখর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সামাজিক পরিবর্তনে সচেতন সংগীতস্রষ্টা যদি তাঁর অব্যবহিত পরেই আর কেউ থাকতেন তবে হয়তো তিনি যুগোপযোগী মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে সংগীত সৃষ্টি করতে পারতেন এবং সাংগীতিক ঐতিহ্যকেও অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই রকম অভিজ্ঞ এবং শিল্পকুশল ব্যক্তি সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। বস্তুত গত শতাব্দীর অপরার্ধে কয়েকজন অসাধারণ সংগীতরচয়িতার উদয় না হলে আমাদের সংগীত-সংস্কৃতি বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়ত। পরবর্তী সংগীতস্রষ্টারা পূর্বের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং ক্ষতি যা হবার তাও হয়ে গেছে। তবুও রক্ষণশীল একটি সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় অতীতের কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশও আমরা পাচ্ছি। তাঁরাই কেবল এসব গানকে সম্পদজ্ঞানে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

নিধুবাবুর বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের পরিচয় পেলে তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা যাবে। সে যুগের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য এবং গতির সঙ্গে মিলিয়েই তাঁকে দেখা কর্তব্য।

খ্রীস্টীয় ১৭৪১ (১১৪৮ বঙ্গাব্দ) অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধেরও যোলো বছর আগে নিধুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন কলকাতার কুমারটুলির বাসিন্দা। তাঁর পিতা বর্গীর ভয়ে ত্রিবেণীর কাছে চাঁপতা গ্রামে চলে এসেছিলেন এবং এইখানেই তাঁর জন্ম হয়। বছর ছয়েক বয়সে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং শিক্ষালাভ করেন। নিধুবাবু সংস্কৃত পারসী ছাড়া ইংরেজিও কিছু শিখেছিলেন। পরে সম্ভবত ইংরেজি পাঠাভ্যাস আরও ভালোভাবে করেন। শেষ জীবনে তিনি ইংরেজি বই পড়ে অবসর যাপন করতেন। এর থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন অথচ এর কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। সংস্কৃত পারসীও তিনি ভালোই জানতেন। এই ব্যাপক শিক্ষার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তিনি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। রামমোহন রায় প্রবর্তিত আন্দোলনে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল এবং সম্ভবত রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রহ্মসংগীত তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি ব্রহ্মসংগীতও রচনা ক'রে গেছেন। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল কর্তৃক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক অংশ উদ্ধৃত করছি—

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব উপাচার্য্য ৺উৎবাসানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহোদয় একদিবস রামনিধিবাবুকে আদেশ করিলেন—"মহাশয়, একটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়া শ্রবণ করাইতে হইবে।" সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া এই গীত রচনা করিয়া শুনাইলেন, যথা।

বেহাগ—তাল আড়া

পরমব্রহ্ম তৎপরাৎপর পরমেশ্বর
নিরঞ্জন নিরাময় নির্ব্বিশেষ সদাশ্রয়
আপনা আপনি হেতু বিভু বিশ্বধর
সমুদয় পঞ্চকোষ জ্ঞানাজ্ঞান যথা বাস
প্রপঞ্চ ভূতাধিকার
অন্নময় প্রাণময় মানস বিজ্ঞানময়
শেষেতে আনন্দময় প্রাপ্ত সিদ্ধ নর।

বিদ্যাবাগীশ মহোদয় এই গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন—"বাবু তুমি সাধু তোমার অসাধারণ ক্ষমতাদৃষ্টে আমরা চমৎকৃত হইয়াছি, কারণ এ প্রকার গীত পূর্ব্বে, কখন রচনা করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা শুনা যায় নাই, যাহা হউক এই গীত দেওয়ানজীকে অর্থাৎ রামমোহন রায় মহাশয়কে দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজে গান করাইব।" এই কথাবার্ত্তার পর কোন বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতন্মায়াময় সংসার পরিহার করত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। একারণ অনুমান হইতেছে এ গীত সমাজের গীতে ভুক্ত হয় নাই, অপ্রকাশ রহিয়াছে।

যে যুগে বাঙালীর কাছ থেকে রামমোহনকে বহু বাধাবিপত্তি এবং উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল সে যুগে নিধুবাবু কোনো সামাজিক মতবাদে শিল্পীধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি— ব্রহ্মসংগীতের শান্ত সমাহিত রসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করেছেন। এই গানটি থেকে সংস্কৃত দর্শনসাহিত্যে তাঁর অধ্যয়নশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

অতি দীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু বাংলার এক বিরাট সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর জন্মের সময় আলিবর্দি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলার মসনদ দখল করেছেন। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে এল পর পর নিষ্ঠুর বর্গীর আক্রমণ। কলকাতায় ইংরেজের সঙ্গে নবাবী সৈন্যের সংঘর্ষও বোধ হয় তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন — তখন তাঁর বয়স প্রায় পনেরো হবে। ওদিকে বাংলা সাহিত্যে তখন ভারতচন্দ্রের রাজত্ব। ভারতচন্দ্র যখন মারা যান তখন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ। ভারতচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে তিনি হয়তো প্রেরণা পেতেন নতুন কিছু সৃষ্টি করবার এবং হয়তো অল্প বয়স থেকেই গানও বাঁধতেন কিন্তু তাঁর বহু গান হারিয়ে গেছে। তাঁর অল্প যে কটি রচনা আমরা পাই তা থেকে কোন্‌টি কোন্‌সময়কার রচনা বোঝবার উপায় নেই।

সম্ভবত টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর তরুণ বয়স থেকেই পরিচয় হয়েছিল। নিধুবাবুর পূর্বে টপ্পার ধরন যে বাংলায় প্রচলিত ছিল না এমন মনে করা সংগত হবে না কিন্তু টপ্পার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং নূতনত্ব নিধুবাবুই বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন। টপ্পাকে যে এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায় সেটা বোধহয় তাঁর পূর্বে আর কেউ ধারণা করতে পারেন নি। বাংলা টপ্পার সাংগীতিক বিশ্লেষণ যথাযথভাবে করা হয় নি। আগেকার গ্রন্থাদিতে টপ্পার যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার সঙ্গে বাংলা টপ্পার কিছু প্রভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "গীতাবলী"র দ্বিতীয় সংস্করণে টপ্পার যে বর্ণনা আছে সেইটি উদ্ধৃত করি—

টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতেই রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ, অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা। ইহার কেবল দুই তুক ; আস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের প্রায় সকল তালই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ধৃতিটি আরও কয়েক জায়গায় দেখেছি বলেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা গেল। টপ্পা ধ্রুপদ এবং খেয়াল থেকে সংক্ষেপতর বললে বাংলা টপ্পার তাৎপর্য বোঝা যাবে না, কেননা এমন অনেক বাংলা টপ্পা আছে যাতে উত্তম সঞ্চারী আছে। অতএব বাংলা টপ্পা যে দুই তুকে সীমাবদ্ধ এ ধারণাও ঠিক নয়। আসলে টপ্পা খেয়ালের রকমফের হলেও উত্তরভারতীয় টপ্পার কয়েকটি শিল্পকৌশলকে অবলম্বন করেই বাংলা টপ্পা রচনা করা হয়েছে। নিছক খেয়ালিয়ার দৃষ্টিতে বাংলা টপ্পা রচনা করা হয় নি— বাংলার টপ্পা বাংলার কাব্যসংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

যাই হোক, তরুণ বয়সে নিধুবাবু টপ্পা তথা বাংলার সংগীত সম্বন্ধে কতটা ভেবেছিলেন জানি না, তবে সংগীতচর্চার পূর্ণ অবসর হয়তো তাঁর মেলে নি, কেননা সময়টা আদৌ শান্তিপূর্ণ ছিল না। নিধুবাবুর বয়স যখন ষোলো তখন পলাশীর যুদ্ধের ফলে তুমুল পরিবর্তনের মধ্যে দেশে নানা দুর্দৈব ঘটেছে। তার পরে দেখা দিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। সেই বিভীষিকাও নিধুবাবুকে দেখতে হয়েছে। তারও বছর সাতেক পরে তিনি চাকরি উপলক্ষ্যে ছাপরায় যাত্রা করলেন। ছাপরা কালেক্টরির দেওয়ান ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। তাঁর চেষ্টাতেই একটি কেরানির পদ পেয়ে গেলেন। প্রায় আঠারো বছর চাকরি করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে দেওয়ান পালটে ছিল। এঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কেউ কেউ বলেন হিসাবের খাতায় গান লেখবার জন্য সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেন, কিন্তু এ রটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ছাপরায় তিনি দীর্ঘকাল সংগীতসাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এক মুসলমান ওস্তাদ ছিলেন। তিনি প্রথমটা বেশ শিখিয়েছিলেন কিন্তু পরে আর কিছু দিতে চাইলেন না। অতএব নিধুবাবু নিজেই সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলার কাব্যসংগীতকে সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হন।

কলকাতায় যখন ফিরলেন তখন তিনি প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করেছেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি সংগীত-চর্চাতেই অতিবাহিত করেন। প্রায় সাতানব্বই বৎসর বয়সে ১২৪৫ সালে (খ্রীঃ ১৮৩৮) রামনিধি গুপ্ত লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁর একটি সংগীতসংগ্রহ "গীতরত্ন" নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জয়গোপাল এই গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করেন।

সুদীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং সম্মানলাভ করেছিলেন। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব তাঁর সুন্দর আকৃতি এবং গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাশীল এবং সার্থক প্রয়োগশিল্পী। এই প্রয়োগশিল্প চিরকালই উদার দৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

স্বরলিপি

১

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ। আট মাত্রার যৎ। স্বরলিপি হ্রস্বমাত্রায় লিখিত

কত বা মিনতি ক'রে আমারে ভুলালে—
এবে অপরূপ দেখো, দেখা না দেয় সাধিলে ॥
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন বা সঁপিব।
না জেনে এই সে হল ভাসি হে দুখ-সলিলে ॥

কথা ও সুর ॥ নিধুবাবু : রামনিধি গুপ্ত — **স্বরলিপি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**

সা গা II {গা -া গা গা । গমা -পপা -মগা -^র^গা । -া মা পা -া I
ক ত বা ০ মি ন তি০ ০০ ০০ ০ ০ ক রে ০

I -া -া গা পমা । গা -মরা রা গা । গমা -পপা -মগা -রগা । -মমা -গরা -সসা -া I
০ ০ আ মা০ রে ০০ ভু লা লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I -া -া (সা গা)} । গা মা । ধা ধা -া ধা । ধণা -র্সর্সা -র্সণা -ধা । -ণা ধা পা -া I
০ ০ ক ত এ বে অ প ০ রূ প০ ০০ ০০ ০ ০ দে খো ০

I -মগা -া গা মা । পা র্সা -া ধা । র্সা র্সণা -ধপা -মপা । -ধধা -পমা -গপা -পমা I
০০ ০ দে খা না দে য়্ সা ধি লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

I -গরা -সা সা গা II
০০ ০ "ক ত"

গা মা II {পধা -নর্সা -^ধ^না না । না না না না । -া র্সা না র্সা I
এ ম ন০ ০০ ০ হ ই বে আ গে ০ কে ম নে

I -া র্সণা -ধধা -নর্সা । না র্সা -া -া । পা না না -া । না না র্সা না I
০ জা০ ০০ ০০ নি ব ০ ০ জা নি লে ০ আ প ন ম

I র্সা -া র্সা র্রা । র্রর্সা -ণধা ণা র্সা । র্সণা -ধপা -ধণা -ণধা । -পমা -পধা -ধপা -মগা I
ন ০ কে ন বা০ ০০ সঁ পি ব০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

I -রগা -া (গা মা)} । গা মা । ধা -া -ণর্রা -র্রর্সা । -নর্সা ণা ধা ণা । ধা ধা -া -া I
০০ ০ এ ম না জে নে০ ০০ ০০ ০০ এ ই সে হ ল ০ ০

I পা পা ধা -া । -া -া ধা ধা । ধণা -ণধা -পধা -ণর্সা । -র্সণা -ধা -ণা ধা I
ভা সি হে ০ ০ ০ দু খ স০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ লি

I পা -া^গ^ গা মা । পধা -ণর্সা ণর্সা র্সণা । -ধপা ধণা ধপা -মগা । -মপা -পমা -গরা -সসা I
লে ০ ভা সি হে০ ০০ দুখ স০ ০০ লি০ লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

I -া -া সা গা II II
০ ০ "ক ত"

২

কামোদ-খাম্বাজ। তেতালা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর,
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

কথা ও সুর॥ নিধুবাবু: রামনিধি গুপ্ত

স্বরলিপি॥ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

II গা গমা -পা -গা। -মা রা সা -া। রা গরা -পা পা। পা -া -া -া I
না না॰ ॰ ॰ ন্ দে শে ॰ না না॰ ন্ ভা ষা ॰ ॰ ॰

I ধা ধা ণা ধা। -া -া -া মা। পধা -ণর্সা -ণা -ধা। -ণা ধা পা -া I
বি নে স্ব দে ॰ ॰ ॰ শী য়॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ভা ষা ॰

I গা গা গা মা। গমা -পধা -ধধা -পমা। -গমা -পপা -পপা -মগা। -রগা -মগা -রসা -া II
পূ রে কি আ শা॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰

II {-া মা মা মা। ধনা -র্সনা -ধপা -ধা। -া না র্সা না। র্সা -া -া -া I
॰ ক ত ন দী॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰ স রো ব র ॰ ॰ ॰

I না না র্সা না। -া -া -া না। নর্সা -র্রর্সা -ণধা -া। ধণর্সা -র্সণধা পা -া} I
কি বা ফ ল ॰ ॰ ॰ চা ত॰ ॰॰ ॰॰ ॰ কী॰॰ ॰॰॰ র ॰

I -া ধা ধা ণা। ধা -া -া মা। পধা -ণর্সা -ণা -ধা। -ণা ধা পা -া I
॰ ধা রা জ ল ॰ ॰ বি নে॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ক ভু ॰

I পা ধা র্সা র্রা। র্গর্মগা-র্রর্গর্রা-র্সর্রর্সা-ণর্সণা। -ধণধা-পধপা-মপমা-গমগা। -রগরা -সা -া -া II I.
ঘু চে কি তৃ ষা॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰॰॰ ॰ ॰ ॰

বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগরের যুগ

বিদ্বৎ-সভার তৃতীয় যুগটিকে বাংলাদেশে 'বিদ্যাসাগরের যুগ' বলা যায়। এই যুগটি উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ জুড়ে (১৮৫০-১৮৭৫) বিস্তৃত। এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলাদেশে বিদ্বৎ-সভার ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত হল। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিদ্বজ্জনের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে অনেক বাড়ল। বিদ্বৎ-সভায় মিলিত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তাঁরা অনেক বেশি উৎসাহী হলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারারও দ্রুত আমদানি হতে আরম্ভ হল। ইংরেজ ও শিক্ষিত বাঙালী, উভয়েরই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের পর, উচ্ছ্বাসের আবেগাতিশয্য প্রশমিত হয়ে, সামাজিক জীবনে সবেমাত্র সমীকরণ-পর্বের সূচনা হ'ল বলা চলে। তৃতীয় যুগের বিদ্বৎ-সভাগুলি এই সমীকরণ ও আত্মীকরণের পথ প্রস্তুত করে দিল।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে, এর মধ্যে, বিদ্বৎ-সভার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম যুগের 'আত্মীয় সভা', 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ছিল কতকটা ঘরোয়া বৈঠকের মতন। দ্বিতীয় যুগের 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ' বা 'তত্ত্ববোধিনী-সভা' আর ঘরোয়া বৈঠক ঠিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হল। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও, ইয়ং বেঙ্গলের যুগে জ্ঞানবিদ্যার প্রেরণার ক্ষেত্রে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ বিদ্যাসাগর-যুগে আরও বাড়ল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিদ্বৎ-সভা তৃতীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত হল, তার স্বরূপই অনেকটা বদলে গেল। সমাজ-জীবনের গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপস্যা করলে, বিদ্বৎ-সভা যে প্রাণহীন স্কলাস্টিক অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দেশের বিদ্বজ্জনদের বৃহদংশের সঙ্গে তার যে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না, এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে-সব বিদ্বৎ-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কোনোটাই সমাজ-জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন করে সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধ অ্যাকাডেমিতে পরিণত হয় নি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, প্রত্যেক যুগের বিদ্বৎ-সভার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। হয়ত সেগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এ দেশের বিদ্বৎ-সমাজ প্রধানতঃ এই সব সভার ভিতর দিয়েই আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানবিদ্যাকেও সমাজ ও দেশের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ছোট ছোট সভাসমিতি ও আলোচনা-চক্র এই সময় অনেক বেশি গড়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনে

তাদের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু যে কয়েকটি বিদ্বৎ-সভা, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—

বেথুন সোসাইটি (১৮৫১)
বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫৩)
সুহৃদ্ সমিতি (১৮৫৪)
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭)
বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭)

এ ছাড়া, পূর্বে স্থাপিত হলেও, 'তত্ত্ববোধিনী সভার' প্রতিপত্তি এই সময় আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনেরা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ-জীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বেথুন সোসাইটি

১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর মুয়াট মেডিকাল কলেজে স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একটি সভা ডাকেন এবং সেই সভায় একটি নতুন বিদ্বৎ-সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ও অন্যান্য সোসাইটির কথা উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, শিক্ষিত বাঙালীরা যাতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পান, তার জন্য এই জাতীয় বিদ্বৎ-সভা আরও বেশি স্থাপন করা উচিত ("...pointed out the great necessity of devising some means of bringing the educated natives more into personal contact with each other...")। এই সভায় মুয়াট আরও একটি কথা বলেন যা প্রণিধানযোগ্য। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিদ্বৎ-সভার ভূমিকার কথা ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন যে, এ দেশের সমাজের গড়নই এমন বাঁধাধরা, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের সুযোগ এ দেশে অনেক সীমাবদ্ধ। বিদ্বৎ-সভার প্রয়োজন এ দেশের সুস্থ সামাজিক জীবনযাত্রার জন্যও তাই এত বেশি ("...how much more such means of mental improvement and intellectual recreation were needed in this country, where, from the very constitution of native society and the social customs of the people, even the private relations of individuals and families were necessarily much restricted.")।

ডক্টর মুয়াটের এই কথাগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, আজও এ কথার মূল্য আছে। উনিশ শতকে বিদ্বৎ-সভার ক্রমোন্নতি ও বিকাশ হয়েছিল যেমন, বিশ শতকে তেমনি তার ক্রমাবনতি ও অবলুপ্তি ঘটেছে। বিদ্বজ্জনদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও চিন্তাভাবনার লেনদেনের পথও আজ নানা কারণে রুদ্ধ। 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা মুয়াটের কথার তাৎপর্য তাই আজ আরও বেশি করে বোঝা দরকার।

মেডিকাল কলেজের আলোচনাসভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর চক্রবর্তী, ডক্টর স্প্রেঙ্গার, রেভারেণ্ড লঙ

প্রভৃতি যোগ দেন। সভাতে স্থির হয় যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিদ্বৎ-সভা স্থাপন করা প্রয়োজন ("A Society be established for the consideration and discussion of questions connected with Literature and Science")। এর কিছুদিন আগে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি এ দেশের নানাপ্রকার সমাজকল্যাণকর কাজে উদারচরিত্র বেথুন সাহেবের দানের কথা স্মরণ ক'রে, নতুন সভার নাম রাখা হয় "বেথুন সোসাইটি"।[১]

সোসাইটির উদ্যোক্তা-সভ্যদের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীদের সংখ্যা ছিল বেশি। শিক্ষিত-সমাজে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ পাদ্রি ও রাজকর্মচারীরাও যোগ দিয়েছিলেন। সোসাইটির রিপোর্টে এই উদ্যোক্তাদের নাম দেওয়া হয়েছে এইভাবে :

জে. এফ. মুয়াট	হরমোহন চ্যাটার্জি
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	জগদীশনাথ রায়
রেভারেণ্ড লঙ	নবীনচন্দ্র মিত্র
মেজর জি. টি. মার্শাল	জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি	প্যারীমোহন সরকার
ডক্টর স্প্রেঙ্গার	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ডক্টর চক্রবর্তী	প্যারীচাঁদ মিত্র
এল. চ্যাট	রসিকলাল সেন
বাবু রামগোপাল ঘোষ	প্রসন্নকুমার মিত্র
রাধানাথ শীকদার	গোপালচন্দ্র দত্ত
রামচন্দ্র মিত্র	হরিচন্দ্র দত্ত
কৈলাসচন্দ্র বসু	দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হয়েছিলেন তখন তার আদর্শগত রূপেরও যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সংযম ও সমন্বয়-সাধনা ছিল সভার অন্যতম নীতি। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন এবং মুয়াট, পাদ্রি লঙের মতন বিদেশী বিদ্যোৎসাহীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজের অগ্রগণ্যদের মধ্যে সকলেই যে বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা তার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির জন্য উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহী হন নি, পরে অবশ্য সভ্য হয়েছিলেন। ধর্মসভার ধারায় যাঁদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি লালিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেথুন সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, যাঁরা সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বৎ-সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ

---

(১) বেথুন সোসাইটির বিবরণ সোসাইটির ট্রান্‌জাকশান্‌স ও রিপোর্টগুলি থেকে সংগ্রহ করেছি।

The Proceedings of the Bethune Society (1859-60, 1860-61); Calcutta, 1862.

The Proceedings and Transactions of the Bethune Society (Nov. 10, 1859—April 20, 1869); Calcutta 1870.

তাঁদের অন্যতম। বেথুন সোসাইটির আগে আর কোনো বিদ্বৎ-সভায় মুসলমানরা এ রকম সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

সোসাইটির নিয়মাবলী যা রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে নীতি-সম্বলিত পঞ্চম নিয়মটি হল—

Discourses (written or verbal) in English, Bengali or Urdu, on Literary or Scientific subjects, may be delivered at the Society's Meetings, but none treating of religion or politics shall be admissible.

সোসাইটির অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি বাংলা বা উর্দু ভাষায়, লিখিত বা মৌখিক ভাষণ দেওয়া যাবে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি বিষয়ে কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ।

প্রথম দিকে সোসাইটির উদ্যোক্তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে সাহিত্য-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান নি এবং এসব বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেন নি। তার কারণ, তাঁরা মনে করেছিলেন ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং অকারণে বিদ্বেষভাব সভ্যদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হবে। ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, তিনটি ভাষাতেই সভ্যদের আলোচনার অধিকার ছিল। উর্দুর উল্লেখ থেকেও বোঝা যায়, বেথুন সোসাইটির আলোচনায় মুসলমানরাও যোগদান করতেন।

প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই সোসাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঢাকা শহরেও "The Branch Bethune Society of Dacca" নামে একটি শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বছরে ১৮৫২ সালেই কলকাতায় সোসাইটির সভ্যসংখ্যা হয় ১৩১ জন, তার মধ্যে ১০৬ জন বাঙালী। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বাড়ে—

	১৮৫৩	১৮৫৪	১৮৫৫	১৮৫৬	১৮৫৭
মোট :	১৪০ জন	২২৮ জন	২৮১ জন	৩০৪ জন	৩৪৫ জন
বাঙালী :	১১৯ জন	?	?	?	?

পৃথকভাবে এদেশী ও বিদেশী সভ্যের সংখ্যা পরে রিপোর্টে উল্লিখিত না হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে সোসাইটির সভ্যসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শ হয়েছিল, এবং তার মধ্যে অন্ততঃ তিন শ জন বাঙালী ছিলেন বলে মনে হয়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে 'এলিট' (Elite) বা সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত ব'লে গণ্য হবার মতন ব্যক্তি ১৮৫৭ সালে এর চেয়ে খুব বেশি ছিলেন না। বেথুন সোসাইটি এই বাঙালী এলিট-সমাজের সঙ্গে ইয়োরোপীয় উচ্চ সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। ১৮৬১ সালের রিপোর্টের ভূমিকায় এই কথাই বলা হয়েছে :

"A Society which had succeeded in bringing together…for mutual intellectual culture and rational recreation, the very elite of the educated native community and blending them in friendly union with leading members of the Civil, Military and Medical services of Government, of the Calcuta bar, of the Missionary body, and other non-official classes ;…"

১৮৫৯ সালে সোসাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে। দেখা যায়, সভ্যরা অধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, এবং ১৪৫৮ টাকা তাঁদের চাঁদা বাকি পড়েছে। কোনো ভালো বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করাও

আর হয় না। সভাপতি মুয়াট ইংলণ্ড যাবার পরে হজসন প্র্যাট, গুডউইন, জেমস হিউম যথাক্রমে সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হন। হিউম সাহেব ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য সভার কাজে তেমন মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। এই সময় সভার পুরাতন সভ্যরা চিন্তা করতে থাকেন, কিভাবে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। প্রথমতঃ এমন একজনকে সভার প্রেসিডেণ্ট করা দরকার, যাঁর উপর সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শিক্ষিত-সমাজের অনেকের আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে। পাদ্রি অ্যালেকজাণ্ডার ডাফের নাম প্রস্তাব করা হয়—"though for various reaons which it is needless now to specify, he had never joined the Society as a member."

ডাফ সাহেব প্রথমে রাজী হন নি। পরে তিনি রাজী হন এবং বোধ হয় তাঁর জন্যই সোসাইটির পঞ্চম নিয়মটি (পূর্বোক্ত) সংশোধন ক'রে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। ১৮৫৯ সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্স সংশোধিত নিয়মটি প্রস্তাবাকারে পেশ করেন এই মর্মে:

"The grand and distinctive object of the Society being to promote among the educated natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits, discourses written or verbal, in English, Bengali, or Urdu, may be delivered at the Society's meetings, on any subject which may be fairly included within the range of Literature and Science."

ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে, এবং আলোচনাকালে সেই কথা মনে রাখলে কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারও না ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায় এবং নিয়মটিও গৃহীত হয়। বেথুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় বলা চলে ("With the adoption of these resolutions, the Bethune Society terminated the first period of its existence, and was fairly projected upon its second".)।

সমাজবিজ্ঞানের চর্চা

সাহিত্য ও দর্শন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমাজবিজ্ঞান—এই কয়টি বিভাগ ছিল বেথুন সোসাইটিতে। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক বিভাগের পরিচালকদের কৃত কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি ক'রে রিপোর্ট পেশ করতে হত। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, সমাজবিজ্ঞান বিভাগটি। ইয়োরোপেও তখন সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বলা চলে। জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন প্রগতিশীল আদর্শ যাঁরা এ দেশে বহন ক'রে আনতেন, তাঁরাই সেদিন বাংলাদেশে অন্যান্য বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চর্চারও যে প্রয়োজন আছে, এ কথা বুঝেছিলেন। বিদ্বৎ-সভার মধ্যে বাংলাদেশে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানচর্চার প্রবর্তকরূপে যদি কাউকে সম্মান দিতে হয়, তাহলে সে-সম্মান বেথুন সোসাইটির প্রাপ্য। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ও অগ্রণী হয়ে এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি পাদ্রি লঙ সাহেব। বাংলার জ্ঞানভাণ্ডারে পাদ্রি লঙের দান শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানচর্চার আদি উৎসাহদাতা

হিসেবে লঙ সাহেবের কথা ভাবলে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, সব ম্লান হয়ে যায়। ভাবলে অবাক হতে হয়, আজ থেকে একশ বছর আগে তিনি এ দেশে সমাজবিজ্ঞান-চর্চার যে প্রয়োজনবোধ করেছিলেন, আজ শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সেই বোধশক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দীতে আজ আমরা সমাজবিজ্ঞানের যুগে বাস করছি বললেও ভুল হয় না।

এই প্রসঙ্গে পাদ্রি লঙ সাহেব একবার তাঁর রিপোর্টে খুব মূল্যবান কথা বলেছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

"One of the reasons why so little in the way of writing has hitherto been contributed to sociology by educated natives and others, may have been the system of education that has prevailed and is prevailing, which cultivates memory to the exclusion of almost every other faculty and particularly the necessary one of observation···"—Report of the Sociological Section, Bethune Society, April 26, 1861.

আজও যে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সমাদর বাড়ে নি, তার প্রধান কারণ, আমাদের শিক্ষার গোড়ায় গলদ আছে। পরীক্ষায় কৃতী ছাত্ররা যতটা স্মৃতিশক্তির সাধনা করেন, বিচারবিশ্লেষণ-শক্তির সাধনা ততটা করেন না। শিক্ষাপদ্ধতিই এমন যে তার মধ্যে একমাত্র যান্ত্রিক স্মৃতিশক্তি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির অনুশীলনের সুযোগ থাকে না। বিশেষ ক'রে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে বিরাট জ্ঞান-জগৎ আছে, পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার ধারায় সে-সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলও জাগে না। শিক্ষিত মন অনুসন্ধানী হয় না, বিচারমুখী হয় না, কেবল মুখস্থবিদ্যার গণ্ডীর মধ্যে থেকে নিশ্চিন্ত চাকুরিগত জীবন কাটিয়ে দেয়। সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এইজন্য আজও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নি। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, কোনো ক্ষেত্রেই আজও আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের স্পৃহা বাড়ে নি। সর্বত্রই আমরা স্মৃতি শ্রুতি ও অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করতে চাই। তাই বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও গল্প-উপন্যাসের এত প্রাচুর্য এবং অন্য দিকে বিস্ময়কর দৈন্য দেখা যায়।

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লঙ সাহেব খুব আশান্বিত হয়ে বলেছিলেন—

"The time is very favourable for sociological investigations as an *Educated class* of natives is rapidly rising, qualified not only to investigate, but also to write the results of their investigations." লঙের আশা আজও সফল হয়নি। বেথুন সোসাইটি ও তার সমাজবিজ্ঞান বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সোসাইটি থাকাকালীন পরে একটি স্বতন্ত্র 'সমাজবিজ্ঞান সভা'ও স্থাপিত হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমাজবিজ্ঞানচর্চার উৎসাহ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন বাড়ে নি। শ্রমবিমুখ, অনুশীলনকাতর, কল্পনাপ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা আলোচনার প্রতি তেমন অনুরাগী নন। গল্প ও কাহিনী শুনতেই তাঁরা বেশি ভালোবাসেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হল, মননশীলতার এই সুস্থ ধারাটি পর্যন্ত আজ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার বদলে, অলস রোমান্টিক ভাবানুভাবের রোমন্থনে আমরা ক্রমেই প্রবৃত্ত হয়ে উঠছি।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

"৺নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন" (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮৫৩)। এই সভার নামই "বিদ্যোৎসাহিনী সভা"। বেথুন সোসাইটির প্রতিপত্তির যুগেই এই সভা সিংহ মহাশয়ের গৃহে স্থাপিত হয়, প্রধানতঃ বিদ্বৎ-সভাকে একটি টিপিকাল বাঙালী মজলিসে পরিণত করার জন্য। বেথুন সোসাইটির সব বাঙালী সভ্যই প্রায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নবীন তরুণ বিদ্যোৎসাহী যাঁরা বেথুন সোসাইটির গুরুগম্ভীর পরিবেশে খুব বেশি স্বস্তিবোধ করতেন না, তাঁরা প্রবীণদের সংসর্গে আসতে হলেও, বিদ্যোৎসাহিনী সভার ঘরোয়া পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এ-সম্বন্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, তা উপভোগ্য :

"পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল Commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলেমানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড়লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলেমানুষ বলিয়াই হোক বা আর কোনও কারণেই হোক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবাবিবাহের উপর—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলেমানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে না কি ?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন।…মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।"— পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ৮৪-৮৫।

কৃষ্ণকমলের মতন তখনকার তরুণ বিদ্যোৎসাহীরা কালীপ্রসন্ন সিংহের সভায় গিয়ে যতটা স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনায় যোগদান করতে পারতেন, বেথুন সোসাইটিতে তা পারতেন না। তার প্রধান কারণ বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজদের সংখ্যাধিক্য না থাকলেও, তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। সভার কাজকর্ম পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। তার কঠোর শৃঙ্খলা ও সংযত পরিবেশ, বাঙালীদের কাছে খুব আকর্ষণের বিষয় ছিল না। তাই বেথুন সোসাইটির খাঁটি বাঙালী সংস্করণ হয়েছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভা। একটু ঢিলেঢালা ঘরোয়া মজলিসি পরিবেশ না হলে বাঙালীদের বিদ্বৎ-সভা বা সাহিত্য-সভা জমতে চায় না। সেই পরিবেশটি সিংহ মহাশয় তাঁর সভায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আর্থিক সামর্থ্যও ছিল এবং প্রধানতঃ তাঁর পোষকতাতেই সভা চলত।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি নানাবিষয়ে সভায় আলোচনা হত। ইংরেজি ও বাংলা, দুই

ভাষাতেই আলোচনা হত, কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। সভার পক্ষ থেকে মধ্যে মধ্যে কৃতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পাদ্রি লঙ সাহেবকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা এই সময় সংবর্ধনা করেন। সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য সভার তরফ থেকে ২০০-৩০০ টাকা ক'রে পুরস্কারও দেওয়া হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' নামে সভার একটি মুখপত্রও কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। সভায় মধ্যে মধ্যে সংগীতের আসর বসত, নাটকেরও অভিনয় হত। 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' নামে, সভার অঙ্গ হিসেবে, ১৮৫৬ সালে একটি পৃথক রঙ্গালয়ও সিংহ মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা রঙ্গালয়ে ও বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রচলনে এই রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য দান আছে।

ধনীব্যক্তির গৃহে সভা হত, তার সঙ্গে সংগীত ও নাটকাভিনয়ও হত, এবং মধ্যে মধ্যে ভোজনাদিরও ব্যবস্থা হত। সভা যে তখনকার বাঙালী সুধীজনদের সমাগমে বেশ জমে উঠত, তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই সভায় মধ্যে মধ্যে যেতেন। বড়লোকের বাড়ির এরকম মজলিসি সভাকে দুষ্টলোকে 'বিদ্যোৎসাহিনী' না বলে যে 'মদ্যোৎসাহিনী' সভা বলবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিদ্বেষও একটি। তখনও তার অভাব ছিল না। কিন্তু বিদ্যোৎসাহিনী সভা যে মজলিসি আড্ডার মধ্যেও বাইরের সমাজ-জীবনের ধারার সঙ্গে যোগ রেখে চলত, তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাংলার সমাজ-জীবনে তখন একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ণধার হয়েছেন। তাঁর সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিদ্বৎ-সভার উপরেও পড়েছে। বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কেউ সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে নি। বিদ্যোৎসাহিনী সভা নানাভাবে এই আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় এই সভার সভ্যরা অগ্রণী হয়ে কৌন্সিলে দরখাস্ত পাঠান। বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, বিধবাবিবাহ করতে যাঁরা ইচ্ছুক হবেন, তাঁদের প্রত্যেককে সভার পক্ষ থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য কোনো বিদ্বৎ-সভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারাদি দিয়ে উৎসাহিত করা, যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা ভিন্ন সম্ভব নয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার সেই পোষকতার অভাব ছিল না। না থাকলেও, এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তখনকার সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে এ রকম অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা এই ধরনের সভার পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবং সেই সভার মারফত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণোদ্দেশে অনেক কাজ করতে পারতেন। তা না ক'রে, বড় বড় বাঙালী ধনীরা অধিকাংশ তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানাভাবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণকর কাজে পোষকতা করেছেন, এ রকম ধনীর সংখ্যা তখনও খুব বেশি ছিল না। অর্থের চেয়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার উৎসাহটাই হল বড় কথা। সেই উৎসাহ সম্মিলিতভাবে সভার সভ্যরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

সুহৃদ্ সমিতি

'সুহৃদ্ সমিতির' নামের আগে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী' কথাটি আছে। প্রধানতঃ সমাজসংস্কারের প্রয়োজনবোধ থেকেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। সুতরাং 'সুহৃদ্ সমিতিকে' ঠিক বিদ্বৎ-সভা বলা যায় কিনা তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বলা যায় না। ১৮৫৪ সালে

১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাসভবনে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে যে সভা ডাকা হয়, তাতে কিশোরীচাঁদ তাঁর ভাষণে, সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোর দিয়ে বলেন। তিনি এমন কথাও বলেন যে, কেবল প্রবন্ধ রচনা ক'রে এবং বক্তৃতা দিয়ে কাজ হবে না। প্রাচীন ও নবীন বাঙালী সকলে মিলে মিশে একযোগে সমাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে।

সভায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং যাদবচন্দ্র মিত্র সমর্থন করেন যে, সমিতির সভ্যরা প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং নিজেরা এমন কোনো কাজ করবেন না যা যুক্তি, সত্য, সুনীতি ও উদারতার বিরোধী। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেন যে, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, বিধবা-পুনর্বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ বর্জন ও বহু-বিবাহ নিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভ্যরা সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে সাহায্য করবেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং কিশোরীচাঁদ সমর্থন করেন যে, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের বিধিগত বাধা দূর করবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হোক এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য নগরের উপকণ্ঠে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক।[২]

এই সব প্রস্তাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, সুহৃদ্ সমিতি প্রধানতঃ সামাজিক সভা রূপেই স্থাপিত হয়েছিল, বিদ্বৎ-সভা রূপে নয়। কোনো বিষয় নিয়ে বিদ্বৎ-সভার মতন আলোচনা বা প্রবন্ধ পাঠ করা যে সুহৃদ সমিতিতে হত না তা নয়, কিন্তু সামাজিক সুনীতি ও সত্যাচরণের আদর্শ প্রচার করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। এক কথায় বলা যায়, বিদ্যাসাগর-যুগের বিদ্বৎ-সভার সঙ্গে সামাজিক সভার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। নতুন জ্ঞানবিদ্যার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণের অনুভূতি তখন প্রায় এক হয়ে মিশে গিয়েছিল।

ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব

সাধারণতঃ মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটারে বেথুন সোসাইটির অধিবেশন হত এবং তার পরিবেশ ছিল পাশ্চাত্ত্য সভার মতন নীতিদুরস্ত। ডক্টর মুয়াট থেকে রেভারেণ্ড ডাফ পর্যন্ত যাঁরা সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। ঠিক ঘরোয়া বৈঠকের অন্তরঙ্গতা সোসাইটির অধিবেশনে স্বভাবতই দুর্লভ ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য সোসাইটির সভ্যরা অন্যান্য আরও অনেক সভা স্থাপন করেছেন, যেখানে আরও বেশি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন এই সময় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' স্থাপন করেছিলেন, তেমনি প্রধানতঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে ১৮৫৭ সালের মে মাসে "ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব" স্থাপিত হয়েছিল। বেথুন সোসাইটি থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁরা এই সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, তা তার নাম দেখেই বোঝা যায়। "ফ্যামিলি" ও "ক্লাব" এই কথা দুটির মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যে-কোনো বিদ্যোৎসাহী ক্লাবের সভ্য হতে পারতেন এবং শহরের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাড়িতে চক্রাকারে ক্লাবের বৈঠক বসত। আলোচনার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব একই ছিল। যেসব বিষয় নিয়ে বেথুন সোসাইটিতে

---

২ সুহৃদ্ সমিতির বিবরণ প্রাচীন পত্রিকাদি ছাড়া, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের "কর্মবীর কিশোরীচাঁদ" গ্রন্থে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৯৯-১১১ পৃষ্ঠা) আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন জীবনচরিতেও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

আলোচনা হত, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবেও প্রায় সেই সব বিষয় নিয়েই বৈঠক বসত। রীতিমত বিতর্কও হত। ক্লাবে ইংরেজরাও যোগ দিতেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড ডল্, রেভারেণ্ড মুলেন্স, ব্যারিস্টার উড প্রমুখ বিদ্যোৎসাহীরা এই ক্লাবের অনুরাগী সভ্য ছিলেন। কেবল পরিবেশের পার্থক্য ছাড়া বেথুন সোসাইটির সঙ্গে লিটারারি ক্লাবের বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।[৩]

আলোচনা-সভায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য

বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সুহৃদ্ সমিতি, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব প্রভৃতি বিদ্বৎ-সভায় আলোচ্য বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট। কোনো বিষয় সম্বন্ধে কোনো গোঁড়ামি ছিল না। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা বেথুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিদ্ধ ছিল ব'লে, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভ্যরা সকলেই খানিকটা অসুবিধা বোধ করতেন ব'লে মনে হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বর্জিত হওয়ার জন্য, সামাজিক সাহিত্যিক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েই বেথুন সোসাইটিতে আলোচনা হত বেশি। সোসাইটির 'ট্র্যানজ্যাকশন্সে' প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকেই তা বোঝা যায়। ১৮৫২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৮৫৯ সালের মে মাসের মধ্যে যে সব বিষয় পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তালিকা দিচ্ছি :

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সংস্কৃত কাব্য : রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা কাব্য : হরচন্দ্র দত্ত
ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক : কৈলাসচন্দ্র বসু
বাংলা শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা : প্যারীচরণ সরকার
বাংলার কৃষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : রামশঙ্কর সেন
বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ : এইচ. উড্রো
কলেজীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান : প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
কৃষ্ণনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চরিত্র ও সামাজিক জীবন : উমেশচন্দ্র দত্ত
বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্যা : জগদীশনাথ রায়
বাঙালী সমাজ ও জীবন : হরচন্দ্র দত্ত
সংগীত প্রসঙ্গে : কিরপ্যাট্রিক
বাংলার নারীসমাজ : কৈলাসচন্দ্র বসু
বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা : রেভারেণ্ড লালবিহারী দে
বাংলায় হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহসমস্যা : তারকনাথ দত্ত

সভায় পঠিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রাধান্য ছিল বেথুন সোসাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে করা হত। কাব্য দর্শন

৩ "ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব" সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী প্রসঙ্গে হরিহর দাস আলোচনা করেছেন—*Bengal Past and Present*, Vol. 38, Part I (July-September 1929)। ক্লাবের বাৎসরিক রিপোর্টও প্রকাশিত হত।

বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তত্ত্বপ্রধান আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিষয়বস্তুর এই বৈশিষ্ট্যটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে। বাংলাদেশে বাইরের সমাজ জীবনে, বিদ্যাসাগর-যুগে, সমাজ ও শিক্ষার সমস্যাই ছিল প্রধান। তখনকার বিদ্বৎ-সভায় এই সমস্যাগুলিই তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। সমাজ-জীবনের সঙ্গে তখন বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের কতটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁরা তাদের সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে কত সচেতন ছিলেন, বিদ্বৎ-সভার এই ইতিহাস থেকে তা বোঝা যায়।

বেথুন সোসাইটিতে ধর্মালোচনার স্বাধীনতা না থাকার জন্য, হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভ্যরা, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিদ্বৎ-সভা গড়ে তোলেন। তার মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব অন্যতম। অন্য দিকে তত্ত্ববোধিনী সভা তো ছিলই। এই সব সভায় ধর্মের কোনো গোঁড়ামি ছিল না, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অবাধ আলোচনা হত। তা হলেও এই সব সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে দেশের সামাজিক ও শিক্ষা-সমস্যা। ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে "বাল্যবিবাহ" "স্ত্রীশিক্ষা" "বহুবিবাহ" ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও সুহৃদ্ সমিতি তো প্রত্যক্ষভাবেই সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা

বিদ্যাসাগর-যুগের বিদ্বৎ-সভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই "বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার" প্রতিষ্ঠার আভাস পাওয়া যায়। বেথুন সোসাইটিতেই যে একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, সে কথা আগে বলেছি। রেভারেণ্ড লঙ সাহেব সমাজবিজ্ঞানের চর্চা সম্বন্ধে বাংলার বিদ্বজ্জনদের অনুপ্রাণিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। পরে স্বতন্ত্রভাবে যখন 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও লঙ সাহেব তার একজন অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

মেরি কার্পেণ্টার এ দেশে এসে একটি স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। স্থানীয় বিদেশী ও এদেশী সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি সভা হয়। তাতে কুমারী কার্পেণ্টার ব্রিটেনের "National Association for the Promotion of Social Science in Great Britain"-এর শাখা প্রতিষ্ঠান রূপে বাংলাদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি বিবেচনা ক'রে সভা সম্বন্ধে প্রাথমিক খসড়া-পরিকল্পনা রচনা করবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড লঙ, জাস্টিস্ নর্মান, জাস্টিস্ ফিয়ার, জাস্টিস্ সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, অ্যাটকিন্‌সন, ফার্কুয়ার, ম্যাকেন্‌জী, ক্ষেত্রমোহন চাটুজ্জে, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কমিটি ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং Bengal Social Science Association নামে একটি স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি মেট্‌কাফ হলের সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রস্পেক্টস্-এ বলা হয়;

"The object of the Association is to promote the development of social progress in the presidency of Bengal, by uniting Europeans and Natives of all classes in the collection, arrangement and classification of facts bearing on the social, intellectual and moral condition of the people."

সভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়: ১. আইন ২. শিক্ষা ৩. স্বাস্থ্য ৪. অর্থনীতি ও বাণিজ্য। প্রত্যেক বিভাগে কি কি বিষয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে, তাই নিয়ে সিলেবাসের মতন একটি ক'রে 'সার্কুলার' তৈরি ক'রে সভ্যদের বিতরণ করা হয়। এই বিভাগীয় সার্কুলারগুলি থেকে অনুসন্ধানযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি:

আইন বিভাগ: ট্রাস্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান আইন পর্যালোচনা করা, তার ফলাফল বিচার করা এবং তা কাম্য কি না বলা।

'বেনামী' রীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

পঞ্চায়েত প্রথা, তার বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব। বিবাদ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে তার প্রয়োজনীয়তা কি?

বিচারালয়ে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতির অনুসন্ধান—তার কারণ কি? প্রভাব কতদূর? দুর্নীতি দমনের পন্থা কি?

অপরাধ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা—অপরাধ কারা করে, অপরাধীরা কোনো বিশেষ জাতির লোক কি না? যদি হয়, তাহলে সেই জাতির স্বভাব, অভ্যাস, আর্থিক অবস্থা কি রকম? কি কারণে অপরাধ করে তারা? তার জন্য দারিদ্র্য কতটা দায়ী? মাদক-নেশা ইত্যাদি কুঅভ্যাসই বা কতটা দায়ী?

আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান—আইন ক'রে আত্মহত্যা বন্ধ করা সম্ভব কি না?

শিক্ষা-বিভাগ: গত অর্ধশতাব্দীতে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার—হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শিক্ষার ফলাফল কি? নিম্নবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না হবার কারণ কি?

প্রত্যেক জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা—কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কতটা শিক্ষার বিস্তার হয়েছে? কৃষকদের মধ্যে, কারিগরদের মধ্যে, ভৃত্যদের মধ্যে?

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি করা সম্ভব কি না— হলে কতটা সম্ভব?

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার—হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কতদূর হয়েছে? বিস্তারের পথে বাধা কি? বাধা দূর করার উপায় কি?

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য এক-একটি বিষয়ে কর্মীদের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে দেওয়া হত। 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে এই ধরনের একটি প্রশ্নমালার পরিচয় দিচ্ছি:

১। জেলায় ক'টি বিদ্যালয় আছে বালিকাদের জন্য? শুধু বালিকাদের জন্য, না বালক-বালিকা উভয়েরই জন্য?

২। ছাত্রীসংখ্যা কত? দৈনিক ক'জন করে গড়ে উপস্থিত থাকে?

৩। বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে জাতিগত বাধা আছে কিনা?

৪। ক'বছর বয়সে সাধারণতঃ বালিকাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়, এবং কত বছর বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়?

৫। স্কুল ছাড়ার প্রধান কারণ কি?

৬। স্কুলের পাঠ্য কি?

৭। বিধবা, না বিবাহিতা স্ত্রীলোক, শিক্ষকতার পক্ষে কাদের ভালো মনে হয়?

৮। হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের গড়ন স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় কি না? তরুণ স্বামীরা তাঁদের নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেন কি না—করলে, কতটা করেন? ইত্যাদি।

বিভাগীয় বিষয়ের সার্কুলার এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্নমালা দেখলে বোঝা যায়, যতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হত। বাংলার বিদ্বৎ-সমাজের মধ্যে শুধু সমাজবোধ জাগানো নয়, সামাজিক জীবন ও তার সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির বিকাশেও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভার বিশেষ দান আছে।[৪]

রামমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিদ্বৎ-সভার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে। সেই বৈশিষ্ট্য-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আলোচনার স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক মিলন ও ভাব-বিনিময়, প্রখর সমাজচেতনা, বিদ্বৎ-সমাজের সামাজিক দায়িত্ববোধ, নবীন বিদ্যোৎসাহীদের প্রেরণাদান ইত্যাদি। যদিও বাঙালী হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে তখন মতবিরোধ যথেষ্ট তীব্র ছিল, নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে পথের ব্যবধানও ছিল বিস্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিদ্বৎ-সভার আসরে সকলের মিলনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনো অন্তরায় ছিল না। আজকের রাজনৈতিক সংঘাতের তীব্রতার যুগে যে দুর্লঙ্ঘ্যপ্রায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন সে-বাধার সৃষ্টি হয়নি। সাধারণভাবে আজ প্রায় সকল শ্রেণীর সভা-সমিতির চরিত্রই বদলে গেছে। রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব সর্বত্র সমান স্পষ্ট না হলেও, তা থেকে একেবারে মুক্ত কারও অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা সম্ভব কি না সন্দেহ। বিদ্বৎ-সভার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অল্পবিস্তর দেখা যায়। রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাও আজ আগেকার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব-বিনিময়ের স্বাভাবিক সামাজিক ইচ্ছা-বাসনা পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে আসছে মনে হয়। মানবোচিত সাধারণ উদারতা-বোধটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ আমাদের সভ্যতার অভিশাপ কি আশীর্বাদ, জানি না। না জানলেও, এইটুকু বোঝা যায় যে এই পরিবেশে, বিদ্বৎ-সভার মুক্ত অঙ্গনে, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে, বিদ্বজ্জনদের পক্ষে মিলিত হওয়া খুবই কঠিন। তাই সেকালের মতন কোনো বিদ্বৎ-সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্তা করা আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু একালের উপযোগী কোনো বিদ্বৎ-সভা আজও গড়ে উঠেছে ব'লে, অথবা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। অথচ মানুষের জীবনের সামনে আজ এত জিজ্ঞাসা, এত সমস্যা এসে ভিড় করেছে যে বিদ্বজ্জনদের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তার উত্তর বা সমাধানের

৪ *Transactions of the Bengal Social Science Association; 1867-1872.*

নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিদ্বজ্জনদের ঐতিহাসিক ভূমিকারই আজ বৈপ্লবিক রূপান্তর হয়ে গিয়েছে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানবতন্ত্র ও যুক্তিবাদের বাতি জ্বালিয়ে মানুষ মধ্যযুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক যুগের আলোকরাজ্যে প্রবেশ করেছিল, তা আজ 'সমষ্টির' অতিপার্থিব প্রতিভূ 'রাষ্ট্রের' ঝাপটায় নির্বাপিতপ্রায়। এই অবস্থায় কোনো বিদ্বৎ-সভার পক্ষে তার প্রকৃত ভূমিকা বজায় রেখে গড়ে ওঠা সুদূরপরাহত ব'লে মনে হয়।

—

বিদ্বৎ-সভা সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনা

(ক) "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) : এই সোসাইটির তিন খণ্ড 'ট্র্যান্জাক্শনস্' প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় বেথুন সোসাইটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভার' ম্যানিফেস্টোটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হয় (*Calcutta Review*, Vol 16, July-December 1851, pp 487-488)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল "নব্যশিক্ষা ও দেশজ্ঞান" প্রবন্ধে (বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৫৯) এই তিন খণ্ড ট্র্যানজাক্শনসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং তাঁর "জাতিবৈর" গ্রন্থে (১৩৫৩) সভার প্রচারপত্রটিও উদ্ধৃত করেন।

(খ) "তত্ত্ববোধিনী সভা" : তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা), শ্রীযোগানন্দ দাস (প্রবাসী ১৩৪৫ চৈত্র) ও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস (ইতিহাস পত্রিকা, ১৩৬১-৬২) মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে এই সভার বিশদ বিবরণ সংকলন করা সম্ভব।

"আত্মীয় সভা" সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় "তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায়" (৭৬ ভাগ, ১৩৬০) ধারাবাহিক ভাবে করেছেন।

(গ) "বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা" : এই সভা সম্বন্ধে সম্প্রতি "প্রবাসী" পত্রিকায় (১৩৬২ কার্তিক, পৌষ, চৈত্র) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল -লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

—

সংশোধন

"এনকয়ারার" পত্রিকা : গত সংখ্যার "বিশ্বভারতী পত্রিকা"য় (মাঘ-চৈত্র ১৩৬২, পৃ ২০২) আমি লিখেছি, ১৮৩১ সালের "জুলাই মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Enquirer পত্রিকা প্রকাশ করলেন—"। জুলাই মাসের বদলে মে মাস হবে, সম্ভবতঃ ১৭ মে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৫)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ।—লেখক

সমাপ্ত

বাউল-পরিচয়

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পূর্বানুবৃত্তি

ত্রিকাল যোগ

সহজমতের আর একটি বড় কথা হইল ত্রিকাল যোগ। ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে বর্তমান কাল হইল সেতু। পূর্বেই বলা হইয়াছে গুরু ভূতকালের প্রতিমূর্তি, শিষ্য ভবিষ্যতের এবং দীক্ষা হইল বর্তমান। আমাদের বর্তমান জীবনে ভূতকালের সার্থকতা যেন থাকে এবং বর্তমানের পরিপূর্ণতা হইবে ভবিষ্যতে। জীবন হইল এই ভূত ভবিষ্যতের মধ্যে সাধনার সমরসীকরণ।

ভক্তিহীন ভোগী বিদ্বান্ ও বিষয়সম্পন্ন শূরণকে দেখিয়া কবীর বলিয়াছিলেন, "তোমার জীবন একটি মর্মর-প্রস্তর-নির্মিত মহার্ঘ সেতু, যাহা দুই তীরের সঙ্গে অল্পের জন্য যুক্ত হয় নাই।" অর্থাৎ এমন মহার্ঘ উভয় তীরের সঙ্গে যোগহীন সেতু অপেক্ষা দীনহীন বংশ-সেতুও ভালো, যদি দুই তীরের সঙ্গে তার যোগ থাকে। যে জীবন ধনে, জ্ঞানে ঐশ্বর্যময় তাহাতেও যদি অতীতের সার্থকতা ও ভবিষ্যতের জন্য পরিপূর্ণতা না থাকে তবে সেই সেতু যতই মহার্ঘ ততই শোচনীয়।"

যাঁহারা ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনা ক্ষয় করিয়া বর্তমানে ঐশ্বর্য সৃষ্টি ও সুখসম্ভোগ করেন তাঁহারা কৃপার পাত্র। তাই বাউল বলেন,

তিনকাল খাইলি এককালে।
কিসের লাইগ্যা ও অভাগ্যা পড়্‌লি এমন বেহালে
ভাইঙ্গা খালি (=খেলি) সোনার চাবি
এখন রতন "কোঠায়" (= ভাণ্ডাগার)
কেমনে যাবি, আপন মরম কেমনে পাবি,
মরলি আপন কপালে।

বর্তমানকে প্রধান করিয়া আমরা যে আমাদের অনন্ত ভবিষ্যৎকে হারাই তাহাই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

অনেক উচ্চ সুযোগ পায়্যা, (রে মন)
বড়ই তুচ্ছ করলি দাবি।
(এমন) অতুল "কোঠার" (=ভাণ্ডার) পালি রে তুই,
কেবল পালি না তার মরম চাবি।

এই ভূত-ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব যেমন একরস সাধনায় মিটাইতে হইবে ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্বও তেমনি সমরস সাধনা দ্বারা মিটাইতে হইবে। বাউল বলিয়াছেন— ভিতর ও বাহিরকে সেই প্রেমময়কে দিয়াই এক করিতে হইবে। এই কথাই কবীর বলেন—

এ দূর-নিকটের ছন্দও তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ হয় না। কারণ ব্রহ্ম দূরে নহেন।

> দূর অহৈ তো পন্থ ভী অহি।
> দূর নহী তো পন্থভী নহি।—কবীর
> ভীতর কহুঁ তো জগময় রাজৈ
> বাহর কহুঁ তো ঝূঠালো॥
> বাহের ভীতর সকল নিরংতর
> চিত অচিত কউ দীঠালো॥—কবীর ১ম ভাগ, ১০৪

যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন তবে বিশ্বজগৎ লজ্জিত হয়। যদি বলি তিনি বাহিরে তবে সে কথা মিথ্যা হয়। বাহির-ভিতরে ব্যবধানকে নিরন্তর করিয়া আছেন তিনি, চেতন-অচেতন এই তাঁর দুই পাদপীঠ।

কায়াযোগ

ভিতরের সাধনা করিতে গিয়া সহজপন্থীদের একটা মস্ত সাধনা হইল কায়াযোগ।

এই জীবাত্মার সঙ্গে যেমন পরমাত্মার একটি প্রেমের যোগ আছে তাহা উপলব্ধি করাই সাধনা, তেমনি এই দেহের সঙ্গে বিশ্বের একটি যোগ আছে, তাহা সাধন করিয়া দেখা চাই। বাংলার নাথপন্থী যোগীদের অনেক বাণী ও শিক্ষা বাউলদের মধ্যেও চলিত আছে।

কবীর প্রভৃতির মধ্যে এই কথা বারবার আমরা পাই—

> যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর যা ঘট নৌলখ তারা ইত্যাদি।

নানকের সম্প্রদায়ে প্রথিত "প্রাণসংগলী" কায়াযোগের একখানা বড় গ্রন্থ। দাদূ, সুন্দর দাস প্রভৃতি সকলের মতেই কায়াযোগ একটি বড় সাধনা। দাদূ তাঁহার "কায়াবেলী" গ্রন্থে বলেন, এই কায়াতেই "ওঁকার" "আকাশ" "পবন" "প্রকাশ" "নীর" "সূর" "তূর" "ত্রিদেব" "অলখ অভের" "চারিবেদ" "সব ভেদ" ও সব "বাণী" নিহিত। এই আমাদের কায়াতেই ভগবান নানাভাবে অবতীর্ণ হইতেছেন। কায়াতেই তাঁর লীলার প্রাঙ্গণ, কায়াতেই প্রাণের আধার।

> কায়ার মধ্যেই ত্রিভুবন রাজ।—কায়াবেলী ১৯
> কায়াতেই চৌদ্দ ভুবন।—ঐ ২০
> কায়াতেই সব ব্রহ্মাণ্ড ও নবখণ্ড।—ঐ ২১
> কায়াতেই অবিগত নাথ, ও সাগর সাত।—ঐ ২৭
> কায়াতেই গঙ্গা যমুনার সঙ্গ।—ঐ ২৮
> কায়াতেই কাশী দ্বারকাদি তীর্থ।—ঐ ২৯
> কায়াতেই প্রজাপতি ও তীর্থযাত্রা।—ঐ ৩১
> কায়াতেই জপ জাপ, কায়াতেই তিনি স্বয়ং।—ঐ ৩৩
> কায়াতেই ভরা ভাণ্ডার কায়াতেই অপার বস্তু।—ঐ ৪১
> কায়াতেই জগৎ কর্তা, সব কিছু কায়াতেই।—ঐ ৪৭

কায়াতেই বহু বিস্তার ; কায়াতেই অনন্ত অপার।—ঐ ৪৯
কায়াতেই অগম অগাধ।—ঐ ৫০
কায়াতেই সাধনা, কায়াতেই বিচার।—ঐ ৫২
কায়াতেই প্রাণের খেলা, কায়াতেই নির্বাণ পদ।—ঐ ৫৪
কায়াতেই নিঝর ঝরে, কায়াতেই সেবা করে।—ঐ ৫৭
কায়াতেই জ্ঞান কায়াতেই ধ্যান।—ঐ ৬১
কায়াতেই এক কর্তা ও অনেক কলা।—ঐ ৬৩
কায়াতেই রূপ ও কায়াতেই সঙ্গ।—ঐ ৬৪
কায়াতেই পার হয় উত্তীর্ণ।—ঐ ৭২
কায়াতেই হয় উদ্ধার।—ঐ ৭৫
কায়াতেই সেই সৌন্দর্যময়ের দর্শন।—ঐ ৭৮
কায়াতেই প্রিয়তম মেলেন।—ঐ ৮০
কায়াতেই সেই জ্যোতি, কায়াতেই সেই পরিপূর্ণ স্বরূপ।—ঐ ৮৪
কায়াতেই সত্য কল্যাণ, কায়াতেই জয় জয় কার।—ঐ ৯৩

অথর্বেও আছে—

যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেধি সমাহিতে।
সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ পুরুষেধি সমাহিতাঃ॥ অথর্ব ১০, ৭, ১৫

মৃত্যু ও অমৃত, এই মানবদেহের কাঠামো ; সমুদ্র তাহার নাড়ী। মানবের মধ্যেই ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে।

মানবের এক-এক অঙ্গে এক সত্য, কোথাও তপ, ব্রত, কোথাও কোথাও যতি, কোথাও শ্রদ্ধা, কোথাও সত্য, অগ্নি, বায়ু। চন্দ্রমাও অঙ্গ, ভূমি অন্তরীক্ষ ও দ্যৌঃ তার অঙ্গ॥

কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধি তিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গ ঋতমস্যাধ্যাহিতম্।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি
কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্॥
কস্মাদঙ্গাদ্দীপ্যতে অগ্নিরস্য
কস্মাদঙ্গাৎপবতে মাতরিশ্বা
কস্মাদঙ্গাদ্বিমিমীতেধি চন্দ্রমা
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যন্তরিক্ষম্।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ॥ অথর্ব ১০, ৭, ১-৩

অজপা জপ

জপও ইহাদের চলিত আছে বটে কিন্তু তাহা মালা-জপ বা কর-জপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ করেন। তাহাকে অজপা জপ বলে। কবীরও বলেন—"মালা চলে

শ্বাস উশ্বাস কী জামেঁ গাঁঠ ন মের।" দাদূ বলিয়াছেন, "মালা জপূঁন কর জপূঁ, জপূঁ তো অজপা জপ।" 'মালা শ্বাস উশ্বাস কী' ?—

মালা জপূঁন কর জপূঁ
মুখসে কহুঁন রাম।"

—সত্য কবীরকী সাখী, সুমিরণ অঙ্গ, ৮৯

তন্ত্রে নাথপন্থী ও শিবপন্থীদের যোগসাধনায়ও এই অজপা জপ আছে। বাউলরা কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট নন; তাঁহারা বলেন, যখন নিশ্বাসের টানাটানি বিনা সহজেই মন স্মরণানন্দে ও যোগানন্দে ভরপুর থাকিবে তখনই সুমিরণ বা জপ হইবে পূর্ণাঙ্গ ও সহজ।

ব্রহ্মসংকোচ

মন্দিরে যাহাদের প্রবেশ নাই, শাস্ত্রে যাহাদের অধিকার নাই, যাগযজ্ঞে ব্রতে যাহাদের স্থান নাই তাহাদের একমাত্র বস্তু আছে আপন অন্তরাত্মা, আপন জীবন ও আপন কায়া। তাহাদের পক্ষে সহজ হইল আপন জীবনে বিশ্বজীবন, আপন আত্মায় বিশ্বাত্মা ও আপন কায়ায় বিশ্বকায়া সমরস করিয়া দেখা। প্রেম ও জ্ঞান সব-কিছু এই সমরসে সমন্বিত করিয়া ইহারা দেখিতে চায়। নানা ভেদবিভেদের কূট বিচারের মধ্যে ইহারা যাইতে নারাজ।

কাজেই ব্রত তীর্থ শাস্ত্রবিচারাদি ছাড়িয়া ইহারা চেষ্টা করে এই কায়াতে সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করিতে ও সমগ্র বিশ্বে এই কায়াকে অনুভব করিতে। নিজেকে যদি বিশ্বপ্রমাণ বিস্তৃত না করি তবে এই জীবনে পরমাত্মা-বিশ্বাত্মাকে আবাহন করিতে পারা যায় না। কারণ তিনি অসীম অপার বিভু, ক্ষুদ্র এই কায়াতে তাঁহাকে আসিতে হইলে তাঁকে সংকীর্ণ করিয়া দুঃখ দেওয়া হয়। এই ব্রহ্মসংকোচের দুঃখ দূর করিতে নিজেকে ও সর্ব বিশ্বকে একরস করিতে হয়। ইহাই তাঁহাদের প্রধান যোগ। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে নিজকে ব্রহ্মধামের মত উদার কর। ইহাদের মতে সহজ গায়ত্রীর তাহাই হইল সহজ ব্যাহৃতি বা 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ'। অর্থাৎ ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চারণের পূর্বে আপনাকে সর্ব ভূ-ভুব-স্বর্লোকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহাই ব্যাহৃতি।

ঊর্ধ্বস্রোত

এই দেহের মধ্যে বাউলদের একটি ক্রিয়া আছে তাহাকে ঊর্ধ্বস্রোত করা বলে। উত্তর-পশ্চিমের সাধকেরা কেহ কেহ উহাকে 'ধারা উলটানো' বলেন। ইহাঁদের মতে জড়ের নিয়ম অনুসারেও জড়শক্তি বশে সব রসই নিম্নগামী। নদীনালা বাহিয়া জল সমুদ্রের দিকে চলে, জড়প্রকৃতির নিয়মে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় দীপে ও জীবনে। অর্থাৎ দীপ জ্বালিলে অমনি তৈলবিন্দু ঊর্ধ্বস্রোতে ফিরিয়া চলিল। জীবনের ধর্মও তাই। একটি বীজ মাটিতে অঙ্কুরিত হইলেই তাহার অঙ্কুর ঊর্ধ্বগামী হয়, সঙ্গেসঙ্গে রসও ঊর্ধ্বগামী হয়। তাল-শাল-নারিকেলাদি বৃক্ষ ততটা ঊর্ধ্ব পর্যন্ত উঠে যতটা তার রস উঠে। অর্থাৎ রস উঠা লইয়াই জীবন। ঊর্ধ্বদিকে যতদূর পর্যন্ত রস উঠিতে পারে ততদূর পর্যন্তই বৃক্ষলতাদির জীবনের সীমা। কাজেই সাধনার যদি জ্যোতিঃ ও জীবনের প্রয়োজন থাকে তবে কামনার জড়ধারাকে উলটাইয়া চিন্ময় ধারা করিতে হইবে। নিম্নগামী কামনায় জীবধারাকে উলটাইয়া জ্যোতির্ময় প্রাণময় শিবধারা করিতে হইবে। পশুধর্মের

জড়ধর্মের ধারা অহংকে কেন্দ্র করিয়া স্বার্থের জন্যই নীচের দিকে ধাবিত হয়, ইহাকে উলটাইয়া ঊর্ধ্বমুখী করিলে তাহা প্রেম ও সেবাতে পরিণত হয়। তখনই তাহা শুদ্ধ হয়। প্রেমের বলেই কামের ধারা উলটিয়া প্রেম হইয়া যায়। প্রেম এমন অপূর্ব বস্তু যে তাহা দেবলোকেও দুর্লভ। প্রেমে অসীম দুঃখ থাকিলেও স্বর্গের অমৃত তার কাছে তুচ্ছ। তাই দেবতারাও প্রেম চাহেন। দুঃখের ভয়ে দেবতারা প্রেমকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই বলিয়া অনুতপ্ত। তাই বাউলেরা গায়—

প্রেম আমার পরশমণি
তারে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা।
(তাই) গোলোক চায় যে ভূলোক হতে
মানুষ হৈতে চায় যে দেবা।

দুঃখভীত স্বর্গলোকে প্রেমের সম্ভাবনা কোথায়? কবীরের মতে প্রেমে যে 'জন্ম মরণ ছোড়', জন্ম-মরণ হিসাব ছাড়িয়া দোলাইতে হইবে। প্রেমের সাধনা বড় কঠিন, সবাই তাহা সাধিতে পারে না। মোমের ঘোড়ায় উঠিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া তাহাতে হয় চলিতে। তাই কবীর বলেন,

নেহ নিবানে কঠিন হৈ সব সে নীভত নাহিঁ
চঢ়রো মোম তুরগপয় চলরো পারক মাহিঁ।—প্রেম অঙ্গ ৮৩

সর্বদুঃখ সত্ত্বেও প্রেম ধন্য। প্রেমহীন সুখময় স্বর্গলোকও অতি ছার। এই মহনীয় প্রেমের পরশমণি মানবজীবনেই সম্ভব বলিয়া দেবতারাও দেবত্ব ছাড়িয়া মানবত্ব প্রার্থনা করেন।

উলটিয়া ধারা যখন শুদ্ধ হয়, মলিন কাম যখন শুদ্ধ প্রেম হয়, তখনই তাহা বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া নব নব আনন্দ নব নব রস ও লীলার সৃষ্টি করে। যোগবাশিষ্ঠে দেখি—

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥—বৈরাগ্যপ্রকরণ ৩, ১১

মলিন বাসনায় সংসার, শুদ্ধ বাসনায় মুক্তি। অথর্ব বেদে আছে—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ॥ ১০, ২, ৩১

নবদ্বারযুক্ত দেবলোক অযোধ্যাপুরীতে এই অষ্টচক্র বিরাজিত। তাহাতে জ্যোতির্ময় হিরণ্ময় কোষ দীপ্যমান।

তস্মিন হিরণ্যয়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥—ঐ, ৩, ৩২

সেই ত্রি-অরাযুক্ত ত্রিপ্রতিষ্ঠিত হিরণ্ময় কোষে যে আত্মময় দিব্য পুরুষ বাস করেন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্‌রাই জানেন।

দেহতত্ত্বের রহস্য এখানে আছে; উলটা কমলের কথা আছে অথর্বে ১০, ২, ১৪, শ্লোকে, সেখানে কমলের স্থলে 'পাত্র' দেওয়া আছে।

ঊর্ধ্বং ভরন্তমুদকং কুম্ভেনেবোদহার্যম্।
পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা ন সর্বে মনসা বিদুঃ॥—অষ্টা, ১০, ৮, ১৪

ঊর্ধ্বে জল ভরিবার যে কুম্ভ তাহাতে রস পূর্ণ করা হইতেছে। মন দিয়া দেখিতে না পারিলে চক্ষু কি

দেখিবে সকলে? কমলের কথা আছে ১০, ৮, ৩৪ শ্লোকে। জলের মধ্যে ফুটিল যে কমল তাহাকে সেখানে রাখিল কোন্ মায়ায়?

অপাংত্বা পুষ্পংপৃচ্ছামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্ ॥—অষ্টা, ১০, ৮, ৩৪

১০, ২, ৪৩ শ্লোকে আছে নবদ্বারমুক্ত কায়াকমলের কথা।

পুণ্ডরীকং নবদ্বারম্ ॥—অথর্ব, ১০, ৮, ৪৩

চক্রবেধ বা চক্রভেদ ধারা উলটানোর মধ্যে আর-একটি কথা আছে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত হইতে ইন্দ্রিয়গম্য স্থূল ও স্থূলতর পদার্থের ক্রমে রূপগ্রহণই হইল সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। ইহাতেই সংসারের বন্ধন লাগিয়া আছে। উপনিষদে আছে—

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥—মুণ্ডক ২, ৩

এই পরমপুরুষ হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়গণ, আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ জল সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইতেছে। পুরাণ তন্ত্র যোগশাস্ত্র ও দর্শনাদিতেও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে যাওয়ায় "সৃষ্টি" ও স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়ায় "প্রলয়" প্রক্রিয়া। "মৃন্ময়" পথ হইল সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে ও "চিন্ময়" পথ হইল স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়া। কাজেই সেই পরমপুরুষে যাইবার উপায় হইল যে-ধারাতে আমরা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে উপনীত হইয়াছি তাহা উলটাইয়া আবার সূক্ষ্মের দিকে যাওয়া। তবেই একটি-একটি তত্ত্বকে ভেদ করিয়া উলটা দিকে যাইতে হইবে। একটি-একটি তত্ত্ব হইল একটি-একটি সৃষ্টিমণ্ডল চক্র বা কমল। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ তত্ত্বের পঞ্চ চক্র বা পঞ্চ কমল ভেদ করিয়া ব্রহ্মকমলে পৌঁছিলে সেখানকার অফুরন্ত রস বা অমৃতধারা পান করিয়া সাধক মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

কোনো কোনো বাউল-মতে আকাশই হইল শূন্য বা ব্রহ্মবস্তু, কাজেই চারিটি চক্র ভেদ করিয়া পঞ্চমে পৌঁছিলেই সেই অমৃতের সাক্ষাৎকার হয়। যাঁরা ছয় চক্র মানেন তাঁদের মতে পাঁচটি চক্র ভেদ করিতে হয়, আর যাঁরা পাঁচটি চক্র মানেন তাঁদের মতে চারিটি চক্র ভেদ করিতে হয়।

জড় স্রোতের প্রত্যক্ষ রূপ হইল 'রেতো'ধারা। ইহাই হইল অনন্ত সৃষ্টিবীজ। যখন তত্ত্বরস উলটাইয়া সাধক ব্রহ্মকমলে যান তখন রসের সেই প্রত্যক্ষরূপ আপনি মিটিয়া যায়। কিন্তু কোনো কোনো স্থূলমতি সহজিয়া মনে করে এই রেতোধারা বা চন্দ্রধারাকে উলটাইয়া চারিটি স্থান ভেদ করিতে হয়। তাই ইহাকে চারি চন্দ্রের ভেদ বলে। ইহা অতি গোপনীয় তত্ত্ব। তাহা নামে মাত্র এখানে বলা হইল। পূর্বেও দাদূর কন্যা নানীমাতার বাণীতে অধোধারা উর্ধ্বে যাইবার কথা বলা হইয়াছে। এই তত্ত্বটি বাউলরা নানা গানে গভীর রস দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মানবজীবন যেমন ভাসানো প্রদীপের মত বহু ঘাট পার হইয়া চলে তেমনি ভিতরের ধারা অনেক ঘাট পার হইয়া চলিতেছে। কবে যে সে তার চরম স্থলে পৌঁছিয়া তার সব জ্বালা জুড়াইবে তা কে জানে?

পরান আমার সোতের দীয়া আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে।

প্রভৃতি গানে দেখি জীবনের সেই মূল আদি রহস্য বুঝিবার জন্য ব্যাকুলতা। ভাসমান প্রদীপ আদি ঘাটে ফিরিতে চাহিতেছে। যে ভাসাইয়া দিয়াছে তাহারই প্রেমময় কোলে আবার গিয়া ভাসিতে চাহিতেছে।

গ্রন্থিমোচন

'ঠাকোর ঠোকোর পূজা' করিয়া যাঁহারা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে যাইতে চান বাউলেরা বলেন তাঁহারা সেই মনের মানুষকে পাইবেন কেমন করিয়া ? তিনিও যেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে চলিয়াছেন সাধকও যদি ক্রমাগত সেই দিকেই চলে তবে উভয়ে একই মুখে ক্রমাগত চলিতে থাকিলে পরস্পরে দেখা হইবার তো উপায় নাই। তাই তখন উভয়ের দেখা হইবে কেমনে ? তাঁর দেখা যদি চাও তবে তিনি যদি সূক্ষ্ম হইতে চলেন স্থূলে তবে তুমি যাও স্থূল হইতে সূক্ষ্মে। তবেই কোনো-না-কোনোখানে উভয়ে দেখা হইতে পারে। ইহাও সৃষ্টির ধারাকে সাধনাতে উলটানো।

রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে ; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।"

উত্তর-ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেও এই তত্ত্ব আছে। মহানির্বাণতন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে ৯৫ শ্লোক হইতেছে এই সাধনারই উপদেশ।

> গন্ধাদি ঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
> রসাদি জিহ্বয়া সার্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ ॥
> রূপাদি চক্ষুষা সার্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
> স্পর্শাদি ত্বগ্‌যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ ॥
> অহংকারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
> মহত্তত্ত্বং চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥—মহানির্বাণ, পঞ্চম উল্লাস, ৯৫-৯৭

এই প্রকারে ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাদি সমুদয়ের সহিত পৃথিবী জলে লীন করিয়া, পরে রসনেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল অগ্নিতে, রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে, স্পর্শ প্রভৃতি ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুকে আকাশে, শব্দের সহিত আকাশ অহংকারতত্ত্বে, অহংকারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে এবং বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতিতে লীন করিয়া প্রকৃতি ব্রহ্মতে লয় করিবে।—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীর অনুবাদ।

মহানির্বাণ স্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন সাধককে ব্রহ্ম যোগলাভের জন্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতে হইবে। সৃষ্টির ক্রিয়া সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে তাই, সৃষ্টিরমূলে যাইতে হইলে আমাদিগকে চলিতে হইবে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে।

দেহতত্ত্বের চক্র ও কমল ভেদ করিয়া ব্রহ্মকমলে যাওয়ার কথা বাউলদের গানেও আছে। এই দেহ-তত্ত্বের গানের কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে। নমঃশূদ্র গঙ্গারামের এই গানটি—

> সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া অষ্ট গিরি পার।
> তিন পাথারের সীমার পরে, দেখ্‌বি তত্ত্বসার ॥
> পাতাল হৈতে চড়বি আকাশ, লামবি (=নাব্‌বি) রসাতলে।
> ছয় ঋতুতে খেলবি ধূলট খেলবি সব কমলে। · ·
> চৌদ্দ ভুবন সপ্ত সাগর তের নদীর পার।
> (তোর) আপন ঘরে দেখা পাবি নইলে অন্ধকার।

সেই আপন ঘরে সহজ মানুষ লীলা রসময়।
জনম সফল করবি যদি কর নিজেরে লয়। ("ক্ষয়" পাঠও আছে)

একটি গান কৈবর্ত বলার—

মাথার উপর মন মজানা আকাশ নীলকমলে।
তার অনন্ত দল কি ঝলমল জ্বলছে জ্যোতি অপার নীলে॥
আকাশ ভরা নীলকমলে, জ্যোতির সুধার ঝলক ঝলে,
মত্ত ভ্রমর উড়ে চলে, অলখ শূন্যে মন উদাসে॥
বলা বলে ভাইবে (=ভেবে) যে মরি,
মাঝে মাঝে হারাই যে পথ, বল্ তো কি করি?
(তাই) বলি গুরু কল্পতরু থেকো সাথে সাথ,
যেথা ঘোর আঁধারে পথ মেলে না ধইরো আমার হাত;
যখন মনে ধন্ধ নয়ন অন্ধ, তখন আশা দিও কর্ণমূলে॥

গঙ্গারামের গুরু কৈবর্ত জগার একটি গান—

(আছে) তোরই ভিতর অতল সাগর, তার পাইলি না মরম।
(তার) নাই কূলকিনারা শাস্ত্রধারা, নিয়ম কি করম॥
(সেই) অতল অকূলে, পূজামন্ত্রে যন্ত্রে তন্ত্রে উদিস না মেলে,
আবার না জান্যা (=জানিয়া) তার, বিফলে যায়, এই মহামানব-জনম॥
যদি খোল্ছ (=খুলিছ) আপন খিল (=অর্গল) যদি অখিল সাথে ফেরে
জগা প্রেমের সাচা মিল, ধন্য হবি যদি গুরু ঘুচায় সব ভরম॥

বলার আর-একটি গান—

হংস পরমী তোরে উড়তে হৈবো (=হবে) অকূল আকাশে।
ভুললি নাকি হৈবো (=হবে) যাইতে (=যেতে) সাগর মানসে॥
বাঁকে বাঁকে (রকম রকম) দেখবি কমল-বন, বিচিত্র দল রসের লীলা গন্ধ
আর বরণ, (যাবি) নানান রসের রসিক হৈয়া, তাই বলা আনন্দে ভাসে॥

নমঃশূদ্রজাতীয় গঙ্গারামের এই গানটি কায়া-সাধনের সমরস সাধনের ও সহজ সাধনের একটি পূর্ণ প্রকাশ—

শোয়াস শোয়াসে গতাগতি চলছে নিরন্তর।
বাহির ভিতর একায় (=এক হয়) যাতে, (সেই) এক রসের মন্তর।
তর (=তোর) আপন মাঝে চৌদ্দ ভুবন আবার ভুবন মাঝে তুই।
শোয়াসে শোয়াসে চলাচলি বুঝিলি না কিছুই।
সেই প্রাণ-গতিতে ধ্যান যোগায্যা হবি যোগিবর।
অলেখ লেখে মাখামাখি শোয়াস শোয়াসে কর।
পল গলাবি যুগযুগাদ্যে যুগযুগাদ্য পলে।
বিন্দু গলে সিন্ধুতে আর সিন্ধু বিন্দে গলে॥
সহজ যদি হয় রে সাধন ধেয়ান গেয়ানের পার।
অমৃত রস মিলবো সহজ শোন্ রে সারাৎসার॥

অনেক ঘাটে ঘুরাঘুরি কৈর‍্যা (= করিয়া) হলি অন্ধ।
গঙ্গারাম তুই হ' না সহজ মিটবো সকল ধন্ধ॥

এমন সুন্দর গান আরো অনেক আছে। সিন্ধুকে বিন্দুতে, অনন্তকে পলের মধ্যে লয় করিয়া যে পরম উপলব্ধি তাহার কিছু ইঙ্গিত ব্রাউনিং শেলি কীট্‌স ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিদের কাব্যেও আছে। কিন্তু তাহা সাহিত্যের কথা। এখানে সাধনার কথা।

প্রকৃতি-পুরুষের যোগে গ্রন্থির পর গ্রন্থি বাঁধিয়া সৃষ্টি। সেই ধারা আশ্রয় করিয়াই উলটা চলিয়া প্রেমের সহজ যোগে প্রকৃতি-পুরুষকে একরস বা সমরস করিয়া আনন্দময় করিয়া পাইলে মুক্তি।

ব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষের সঙ্গে আর-এক প্রকারের যোগ আছে; তাহাতে মানুষ সব ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ও নিয়মকে আনিয়া লোভ-বশে সেই নিয়মসূত্র ধরিয়া জড় ধারার সব শক্তি সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিয়া শক্তিমান্ হয়। এই পথেই এই যুগের বিজ্ঞান প্রভৃতির সব রহস্য চুরি করিয়া শক্তিশালী হইয়া বিপক্ষকে মারিয়া প্রবল হইতে চায়। এই পথ নিন্দিত পথ। সেই যুগে এই পথেই রসায়ন-সাধকেরা জীবনরস মারণরস প্রভৃতি খুঁজিয়াছেন। তন্ত্রের মতে এই পথের পথিকেরাই রসায়ন প্রভৃতি নানা শক্তির সাধক। সহজ সাধক কিন্তু সে পথে যান না। তিনি ঐ ধারা উলটাইয়া সমরসে সহজ এক করিয়া পরমানন্দ রস উপলব্ধি করেন। কোনো পার্থিব বস্তু বা শক্তি তাঁহারা চান না। আদর্শভ্রষ্ট সিদ্ধি লোভীদের হইল সে-সব খোঁজ। তাঁহারা প্রকৃতিকে জানিয়া তাহাকে খাটাইয়া নিজেদের পশুস্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লন। তন্ত্রে সে সাধনাও আছে, কিন্তু তাহা মলিন। তাহাতে সাধককে শক্তিশালী করিলেও দিনে দিনে আরও বদ্ধ করে। মুক্তির আনন্দ সে পথে নয়। তাহা সহজ ও সমরসের পথে।

সহজ

যতক্ষণ লোভ থাকে ততক্ষণ জীবনে এই সহজ আসে না। তাই কবীর বলেন তখন "মন না রঙায়ে রাঙায়ে জোগী কাপড়া।" (কবীর ১০২)। "মন না রাঙাইয়া যোগী রাঙ্গাইল তার বস্ত্র।" তখনই বাহ্য চিহ্নাদির প্রয়োজন হয় কিনা। এমন অবস্থায় সদ্‌গুরু যুক্তি অর্থাৎ পথ দেখাইয়া দেন—

জব মৈঁ ভুলা রে ভাঈ।
মোরে সত্‌গুরু জুগতে লখাঈ॥—কবীর ১-২২ পৃ

যখন আমি ভুলিয়াছিলাম তখন সদ্‌গুরুই আমাকে যুক্তিযুক্ত পথ দেখাইলেন, সেই সদ্‌গুরু "নবদ্বার বন্ধ করাইলেন না, শ্বাস বন্ধ করাইলেন না, ভবখণ্ড ত্যাগ করাইলেন না।" তখন

সহজৈ রঁহে সমায় সহজমেঁ
না কছুঁ আবে ন যারে॥—কবীর ১-৬৯

তখন সহজেই সেই সহজের মধ্যে ডুবিয়া থাকা হইবে। আর কোথাও যাওয়া-আসা নাই। তখন আমি

আঁখ ন মূদুঁ কান ন রূধুঁ।
কায়া কষ্ট ন ধারুঁ॥—কবীর ১ম-৭৬

তখন চক্ষুও আর বুজি না, কানও বন্ধ করি না। কায়াকৃচ্ছ্রও সাধন করি না; তখন

জহঁ জহঁ জাউঁ সোই পরিকরমা।
জো কুছ করুঁ সো সেবা॥—ঐ

তখন যেখানে যেখানে যাই তাহাতে তাঁকে প্রদক্ষিণ করা হয়, যাহা-কিছু করি তাহাই হয় তাঁর সেবা। সেই "সহজ সমাধি ভলী" (ঐ)—এমন সহজ সমাধিই ভাল।

কাজেই সহজপন্থীরা তীর্থেও যাইবেন না, শাস্ত্রও মানিবেন না, মন্দিরও তাঁহাদের অনাবশ্যক। তাঁহাদের সবই মানুষের মধ্যে। তাঁহাদের উপাস্যও হইলেন পরমপুরুষ বা মনের মানুষ। তাঁহাদের সাধনাও মানুষের কায়া ও জীবনের মধ্যে। কাজেই মানুষই ইঁহাদের পরাকাষ্ঠা, মানুষই ইঁহাদের সবচেয়ে বড় কথা। তাই সহজিয়া চণ্ডীদাস বলেন—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

অথর্ব বেদে (১০,১,১১-১২) দেখি মনের দেহের এই রহস্য, অথর্বের ১০,৭,১৭ শ্লোকে দেখি মানবের মধ্যেই ব্রহ্ম যে "পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্ তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্"—যিনি মানবের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে যথার্থ স্থানে দেখিয়াছেন, এই মানবজীবনই জন্মে জন্মে নূতন হইয়া চিরন্তনকে নব নব সাধনায় নব নব রূপে প্রকাশ করিতেছে।

সনাতন মেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ॥—অথর্ব, ১০,৮,২৩

ভগবানও মানুষ, তাই বাউল বলেন—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে?

নরহরির শিষ্য পদ্মলোচনের পদ—

চলছে মানুষ বঙ্কনালে (=রহস্যময় বক্রপথ)
আমার হৃদয়কমল মেলবে যে দল খবর তারে কে জানালে।
এই কমল-রসে ডুব্‌বে বলে, বন্ধু, তুমি ভ্রমর হলে
এখন না পেয়ে পথ চলছ ফিরে,
হৃদয়কমল দল না মেলে।

সাধনা-অংশের প্রথমেই ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে বাউলের চমৎকার গান—

তত্ত্বে ফত্ত্বে মন মানে না;
পরম মানুষ চাইই চাই··
মানুষ আমার চায় যে মানুষ,
তাই আউল বাউল হৈয়া ধাই।

মানবহৃদয়ই যে তাঁহার মন্দির এ কথাই বাউল ও নানক কবীরাদি প্রত্যেক সাধকের অসংখ্য গানে। শাস্ত্রও যে মানবজীবনে তাহাও তাঁহাদের অনেক অনেক গানে। পূর্বেই রজ্জবের এই গানটি দেওয়া হইয়াছে—

সাধন হারকী অংতর কাগজ প্রাণ অক্ষর মাহিঁ।

সাধকদের অন্তরই কাগজ, তাহাতে প্রাণের অক্ষরে সত্য শাস্ত্র লেখা। মানব-অন্তরেই সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চাহিয়া দেখ অসীম শাস্ত্র—

রজ্জব বসুধা বেদ সব কুল আলম কুরাণ··
রজ্জব কাগজ ক্যা পঢ়ে নিতহি তাজা জ্ঞান।

হে রজ্জব, বসুধাই সম্পূর্ণ বেদ, সকল সৃষ্টিই কোরাণ।· ·রজ্জব, কাগজ আর কি পড়িবি, বিশ্বে চাহিয়া দেখ নিত্যই তাজা জ্ঞান। আবার সকল মানবজীবনসমষ্টিতে অনন্ত বেদ—

প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ডমেঁ ঝলকে অনংত বেদ।

কোটি প্রাণের যে একটি মানব-ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বমানব সেখানে অনন্ত অনন্তবেদ ঝলমল করিতেছে।

সহজ না হইলে প্রেমে সরস না হইলে এই শাস্ত্র এই মন্দির এই সত্য উপলব্ধি হয় না। কবীর তাই বলেন, প্রেম যদি না আসে তবে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া কিসে সত্য পাইবে ?

জাকে প্রেমন আবৃত হিরে।
কাজ ভয়ে নর কাসী বসে সে
কা গংগা জল জিয়ে।—কবীর ১ম-১৭

ব্রহ্মাণ্ডের মত সহজ হইলে, জীবন আকাশের মত সহজ হইলে সেই সহজ মানুষকে দেখিতে পাইবে—

যদি ভেট্‌বি সে মানুষে।
সাধনে সহজ হবি, তোরে যেতে হবে সহজ দেশে।
হাথ গড়া পথ লৈলো যারা, সাচার খবর পায় কি তারা ?
বাসি মিছা হয় না সাচা, মিছা ভিড়ে ভেসে ভেসে।
তিন কোটি তার যে সহজে, যোগ রাগেতে সদাই বাজে
মিল্‌বো সাচা সেই রসে মজে—
জীব চরাচর নে তোর ভিতর, চিত্ত ডুবা নিত্য রসে।

"বাসি মিছা হয় না সাচা" অর্থাৎ যাহা মিথ্যা তাহা বাসি অর্থাৎ পুরাতন হইলেই সত্য হয় না। এই সহজ দৃষ্টিতে দেখিলে শাস্ত্র পুরাণ কোরাণ সব-কিছুই চিন্ময় নব দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

মানুষকে পাইলে শাস্ত্র সত্য সব আপনি গড়িয়া ওঠে। সত্য গুরু যখন সাচ্চা শিষ্য পান, মা যখন পুত্রকে পান, নারী যখন প্রিয়তমকে পান তখন সকল জ্ঞান আপনি আপনি সহজ প্রেমে ভরিয়া ওঠে। সে জ্ঞান এত সহজ যে তাহা আর শিখাইতে হয় না।

সতীকো কোন্ শিখারতা হৈ সঙ্গ স্বামীকে তন জারনা জী।
প্রেমকো কোন্ শিখারতা হৈ ত্যাগ মাঁহি ভোগকা পানা জী।—কবীর ১ম ৩৫

সতীকে স্বামীর চিতানলে আপন দেহ ভস্ম করিতে শিখায় কে ? ত্যাগের মধ্যে ভোগকে পাইতে প্রেমকে শিখায় কে ?

তখন সেই সহজ জীবনই হইবে নিত্য দীক্ষা—"যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা পেয়েছি।"

নিত্য দীক্ষার আধার হৃদয়ের মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করাই হইল সাধনা। তাই ভূক্তিমালী বিশার গান—

সহজ মানুষ আছিল হৃদয় বৃন্দাবনে।
জানি না ভাই হারাইলাম কোন্ ক্ষণে
এখন বাইরে ঘরে শান্তি যে আর নাই ;
দিবানিশি খুঁইজে মরি কোথাও যদি পাই,
ধ্যানে জপে পূজায় তপে চল্‌ছে তালাস রাত্রি দিনে
সেই সহজ যদি না দেয় নিজে ধরা।

তবে জোর তালাসে মেলে না সে, (বৃথা) কেবল খুঁইজে মরা ॥
তাহায় সহজ রসেই বান্ধন খসে, বুঝছে (=বুঝেছে) বিশা আপন মনে ॥

তাহাকে পাওয়াই মুক্তি। সে মুক্তি প্রেমে জ্ঞানে আনন্দে ভরপুর। তাহা বস্তু নহে, তাহা জীবনের পরম অবকাশরূপা মুক্তি, তাই তাকেই বলে শূন্য। এই শূন্য একটি শূন্যতা মাত্র নয়। এই শূন্যের কোলেই অনন্তলোকের গতি ও দীপ্তি অবারিত চলিয়াছে। নির্বাণের মত মুক্তি একটা না-বস্তু নহে।

এই জড়জগতে বাহ্য আচার-বিচার দিয়া সহজের প্রেমের মানুষকে খুঁজিলে চলিবে না।

তাই নমঃশূদ্র গঙ্গারাম গাহিয়াছেন—

ব্রেথা তারে খুঁইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে।
ছুঁইয়ে কি সে বস্‌বারি ধন, সে বস্‌বে হৃদয়-সিংহাসনে।

যখন সেই সহজ মানুষ মেলে তখন কোনো তীর্থের আর কোনো মূল্য নাই। তখন কোথাও আর ঘুরিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না, তখন হৃদয় বলে—

যাইতে তো চায় না রে মন মক্কা মদীনা।
এই যে বন্ধু আমার আছে, আমি রই রে তারি কাছে
(আমি) পাগল হৈতাম দূরে রইতাম তারে চিন্‌তাম রে যদি না।
(আমার) নাই মন্দির কি মস্‌জেদ, নাই পূজা কি বকরেদ্
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী পলে পলে সুদিনা ॥

তাই বাউলদের কোনো তীর্থ নাই। তবে যেখানে ভাবের লোক একত্র হয় তাহারা মাঝে মাঝে সেখানে যায়। বৈষ্ণবদের মেলার জায়গায়ও ইহারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণবদের মন্দিরে প্রবেশ করে না। করার অধিকারও অবশ্য তাহাদের নাই। বাংলাদেশের নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে অনেক মেলা হয়। তার মধ্যে কতকগুলি মেলায় বাউলেরা পরস্পরে মিলিবার জন্য আসাযাওয়া করে। কিন্তু এখন গবেষণারত লোকদের ঠেলায়, বীরভূম জেলায় কেন্দুলী, রাজসাহীর খেজুরী, মালদহের রামকেলী প্রভৃতি মেলা ভালো বাউলেরা প্রায় বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই আর এখন বাউলদের মেলাগুলির নাম-ধাম দিলাম না। তবে যাঁহারা এই পথের খোঁজ করেন তাঁহারা সেই সব মেলার খোঁজও রাখেন। তবে এ কথা ঠিক, বাউলেরা অনুকূল সব স্থানে পরস্পরে মিলিবার জন্য যায়। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন ওসব জায়গায় যাও? তবে তাহারা বলে, ভাবের মানুষের পরশ পাইতে। অন্ধকার রাত্রিতে যখন নৌকা চলে তখন দূরের মাঝি দূরের মাঝির ডাকের সঙ্গে ডাক মিলাইয়া দেখে ঠিক পথে আছে কি না—

মাঝে মাঝে ডাক মিলাইয়া দেখি।
নাও আমার সহজ ধারায় চলছে নাকি।

এইখানে যেমন নানা জ্ঞানী একত্র হইয়াছিল সকলে ডাক মিলাইয়া দেখিবে যে ঠিক ধারায় সবার সত্যের সন্ধান চলিয়াছে কি না। শাস্ত্র পুঁথি তো গ্রন্থাগার ভরিয়া আছে, তবু মানুষ মানুষের কাছে দুর্লভ। মানুষের মত বল মানুষের আর নাই—

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

সকল মন্ত্রের পরম মন্ত্র মহারহস্যময় মহাকাব্য গুহ্যমন্ত্র ভীষ্ম একদিন বলিয়াছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।—শান্তিপর্ব, ২৯৯, ২০

তাহারও বহু পূর্বে আকর্ষণ ঋষি বলিয়াছিলেন, মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে পরম স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।—অথর্ব, ১০, ৭, ১৭

কারণ মানুষের মধ্যে অমৃত ও মৃত্যু একত্র সমাহিত। মানুষের নাড়ীতে নাড়ীতে মহাসমুদ্র স্পন্দিত—

যত্রামৃতং চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেধি সমাহিতে।
সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ পুরুষেধি সমাহিতাঃ।—ঐ, ১০, ৭, ১৫

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য-অনুশীলন

১৯৫৩ সালে একবার পশ্চিম-ইউরোপে গিয়েছিলাম। তখন নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমরা এক সময়ে জানতাম বিদেশে ভারতবর্ষের প্রধান পরিচয় রবীন্দ্রনাথের যোগে, ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের দেশ। এখন কালের গতিতে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ইয়োরোপ জেনেছে, ভারতবর্ষ শুধু রবীন্দ্রনাথের দেশ নয়— শাড়ির দেশ, হিন্দু-মুসলমানের দেশ ইত্যাদি; ইত্যাদি কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও যে দেশ সে কথা খুব কম লোকেরই মনে আছে। খুঁজে খুঁজে কোনো দোকানে তাঁর বই দেখতাম না, ছাপা নেই, কিংবা দোকানে রাখে না। বিশ্বপ্রেম ও সৌভ্রাত্র-বন্ধন যে ভারতবর্ষের বাণী তা অনেকে জানে কিন্তু সে মন্ত্রের উদ্‌গাতাকে ভুলে গেছে ও যাচ্ছে। কালের ধর্মই এই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তাছাড়া প্রপাগ্যাণ্ডার যুগে, খবরের কাগজে যে সব নাম প্রত্যহ দেখা যায় না তা কার মনে থাকে? সাধারণ শিক্ষিত মানুষ আজকাল খবরের কাগজ আর ফাইল ছাড়া অন্য কিছু পড়ে উঠতে পারে না।

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটউট অব কালচার আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করলে আমি কবির সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সভায় কয়েকজন ছিলেন যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন, এমন কি লণ্ডনে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠের দিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ। তাঁদের অনুরোধে গ্লোব হাউসে ওভারসীজ্ লীগের ঘরে আবার কিছু আলোচনা করবার সুযোগ পাই। সেদিন আমি বিশেষ করে কবির রচনার একটি সঞ্চয়ন অনুবাদ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছিলাম। কবির রচনায় ক্লিষ্ট মানবের জন্য যে সুপথ্য আছে ভাষার ব্যবধানের জন্যই তা সকলের কাছে পৌঁছল না, মানবজাতির এটা দুর্ভাগ্য। সেই সভায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের ভ্রাতুষ্পুত্রী লিলি ফ্রয়েড উপস্থিত ছিলেন, তিনি কবির সঙ্গে ইয়োরোপে নানা জায়গায় ভ্রমণ করেছিলেন, অনেক বাংলা কবিতা শিখেছিলেন ও সভায় আবৃত্তি করতেন; এতদিন পরেও তিনি চমৎকার উচ্চারণে "হৃদয় আমার নাচে রে" আবৃত্তি করলেন। লিলি ফ্রয়েড আমাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করলেন। সভাপতি পি. ই. এন.-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডেভিড কার্ভার আমাকে ভরসা

দিলেন যে, ইউনেস্কো থেকে প্রত্যেক দেশীয় ভাষার সাহিত্য অনুবাদের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাঁদের তিনি অনুরোধ করবেন যেন কবির একটি কাব্যসঞ্চয়ন অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। পরে তিনি আমায় জানিয়েছিলেন, ঐ অনুরোধ রক্ষিত হয় নি, ইউনেস্কো এখন রবীন্দ্রকাব্য অনুবাদ করাতে রাজি নয়। তাঁরা ভারতীয় যে যে বই অনুবাদ করছেন তারও নাম জানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞতা আমার মনকে পীড়িত করেছিল। পরে যাঁরা দীর্ঘ দিন ওদেশে বাস করেছেন, এমন অনেকে আমাকে বলেছিলেন ওদেশে সবাই কবিকে ভুলে যাচ্ছে, এখন নূতন করে তাঁর রচনার অনুবাদ ও প্রচার হওয়া দরকার। এ বিষয়ে আমার সেই সামান্য চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল, দেখলাম ওদের একেবারেই উৎসাহ নেই। শুনলাম প্রকাশকরাও ছাপবে না। এ সম্বন্ধে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের চিঠিপত্র এখনও আমার কাছে রয়েছে।

তার পর গতবছর জুলাই মাসে সোভিয়েট রাশিয়ায় যাবার একটা সুযোগ এল। যাবার সময়েই মনে করেছিলাম, যেমন করে পারি কবির কথা বলবই। তবে মনে প্রচুর সংশয় ছিল তাঁর প্রতি এখনকার 'যন্ত্রমানব'দের অনুরাগ কতটা থাকবে। ইতিপূর্বে যে সব আধুনিক সোভিয়েট সাহিত্যের অনুবাদ পড়েছিলাম সেগুলি কেবলমাত্র প্রপাগ্যাণ্ডা ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সন্দেহ ছিল বিশুদ্ধ আনন্দবাণী, নিছক সাহিত্য আর ওদের ভালো লাগে কি না। প্রথম সংশয় ঘুচল, লুসানে মহিলা সম্মেলনেই। প্রতিনিধিদের মধ্যে রাশিয়ান মেয়ে অনেক ছিল, দৈবাৎ তাদের একজনের সঙ্গে খাবার টেবিলে পাশাপাশি বসেছিলাম। ভালো করে আলাপ হয়ে গেল, কারণ সে ইংরেজি বলে চমৎকার। দোভাষীর কাজ করতে এসেছে। নাম তানিয়া। দেখলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবর রাখে, অনেক বাঙালী সাহিত্যিকের নাম জানে, দার্শনিক হিসাবে আমার পিতার নামও শুনেছে। বিস্মিত হয়ে গেলাম। তার কাছেই শুনলাম রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা ওরা স্থির করেছে এবং একখণ্ড বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। "কি বই জান কি?" "কি করে জানব? সে আমি চক্ষেও দেখিনি— দেখবার আশাও নেই। আমার নাম রেজেস্ট্রি করিয়েছি কিন্তু আমার নাম পর্যন্ত পৌছতেই সব বই ফুরিয়ে যাবে। তাই পরের সংস্করণের অপেক্ষায় আছি।" তাকেই আমি বিশেষ অনুরোধ করলাম, যাঁরা এই অনুবাদের ভার নিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য। আমরা পনেরো-কুড়ি জনের দল চলেছি। সকলেরই ভিন্ন রুচি, ভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ। বিশেষত, বেশির ভাগই স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তাঁরা স্কুল দেখবেন, হাসপাতাল দেখবেন, সে দলে পড়ে আমার যা প্রধান সন্ধানের বিষয় তার খবর পাব কি না সন্দেহ ছিল। যা হোক মস্কো পৌছেই, আমাদের মহিলা-কমিটির সেক্রেটারির ঘরে কর্মসূচী স্থির করবার জন্য ডাক পড়ল। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের দেশে আমরা কী কী দেখতে চাই, কার কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁরা বিশেষভাবে বললেন যে আমাদের প্রোগ্রাম আমরাই ঠিক করব, তাঁরা সে বিষয়ে কিছুই বলতে রাজি নন। বুঝলাম নইলে চোখ বেঁধে সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরিয়ে দিয়েছে এই নিন্দাভাগিনী হতে হবে, তাতে তাঁরা রাজি নন। অতএব সবাই মিলে যে যা দেখব বলতে থাকায় এবং মহা-সোভিয়েটের যোলটা রিপাব্লিকের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত সে শোনাল যেন আসাম যাবার পথে মাদ্রাজ ঘুরিয়ে দিল্লী পৌছে দেওয়ার মতো। যা হোক তার মধ্যেই আমি আমার আরজি পেশ করলাম। মাদাম পারফেনোভা, PERFENOVA মহিলা কমিটির সহকারী সভানেত্রী আমায় আশ্বাস দিলেন, যে করে হোক সে ব্যবস্থা করে

দেবেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, অনুবাদকারিণী থাকেন লেনিনগ্রাদে, এবং লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। ফিরতি পথে একজন বর্ষীয়সী মহিলা কর্মী মারিয়া বললে, "আপনি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত? আমাদের সমস্ত দেশ তাঁর ভক্ত। তাঁর লেখার জন্য আমাদের জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। তাঁর গ্রন্থাবলী আট খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই হাজার কপি, তিন দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। আমরা নাম রেজেস্ট্রি করেছি কবে পাব কে জানে?" "কী বই সেটা বলতে পারেন?" "উপন্যাস। বইটি তো আমি জানি, তার ইংরেজি নাম মনে পড়ছে না।" তার পর দু-তিনজনে মিলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে বললে, "BROKEN BOAT।" "WRECK?" "হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছেন, WRECK।" "ঐ গল্প এদেশের লোকের এত ভালো লেগেছে? ও তো পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার পুরোনো বাংলা দেশের চিত্র। একেবারেই দেশী জিনিস।" "তা হোক, ঠাকুরের নামে এদেশের লোক মুগ্ধ, তাঁর সব লেখা পড়তে চাই আমরা।" মারিয়া একজন সাধারণশিক্ষিতা বর্ষীয়সী কর্মিষ্ঠা মেয়ে, ঠিক ইনটেলেকচুয়াল বলা চলে না। তার মুখে এত খবর পেয়ে বুঝতে পারলাম কবিকে জানবার জন্য ওদের আগ্রহটা সত্য।

যেদিন সকালে লেনিনগ্রাদ পৌঁছলাম, সেদিনই দুপুরবেলা দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে দেখা করতে এলেন। শুনলাম ঐ ভদ্রলোকের বাবা রাশিয়ান ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেছেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী কোনো-না-কোনো প্রাচ্য ভাষা শেখে। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সংস্কৃত আর-একজন পাঞ্জাবী ভাষা পড়ছেন। তাঁরা বললেন শ্রীযুক্তা ভিরা নভিকভা Vera Novikova যিনি বাংলার অধ্যাপিকা, তিনিই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সহযোগে এই অনুবাদ-ব্যাপারের ভার নিয়েছেন। গ্রীষ্মাবকাশে তিনি গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম করতে গেছেন। বেশি দূর নয়, খবর দেওয়া হয়েছে, শীঘ্রই এসে পড়বেন। আমাদের হাতে মাত্র দুটি দিন সময় ছিল। কাজেই বেশ একটু নিরাশ হলাম। এত দূর দেশে এসেও কী ভাবে তাঁর রচনার অনুবাদ হচ্ছে তার সঠিক খবরটা পাওয়া হবে না। মেয়ে দুটি বারবার বললে— যদিই নভিকভার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, যাঁরা প্রকাশ করছেন তাঁরা কেউ-না-কেউ মস্কোতে আমার কাছে নিশ্চয় আসবেন। এদের এই উৎসাহ দেখে ভিরা নভিকভার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ফোটো রেখে দিলাম। মেয়েরা লোলুপ নেত্রে চেয়ে রইল। তার অর্থ— "এটা তো তাঁর? আর আমাদের?" "তোমরা চাও?" সমস্বরে তার সাগ্রহ উত্তর এল। ছবি পেয়ে এত খুশি হল যে আশ্চর্যই হলাম। যাবার সময় বলে গেল, "পুনর্দর্শনায় চ।"

পরের দিন লেনিনগ্রাদ থেকে কিছু দূরে পিটারের প্রাসাদ দেখতে যাবার জন্য গাড়িতে উঠছি এমন সময় একটি স্থূলাঙ্গী হাস্যমুখী বর্ষীয়সী মহিলা একেবারে ছুটে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে পড়লেন। তানিয়া পরিচয় করিয়ে দিল, "যেদিন থেকে এঁর রাশিয়া আসার কথা হয়েছে সেই দিন থেকে ইনি আপনার সন্ধান করছেন, এখন আপনাদের দেখা করিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম"। ভদ্রমহিলা আমায় জড়িয়ে ধরলেন, ভাঙা ভাঙা অর্ধোচ্চারিত বাংলায় বললেন, "তোমাদের কবি আমাদেরও কবি"—বাস্-সুদ্ধ বঙ্গবালারা চমকে উঠলেন, একটা সাড়া পড়ে গেল। তিনি আমাদের সঙ্গে চললেন পিটারের প্রাসাদ অভিমুখে। উদ্দেশ্য অন্যরা যখন প্রাসাদ দেখবে আমরা রবীন্দ্রকাব্যালোচনা করব। "শুনেছ বোধ হয়, নৌকাডুবি বেরিয়েছে, এবার ঘরে বাইরে অনুবাদ করছি।" এই বলেই তিনি তাঁর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ফেললেন।

ভদ্রমহিলার সাজগোজের বালাই নেই ; তাই ভাবছিলাম সাজের সরঞ্জাম তো নয়, অত মোটা হাতব্যাগে কি আছে। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল 'ঘরে বাইরে'র ফোটোগ্রাফ-করা কতগুলি পৃষ্ঠা। শুনলাম ওঁদের কাছে একখানি মাত্র বাংলা ঘরে বাইরে আছে। নানা জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা এক-একটা অংশ অনুবাদ করছে। পরে সব একত্র করে উনি দেখবেন ও প্রকাশিত হবে। ওদের বড় তাড়া। কারণ জন-সাধারণের যে রকম আগ্রহ তাতে ধীরে সুস্থে করলে চলবে না। ভদ্রমহিলা বাংলা জানেন তবে কথা বলতে আটকে যায় অনভ্যাস বশত ; তাছাড়া চলতি বাংলা ও 'সাধু' বাংলায় গোলমাল করে ফেলেন। তাই যেই শুনেছেন আমি এসেছি যা যা অসুবিধা আছে ব্যাগে পুরে নিয়ে এসেছেন। "আচ্ছা, 'লাল পাড়' তো জানি। 'লালপেড়ে' কি ? 'যা' মানে তো 'চ'লে যা', 'আমার মেজো যা' কী ?" এই রকম ছোটখাট অনেক দাগ ছিল পেনসিলে, চলতে চলতে তারই অর্থ ব্যাখ্যা হতে লাগল। অবশেষে "যে পেটেও খাবে না সেই পিঠেও সইবে" বিদেশীর পক্ষে এই দুর্বোধ্য উক্তিটিতে পৌঁছানো গেল। এর অর্থ বাংলা-দেশের বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন প্রযোজ্য তা বলতে বলতে বাকি সময়টা কেটে গেল। আমার অবশ্য কেবলই মনে হচ্ছিল, গল্প উপন্যাস প্রভৃতির চেয়ে শেষের দিককার কবিতা প্রবন্ধ যাতে তাঁর ধর্ম্মমত, বিশ্বতত্ত্ব, সাহিত্যবিচার প্রভৃতি রয়েছে, যে আলোচনা মানুষের জীবনের গভীরে প্রবেশ ক'রে তার দৃষ্টিকে সত্যের অনুসন্ধানী করে তুলতে পারে, সেগুলির অনুবাদ বেশি প্রয়োজন ; তা ছাড়া যতই এঁরা শিখে থাকুন একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে এমন আয়ত্ত করতে পেরেছেন কি না যাতে এ কাজের দায়িত্ব একলা নিতে পারেন। এমন একজন বাঙালী সাহিত্যিক যাঁর ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসে জ্ঞান আছে এবং যিনি রবীন্দ্রসাহিত্য সমনোযোগে অনুশীলন করেছেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু ওঁদের উৎসাহ দেখে বেশি কিছু বলতে পারলাম না। কবির কাছে শুনেছিলাম যে প্রথম যুদ্ধের সময় রাশিয়াতে বারে বারে 'রাজা' নাটকের অনুবাদ KING OF THE DARK CHAMBER অভিনয় হয়েছে। তাই বেশ বিজ্ঞের মতো শ্রীমতী নভিকভাকে বললাম, "তোমাদের তো আগেও অনেক অনুবাদ হয়েছে। তোমরা তো KING OF THE DARK CHAMBER যুদ্ধের সময় অভিনয় করেছ ?" "যুদ্ধের সময় !" বিস্মিত হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। তার পরই মনে পড়ল, "ও হাঁ হাঁ, সে তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, শুনেছি বটে।" কিন্তু সে সমস্তই ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা। এরকম পরের হাতে ওঁরা নিতে রাজি নয় তাই মূল বাংলা থেকে অনুবাদ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আমার অবশ্য একটু সন্দেহ রয়েই গেল যে অনুবাদ কতটা নিখুঁত হবে। কিন্তু সেদিন সেই বহু দূর দেশের প্রাসাদ-উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীমতী নভিকভার মধ্যে যে রবীন্দ্রভক্তি, তাঁকে জানবার ইচ্ছা, তাঁর কাব্যকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা ও উৎসাহ দেখেছিলাম, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। কোনো সমালোচনার কথা বলতে পারি নি।

মস্কোতে ফিরে একদিন একটা প্রকাণ্ড সভায় আমরা যে যার স্থানে বসবার আয়োজন করছি এমন সময় একজন ভদ্রমহিলা এসে অত্যন্ত ভাঙা ইংরাজী ও ফরাসী মিলিয়ে অন্য কোনো একটা নূতন ভাষা তৈরি করে কিছু বলতে লাগলেন। তখন কাছাকাছি দোভাষী কাউকে পাই না। শুধু তার একটি কথা, 'তাগোর' 'তাগোরে' বুঝতে পারলাম— সেই অতিপরিচিত শব্দটি শোনা মাত্র তার পিছন পিছন এসে ভিড়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধার সামনে পৌঁছলাম। তাঁর সঙ্গে একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে ছিল, সে সুন্দর বাংলায়

বললে, "ইনি স্টেট পাবলিশিং হাউসের ডিরেক্টর মারিয়া ভিটাসেভ্স্কায়া Maria Vitashevskya। আমরা ভারতীয় যে কখানি বই অনুবাদ করেছি তার এক সেট আপনাকে ও আপনার হাত দিয়ে বিশ্বভারতীকে পাঠাতে চাই। নৌকাডুবি, শকুন্তলা ও লোকসাহিত্যের কতকগুলি গল্প।" মারিয়া ইংরাজিও বলেন না বাংলাও বলেন না, ঐ বালিকার সাহায্যে কথাবার্তা বলা গেল। তাঁরা কবির সমগ্র রচনাবলীর জন্য অনুরোধ জানালেন। অনেকদিন থেকে তাঁরা চেষ্টা করছেন বই জোগাড় হচ্ছে না। শ্রীযুক্ত মেননকে বলায় তাঁর কাছে যা কিছু ইংরেজি অনুবাদ ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। "আমরা ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে কী করব, যে ভাষায় তিনি লিখেছেন আমরা নিজেরা পড়ে তাঁর কথা আমাদের ভাষায় তুলে নেব। আমাদের দেশ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। নব্বই হাজার কপি দু তিন দিনে বিক্রি হয়ে গেল। বেশির ভাগ লোকই পেল না। আমরা তাঁর ভক্ত।" আমি বললাম, "তোমরা এখানে একটা ভালো করে টাগোর সোসাইটি কর-না কেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যোগ থাকবে।" "বেশ তো বেশ তো"—খুব উৎসাহিত হলেন ভিটাসেভস্কায়া, "তোমাদের তো খুব বড় টাগোর সোসাইটি আছে?" একটু সামলে নিয়ে বললুম, "হাঁ, তা আছে বইকি।" "সেখানে তো লক্ষ লক্ষ মেম্বার, তিনিই প্রিয়তম কবি ভারতবর্ষের— সমস্ত প্রদেশে প্রদেশে নিশ্চয় তাঁর নামে বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে তাঁর কাব্য পড়া হয়, আলোচনা হয়?" এবারে কষ্টে আত্মসংবরণ করে ঐ প্রসঙ্গ ইতি করে দিলাম। ভদ্রমহিলা গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, "অসীম সৌভাগ্য তোমাদের, এমন মানুষ তোমাদের দেশে জন্মেছেন। তোমাদের ভাষা ছন্দ-সুরে ভরে দিয়েছেন, তোমাদের জীবনে প্রেরণা দিয়েছেন, তোমরা পরমসুন্দর সেই মানুষকে দেখেছ। যখন তিনি এদেশে এসেছিলেন আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। দয়া করে আমাকে একখানি ছবি দিয়ো। ভালো ছবি আমাদের নেই।"

সাধারণের অবগতির জন্য আমার এই অভিজ্ঞতা লিখলাম— লৌহযবনিকার অন্তরালে যখন রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙাগড়া চলছিল, যখন মানুষের ভাবনা-চিন্তা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নূতন পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল সেই দ্বন্দ্ব-আকীর্ণ দেশের মধ্যে থেকে তখনও মুছে যায় নি অল্প-একটু-দেখা আশ্চর্য মানুষের স্মৃতি। তাঁর বাক্য তাঁর কাব্য যে চিরন্তন মানবের বাণী বহন করছে— সব অবস্থায় সেই অমৃতপাত্রে দুর্গত ও ক্লিষ্ট মানুষের পথ্য আছে, সুস্থ চিত্তের আনন্দ আছে, আনন্দিতের মুক্তি আছে, জীবনের সত্য আছে। এরা বুদ্ধিমান জাতি এবং যথার্থই নিজেদের মঙ্গল চায় তাই দেশ কাল ও ভাষার দুস্তর ব্যবধান পার হয়ে তারই অনুসন্ধানে বেরিয়েছে।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

১৮ নবেম্বর ১৮৯৮ — ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৬

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিদেশে— প্যারিসে। ১৯২৪ সালে।

দেশে থাকতেই তাঁর নামের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় ছিল। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর সুনাম শুনেছি অনেকের মুখে। কিন্তু সাক্ষাৎ-পরিচয় হল বিদেশে। সেই পরিচয় অল্প দিনের মধ্যেই সখ্যে দাঁড়িয়ে গেল। শেষদিন পর্যন্ত সেই সখ্য নিবিড় ছিল।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমি প্রথম বিদেশ যাত্রা করি। ভারতের বাইরে যাওয়া সেই আমার প্রথম। বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকব, কার সঙ্গে কি ভাবে পরিচয় করব, সে-দেশের আচার-আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেব কি ভাবে— এই রকম নানা প্রশ্ন মনে জেগেছিল। আর, এইসব প্রশ্ন সঙ্গে নিয়েই আমি যাত্রা করি।

প্যারিসে পদার্পণ করেই আমার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা যেন হয়ে গেল। আমি সহায় পেয়ে গেলাম, বন্ধু পেয়ে গেলাম। ডক্টর বাগচীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। কিছুদিন আগে থেকে তিনি প্যারিসে ছিলেন।

ডক্টর বাগচী তখনও ডক্টর নন। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির অধীনে তখন তিনি গবেষক ছাত্র। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ, আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ। প্রায়-সমবয়সী একজন সুহৃদ্ পেয়ে বিদেশকে আর বিদেশ বলে মনে হল না।

ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস' অ্যাসোসিয়েশন নামে প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের একটা আড্ডা ছিল। ডক্টর বাগচী ছিলেন এর সেক্রেটারি। দেশে যেসব ছাত্র বিপ্লবী ব'লে মার্কামারা ছিল, সে-আমলের ব্রিটিশ সরকার যাদের সুনজরে দেখতেন না, এই অ্যাসোসিয়েশন ছিল তাদের আশ্রয়। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর শাখা ছিল, প্যারিসে ছিল প্রধান ঘাঁটি— 17 Rue du Sommerard ছিল তার ঠিকানা। এই বাড়িতে আমরা একত্রে থাকতাম। একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতাম। তাই, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি হয়ে গেল।

ডক্টর বাগচী প্রফেসর লেভির খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রফেসর ও মাদাম লেভি খুব স্নেহ করতেন ডক্টর বাগচীকে, বলতেন, "আমার ছেলে।"

ইণ্ডোলজি নিয়ে তাঁদের গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন চলত। আমরা দূর থেকে দেখতাম। কেননা, ওই বিষয় সম্বন্ধে আমার আগ্রহ থাকলেও জ্ঞান ছিল না। আমার বিষয় ছিল বিজ্ঞান— ফিজিক্স।

বিজ্ঞানই আমার সাবজেক্ট। বৈজ্ঞানিকদের উপর টান হওয়া তাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। যেসব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার আমার খুব আগ্রহ হল। কিন্তু হঠাৎ তো কারো কাছে গিয়ে হাজির হওয়া যায় না।

এই সময় ডক্টর বাগচীর সহায়তা আমি পাই। তিনি প্রফেসর লেভির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আমি মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখা করি। এর পর জার্মানীতে গিয়ে

আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়। অবশ্য আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার পত্রযোগে পরিচয় ছিল দেশে থাকতেই।

ডক্টর বাগচীর আগেই আমি দেশে ফিরে আসি। আমি আসার সময় আমার অনেকগুলি বই ফেলে এসেছিলাম, ডক্টর বাগচী সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।

দেশে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেক বার। যতই তাঁকে দেখেছি কাজে তাঁর নিষ্ঠা দেখে ততই মুগ্ধ হতে হয়েছে।

তার পর আমি ঢাকায় চলে যাই। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতাম তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হত। বৌদ্ধশাস্ত্র, ভারতের যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে আলাপে বুঝেছি, এসব বিষয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুবই নিবিড়। বিভিন্ন বই লিখে তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ যেসব জ্ঞান বিতরণ করে গিয়েছেন তার চিরস্থায়ী মূল্য আছে।

অতি সহজ কোমল ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। বিদেশে গিয়ে যেসব ছাত্র অসুবিধেয় পড়ত, তিনি তখন তাদের সহায় হয়ে এগিয়ে যেতেন। টাকা জোগাড় করে তাদের সাহায্য করতেন। ভারতীয় ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে যাতে জ্ঞানার্জন করতে পারে, তার জন্যে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। বিদেশে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে তিনি একটা ফণ্ড তৈরি করেছিলেন।

মনে পড়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির কথা। চীনদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহুকাল থেকে। মাঝে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে চীনদেশের এই আত্মীয়তার কথা তিনি বিস্মৃত তো হনই নি, বরঞ্চ সেই আত্মীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্যোগের পরিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম চীনা-সংস্কৃত অভিধান সম্পাদন করেন, এর দ্বারা তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

অনুলেখক শ্রীসুশীল রায়

২

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পরলোক-গমনে জ্ঞানবিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তথা সমগ্র জগতের পক্ষে যে ক্ষতি হইল, তাহা উপস্থিত কিছু কালের জন্য অনপনেয় রহিল, এবং ভবিষ্যৎ বহু বৎসর ধরিয়া তাহা দুরপনেয়ই থাকিবে। তিনি মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন, এবং যে কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনায় যাহা তিনি করিয়া উঠিবার সময় পাইলেন না তাহার বিচার করিলে আমাদের বলিতে হয় যে ইহা অকাল-মৃত্যুই হইয়াছে। পরিপূর্ণ এবং পরিণত মানসিক শক্তির অধিকারী আশী ও তদূর্ধ্ব বয়সের জ্ঞান-তপস্বী আমাদের দেশে বিরল নহেন; এবং এই হেতু আমাদের মনে এই অকাল-মৃত্যুর জন্য পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কথা এবং জাতির কথা ভাবিয়া নিরুপায় হাহাকার জাগিয়া উঠে। ইহার উপর এই অকাল-মৃত্যুর কারণ পরিবার-গত ও মিত্রগোষ্ঠী-গত অনপনেয় শোক তো আছেই।

বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে পণ্ডিত ও গবেষকের অভাব নাই, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পাণ্ডিত্যের বস্তু এবং প্রকাশ উভয় দিকেই একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। Indology বা প্রাচীন ভারত-বিদ্যা
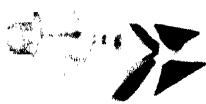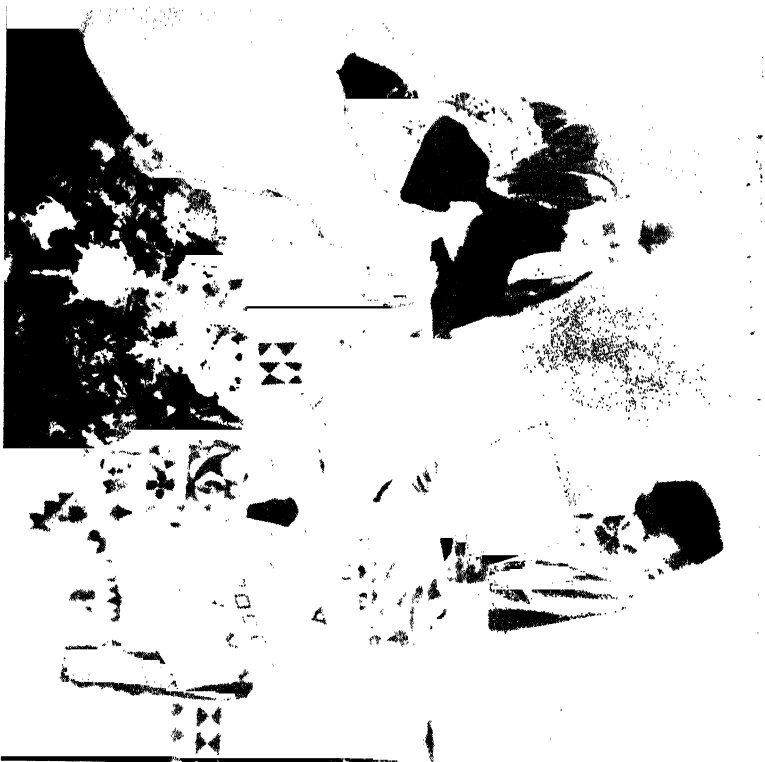
Prabodh Bagchi
Chakravarti
Sylvain Lévi
Nad. Stchoupak

আচার্য শ্রীজহরলাল নেহরু ও উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন-উৎসব । শান্তিনিকেতন ১৯৫৪
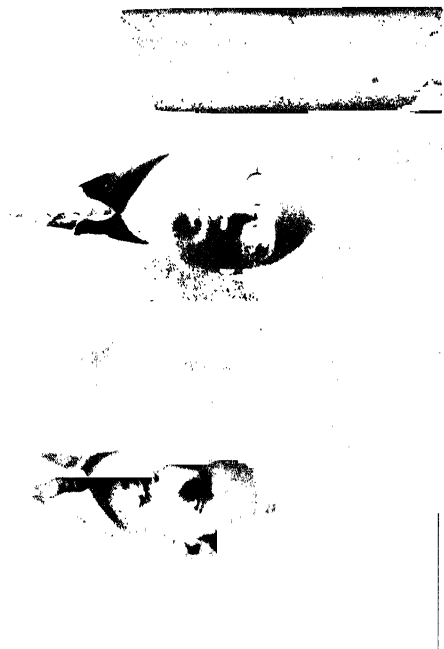
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রবোধচন্দ্র বাগচী
প্যারিস ১৯২৫

অবলম্বন করিয়া বহু ধুরন্ধর পণ্ডিত আমাদের দেশে ও অন্যত্র কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের নাম অনায়াসে করা যায়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র নিজের বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন সেটী অনন্যসাধারণ, সেটী হইতেছে ভারত ও চীনের সম্পর্ক। চীন-বিদ্যা ও ভারত-বিদ্যা, এই উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ ছিল প্রবোধচন্দ্রের বিদ্বত্তা। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরু ফরাসী আচার্য্য Sylvain Levi সিল্ভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং Paul Pelliot পোল পেলিও প্রভৃতি অন্য কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভাবশিষ্যও তিনি ছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারত ও চীন এই দুইটী বিরাট সভ্যতার সংযোগের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার কার্য্যে যে যোগ্যতা ও যে অধিকার অপেক্ষিত, তাহা সর্বজন-সুলভ নহে। একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সহিত এবং আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপেক্ষিত, অন্য দিকে তেমনি চীনা ভাষাতে কাজ-চালানো দখল থাকা দরকার; এবং চীনা লিখিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইহার দুরূহতার কথা চিন্তা করিলে, এই কাজ-চালানো দখল, অর্থাৎ কম-পক্ষে আড়াই-তিন হাজার বিভিন্ন character বা অক্ষরের সহিত পরিচয়, সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। এতদ্ভিন্ন, ইংরেজী ছাড়া উপরন্তু অন্ততঃ পক্ষে ফরাসী ও জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য্য। তদুপরি সমগ্র এশিয়া-খণ্ডের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও ভাল করিয়া জানা দরকার। চীনার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ জাপানী ভাষার জ্ঞানও কখনও-কখনও অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তিব্বতীর সহিত, বিশেষ করিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার জন্য, পরিচয়ও আবশ্যক হয়। এবং এই-সমস্ত ভাষা-বিষয়ক বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, অবান্তর বিষয় বর্জন করিয়া মুখ্য বিষয় ধরিয়া লইবার শক্তি, সংস্কৃতি-পূত মনোভাব এবং সব কথা নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়া সহজ ও সার্থক ভাবে তাহা অপরকে বুঝাইতে পারিবার মত প্রাঞ্জল লিখন-শৈলী, এগুলিও থাকা চাই।

ভারত ও চীনের সংযোগ সম্বন্ধে ও এশিয়া-খণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আলোকপাত করিবার কার্য্যে এই সমস্ত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রবোধচন্দ্রের অধ্যাপনা ও গবেষণা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম চীনবিদ্যাবিৎ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, দুইজন ভারতীয় পণ্ডিত প্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র লইয়া চীনদেশে হান্-বংশীয় সম্রাটের রাজধানী লো-য়াঙ্-এ উপনীত হন, ইহাঁদের নাম হইতেছে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ। চীনদেশে পহুঁছিয়াই ইহাঁরা ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে চীন ভাষায় অনুবাদ করিতে আত্মনিয়োজিত হইলেন। এই ভাবে ইহাঁরা ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত করিলেন, তাহা ১২০০।১৩০০ বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রহিল। ইহাঁদের প্রবর্তিত ধারা বা পরম্পরার মধ্যে আসিলেন, একদিকে বহু বহু ভারতীয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী, যাঁহারা চীনদেশে গিয়া চীনা ভাষা আয়ত্ত করিলেন এবং চীনা পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধশাস্ত্র ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করিলেন, ক্বচিৎ বা নূতন গ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চীনদেশেই রহিয়া যান, এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন। অন্যদিকে তেমনি বহু চীনা জিজ্ঞাসু এই ধারার মধ্যে দেখা দিলেন, বুদ্ধ-বচন সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিবার আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা ভয়াবহ বিপৎসমূহকে উপেক্ষা করিয়া ভারতে আসিয়া ভারতীয়

ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিবার ও চীনা ভাষায় অনুবাদ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং মাতৃভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র সহজ-লভ্য করিবার কার্য্য জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিলেন, ও তাঁহাদের ভারতীয় গুরু ও অগ্রগামীদের মত এই কাজে জীবনপাত করিলেন। কুচা-নগরীর কুমারজীব, দক্ষিণ ভারতের বোধিধর্ম, চীনদেশের ফা-হিয়েন, হিউএন-থ্‌সাঙ্‌ ও ঈ-ত্‌সিঙ—ইহাঁদের নাম এই সম্পর্কে প্রথম করিতে হয়। কালক্রমে ভারতবর্ষ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইল, ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, ভারতের সঙ্গে চীনের সাক্ষাৎ যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। পণ্ডিতের আদান-প্রদান কয়েক শতক ধরিয়া প্রায় বন্ধই রহিল। চীনের সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ নির্বাপিত হইল, চীনদেশেও সংস্কৃত-চর্চা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে তবুও চীনদেশে ভারতের সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত রহিল। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয় পণ্ডিতের চীন-ভাষায় বিদ্বত্তার কাহিনীর স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

পুনরায় ইউরোপের পণ্ডিতদের চেষ্টায় চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনাকে আশ্রয় করিয়া ভারত ও চীনের এই প্রাচীন সংযোগের কথা আবার জনসমক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল। ইউরোপীয় চীন সংস্কৃতিবিৎ পণ্ডিতেরা চীনা গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন, ফরাসী, জর্মান, ইংরেজীতে; আমাদের দেশেও ক্রমে চীন ও ভারতের পুরাতন কল্যাণ-মিত্রতার কথা আসিয়া পহুঁছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের আধারে আমাদের দেশের জিজ্ঞাসুদের মধ্যে এই চীন-ভারত-সংবাদ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, এবং চীনা ভাষার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য কিছু পরিমাণ আগ্রহও দেখা দিল। আধুনিক ভারতে চীনা ভাষার চর্চার আবশ্যকতার কথা আমাদের শিক্ষা—নেতাদের কাহারও-কাহারও মনে জাগরিত হইল। চীনা ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে দুই কারণে; এক—প্রাচীন ভারতকে আরও ভাল করিয়া বুঝিবার সাধন হিসাবে; এবং দুই—প্রতিবেশী সুপ্রাচীন সুসভ্য চীনকেও বুঝিবার জন্য।

এ যুগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে প্রথম চীনা ভাষার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে— বোধহয় ১৯১৭ সালে তিনি চীন হইতে প্রত্যাগত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই চীনা ভাষা পাঠের জন্য আমি অন্যতম ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ক্লাস বেশী দিন চলে নাই— ছাত্রের অভাবে। ইহার পূর্বে, ১৯১৫র পূর্বে, বিখ্যাত নানাভাষাবিৎ হরিনাথ দে নিজ গৃহে চীনা ভাষার শিক্ষক রাখিয়া চীনার চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনিয়াছিলাম। মির্জাপুর ও পাটনার ব্যারিস্টার, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ জায়সবাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে অবস্থানকালে চীনা-ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া এক বৎসরের জন্য একটী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তিনি কিন্তু আর অগ্রসর হন নাই। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি চীনাভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি পারিস হইতে বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক রূপে আগমন করিলেন, এবং তাঁহার বিশ্বভারতীতে অবস্থান ভারতে চীনা ভাষার চর্চার পক্ষে বিশেষ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আনিয়া দিল। চীনা ও তিব্বতী উভয় ভাষার শিক্ষা আরম্ভ হইল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উৎসাহের সঙ্গে এই দুই ভাষা অধ্যয়নে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মীদের কেহ কেহও যোগদান করিলেন।

অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভির শুভাগমনে চীনাভাষার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা কার্য্যকর হইল প্রবোধচন্দ্রের জীবনে। ইহার স্থায়ী ফল ইহাই হইল যে, এই যুগে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, ভারতবর্ষ প্রবোধচন্দ্রকে পাইয়া বিশ্বের চীনবিৎ পণ্ডিতদের সভায় নিজ গৌরবের আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। এ যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চীনবিৎ রূপে প্রবোধচন্দ্র প্রকাশিত হইলেন। এবং কেবল তাহাই নহে। বিশেষ মূল্যবান গবেষণার দ্বারা তিনি ভারতের পক্ষে এই নূতন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একটী অনপেক্ষিত দিকে আধুনিক ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের জীবন সাধারণ বিজ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োজিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতের জীবন, ইহাতে ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, চীনে ও জাপানে ভ্রমণ ব্যতীত লক্ষণীয় বা চমকপ্রদ ঘটনা বা কার্য্যাবলী আর কিছুই নাই। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র যশোহর জেলার শ্রীকোল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান ছিল খুলনা জেলায়। যথারীতি স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯১৮ সালে ইনি বি-এ পাস করেন, এবং ১৯২০ সালে "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ অধীত বিদ্যায় লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। বৌদ্ধ ধর্ম ও চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৯২১ সালে স্যর আশুতোষ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, এবং এই রূপে বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মেধাবী পরিশ্রমী এবং নীরব-কর্মী শিষ্যকে পাইয়া অধ্যাপক লেভির মত পণ্ডিত বিশেষ প্রীত হন, এবং নিজ মানসিক ও চারিত্রিক গুণে ও চরিত্র-মাধুর্য্যে লেভি-দম্পতীর নিকট প্রবোধচন্দ্র পুত্রবৎ স্নেহ ও অনুকম্পা লাভ করেন। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে যতগুলি ভারতীয় ছাত্রের পরিচয় হইয়াছিল, ছাত্রবৎসল লেভির কাছে সকলেই প্রিয় ছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্র ইহাঁদের সকলের চেয়ে লেভির প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন। প্রবোধের সহিত সাক্ষাৎ আচরণে ও প্রবোধ সম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখে আচার্য্য লেভির এই প্রগাঢ় স্নেহের বহু নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি। ওদিকে প্রবোধেরও গুরুর প্রতি অচলা গুরুভক্তি ছিল। ইহাদের গুরুশিষ্য-সম্পর্ক যেন আমাদের দেশেরই মত হইয়াছিল।

অধ্যাপক লেভির আগ্রহে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার সহিত ইন্দোচীনে ও জাপানে যান। কাম্বোডিয়া বা কম্বুজদেশ, আনাম বা ভিয়েৎনাম, এবং কোচিন-চীন বা প্রাচীন চম্পারাজ্য ঘুরিয়া আসিবার সুযোগ তাঁহার হয়। গুরুর নিকট এশিয়ার ইতিহাস ও চীনা ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে একান্ত ভাবে উপদেশ পাইবার সুযোগ এই ভ্রমণের সময়ে তাঁহার হইয়াছিল। "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে এইভাবে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর-প্রাচ্য ভ্রমণের পরে, প্রবোধচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসেন, এবং অল্পকাল পরেই তিনি বৃত্তি লাভ করিয়া পারিসে উপস্থিত হন ও সেখানে ধারাবাহিক ভাবে গভীর নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপক লেভি ও অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছে ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত ভোট ও চীন ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ও অধীত বিদ্যায় গবেষণা করেন। ইহার এই গবেষণার ফলস্বরূপ ফরাসী ভাষায় তিনখণ্ডে তিনি Le Canon Bouddhique en Chine অর্থাৎ "চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র" নামে অতি মূল্যবান গ্রন্থ, ও Deux Lexiques Sanscrit-Chinois অর্থাৎ "দুইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান" নামে দুই খণ্ডে এক অভিনব গ্রন্থ, পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পেশ করেন, এবং এই দুই বইয়ের জন্য

পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সুকুমার-সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ভাষাবিদ্যা ইত্যাদির জন্য সর্বোচ্চ সম্মান Docteur-ès-Letters (D.-ès-L.) দক্তোর-এ-লেত্র্ অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ফরাসী নাগরিক হইলে এই উপাধির সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী চাকরী বাঁধা থাকে। প্রবোধচন্দ্রের পূর্বে কেবল একজন ভারতীয় এই উপাধি অর্জন করিতে সমর্থ হন, তিনি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া ইনি কাজ করেন; এবং প্রবোধচন্দ্রের পরে মাত্র আর একজন ভারতীয় এই মর্য্যাদার যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন— আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ তারাপ্রসাদ দাশ; ইনি ফরাসী সাহিত্যে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিষয়ে ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করেন।

এইরূপে বিদেশে নিজ পাণ্ডিত্যের জন্য জয়মাল্য অর্জন করিয়া প্রবোধচন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যা— ইতিহাস ও সংস্কৃতি— বিভাগে অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যে তাঁহার মুখ্য কৃতি ফরাসী ভাষায় লিখিত এই দুই বই Sino-Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশিত হয়, এবং এই দুই বইয়ের দ্বারায় সমগ্র জগতে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রের প্রশংসা ধ্বনিত হয়। চীনা ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থের সূচী বহুপূর্বে জাপানী পণ্ডিত Bunyu Nanjyo বুন্যু নান্জ্যো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করেন। এই সূচী বহুবৎসর ধরিয়া চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার জন্য অন্যতম মুখ্য সাধন-রূপে সমাদৃত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। নান্জ্যো চীনা অনুবাদগ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত নাম ধরিয়া দেওয়াতেই এই বইয়ের ছিল প্রধান উপযোগিতা। (ফরাসী পণ্ডিত P. Cordier কর্দিয়ে অনুরূপ ভাবে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভোট বা তিব্বতী অনুবাদের সূচী প্রকাশিত করিয়া ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্মের চর্চার পথ সুগম করিয়া দেন।) প্রবোধচন্দ্রের মুখ্য কৃতিত্ব এখানে, যে এই সমগ্র চীনা অনুবাদরাশির একটী ইতিহাস প্রদর্শন করেন, এবং চীনা ও ভারতীয় অনুবাদকগণের কালনির্দেশ ও অনূদিত গ্রন্থের আলোচনা করিয়া প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী একটী সমগ্র অনুবাদ-সাহিত্যের ইতিহাস কৌতূহলী পাঠক সমাজের সমক্ষে ধরিয়া দেন। চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ তো ভারতে আসিয়া সংস্কৃতচর্চা করিতেনই, তাহা ছাড়া চীনদেশেও সংস্কৃত অধ্যয়নের ও সংস্কৃত লেখ ইত্যাদি লিখনের রীতি ছিল। চীনাদের সংস্কৃত শিখাইবার জন্য চীনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ছোটখাট সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল অভিধানে প্রথম দেওয়া হইত চীনা শব্দ, ও তন্নিম্নে সেই শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ। সংস্কৃত শব্দের ভারতীয় লিপির অক্ষরগুলি চীনা লিপির অনুকরণে উপর হইতে নীচে লেখা হইত, ও পাশে-পাশে চীনা অক্ষরে ভারতীয় বর্ণের উচ্চারণ দেওয়া হইত। এইরূপ চীনা-সংস্কৃত অভিধান হস্তলিখিত ও মুদ্রিত অবস্থায় চীন ও জাপান দুই দেশেই পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে জাপানে মুদ্রিত এইরূপ দুইখানি অভিধান প্রবোধচন্দ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়া ও ফরাসী ভাষায় টীকা-টিপ্পনী দিয়া প্রকাশিত করেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার তথা প্রাচীন চীনা উচ্চারণের অনুশীলনে এইরূপ অভিধানের মূল্য ইঁহার ভূমিকায় ও টীকায় সুন্দরভাবে প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক প্রদর্শিত হয়। চীন ও ভারতের সভ্যতার মিলনের ইতিহাসে এইভাবে প্রবোধচন্দ্র তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই সার্থক গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেন।

১৯২৬ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ১৯ বৎসর ধরিয়া প্রবোধচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা বালিগঞ্জ প্লেসে তাঁহার বসত-বাটী তিনি প্রস্তুত করেন। এই

দীর্ঘকাল প্রবোধচন্দ্রের সহকর্মী-রূপে একত্র কার্য্য করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে অন্যত্র নানা স্থানে, প্রবোধচন্দ্রের নিজগৃহে, আমার গৃহে ও মিত্রবর্গের গৃহে, নানা সূত্রে প্রবোধের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি। পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল, উপরন্তু মানুষ প্রবোধচন্দ্রকে ভাল না বাসিয়া পারি নাই। মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী বহু বিষয়ে আমাদের একই ধরণের ছিল, উভয়েই এক হিসাবে সমানধর্মা ছিলাম। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ যোগ্যতা ছিল। জীবনের ও জীবনবাহ্য গভীরতম নানা বিষয়েও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। এরূপ নিরহঙ্কার অমায়িক সদাপ্রফুল্ল মানুষ দুর্লভ ছিল। পাণ্ডিত্য ইঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া বা চাপিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। সারল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধের চরিত্রে একটা সহজ স্বাধীনতা ছিল, যে জন্য তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী থাকিতে পারেন নাই। নিজের কোনও সুবিধার জন্য ক্ষমতাশালী লোকের কাছে "দরবার" করা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একেবারেই ছিল না। এইজন্য অনেক সময়ে তাঁহার গুণ না বুঝিয়া লোকে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছে, প্রবোধচন্দ্র সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। আমাদের মনে হয়, প্রবোধচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মূল্য কলিকাতায় আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে বা ধরিতে পারি নাই। নির্বিবাদে একাগ্রমনে ও নিজ স্বাভাবিক নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইবার অবকাশ পাইবার আশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া দিয়া ১৯৪৫ সালে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন বা গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন।

কতকগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীতে প্রবোধচন্দ্র অনেকটা আশানুরূপ কার্য্য করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন ও চীনাভবন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন; এবং বিদ্যাভবনের নানা বিভাগে উৎসাহের সহিত গবেষণার কার্য্য চলিতে লাগিল। নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন কতকগুলি গবেষক দেখা দিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা চাহিয়াছিলেন, বিশ্বভারতী ভারতের অন্যতম প্রধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, তিব্বতী, চীনা, অবেস্তা, প্রাচীন পারসীক, ফারসী, উড়িয়া, প্রভৃতি ভাষায় মূল্যবান পুস্তক ও প্রবন্ধ বিশ্বভারতীর মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া এই রূপে ভারত-বাণীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

১৯৪৭ সালে ভারত সরকার চীন দেশে গিয়া চীনা ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষার জন্য পাঁচজন ছাত্র পাঠান, তন্মধ্যে বিশ্বভারতী হইতে দুইজন ছিলেন, এবং ইঁহারা সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রকে ভারত সরকার হইতে ভারত-বিদ্যার অধ্যাপক রূপে পেকিঙ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসরের জন্য পাঠানো হয়। এইরূপে চীনদেশে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া প্রবোধচন্দ্র চীনা ভাষায় ও ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে আরও প্রাবীণ্য অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯৪৯ সালে চীন দেশে মাও-ৎসে-তুঙ-এর অধীনে কমিউনিস্ট-তন্ত্র স্থাপিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে, ভারত সরকার চীন-দেশে অরাজকতার আশঙ্কায় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রকে ও ভারতীয় ছাত্রকয়জনকে ডাকিয়া পাঠান। ইহার পরে তাঁহাকে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটী সংস্কৃতি-অনুশীলক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আর একবার কয় সপ্তাহের জন্য চীনদেশে যাইতে হইয়াছিল।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার ইতিমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরু এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম উপাচার্য্য হইলেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

তৎপরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, এবং ১৯৫৪ সালে প্রবোধচন্দ্র এই গুরুভার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য নির্বাচিত হইলেন। প্রবোধচন্দ্র অনন্যকর্মা হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার কর্তব্যপালনে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার পদের প্রাপ্য বেতন ১৫০০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা কম লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবর্ধনের ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি চেষ্টিত হইলেন, এবং বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

প্রবোধচন্দ্রের পারিবারিক জীবন সুখের ও শান্তির ছিল। কিন্তু মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বিধাতার বিধানে তাঁহাকে নিদারুণ শোক পাইতে হইয়াছিল, এবং এই শোক হইতেছে ১৬ বৎসর বয়সের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু। এই শোক, ও তৎসঙ্গে দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও বিশ্বভারতীর কাজে অত্যধিক পরিশ্রম, ইহাই তাঁহার অকালে পরলোক গমনের প্রধান কারণ হইয়াছিল। ১৯২১ সালে প্রবোধচন্দ্র পাবনা জেলায় বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী পান্না দেবী তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের পরপর তিনটি কন্যার পরে ১৯৩৮ সালে একমাত্র পুত্র প্রতীপ জন্মগ্রহণ করে। কন্যা তিনটীর মধ্যে প্রবোধচন্দ্র দুইটীর বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় কন্যাটী ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্রের পরে প্রবোধ-চন্দ্রের আরও দুইটী কন্যা জন্মে। পুত্র উত্তরকালে পিতার মত পণ্ডিত হইবে এইরূপ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়স হইতেই বালক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়। নানা প্রকারের চিকিৎসায় বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে ১৯৫৫ সালে কলিকাতায় মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে এই চরম শোক বাগচী-দম্পতীকে সহ্য করিতে হইল। কাজের মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রবোধচন্দ্র আত্মসমাহিত হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এইসব কারণে ও হৃদ্রোগের ফলে ১৯শে জানুয়ারি প্রাতে তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইল, বঙ্গ-ভারতী ও বিশ্ব-ভারতী এক কৃতী সন্তানকে হারাইল।

প্রবোধচন্দ্রের পুস্তক ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার সম্পাদিত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত বিশ্বভারতীর গবেষণাময় গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রধান কীর্তিস্তম্ভরূপে বিরাজ করিবে। চীনদেশে বৌদ্ধশাস্ত্র ও চীনা-সংস্কৃত অভিধানের কথা বলিয়াছি। ভারতে আর্য্যদের আসিবার পূর্বে যে অনার্য্য সভ্যতা— কোল বা নিষাদ এবং দ্রাবিড় সভ্যতা— ভারতীয় সভ্যতার আধার স্বরূপ ছিল, ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে সে বিষয়ে তিনজন ফরাসী পণ্ডিত Jean Przyluski ঝাঁ প্‌শিলুস্কি, Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক্ ও প্রবোধচন্দ্রের গুরু আচার্য্য Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান্ প্রবন্ধ বিভিন্ন ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এগুলির প্রচার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। প্রবোধচন্দ্র এগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন, ও ভারতে ও এশিয়া-খণ্ডে Austric ও Austro-Asiatic (নিষাদ) ভাষাগোষ্ঠির স্থান নির্ধারণ করিয়া একটী গবেষণাত্মক প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ও ফরাসী পণ্ডিতগণের প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে দুইটী নূতন প্রবন্ধে আরও কিছু কার্য্য স্বয়ং করিয়া, এবং তদ্বিষয়ে আমার রচিত একটী প্রবন্ধ লইয়া, ফরাসী হইতে অনূদিত প্রবন্ধগুলির সহিত এই চারিটী নূতন প্রবন্ধ জুড়িয়া দিয়া ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India নাম দিয়া একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক প্রকৃতি বা আধার যে মিশ্র, আর্য্যানার্য্য, তৎসম্বন্ধে বোধ বা বিচার জাগরিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বই (ফরাসী প্রবন্ধের সংগ্রহ, ও

নূতন প্রবন্ধ কয়টী) অনেকটা কার্য্যকর হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের ১৯৪৩ সালের অধিবেশনে শাখা-সভার সভাপতি হিসাবে প্রবোধচন্দ্রের একটী মূল্যবান্ লেখ প্রকাশিত হয়—The Role of the Central Asian Nomads in the History of India অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে মধ্য-এশিয়ার যাযাবর জাতির কার্য্য। এই প্রবন্ধটী ভারতের ইতিহাসের একটী জটিল অধ্যায়ের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য নূতন তথ্য ও তদপেক্ষা মূল্যবান্ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করে। মধ্য-এশিয়ার স্থগ্‌দ বা সোগ্‌দীয় জাতির ভাষার আধারে গঠিত একপ্রকার প্রাকৃত ভাষাই যে ভারতে "চূলিক-পৈশাচী" নামে অভিহিত হয়, তাহা প্রবোধচন্দ্র দেখাইয়া দেন। মহারাজ অশোকের অনুশাসন অনুশীলন করিয়া প্রবোধ-চন্দ্র এই অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্তে পহুঁছান যে হীনযান মতের বৌদ্ধধর্ম, পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র যাহার বাহন এবং যাহা সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও কম্বোজে এবং চট্টলে প্রচলিত তাহাই মূল বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানের মুখ্য প্রাতিপন্ত বোধিসত্ত্ববাদও বহু প্রাচীন, এবং অশোকের শিলালেখে মহাযান-মতের অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্বোজদেশের প্রাচীন সংস্কৃত শিলালেখে উল্লিখিত কয়েকখানি সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থের পরিচয় নেপালে প্রাপ্ত পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রবোধচন্দ্র তাঁহার আর একটী মূল্যবান প্রবন্ধে ভারত ও বহির্ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যোগের একাংশে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের আলোচনায়, চর্য্যাপদগুলির তিব্বতী অনুবাদ বিচার করিয়া চর্য্যাপদের পাঠনির্ণয়ের জন্য প্রবোধচন্দ্র অমূল্য উপাদান আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য্য সরহের কাল-নির্ণয়ও তাঁহার এক সার্থক গবেষণা। এদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত দোহা ও অন্য কবিতার সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে তাঁহার কৃতিত্বের মধ্যে ধরিতে হয়।

প্রবোধচন্দ্র নিছক গবেষক ছিলেন না, সাহিত্য ও কলারসিকও ছিলেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফরাসী লিখিতে পারিতেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, চীনের ও ভারতের সংযোগ সম্বন্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রচারের সম্বন্ধে তাঁহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা বইগুলি সহজবোধ্য ভাবে এই-সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, ভারতে ইতিহাসের জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতি প্রচারের সহায়ক হইয়াছে। তাঁহার বহু প্রবন্ধের কথাও এখানে বলা যাইতে পারে।

প্রবোধচন্দ্র অন্যায়ের জন্য কখনও-কখনও উষ্মা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষভাব কখনও আনয়ন করে নাই। প্রবল কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে ছিল, তাঁহার সারল্যে ও ব্যবহার-মাধুর্য্যে সকলেই তাঁহার অনুরাগী আপন জন হইয়া পড়িত। প্রবোধের তিরোধানে আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্মরণ করিয়া মনে-মনে তাঁহার প্রতি অনুজের মত স্নেহ করিয়া আসিয়াছি, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অগ্রজের উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিয়াছি।

ভারতের নিকট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে, দর্শন পাইয়াছে, ভাস্কর্য্য চিত্রণ নৃত্য নাট্য প্রভৃতি নানা শিল্পকলা পাইয়াছে। ভারতের ভাণ্ডারে যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল তাহারও অংশী হইয়াছে। ফান্-শূ বা ভারতীয় লিপিবিদ্যা চীনের মনে তাহার ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা আনিয়া দিয়াছে। এ-সব কথা ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌গণ আমাদের জানাইয়াছেন, আমরা তজ্জন্য নূতন ভাবের গর্বসুখ অনুভব করিয়া থাকি। চীনারাও এসব কথা মানিয়া আসিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের প্রতি এজন্য এতাবৎ তাঁহাদের শ্রদ্ধাও

ছিল অসীম। কিন্তু আমরা কি শুধুই দিয়াছি? চীনের মত অতবড় সুসভ্য জাতির কাছ থেকে ভারত কি কিছুই লয় নাই? যদি ভারত কিছুই গ্রহণ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভারতেরই মানসিক দৈন্য প্রমাণিত হইবে—কারণ পরস্পর আদান-প্রদানের উপরেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রগতি সম্ভবপর হয়। সুখের বিষয়, আমরাও চীনের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী— এবং এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধে আমি আমাদের সংস্কৃতির কতকগুলি দিকের উল্লেখ করি, যেখানে চীনা প্রভাব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভ্রমণকালে চীনদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি। গবেষণার সামগ্রী চীনদেশে-সংগৃহীত হইয়া আছে; চীনাদের ইতিহাস-বোধ অসাধারণ, আমাদের সংস্কৃতির মত তাহাদের সংস্কৃতি ইতিহাস-বিষয়ে উদাসীন নহে। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বহুবার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারও ধারণা, ভারতের সংস্কৃতিতে চীনের ছাপ আছে—ভারত ও চীনের মধ্যে, কেবল ভৌতিক বস্তু লইয়া নহে, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, কলার ক্ষেত্রেও লেন-দেন উভয়ই হইয়া গিয়াছে। প্রবোধচন্দ্রের ধারণা ছিল, চীনা ঋষি লাউ-ৎসের আলোচিত তাও-বাদ বা ঋত-বাদ অথবা নিগুর্ণ-সগুণ-ব্রহ্মবাদ, পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হইয়া অন্যরূপ গ্রহণ করে, এবং আমাদের তান্ত্রিক বামাচার ও অন্য গুহ্য সাধনার মধ্যে এই অর্বাচীন তাও-বাদের প্রভাব নাকি সুস্পষ্ট। মূল চীনা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহার সিদ্ধান্ত এই সম্বন্ধে যাহাতে তিনি প্রকাশ করেন সে বিষয়ে তাঁহার ও আমার উভয়েরই আগ্রহ ছিল। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে চীনা ভাষার প্রভাব স্বরূপ কতকগুলি শব্দের অবস্থান দেখা যায়। সে বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র ও আমি উভয়েই আলোচনা করিতাম। আমার ন্যায় তিনিও মনে করিতেন, খোঁজ করিলে বেশ লক্ষণীয় একটী চীনা উপাদান প্রাচীন ভারতের ভাষায় মিলিবে। চীনা-সংস্কৃত অভিধানগুলি হইতে অন্ততঃ এইরূপ একটি চীনা শব্দ খ্রীষ্টীয় ৭।৮ শতকের প্রচলিত সংস্কৃতে তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের আন্তর্জাতিক মানসিক সহযোগিতার ইতিহাসে এ সমস্ত অতি মূল্যবান তথ্য। এ কাজ তিনিই ভাল মতে করিতে পারিবেন যিনি চীনা ও সংস্কৃত-প্রাকৃত এবং অন্য ভাষা জানেন, ও যাঁহার ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ আছে। প্রবোধের তিরোধানে এরূপ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কই? অবশ্য শ্রীমান্ বসন্ত বাসুদেব পরাঞ্জপে, শ্রীমান্ সতীরঞ্জন সেন প্রমুখ কতকগুলি তরুণতর ভারতীয় চীনবিৎ পণ্ডিত আছেন, ইহাঁরাই এখন আমাদের একমাত্র আশাস্থল।

বঙ্গদেশ তথা ভারতের দুর্ভাগ্য যে আমরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চারিজন বিশিষ্ট বিদ্বান্ মনীষী চিন্তানেতাকে হারাইলাম, যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব পাণ্ডিত্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাঁরা হইতেছেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হরিদাস ভট্টাচার্য্য (মৃত্যু, প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুর পরের দিন, ২০শে জানুয়ারি ১৯৫৬), মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬), এবং বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)। নিজ-নিজ ক্ষেত্রে ইহাঁরা আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। প্রাচীন-ভারত-বিদ্যা ও চীন-বিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান ও ব্যবহার-শাস্ত্র—এতগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে আলোক নির্বাপিত হইল। তবে তাঁহারা যাহা রাখিয়া গেলেন তাহার জ্যোতি কখনও ম্লান হইবে না।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩

প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় বোধ করি ১৯১৯-এর আগে। পরলোকগত হেমন্তকুমার সরকার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে একখানি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গেই হোক বা কলেজ স্ট্রীটের মেসেই হোক, প্রবোধবাবুকে দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা হয় আমি যখন রংপুর কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি তখন থেকে। প্রবোধবাবু শান্ত অধ্যয়নশীল পণ্ডিত; সিলভাঁ লেভির ছাত্র; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি তাঁর বিশেষভাবে অধ্যয়নের বস্তু ছিল। কেমন করে জানি না, আমাদের অর্ধেক মন রাজনীতিতে ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম। তিনি অধ্যয়নশীল হলেও, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তাঁর মনোযোগ আবদ্ধ থাকলেও বর্তমান অবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ছিলেন। কলকাতার যে পল্লীতে তিনি বাড়ি তৈরি করেন সেই পল্লীর কল্যাণকর্মে তিনি সর্বদা উৎসাহী ছিলেন। এবং সে কর্মে সময় ও অর্থদান করতে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তাঁর সঙ্গে দু বার আমার একত্র ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল, প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর আগের কথা। প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমরা উভয়েই গিয়েছিলাম বরোদায় একবার, ও মহীশূরে একবার। বরোদা সম্মেলনের পর একসঙ্গেই ছিলাম আমার এক পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে আমেদাবাদে, এবং অতদূর গিয়ে কাঠিওয়াড়ের খানিকটা না দেখে ফিরব না মনে করে ভাবনগর, পলিতানা, ভালা ও রাজকোট হয়ে দ্বারকা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। তাঁর মত ইতিহাসে পণ্ডিতের সঙ্গে থাকায় আমার তো খুবই সুবিধা হয়েছিল। আমরা ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, জায়গা ধর্মশালাতেই খুঁজে নিতাম, হয়তো তার মধ্যে কোথাও কিছু সুবিধা হয়ে যেত। প্রবোধবাবু কখনো অভিযোগ করতেন না, যা জুটত তাইতেই খুশি থাকতেন। শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে ওঠবার ও নামবার সময় ধূমপান নিষেধ, মনে পড়ে শুধু এইটেতেই তাঁর তখন একমাত্র অসুবিধা হয়েছিল। তেমনি মহীশূরে যখন যাই, তখনও সম্মেলনের শেষে দুজনে বেলুড় ও হালেবিড়ে প্রাচীন কীর্তি ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখে যাই শৃঙ্গেরী মঠে— সেখানে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের মঠ দেখে কলকাতায় ফিরি— বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, বেশি দিন ছুটি নেওয়ার ভরসা করতে পারিনি।

ব্যক্তিগত কথা একটা বলি। ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ের আবেস্তার গাথা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা আমি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ পূর্বে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে ছাপিয়েছিলাম, পরে তা একত্র পুস্তিকা হিসাবেও প্রকাশিত হয়। পরে শুনেছিলাম, বোম্বাইয়ের কোনো কাগজে সেই পুস্তিকার তথ্য ও ভাষার দিক দিয়ে খুব এক প্রতিকূল সমালোচনা বেরিয়েছিল। প্রবোধবাবু তার যুক্তি খণ্ডন করে ঐ কাগজেই এক প্রবন্ধ লেখেন। তার কিছুকাল পরে আমাকে সেটা দেখান। তাঁর যুক্তির স্পষ্টতা ও আক্রমণের তীক্ষ্ণতা ছিল যথেষ্ট। এমনি ধারা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে যখন তাঁর প্রতিকূল সমালোচকেরা তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আক্রমণ করেন তখন প্রবোধবাবুর প্রবন্ধে যুক্তিতে ও বিদ্রূপে তাঁরা নীরব হন। আন্তর্জাতিক পি. ই. এন.- এর ব্যাপারেও তাঁর আদর্শনিষ্ঠা সংগঠনপটুতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় পি. ই. এন. -এর যুগ্মসম্পাদক, আমিও তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, কালিদাস নাগ মহাশয়ের পরে। যখন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া পি. ই. এন. বঙ্গীয় পি. ই. এন. -কে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন তখন যে গোলযোগের সৃষ্টি হয় তা মেটাবার জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী

নাইডু পর্যন্ত কলকাতায় আসেন। বঙ্গীয় পি. ই. এন. -এর মুখপাত্র শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের যুক্তির বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার থাকল না। কিন্তু বঙ্গীয় পি. ই. এন. সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

প্রবোধবাবুর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবার কথা সাধারণত লোকের মনে না-ও উঠতে পারে। তাঁর বিস্তর মূল্যবান প্রবন্ধ ও পুস্তক নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ভাষা ছিল তাঁর স্বচ্ছ ও সাবলীল, চিন্তা ছিল পরিচ্ছন্ন। সে কথা ছেড়ে দিলেও 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর প্রথম যুগে মিলনভূমি ছিল তাঁরই বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে নিয়মমত একদিন সকলে সেখানে আসতেন, কারও কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার থাকলে করতেন, এবং পরস্পরের 'পরিচয়' হত। পরিচয়ের বৈঠকে দেখা যেত, তিনি সংগীতের সমঝদার শ্রোতা ছিলেন, সংগীতের তত্ত্ববিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা যথেষ্ট ছিল এবং ঐ বিষয়ে তাঁর রচিত প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আত্মীয়বৎসল ও বন্ধুবৎসল তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত বাগ্‌দেবীর উপাসনায়। নিত্যনিয়মিত পড়াশোনাই ছিল তাঁর অভ্যাস। জীবনের শোকে দুঃখে যদি কোথাও কিছু সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন, তাহলে তাও এই বাগ্‌দেবীর আরাধনা থেকেই। এই আরাধনা পূর্ণতর হবে বলেই তাঁর বিশ্বভারতীতে যাওয়া। সেখান থেকে কলকাতাতেও তিনি বড় একটা আসতে চাইতেন না। আমাদেরও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ বেশি হত না।

বিদ্যা ভিন্ন চরিত্রের দিক দিয়ে দেখলেও তাঁর মত সহৃদয়, সজ্জন ও গুণী লোক সুলভ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে পেয়ে খুবই তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। তাঁর কর্মময় জ্ঞানব্রতী জীবনের এই আকস্মিক অবসানে বন্ধুরা যে বিয়োগকাতর হবেন, তা তো স্বাভাবিক। জীবনে তাঁকেও দারুণ শোক সহ্য করতে হয়েছিল; পূর্বে এক কন্যাকে হারিয়েছিলেন, পরে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে খানিকক্ষণের জন্য কেমন হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বভারতীর আসন্ন সমাবর্তন-উৎসবের কার্যের জন্য নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" আমাদের জীবনের সাধনা; সেই সাধনার পরিচয় কেমন সহজভাবে তিনি সেদিন দিয়েছিলেন সে কথা মনে পড়ে। শান্তমূর্তি সংযতবাক্ অথচ কর্মতৎপর তাঁর মূর্তি চোখের সামনে যেন বারবার ভেসে উঠছে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ছাত্র ও কর্ম-জীবন

১৮৯৮ ॥ যশোহর জেলার শ্রীকোল গ্রামে জন্ম। শিক্ষা আরম্ভ হয় ওই গ্রামেরই বিদ্যালয়ে। পরে মাগুরা শহরে শিক্ষা লাভ করেন।

১৯১৪ ॥ মাগুরা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৮ ॥ কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯২০ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ধর্ম-ইতিহাস বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২১ ॥ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি শান্তিনিকেতনে

এলে তাঁর কাছে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্য দেশগুলি বিশেষভাবে চীনদেশের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি এই সময়েই তাঁর দৃষ্টি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়।

১৯২২ ॥ আচার্য লেভির সঙ্গে নেপালে যান। নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাজ করেন।

১৯২২-২৫ ॥ স্যর রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে ইন্দোচীন ও জাপান থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ সালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান। দুই বৎসর কাল তিনি আচার্য লেভি ও আচার্য পেলিওর কাছে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। Association des Eutudiants Hindo des France (Association of Indian Students in Paris) নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক।

১৯২৬ ॥ পারিসের সর্বোত্তম উপাধি Docteur-ès-Letters (State Doctorate) লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল চীন দেশে বৌদ্ধ সাহিত্য। পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক এই গবেষণা বিশেষভাবে আদৃত হয়। ১৯২৬ সালেই দেশে ফিরে আসেন।

১৯২৮-২৯ ॥ দোঁহাকোষ চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয়বার নেপালে যান।

১৯৩০-৪৪ ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে দোঁহাকোষের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ (১৯৩৫), চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা (১৯৩৮) Studies in the Tantras (১৯৩৯), ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালে মাজুতে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। দিব্য-স্মৃতি-উৎসব চতুর্থ অধিবেশনে (৬ চৈত্র ১৩৪৪, ভীমেরগড়, বদরগঞ্জ, রংপুর) সভাপতিত্ব করেন। গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১৬শ অধিবেশনে (১৯৩৮) বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৯ সালে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৩ সালে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস পরিষদে (Indian History Congress) প্রাচীন ভারত (৭১১ খ্রী পর্যন্ত) শাখার সভাপতি হন।

১৯৪৪ থেকে স্বকীয় প্রচেষ্টায় Sino-Indian Studies নামে চীন-ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা-পত্রিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯৪৫ ॥ বিশ্বভারতীর চীনভবনে গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৪৬ ॥ নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন (All India Oriental Conference) -এর নাগপুর অধিবেশনে পালি ও বৌদ্ধধর্ম শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৯৪৭ ॥ Visva-Bharati Annals নামক গবেষণা-পত্রিকার পরিকল্পনা করেন ও সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন। পেকিঙ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপক রূপে চীনদেশে যান।

১৯৪৮-৫১ ॥ বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অবসর গ্রহণের পর বিদ্যাভবন বা গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন। যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Education) হেমচন্দ্র বসু মল্লিক

-অধ্যাপক রূপে বক্তৃতা দেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হলে ইতিহাসের অধ্যাপক এবং স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১৯৫২ ॥ শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি সংঘের সদস্যরূপে চীনদেশে যান।

১৯৫৪ ॥ বিশ্বভারতীর উপাচার্য নির্বাচিত হন।

অ.

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর গ্রন্থপঞ্জী

ভারত ও ইন্দোচীন। প্রকাশক শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী। পৃ ।০, ১০৪। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত, ভাদ্র ১৩৫৭, বিশ্বভারতী।

সূচী: ঐতিহাসিক পটভূমিকা। ইন্দোচীনের পথে। কম্বোজের পথে। এঙ্কোরের ধ্বংসাবশেষ। চম্পার পথে। চম্পার ধ্বংসাবশেষ।

ভারত ও মধ্য-এশিয়া। ভারতী ভবন। পৃ ।৵০, ১১০। ১৯৩৭? বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত, আশ্বিন ১৩৫৭, বিশ্বভারতী।

সূচী: পথঘাটের কথা। মধ্য এশিয়ার প্রান্তভূমি। কাশগর ও খোটান। তুন্-হোয়াংএর পথে। কুচী ও অগ্নিদেশ। পরিশিষ্ট: মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান।

বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য। ভারতী ভবন। পৃ ।৵০, ১০২। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত, মাঘ ১৩৫৯, বিশ্বভারতী।

সূচী: বৌদ্ধ সাহিত্য। বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। হীনযান—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। মহাযান—নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন। মহাযান যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। বজ্রযান ও সহজযান। পরিশিষ্ট: পালি বৌদ্ধ সাহিত্য। তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য। চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য। নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য। মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য। মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য। ধম্মপদ।

ভারত ও চীন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, কার্তিক ১৩৫৭, বিশ্বভারতী। পৃ ।০, ৭৮।

সূচী: মৈত্রীর সূত্রপাত। গুপ্তযুগে চীনদেশে ভারতীয় পণ্ডিত। ভারতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম। চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব। চীনদেশে ভারতীয় সংগীত। চীনদেশে হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান। পরিশিষ্ট: যে সব ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা।

INDIA AND CHINA. Greater India Society Bulletin 2. Calcutta. January-February 1927. Pp 42.

Contents: The Beginning of the Historical Relation: China and India; Foreign Policy of China; Unoffical Relation; Introduction of Buddhism; Ancient Routes of Communication; Ser-Indian Intermediaries; The Tibeto-Mongol Intermediaries; Indo-China and Insulindia; Sino-Indian Collaboration.

LE CANON BOUDDHIQUE EN CHINE LES TRADUCTEURS ET LES TRADUCTIONS. Tome I, pp lii, 436. 1927. Tome II, pp vi, 437-742. 1938. Sino-Indica Publications de L'Université de Calcutta.

An inventory of Chinese Tripitaka classified according to periods and regions. The first part is devoted to the Buddhist monasteries of the North (68-581 A.D.), the second part to those of the South (222-589. A.D.) with extensive notes on their literary activities, the life and writings of the principal missionaries. The history of penetration of Buddhism into China is given in the Introduction.

The second volume continues the history of translators and translations till 1368 A. D. It also gives an account of the non-canonical works compiled in China and Japan till the latest period, works that are of help to the study of Buddhist literature.

DEUX LEXIQUES SANSKRIT-CHINOIS : FAN YU TSA MING DE LI YEN, ET FAN YU TS'IEN TSEU WEN DE YI-TSING Tome 1, pp iv, 336. 1929. Tome 2, pp. viii, 337-540. 1937. Sino-Indica Publications de l'Université de Calcutta. 'The first volume gives the text of two Sanskrit-Chinese dictionaries, the FAN YU TSA MING of Li Yen and the FAN YU TS'IEN TSEU WEN of Yi-Tsing in a facsimile reprint from Japanese wood-block editions published in the 18th century, together with a Roman transcription of the FAN YU TSA MING, accompanied by French equivalents of the words occurring in it ; the Chinese characters in this lexicon have been transcribed from a standard modern pronunciation and the Sanskrit words have been transliterated, corrections (which are numerous) being given within brackets. The second volume contains full accounts of the two works, and their authors ; and the words are submitted to orthographical, linguistic and lexicographical survey.'

KAULA-JÑĀNA-NIRṆAYA AND SOME MINOR TEXTS OF THE SCHOOL OF MATSYENDRA-NĀTHA. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta, 1934. Pp. viii, 92, 148.

Critical edition of Sanskrit texts discovered in Nepal in 1921 and 1929, with introduction and notes.

AN INTRODUCTION TO THE ADHYĀTMA-RĀMĀYAṆA. Reprinted from ADHYĀTMA-RĀMĀYAṆAM in the Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta. 1935? Pp. 78.

DOHĀKOṢA, WITH NOTES AND TRANSLATIONS. Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII, Calcutta University. 1935. Pp. viii, 180. Critical edition of the DOHĀKOṢA, discovered in Nepal in 1929, in Apabhraṁśa language, of Tillopāda, Sarahapāda (with the Sanskrit commentary by Advayavajra), and Kṛṣṇapāda (with the Sanskrit commentary called MEKHALĀ).

DOHĀKOṢA, (APABHRAṀŚA TEXTS OF THE SAHAJAYĀNA SCHOOL). Part 1, Texts and Commentaries. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, Calcutta, 1938. Pp. viii, 167.

A new edition of the book noted above ; Sanskrit paraphrase (*Chāyā*) of the texts has been added ; and notes and translations have been excluded, for inclusion in a proposed second part.

MATERIALS FOR A CRITICAL EDITION OF THE OLD BFNGALI CARYĀPADAS (A COMPARATIVE STUDY OF THE TEXT AND THE TIBETAN TRANSLATION). Part 1. Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol xxx, Calcutta University 1938. Pp x, 156.

'I began a study of these songs for my researches in the history of later Buddhism and I found out that it was almost impossible to interpret the songs without the help of the Tibetan texts. After a considerable fruitless search I finally succeeded in discovering the Tibetan translation of the poems.···The Tibetan translation provides us with materials for the first critical edition of the Caryapadas.···In the present study I have taken into consideration only the translation of the Caryāpadas. I have given a literal Sanskrit rendering of the Tibetan translation with notes···' —Introduction.

STUDIES IN THE TANTRAS. Part I. Calcutta University, 1939. Pp. viii, 114.

Contents : On some Tantrik texts studied in Ancient Kambuja ; Further notes on the same ; The SANDHABHĀSĀ and SANDHĀVACANA ; On the SĀDHANAMĀLA ; On Foreign element in the Tantra ; Some technical terms of the Tantras ; Some aspects of Buddhist mysticism in the CARYĀPADAS ; Notes on the word PARĀVṚITTI ; and detailed notices on the following manuscripts : NIŚVĀS-TATTVA-SAṀHITĀ ; SAMMOHA TANTRA ; BRAHMAYĀMALA ; PIṄGALĀMATA JAYADRATHAYĀMALA.

INDIA AND CHINA, A THOUSAND YEARS OF SINO-INDIAN CULTURAL CONTACT. China Press, P27 Prinsep Street, Calcutta. April 1944. Second Edition, Hind Kitabs, Bombay. 1950. Pp viii, 234.

Contents : Routes to China and the First contact ; Buddhist Missonaries of India to China ; Ancient Chinese Pilgrims to India ; Appendixes (i) Some letters of Hiuan-Tsang and his Indian friends (ii) Chinese inscriptions of Bodhgaya ; Buddhism in China ; Buddhist Literature in China , Indian Art and Sciences in China ; The two Civilizations— a synthesis ; China and India ; Appendix (iii) Biographical notes on Indian scholars who worked in China.

DISCOURSES ON BUDDHISM. Reprinted from the Visva-Bharati Quarterly. February-April 1949. Visva-Bharati. [1949]. Pp 16.

'These are essentially some of the lectures delivered in Peiping in 1948 by the author as the first Visiting Professor from India to China.'

Contents : Buddhism and Ancient Indian Thought ; Buddhism—The First Popular and Theistic Religion ; Hinayāna and Mahāyāna ; Place of Buddhism in Indian Life.

INDIA AND CENTRAL ASIA. Lectures delivered at the National Council of Education, Bengal, during 1949-51 as the Hemchandra Basu Mallik Professor of Indian History. Pp viii, 184. National Council of Education, Jadavpur, Calcutta, 1955 [1956].

Contents : Nomadic Movement of Central Asia ; Tokharestan and Eastern Iran ; Eastern Turkestan—The Southern States ; EasternTurkestan—The Northern States ; Language and Literature. Appendixes (i) Role of Central Asian Nomads in Indian History (ii) Cūlika, Śulika and Cūlika—Paisaci (iii) Kuchean or Western Arsi.

PRE-ARYAN AND PRE-DRAVIDIAN IN INDIA. By Sylvain Lévi, Jean Przyluski and Jules Bloch. Translated from French by Prabodh Chandra Bagchi. Calcutta University, 1929.

Prabodh Chandra Bagchi contributed :

Introduction, pp i-xviii

Some more Austric words in Indo-Aryan, pp xxv-xxxix

Note on Tosala and Dhauli, pp 176-78.

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতির অভিভাষণ। হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মিলনী, মাজু ১৯৩৭। পৃ ১৬

সভাপতির অভিভাষণ। দিব্যস্মৃতি উৎসব, চতুর্থ অধিবেশন, ৬ চৈত্র ১৩৪৪। ভীমের গড়, বদরগঞ্জ, রঙ্গপুর। পৃ ২১

সভাপতির অভিভাষণ। বৃহত্তর বঙ্গ শাখা, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, ষোড়শ অধিবেশন, গৌহাটি। ১৩৪৫। পৃ ১৯

Presidential Address : The Indian History Congress, Aligarh, 1943, Section 1 : Ancient India up to 711 A. D. Pp 128

Presidential Address : All India Oriental Conference, Nagpur 1946, Section : Pali and Buddhism. A reprint from the Proceedings and Transactions.

বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও প্রবন্ধসংগ্রহে মুদ্রিত রচনার সূচী যথাসাধ্য সংকলন করিয়া ১৯৫৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা VISVABHARATI NEWS পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পত্রে পুস্তকের তালিকাও মুদ্রিত হইয়াছে; তাহা পরিবর্ধিত আকারে এখানে প্রকাশিত হইল; এই সংশোধিত তালিকায় পুস্তকের বিবরণ, অধ্যায়সূচী ইত্যাদিও যোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্বমুদ্রিত তালিকাভুক্ত কলিকাতা-পরিচায়ক তিনখানি পুস্তক-পুস্তিকা (13-15), ও বিদ্যালয়পাঠ্য একখানি গ্রন্থ (21) বর্তমান তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীকল্যাণকুমার সরকার
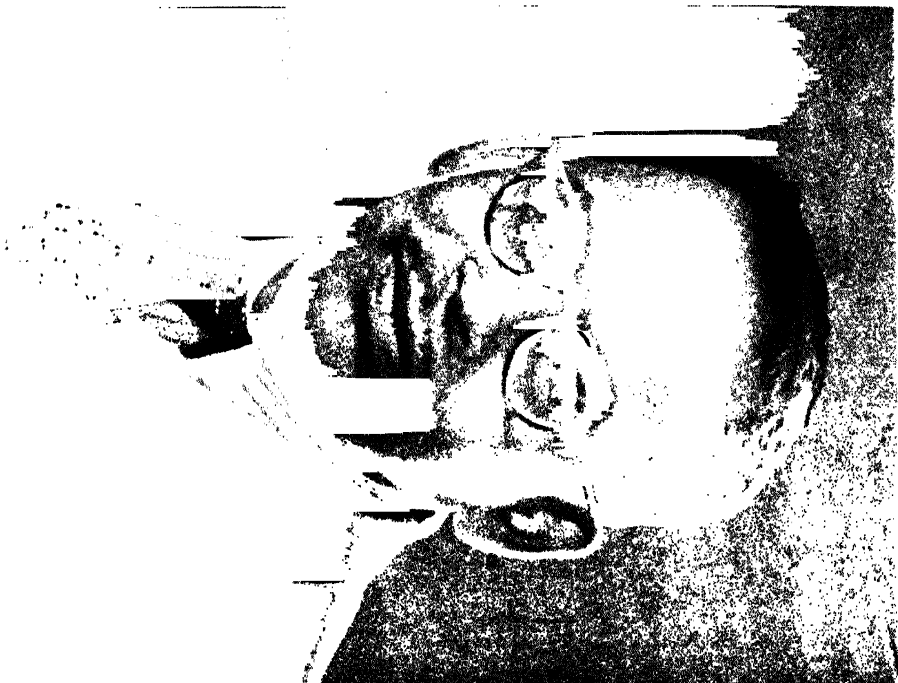
মেঘনাদ সাহা

জন্ম : ৬ অকটোবর ১৮৯৩ মৃত্যু : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৫ আগষ্ট ১৮৯১ মৃত্যু : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

মেঘনাদ সাহার আবিষ্কার

যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মেঘনাদ সাহা রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে বৃত হয়েছিলেন, অনেকে মনে করেন, সেই আবিষ্কারের কৃতিত্বে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলে নোবেল পুরস্কারের মান এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হত না।

এই আবিষ্কারের পরিচয় দেবার আগে কয়েকটি পূর্বকথার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানী অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। একটা অক্সিজেন অ্যাটমের ওজন 16 ধরে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অ্যাটম-ভার বের করা হয়েছে। ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে অ্যাটম-ভার দাঁড়াল, হাইড্রোজেনের 1, তার পর হিলিয়মের 4, তার পরেরটার 7, তার পরেরটার 9 — এই রকম চলে গিয়ে সবচেয়ে ভারি ইউরেনিয়মের অ্যাটম-ভার হল 238। দেখা গেল, ওইসব অ্যাটম-ভারের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই, খামখেয়ালিভাবে তারা বেড়ে চলেছে। মোজ্‌লে নামে একজন বিজ্ঞানী এক্‌স্-রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেখলেন যে, পরপর অ্যাটমদের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। বায়ুশূন্য কাচের বাল্‌বের মধ্যে ইলেক্‌ট্রনরা ধাক্কা দিয়ে এক্‌স্-রশ্মির সৃষ্টি করে। যাকে আঘাত করে মোজ্‌লে সেই জিনিসটাকে অ্যাটম-ভারের গুরুত্ব অনুসারে বদলে বদলে যেতে থাকলেন; প্রতিবার নির্গত এক্‌স্-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য মাপতে রইলেন। পরপর পদার্থগুলির অ্যাটম-ভার বেহিসেবে বেড়ে চলেছে, কোনো নিয়ম নেই; কিন্তু মোজ্‌লে দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, তাদের থেকে যে, বিভিন্ন তরঙ্গ বেরচ্ছে সেই তরঙ্গদের দৈর্ঘ্যের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু এ শৃঙ্খলা আসবে কেন? এ কথার মীমাংসা হল পরে।

মোজ্‌লে মৌলিক পদার্থগুলিকে তাদের অ্যাটম-ভারের গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে গেলেন, ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে গেলেন 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। অনাবিষ্কৃত কয়েকটি মৌলিক পদার্থের স্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরেনিয়মের সংখ্যা পড়ল 92। এগুলিকে বলা হল অ্যাটম-অঙ্ক। মোজ্‌লে বললেন, একটি মৌলিক পদার্থের প্রকৃত পরিচয় হল তার অ্যাটম-অঙ্ক, অ্যাটম-ভার নয়।

পদার্থ তো হল অ্যাটমের সমষ্টি, কিন্তু অ্যাটমরা মূল বস্তু নয়। প্রমাণ পাওয়া গেল, বিশ্বে মূল বস্তু হল— ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মেসন, আর সম্ভবত নিউট্রিনো। পজিট্রন, মেসন ক্ষণজীবী; নিউট্রিনো এখনও আছে খাতায়-কলমে; বাকি তিনটে হল, ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। এই তিন মূল বস্তু দিয়ে অ্যাটম তৈরি। চুন সুরকি আর ইট দিয়ে যেমন হরেক রকমের বাড়ি তৈরি হয়, সেই রকম ওই তিনটি মূল বস্তু দিয়ে 92টি বিভিন্ন রকমের অ্যাটম গঠিত।

ধরে নেওয়া হল যে, একটা অ্যাটমের দুটো অংশ আছে, কেন্দ্রক ও বাহির। অ্যাটমকে তো মানুষ চোখে দেখতে পায় না, কিন্তু দৃষ্টির অগোচর এই অ্যাটম তার ভিতরের আর বাইরের কোনো খবরই মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

বাইরের কথায় আসা যাক।

অ্যাটমের বাইরে আছে শুধু ইলেক্‌ট্রন, আর কিছু নেই; আর প্রতি অ্যাটমেই তাই আছে। কিন্তু ক'টা করে ইলেক্‌ট্রন আছে? এখানে হিসেবটা ভারি সোজা। আমাদের মনে রাখতে হবে গোটা অ্যাটমটি তড়িৎশূন্য। সেই অ্যাটমের অ্যাটম-অঙ্ক যত, তার বাইরের ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা তত। একটা

উদাহরণ নেওয়া যাক। সোনার অ্যাটম-অঙ্ক হল 79। আমাদের হিসেবে দাঁড়াল, সোনার একটা অ্যাটমের বাইরে আছে 79টা ইলেক্‌ট্রন।

একটা অ্যাটমের চিত্রটা মোটামুটিভাবে একবার দেখা যাক। প্রথম হাইড্রোজেন। এর বাইরে একটা ইলেক্‌ট্রন আছে, কেন্দ্রকে আছে প্রোটন। কেন্দ্রকের এই প্রোটন থেকে ইলেক্‌ট্রনটি কত দূরে আছে? রাদারফোর্ড আল্‌ফা-রশ্মি পাঠিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে তার একটা আভাস দিলেন। আগে অনেক পরীক্ষা থেকে সমস্ত অ্যাটমটার ব্যাসের একটা হিসেব পাওয়া গিয়েছিল। এখন দেখা গেল, কেন্দ্রকে ওই প্রোটনের ব্যাস সমস্ত অ্যাটমটার ব্যাসের প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাকিটা একেবারে খালি পড়ে রয়েছে।

একটা অ্যাটমের রাসায়নিক ধর্ম আর তার বর্ণালি মোটামুটিভাবে নির্ভর করে বাইরে ইলেক্‌ট্রন-সংখ্যা কত তার উপর। অত্যধিক উষ্ণতায়, উচ্চ বিভবের তড়িৎপ্রয়োগে, নিকটে এক্‌স্‌-রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আনলে বাইরের ইলেক্‌ট্রন বেরিয়ে যায়।

মেঘনাদ সাহা অঙ্ক কষে বের করলেন, কত উষ্ণতায় একটা অ্যাটম থেকে তার ইলেক্‌ট্রনকে তাড়ানো যেতে পারে। একটা অ্যাটম থেকে যখন তার বাইরের ইলেক্‌ট্রন চলে যায় তখন ইলেক্‌ট্রন-বর্জিত এই অ্যাটমের বর্ণালি গোটা অ্যাটমের বর্ণালির সমান হয় না। সূর্যের বর্ণালিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের জন্য তাদের নির্দিষ্ট রেখা দেখা যায়, কিন্তু অপর পদার্থজনিত রেখা পাওয়া যায় না। এর সঠিক কারণ আগে জানা ছিল না। সাহার গণনা থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হল। জানা গেল, সূর্যের যে উত্তাপ সে উত্তাপে সূর্যস্থিত ওই মৌলিক পদার্থগুলি তাদের বাইরের ইলেক্‌ট্রন হারিয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালিতে কোন্‌ কোন্‌ রেখা লোপ পেয়েছে দেখে সাহা তাঁর হিসেব দিয়ে ওই-সকল নক্ষত্রের উষ্ণতা নিরূপণ করলেন। তিনি নক্ষত্রগুলিকে তাদের উষ্ণতা অনুসারে ছ'টি বিভিন্ন দলে ভাগ করলেন। আগে জ্যোতির্বিদেরা নক্ষত্রগুলিকে তাদের ঔজ্জ্বল্য অনুসারে ছ'টি দলে ভাগ করেছিলেন; তাঁদের সে বিভাগ ও সাহার বিভাগ একেবারে মিলে গেল। আর-একটা কথা এল। সূর্যের চেয়ে সূর্য-কলঙ্কের উষ্ণতা কম। সাহা হিসেবে দেখালেন যে, সূর্যকলঙ্কের কম উষ্ণতায় কয়েকটি মৌলিক পদার্থ তাদের বাইরের ইলেক্‌ট্রন হারায় নি, সুতরাং সূর্যকলঙ্কের বর্ণালিতে তাদের নির্দিষ্ট রেখা পাওয়া যাবে। সাহার এ কথার যাচাই হল। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের বড়ো দূরবীন দিয়ে জ্যোতির্বিদ রাসেল সূর্য-কলঙ্কের বর্ণালিতে ওইসব রেখা দেখতে পেলেন। একটা অ্যাটমের বাইরের অংশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানী যে চিত্র এতদিন কল্পনা করে আসছিলেন, সাহার গবেষণা তাকে সমর্থন করল।

মেঘনাদ সাহা জ্যোতির্বিদ্যার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পরিণত বয়সে পৌছবার আগেই অবসর নিতে হয়েছিল শারীরিক অসুস্থতার জন্যে। তিনি যখন ছুটি নিয়ে দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন তখন আমরা সকলেই আশা করেছিলাম যে, একটানা কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে নীরোগ হয়ে তিনি ফিরে আসবেন। কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন একটু ভালোও ছিলেন। সুতরাং ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকেলবেলা যখন টেলিফোনে খবর এল যে, বিজনবাবু শেষ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপ্রস্থান-পথে চলে গেছেন তখন আমাদের সকলেরই মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে গেল। আমরা ক'জন তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুকাল কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তাঁর নিকটসান্নিধ্যলাভ করেছিলাম, সেইজন্যে তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে যেন একটা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলেই মনে হল।

১৮৯১ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে বিজনকুমারের জন্ম হয় নবদ্বীপ অঞ্চলের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে। তাঁর পিতা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন কিন্তু তিনি কাজ করতেন হুগলী জেলা-আদালতে। সেইজন্যে বিজনকুমারের বাল্যশিক্ষা হয়েছিল হুগলীতে। পরে তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন। ইতিহাসচর্চা করেছিলেন এবং ইতিহাসেই এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। একে একে বি. এল. এবং এম. এল. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তিনি অনাথ দেব গবেষণা-বৃত্তিও লাভ করেছিলেন।

১৯১৪ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হয়েছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে ছোকরা উকিলের দন্তস্ফুট করা যে কি কঠিন কাজ তা যিনি না ভুগেছেন তিনি সহজে বুঝবেন না। দিনের পর দিন আদালতে যাওয়া এবং রিক্তহস্তে ফিরে আসা এক মর্মান্তিক ব্যাপার। আশায় আশায় কিছু দিন চলে, কিন্তু শেষে যেন মন দুর্বল হয়ে ভেঙে আসে। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে যদি বরাত ফিরল তবেই সে উতরে গেল। এই মর্মন্তুদ কষ্টের মধ্যে দিয়ে বিজনকুমারকেও যেতে হয়েছিল। যখন আর চলছিল না তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে বিহারে গিয়ে ওকালতি করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় স্বর্গগত মনস্বী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নজর পড়েছিল এই মেধাবী কৃতবিদ্য ছাত্রটির 'পরে। তিনি বিজন-কুমারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের একটি অধ্যাপকের পদ দান করলেন। বিজনকুমারের জীবনরথের চাকা ঘুরল। হঠাৎ একদিনে নয়, দিনে দিনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবসরের ফাঁকে ফাঁকে অধ্যয়ন করে তিনি ডি. এল. উপাধি লাভ করলেন। এই সময়ে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা তাঁর পরিণত বয়সে খুব কাজে এসেছিল। আইন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এবং হাতে কলমে ওকালতি করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর আইন-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মিতার সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাঁর বাগ্মিতায় পুলিস কোর্টের কিংবা সেশন্‌স্ আদালতের থিয়েটারি ঢঙ ছিল না। তাঁর ভাষায় এবং বলবার ধরনে একটা কমনীয়তা ছিল। ক্রমশঃ তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল জজেদের কাছে এবং তার চেয়েও কঠিন যে ঠাঁই সেই উকিল-মহলে। ১৯৩৪ সালে তিনি ছোট সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হলেন এবং দু বছরের

মধ্যে বড় সরকারী উকিলও হয়েছিলেন। তার পর যা হওয়া উচিত তাই হল। তিনি ১৯৩৬ সালে মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতের জজ হলেন।

বিজনকুমার ওকালতি ব্যবসায়ে খুব বড় হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জজিয়তিতে তিনি আরো মহীয়ান হয়েছিলেন। কোমল স্বভাবে এবং মধুর বাক্যালাপে তিনি সকলের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নেহাত ছোকরা উকিলও তাঁর ঘরে নির্ভয়ে সওয়াল জবাব করে খুশি হয়ে ফিরে আসত। তাঁর সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে একসঙ্গে বেঞ্চে বসবার সুযোগ আমার হয়েছিল— তাঁর ব্যবহারের সৌজন্য ও ভাষার অমায়িকতার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

১৯৪৭ সালে যে সীমানা-কমিশন বসেছিল বিজনবাবু তার একজন সভ্য হয়েছিলেন। সেই সূত্রে তাঁকে পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গের ভাগবাঁটোয়ারার কাজ করতে হয়েছিল। পর বৎসরই তিনি ও শ্রদ্ধেয় মেহেরচন্দ মহাজন তখনকার দিনের ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। কর্তব্যের ডাকে তাঁকে কলকাতা ছেড়ে, নিজের একমাত্র পুত্রকে সেখানে রেখে দিল্লী চলে আসতে হয়েছিল। তার পর আমাদের সুপ্রীম কোর্টের জজ হলেন এবং শ্রীযুত মেহেরচন্দ মহাজন সাহেব ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে অবসর নিতে বিজনকুমার ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়াধিকরণের মুখ্য ন্যায়াধীশের আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁকে ছুটি নিতে এবং কিছুদিন পরে অকালে অবসর নিতে হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর বিখ্যাত টেগোর ল লেকচার লিখেছিলেন হিন্দু দেবোত্তর আইন সম্বন্ধে।

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারাসনে তিনি গভীর ব্যবহারজ্ঞান, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি এবং অপক্ষপাত ন্যায়পরতার উচ্চ আদর্শ অম্লান উজ্জ্বলভাবে রক্ষা করে গেছেন। গুরুদেবের বাণী "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে" বিজনবাবুর জজিয়তী জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। যে-সকল রায় তিনি লিখে গেছেন তার মধ্যে একটা নির্ভীক অথচ সংযত দৃঢ়তা দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কতকগুলি পুরোনো নজিরের মালা তিনি গেঁথে যান নি। তিনি আইনের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে তার সারমর্মটুকু অনমুকরণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে রেখে গেছেন একাল এবং পরবর্তী কালের জন্যে। তিনি জজ হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টের এবং সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহ্যকে উজ্জ্বল করে গেছেন।

বিজনকুমারের কর্মক্ষেত্র শুধু আইন-আদালতেই আবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। এটা বোধ হয় তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে পাওয়া, তিনিও বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য তিনি সংস্কৃতে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যের রসে তিনি ভরপুর ছিলেন। যেমন অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন গুরুদেবের কাব্যগ্রন্থ থেকে, তেমনি অনায়াসে বলতে পারতেন কালিদাস ও ভবভূতি থেকে। ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ লক্ষ্য করেছি। বৈষ্ণব সাহিত্য নবদ্বীপের লোকের তো রক্তমাংসেই মিশিয়ে থাকে। তিনি সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং "সরস্বতী" উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য হয়েছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকালটিরও সভ্য ছিলেন।

তাঁর পারিবারিক জীবন কঠোর সংযমের মধ্যেই কেটেছে। যৌবনেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। একমাত্র শিশুপুত্র রেখে তাঁর সহধর্মিণী ইহলোক থেকে চলে যান—বিজনকুমারের বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়।

শুনেছি শিশুপুত্রের কথা স্মরণ করে তাঁর পত্নী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, শিশুটি যেন বিমাতার কাছে কষ্ট না পায়। সে অনুরোধ বিজনকুমার আজীবন রক্ষা করে গেছেন, শিশুপুত্রের মা বাবার কাজ একাধারে পালন ক'রে।

বিজনকুমার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সর্বগুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে সংযম, নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা ছিল। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে-ই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছে তাঁর উন্নত চরিত্রের অম্লান পবিত্রতার পরিচয়ে। একাধিক লোকের মুখে শুনেছি—"বিজনবাবুর কাছে দু দণ্ড বসে কথা শুনে এলে মনে হয় গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হয়ে ফিরে এলাম।" মানুষ মানুষকে এর চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা কী আর জানাতে পারে?

বিজনবাবুর মৃত্যুতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হল। আদর্শ ন্যায়াধীশ, গভীর-শাস্ত্রজ্ঞানী, অমায়িক সুজন— যে ভাবেই তাঁকে দেখি না কেন, দেশে ও সমাজে তাঁর স্থান শীঘ্র পূরণ হবার নয়। আর, আমরা যাঁরা তাঁর সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছি, তাঁর সুখদুঃখের ভাগ নিয়েছি ও তাঁকে আমাদের সুখদুঃখভাগী করেছি, আমরা হারালাম আমাদের অশেষ গুণবান্ সতীর্থকে, শ্রদ্ধাভাজন নেতাকে আর পরম প্রেমাস্পদ সুহৃদকে—আমাদের ক্ষতি কোনোদিনই পূরণ হবার নয়।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

চিত্রপরিচয়

পৃ ৩২০

আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি যখন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনাকর্মে যোগ দেন (১৯২১) সেই সময় প্রবোধচন্দ্র বাগচী গুণী ছাত্ররূপে তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন; তাঁরই আগ্রহাতিশয়ে এবং তাঁরই সহকারীরূপে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অবশেষে প্রবোধচন্দ্র প্যারিসে যান তাঁর গবেষণা সম্পূর্ণ করতে— ছবিটি সেই সময়কার (১৪ এপ্রিল ১৯২৬)। প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে আমার প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পূর্বে (১৯২৩) প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Indian Civilization বা ভারত-সংস্কৃতি-পরিষৎ সংগঠনে অধ্যাপক লেভিকে সাহায্য করার ভার তিনি গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সুধী ডক্টর নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী (যিনি পরে Archaeological Survey of Indiaর সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন) এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি এই পরিষদের কাজে আকৃষ্ট করেছিলেন— চিত্রে মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আচার্য লেভির যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে এঁদের দেখা যাচ্ছে; নিরঞ্জনপ্রসাদের দক্ষিণে প্রবোধচন্দ্র। চিত্রে যে বিদেশী মহিলাকে (Mmlle N. Tchoupak শ্রীমতী চুপাক্) দেখা যাচ্ছে, তিনি

পোল্যাণ্ডের অধিবাসী, সংস্কৃত ভাষায় বিদুষী—বহুকাল তিনি উক্ত ইনস্টিট্যুটের সম্পাদিকার কার্য নির্বাহ করেছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র দেশে ফিরে এলে Indo-Latin Societyর কাজে তাঁকে পেয়েছি, সুবোধচন্দ্রও এই প্রতিষ্ঠানের মারফত ফরাসী সংস্কৃতি-চর্চার প্রসারে তাঁর সহযোগী ছিলেন। পরে যখন Greater India Society বা বৃহত্তর ভারত পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করি তখন পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থমালায় তিনি China and India নামে একটি পুস্তিকায় তাঁর গবেষণার ফল সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় চৈনিক বৌদ্ধধর্ম, ইন্দো-চীন, চীন ও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে পরিষৎ-স্থাপনার উদ্দেশ্যকে তিনি সার্থক করেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত চিত্রপরিচয় লিখতে গিয়ে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের সেই সহযোগের নানা মধুর স্মৃতি মনে পড়ছে।

শ্রীকালিদাস নাগ

পৃ ৩৩৬

ভারতবর্ষ যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন আসন লাভ করবে জগদীশচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে তা একরূপ কল্পনার অতীত ছিল— আধুনিক বিজ্ঞানের দীপালিতে ভারতবাসী তিনিই প্রথম 'ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ' করতে পেরেছিলেন। তারপর দীপ থেকে দীপমালা আলোকিত হয়ে চলল জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রধারার সাধনায়। এই সাধকদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, আচার্যসন্নিধানে তাদের কয়েক জনের ছবি এই চিত্রে সংগৃহীত হয়েছে।

নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ— আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্কার ক'রে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের সূচনা করলেন। নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ আগ্রা কলেজে সে-সম্বন্ধে গবেষণায় রত থাকেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'লে আচার্যদেব নগেন্দ্রচন্দ্রকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁর সহকারী পরিচালকরূপে গ্রহণ করেন।

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু— বিজ্ঞান কলেজে প্রথম ঘোষ অধ্যাপক পরে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের দেহাবসানের পর হতে এখন অবধি তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিণত করেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন— একই বছর এই কয়টি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ ক'রে নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় রত হলেন, আর তাঁদের আবিষ্ক্রিয়া ভারতকে জগৎসভায় এক উন্নীত আসন দান করল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরকমটি আর কোনদিন দেখা যায় নি।

স্নেহময় দত্ত— লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্-সি উপাধি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করেন। পরে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রকসনের পদ অলংকৃত করেন।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য